ডঃ বাবাসাহেব

আম্বেদকর

ধনঞ্জয় কীর

বাংলা রূপান্তর ঃ

সুধীর রঞ্জন হালদার

ডঃ বাবাসাহেব

আম্বেদকর

আম্বেদকর প্রণাম

হে বাবাসাহেব আম্বেদকর, ভারতরত্ন তুমি,
তোমায় বক্ষে ধরিয়া ধন্য হয়েছে ভারত-ভূমি।
জাতির লাগিয়া দিয়েছ বিধান সাম্যের গড়া ভিতে,
জাতপাত ছাড়ি সকলারে হবে সম-অধিকার দিতে।

মানবাধিকার ফিরাবার লাগি আজীবন লড়েছিলে,
দলিত-শ্রমিক, নারী-অসহায়ে মুক্তিমন্ত্র দিলে।
তোমার লড়াই– সকলের লাগি সম-অধিকার চাই,
ছোটোবড়ো নয় কেউ এ জগতে, সকলে সমান ভাই।

চিরবঞ্চিতে অধিকার দিতে আজীবন লড়ে গেলে,
বিনিময়ে শুধু তোমার ললাটে কলঙ্কটিকা পেলে।
ছিলে সকলের– সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাকামী বীর,
তবুও পেয়েছ স্বরাজবিরোধী অপবাদমাখা তির।

স্বার্থের লোভে ক্ষমতালিপ্সু যত কপটের দল,
মিথ্যা প্রচারে হীন কৌশলে করিয়াছে দুর্বল।
জাতপাতে যারা বিভেদ বানায় সব মানুষের মাঝে
মিথ্যে মায়ায় ধোঁকা দিয়ে দেখি তারা 'মহাত্মা' সাজে!

তুমিই জ্বালালে আমাদের প্রাণে নব-চেতনার আলো,
ঘুচালে মনের গভীরে লুকানো যতেক আঁধার কালো।
তোমার যা দান নিয়েছে সবাই চেনেনি তোমায় যারা,
বর্ণবাদীর মোহজালে আজও হয়ে আছে দিশেহারা।

তবু জানি তুমি যে আলোর শিখা রাখিয়া গিয়াছ জ্বালি,
সে আলোর পথে একে একে এসে মনপ্রাণ দেবে ঢালি।
চিরদিন রবে বিশ্ব জুড়িয়া অম্লান তব নাম,
হে বাবাসাহেব, তোমার উদ্দেশে রাখি হাজার প্রণাম।

ডঃ বাবাসাহেব

আম্বেদকর

মূল রচনা ঃ ধনঞ্জয় কীর

বাংলা রূপান্তর ঃ সুধীর রঞ্জন হালদার

গুরুদাস প্রকাশনী

পালপাড়া, চাকদহ, নদিয়া।

উৎসর্গ

বাংলা ভাষাভাষী সকল আম্বেদকর অনুরাগীদের উদ্দেশে–

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। সুধীর রঞ্জন হালদার, পালপাড়া, চাকদহ, মোঃ 9433814298.
২। সুবোধ কাইয়া, বর্দ্ধনবেড়িয়া, গোপালনগর, মোঃ 9775041408.
৩। পরিমল কুমার রায়, পালপাড়া আম্বেদকর ভবন, মোঃ 9231613891.
৪। অমল সরকার, গাছা, কৃষ্ণনগর, মোঃ 7679262891.
৫। রাজেশ দাস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মোঃ 9836260904.
৬। বিদ্যাসাগর মেটে, বোলপুর, বীরভূম, মোঃ 9474360650.
৭। অপূর্ব বিশ্বাস, দুর্গানগর, দমদম, মোঃ 9230640818.
৮। চৈতন্য মণ্ডল, পলতা, ব্যারাকপুর, মোঃ 9143175434.
৯। পরিমল বিশ্বাস, হুগলি, মোঃ 9474705005.
১০। সঞ্জীব হাজরা, বর্ধমান, মোঃ 9735139087.
১১। অমিত বাউরি, আসানশোল, মোঃ 9126072267.

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয় বিগত শতাব্দীর শুরুতেই। কিন্তু হিন্দু-ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি চাইলেও উপেক্ষিত থেকে যায় তাদের কথা, যাদের তারা নিজেরাই পদানত করে রেখেছে হাজার বছর ধরে। তারা হল ভারতের অস্পৃশ্য ও নির্যাতিত হিন্দু, বর্তমানে যাদের দলিত শ্রেণি বলা হয়। এদের মুক্তি দূরস্থান, মনুবাদী হিন্দু-ভারত এদের বিরুদ্ধে জারি রেখেছে সর্বপ্রকার সামাজিক ও আর্থিক অবরোধ। ধর্মীয় অনুমোদন থাকায় তা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। ফলে নির্যাতিত শ্রেণির শতাব্দীব্যাপী মুক্তি আন্দোলনও চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছায় একই সময়।

দুই আন্দোলনের দুই মুখ। হিন্দু-ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধি এবং নির্যাতিত মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। হিন্দু-ভারত চাইছিল দু'শো বছরের ব্রিটিশের গোলামি থেকে মুক্তি। নির্যাতিত শ্রেণি চাইছিল হাজার বছরের অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি। তারা চাইছিল কেবল স্বাধীনতা নয়, সহস্র বছরের গোলামি থেকে মুক্তি। গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ আম্বেদকর ব্রিটিশকে অভিযুক্ত করেছিলেন, তাদের দু'শো বছরের শাসনে অস্পৃশ্যদের দুর্দশার প্রতিকারের চেষ্টা করেনি। তাহলে কী করে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করবে অস্পৃশ্যরা? প্রতিকারে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক অধিকারের দাবি পেশ করেন। গান্ধি সর্বান্তকরণে বাধা দেন অস্পৃশ্যদের পৃথক রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে। তাঁর বক্তব্য ছিল অস্পৃশ্যরা হিন্দু সমাজের অঙ্গ, হিন্দুর অভ্যন্তরীণ সমস্যা।

সুতরাং যা করার তারা নিজেরাই তা করবে। ব্রিটিশের কিছু করার নেই। বড়ই অদ্ভুত! যারা সমাজ জীবনে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সম্মানে পশুরও নিচে, রাজনৈতিক জীবন তা স্বীকার করবে না। আম্বেদকর যখন জাতিব্যবস্থার বিলোপের কথা বলেন, তখন কেউ কিছু বলেনি, যখন পৃথক স্বীকৃতি চাইলেন, ব্রিটিশ তা দিয়েও দিল, তখন সকলের যেন ঘুম ভাঙল। আম্বেদকরকে ব্রিটিশের দালাল, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে পথের কাঁটা ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষণে বিভূষিত করা হলো। গান্ধির আমরণ অনশন এটাই প্রমাণ করে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল দ্বিমুখী। প্রথমত স্বরাজের জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন, দ্বিতীয়ত ছ'কোটি অস্পৃশ্য শিকার যেন কোনোমতেই তাদের কব্জা থেকে বেরিয়ে না যায় তা প্রতিরোধ করা। লক্ষণীয় এই যে, গান্ধির এই আমরণ অনশন কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, শুধুমাত্র অস্পৃশ্যদের অধিকারপ্রাপ্তিতে বাধা দেওয়ার জন্যই।

ধনঞ্জয় কীরের এই অমূল্য গ্রন্থখানি কেবল ডঃ আম্বেদকরের সংগ্রামময়

জীবনকাহিনিই নয়, এটি ভারতের দু'টি ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামের (মনুবাদী ভারত ও নির্যাতিত ভারত) ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অনালোচিত। এই গ্রন্থে আরও দেখি নির্যাতিত শ্রেণি অবরুদ্ধ অন্ধকারাগারে থাকলেও তার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কিছু করুণার আলোকরশ্মি প্রবেশ করেছিল। সেই আলোটুকু সম্বল করেই সেদিনের অচ্ছুত বালক ভীম, ডঃ আম্বেদকর হতে পেরেছিলেন। ওইটুকু আলোর উত্তাপ সংগ্রহ করে মনুবাদী শিবিরে যে প্রথম বিষ্ফোরণ ঘটাতে পেরেছিলেন তার ভিত্তিমূলে ছিল ভীমের প্রচণ্ড অধ্যবসায়, বাল্যে পিতার অনুপ্রেরণা, আশৈশব অর্জিত নিদারুণ সামাজিক নিপীড়ন ভোগের অভিজ্ঞতা। 'কালস্য কুটিলা গতি', এককালের ঘৃণিত-অচ্ছুত, হিন্দু-ভারতের চোখের বালি, মনুসংহিতা-দাহক ভীমের হাতেই আধুনিক মনুবাদী ভারত তাদের নতুন সংহিতা রচনার ভার দিল Ñ জাতীয় সংবিধান রচিত হল।

কিন্তু প্রবাদ আছে, 'কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি'। মনুবাদী কংগ্রেস ভেবেছিল সিংহ বুঝি পোষ মানল, তাঁকে খাঁচায় পুরতে চাইল। সিংহ তো খাঁচায় থাকতে অভ্যস্থ নয়, সিংহ খাঁচা ভাঙল। কিন্তু মুক্ত সিংহ বেঁচে থাকলে তো বিপদ ঘটবে। তারা সিংহকে শেষ করে দিতে চাইল, সমস্ত ইতিহাস থেকে তাঁকে মুছে দেওয়া হল। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু বলা হল, তা বিকৃতাকারে। ফুটিয়ে তোলা হল এক অমানবিক রূপ নিপুণ শিল্পীর তুলিতে। সাম্প্রদায়িক, জাতীয়তা বিরোধী Ñ কত কি!

কিন্তু মহৎ ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তিনি বেঁচে থাকেন তাঁর মহান কর্ম ও সৃষ্টির মাধ্যমে। নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্য তাঁর অবদান, অগাধ পাণ্ডিত্য ও তাঁর বুদ্ধিমত্তা বিশ্বের দরবারে তাঁকে স্থায়ী আসন দিয়েছে, গান্ধি-নেহরুর মতো রাষ্ট্রীয় প্রচার ছাড়াই।

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির নির্ধারিত কতগুলি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল Ñ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় মহাপুরুষদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাবোধ জন্মানো। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সেভাবেই সাজাতে হবে। ওই মহাপুরুষদের মধ্যে আম্বেদকর নেই। কারণ রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় দেশের মানুষ কাকে মহাপুরুষ বলবে, কোন মানুষকে ঘৃণা করতে হবে, কোন পশুকে পুজো দিতে হবে। সুতরাং আধুনিক ভারতের ছাত্র-যুবা বা দলিত শেণি তাঁদের মুক্তিদাতা আম্বেদকরকে চেনে না, তাঁর নাম শোনে না। তাই প্রয়োজন নিজস্ব প্রেস ও পাব্লিকেশনের। না হলে নির্যাতিত শ্রেণি তাঁদের বাবাসাহেবকে চিনবে কী করে! বাংলায় এ বিষয়ে অগ্রগণ্য প্রয়াত রণজিতকুমার সিকদার ও তাঁর আম্বেদকর প্রকাশনী। এই সাথে চলে আসে অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায় ও অধ্যাপক সমর রায় প্রমুখ অন্যান্য সমাজপ্রেমিক পণ্ডিতদের নাম। কিন্তু বাংলায় আম্বেদকরবাদী আন্দোলন বিভক্ত ও টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ায় প্রকাশনার প্রচার যেমন বিঘ্নিত হয় তেমনি রণজিতকুমার সিকদারের মৃত্যুর ফলে আম্বেদকর প্রকাশনী

বন্ধ ও প্রকাশিত বইগুলিও প্রায় নিঃশেষিত। অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায়ও এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন, তাও প্রায় নিঃশেষিত। কাজেই সুধীর রঞ্জন হালদার মহাশয়ের এই গ্রন্থ অনুবাদ করার প্রয়াস যথেষ্ট সময়োপযোগী এবং তা আম্বেদকর অনুরাগীদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবে সন্দেহ নেই।

সাধারণত অনুবাদ কার্যে মূল রচনার বক্তব্যের সাথে রসবোধ বজায় রাখাই অনুবাদকের কেরামতির পরিচয়। সুধীরবাবু একজন কবি ও সুসাহিত্যিক, এ বিষয়ে তিনি তাঁর দক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। তবুও অনেক ক্ষেত্রে বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ না করে যদি বিষয়টি আত্মীকরণ করে মৌমাছির মতো সাহিত্যশৈলী যোগ করে উগরে দিতেন তবে সেসব বাক্যগুলি আরও অনেকটা শ্রুতিমধুর হত বলে আমার মনে হয়।

পরিশেষে মূল গ্রন্থের রচক ধনঞ্জয় কীরকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বাবাসাহেবের জীবনীগ্রন্থখানি উপহার দেওয়ার জন্য। দলিত বা অদলিত যিনিই ডঃ আম্বেদকর সম্পর্কে কিছু লিখেছেন, তাঁদের তথ্যসূত্র এই গ্রন্থ। তবুও বলতে হয়, লেখক যখন কিছু লেখেন, তাতে নিজস্ব মত বা দৃষ্টিভঙ্গি এড়াতে পারেন না। লক্ষ করেছি কীরের কিছু উক্তি যা 'আম্বেদকর বলেছেন' বলা হয়েছে, আম্বেদকর রচনা পড়লে তা পাঠকের কাছে স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। বিশেষত ধনঞ্জয় কীরের যে কলমে লিখিত হয়েছে মনু-পূজক গান্ধি ও তিলকের জীবনীগ্রন্থ, সেই কলমেই লিখিত হয়েছে মনু-সংহারক ডঃ আম্বেদকরের জীবনীগ্রন্থও। যাই হোক, বাবাসাহেব তো আর জীবনী-নির্ভর চরিত্র নন। অজস্র রচনার মধ্যেই তিনি স্বপ্রকাশ। কাজেই বাবাসাহেবের মত ও পথ জানতে সরাসরি বাবাসাহেবের কাছেই জিজ্ঞাসা করা ভালো। তিনি যে বসে আছেন পাঠকের প্রশ্নের জবাব দিতে তাঁর রচনাবলির মধ্যে।

বর্দ্ধনবেড়িয়া,
১৬ জুন; ২০১৭।

সুবোধ কাইয়া
বর্দ্ধনবেড়িয়া, বৈরামপুর,
উত্তর ২৪ পরগণা।

সবিনয় নিবেদন

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতরত্ন ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। তিনি ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের রূপকার। জন্ম থেকে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি পদক্ষেপই যেমন ঘটনাবহুল তেমনি অভাবনীয় ও রোমাঞ্চকর। ভারতের প্রতিটি মানুষেরই তাঁর মতো মহান ব্যক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা অতি আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় মনুবাদী তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতবর্ষে তাঁর সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস জানা তেমন সহজসাধ্য নয়। বর্ণহিন্দুরা তো ঘৃণা ও অবজ্ঞায় তাঁর সম্পর্কে যেমন কিছু জানতে চান না, তেমনি জানাতেও চান না। এর প্রধান কারণ, তিনি, জাতপাতের দেশ ভারতবর্ষে তথাকথিত অস্পৃশ্য সমাজে জন্মেছিলেন। আবার এককালের অস্পৃশ্য বর্তমানে তপশিলি সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষেরাও বাবাসাহেব সম্পর্কে জানবার তত আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তবে আশার কথা বর্তমানে বাবাসাহেব সম্পর্কে জানার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে পূর্বের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। কিন্তু বাবাসাহেবের ঘটনাবহুল জীবন সম্পর্কে জানার উৎস ততটা সহজ নয়।

ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে বাংলা ভাষায় তথ্য সমৃদ্ধ বই খুবই কম। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ লিখছেন বটে, তবে তার বেশির ভাগই বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ যেমন নয়, তেমনি বহুল প্রচারিত বা সহজলভ্যও নয়। আমার চোখে পড়া **ধনঞ্জয় কীর** প্রণীত ইংরেজি Dr. Babasaheb Ambedkar জীবনীগ্রন্থখানি যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ বাবাসাহেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলেই মনে হয়েছে। তার বাংলা অনুবাদ হয়ে থাকলেও বর্তমানে তাও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং বাংলাভাষী আগ্রহী পাঠকদের জন্য বাংলা ভাষায় বাবাসাহেবের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের অভাব দীর্ঘদিন ধরেই অনুভব করছি। তাই বলে ধনঞ্জয় কীর প্রণীত উক্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করব এমন দুঃসাহস আমি স্বপ্নেও করিনি। কিন্তু অনুজ প্রতীম পরিমল রায়ের দীর্ঘদিন ধরে একই অনুরোধ আমার সেই দুঃসাহসিক স্বপ্নকে দেখতেও বাধ্য করেছে। তাই দুরুদুরু বক্ষে একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কা মাথায় নিয়ে সেই অনুবাদের কাজই শুরু করেছিলাম। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে একটা কাঠামো খাড়া করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু গ্রন্থখানির কলেবর দেখে আতঙ্কিত না হয়ে পারিনি। এতবড়ো গ্রন্থ প্রকাশ করার মতো অর্থব্যয় করার সামর্থ্য কার হবে? আবার কিছু কিছু তথ্য যা বাঙালি পাঠকদের জানাও জরুরি, মূল রচনায় তার ঘাটতিও লক্ষ করেছি। সুতরাং কী করা যায়!

সুতরাং মূল রচনায় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কিছুকিছু অংশ ছাটাই করে যতটা সম্ভব গ্রন্থের আকার ছোটো করার চেষ্টা করেছি। তবে এ কথাও বলে রাখছি যে, তার জন্য গ্রন্থে তথ্যের বিশেষ হানি হয়েছে বলে মনে করার কিছু নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূল বাক্যের অনুবাদ না করে তার ভাবার্থ সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করেছি। তবে বাবাসাহেবের যেসব প্রত্যক্ষ উক্তি, সেগুলিকে যথাসম্ভব মূল ইংরেজি বাক্যের অনুবাদে রাখার চেষ্টা করেছি। আবার যেখানে আমার মনে হয়েছে বাঙালি পাঠকদের জন্য আনুসঙ্গিক কিছু বাড়তি তথ্য দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে তেমন তথ্য সংযোজন করেছি; সঙ্গে তথ্যসূত্রও দিয়েছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী মূল রচনার কিছু তথ্য আগে-পরেও বিন্যস্ত করা হয়েছে।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করছি। ইদানিং বাংলার দলিত শ্রেণির কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায় ‘দলিত’ কথাটিতে বড়ো অসম্মান বোধ করে থাকেন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে অদ্ভুত সব যুক্তিও খাড়া করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা অভিধানে ‘Depressed Class’ শব্দটির যে অর্থ খুঁজে পাই, তাতে তার উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা পাওয়া দুষ্কর। একমাত্র ‘দলিত শ্রেণি’ অথবা ‘অবদমিত শ্রেণি’ ছাড়া ওই শব্দটির বাংলা মানে বুঝানো সম্ভব নয় বলেই আমার মনে হয়েছে। সুতরাং আমি Depressed Class-এর স্থলে বাংলায় ‘দলিত শ্রেণি’ কথাটিই ব্যবহার করেছি।

আমার একার প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থের রূপ দেওয়াও সম্ভব হয়নি। পূর্বোক্ত পরিমল রায়ের মতামত গ্রহণ করে যেমন নতুন করে বাক্য সাজিয়েছি, তেমনি সর্বোপরি বন্ধুবর সুবোধ কাইয়া মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে রচনার মান উন্নত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও নিয়েছি। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই গ্রন্থের ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন; এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

এ গ্রন্থ প্রকাশের দায়দায়িত্বও সম্পূর্ণভাবে পরিমল কুমার রায়ের। ওর পীড়াপীড়ির কারণেই এই গ্রন্থের জন্ম। আশা করি সে কাজে ও সফলতা লাভ করবে। পাঠকবৃন্দ সাহিত্যগুণে তৃপ্ত না হলেও বাবাসাহেব সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তিতে তৃপ্ত হবেন। তবুও জন্ম যখন আমার হাতেই তখন পাঠকদের নিন্দা বা সমালোচনা যা কিছুই হোক, তা সব আমারই। জয় ভীম! জয় ভারত!

পালপাড়া; বিনীত
১ জুলাই, ২০১৭ সুধীর রঞ্জন হালদার

প্রসঙ্গক্রমে

একজন পিতা, জীবনে চরম শান্তি তখনই পান, যখন তিনি দেখেন তাঁর আদরের সন্তানসন্ততিরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সুখে, শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করছে। ঠিক একই রকম ভাবে বাবাসাহেবও আমাদের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন, আমাদের নিয়ে চরম শান্তির স্বপ্ন দেখতেন, যাতে আমরা আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সুখে, শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারি। মানুষের দুঃখ, কষ্ট বা অসহায় অবস্থার কথা যাঁরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, তাঁদের অনুভূতি শক্তি অন্য রকম। হয়তো সেজন্যই ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক ও বাহকদের এত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সারাজীবন কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন, "নির্যাতিত শ্রেণির মানুষের প্রকৃত বন্ধু উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে থাকতে পারে না। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সরকার এদের ব্যবহার করে শুধু নিজেদের অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত ও সুদৃঢ় করার জন্য।"

ব্রাহ্মণ্যবাদ অত্যন্ত হিংস্র মতবাদ। একটি সিংহ, তার শিশুসন্তানকে খাওয়ানোর জন্য কোনো দুর্বল পশুশাবককে নির্মমভাবে হত্যা করতে যেমন এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না, এঁরাও ঠিক তাই। ধর্মই এঁদের হিংস্র হতে শিখিয়েছে। ধর্মীয় শাস্ত্র ও তার রীতিনীতি মুখোশ মাত্র। এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য হল Ñ অসাম্য, বিভেদ ও শোষণ। মানবতাবোধ বলে কোনো শব্দই নেই এঁদের অভিধানে। ধর্মের নামে বর্ণভেদ নামক প্রথার মাধ্যমে বংশপরম্পরায় যন্ত্রণা ও প্রতিবাদহীন শোষণ-শাসনের এই যে অপকৌশল, এরই নাম ব্রাহ্মণ্যবাদ, যা হিন্দুসমাজের অন্যায়-অবিচারের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। এই মতবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় 'মনুসংহিতা' দ্বারা, যা এক শ্রেণির মানুষকে সম্মানের চরম শিখরে পৌঁছে দেয়, আর এক শ্রেণির মানুষকে নামিয়ে দেয় অপমানের অতল অন্ধকারে।

বাবাসাহেব সেই পাথরের মতো নিশ্চল জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের জন্মদাতা মনুর 'মনুসংহিতা'-কে হটিয়ে মানবতার প্রতীক ও মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা 'ভারতীয় সংবিধান'-কে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী অসহিষ্ণু সামাজিক পরিমণ্ডলে থেকে এটা কোনো সাধারণ কাজ নয়, যা তিনি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। লৌহপ্রাচীরে বেষ্টিত ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং তার ধারক ও বাহকদের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তিনি প্রতি পলে পলে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সমস্যা তখনই হত, যখন তিনি দেখতেন দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের উপর বর্ণবাদীদের অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা যতটা সমস্যা, ঠিক ততটাই সমস্যা তাঁদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের প্রতি অনীহা।

স্বাধীনতার দীর্ঘ সত্তর বছর পর এখনও সেই মানসিকতার একবিন্দুও পরিবর্তন হয়নি। এখনও তাঁরা সেই অসম ব্রাহ্মণ্যবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যদিও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা অনেক অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আসলে মানুষ যদি নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে অপমানের জ্বালায় না জ্বলে, তাহলে বাইরে থেকে কারোর অনুভূতিকে জাগানো কখনই সম্ভব নয়। এ কথা সকলেই অবগত যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক বিন্যাস দাঁড়িয়ে আছে লম্বভাবে, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপরে বিন্যস্ত করা হয়েছে, এতে একটি সম্প্রদায় গৌরব বোধ করছে ও সান্ত্বনা পাচ্ছে এই ভেবে যে, জাতের মানদণ্ডে সে অপরটির থেকে উঁচুতে। এই ক্রমোন্নতির যুক্তিহীন মোহবশেই সকলের টিকি বাঁধা।

বাবাসাহেবের দ্বারা অর্জিত সংরক্ষণের অধিকার মাতৃদুগ্ধের মতো আমাদের সিঞ্চিত করে চলেছে, কিন্তু প্রতিদানে আমরা দিচ্ছি না কিছুই। তিনি তো তাঁর নিজের জন্য কিছুই চাননি, শুধু চেয়েছিলেন আমরা আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হই, আর অপরকে দাঁড়াতে সাহায্য করি, এর বেশি কিছু নয়। এই ভেবে কষ্ট হয় যে, তাঁর আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, লেখা গ্রন্থগুলি সবকিছুই সময়ের সাথে সাথে কীভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মানুষের বিস্মৃতির অন্তরালে, ধুলোয় লুণ্ঠিত হচ্ছে তাঁর ঘটনাবহুল সংগ্রামী জীবনের বর্ণময় উচ্চাভিলাষ। অথচ তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর লোকজনকে দেশের শাসকরূপে দেখে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে ও একই মাপকাঠিতে রাজনৈতিক ক্ষমতাও ভাগ করে নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, তারা একদিন তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হবেই।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সব স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে; এককণাও পূর্ণ হয়নি।

দুঃখে, শোকে, হতাশায় বিধ্বস্ত বাবাসাহেব তাঁর জীবনের একদম শেষলগ্নে এসে অত্যন্ত বেদনার সাথে ব্যক্ত করেছিলেন, "যেটুকু আমি করতে পেরেছি, তার সবটাই তো অল্প কয়েকজন দলিত শ্রেণির শিক্ষিত লোকেরা ভোগ করছে। প্রতারণার দ্বারা তারা নিজেদের অকর্মণ্যতারই প্রমাণ রাখছে। নিজেদের পদদলিত, নির্যাতিত, নিরক্ষর ভাইবোনদের প্রতি কারও কোনোরূপ সহানুভূতি নেই। এসব আমার কল্পনার বাইরে। এরা কেবল ব্যক্তিগত লাভের জন্যই বেঁচে আছে, একজনও সমাজের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত নয়। এরা নিজেদের ধ্বংসের পথ নিজেরাই তৈরি করে চলেছে। এখন আমার দৃষ্টি গ্রামের অসংখ্য নিরক্ষর আমজনতার দিকেই ফেরাবো ভাবছি। আজও তারা চরম দুর্ভোগ ভুগেই চলেছে। তাদের অর্থনৈতিক কোনো পরিবর্তনই আসেনি। অথচ এদিকে আমার পরমায়ুও কমে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

"…. যেটুকু আমি করতে পেরেছি, সেটুকু করতে সারাজীবন আমাকে সীমাহীন

দুঃখ এবং ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যেরূপ কষ্ট হয় সেইরূপ কষ্টকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে সব সময় দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। আজ সভ্যসমাজের মধ্যে যে সমাজকে দেখা যাচ্ছে, এই মরুযাত্রীদলকে এই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আমাকে অনেক বৃহৎ বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই মরুযাত্রীদলকে অগ্রসর করতে দাও। যদি আমার সেনাপতিগণ এই মরুযাত্রীদের সম্মুখে অগ্রসর করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে, তবে তাদের কর্তব্য হবে সেখানেই থেমে থাকা, কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই এই মরুযাত্রীদের পিছু হটতে দেওয়া হবে না। আমার জনগণের কাছে এই আমার বাণী।”

বাবাসাহেব একবার বলেছিলেন, “আমি যদি আমার লাভলোকসানের কথা ভাবতাম, তাহলে আমিও তা করতে পারতাম। আমি যদি কংগ্রেসে যোগদান করতাম, তাহলে হয়তো ওই সংগঠনের সর্বোচ্চ পদেও যেতে পারতাম। কিন্তু আমি সেটা করিনি। কারণ, দলিত শ্রেণির স্বার্থে কাজ করাই ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য।” একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, তিনি যদি সত্যি সত্যি কংগ্রেসে যোগদান করতেন, তাহলে তাঁর কোনো দোষত্রুটি থাকত না, কংগ্রেস পার্টি তাঁকে মাথায় করে রাখত, আর এদেশের বর্ণবাদী হিন্দুসমাজ তাঁকে ‘দেশের গর্ব’ বলে বিশ্ববাসীর কাছে গর্বিত হতেন।

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর শুধু যে দলিত শ্রেণির জন্য কাজ করেছেন তা তো নয়, তিনি সমগ্র দেশবাসীর জন্যই কাজ করেছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল বিশ্বজনীন। তিনি সমতা, মানবতা ও মৈত্রীর কথা বলেছেন। কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, আদিবাসী সবার সমস্যা ছিল তাঁর ভাবনার বৃত্তে। আজীবন তিনি ভারতবর্ষ নিয়েই ভেবেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি দলিত শ্রেণির অধিকারের পক্ষে ও বর্ণবাদীদের শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, সেহেতু বর্ণবাদীরা তাঁকে শত্রুভাবাপন্নই মনে করেন এবং ঘৃণা করেন। আসলে তাঁদের নির্লজ্জ জাতিগত স্বার্থপরতাই এর জন্য দায়ী।

সুতরাং এখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যেহেতু এদেশে বর্ণবাদী শ্রেণির রাজনৈতিক জীবন ‘অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত’, সেহেতু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তাঁরা দলিত শ্রেণির উন্নয়নের কথা কোনোদিনই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি, বরং বিরোধিতা করেছেন। তাই যখনই কেউ তাঁদের উন্নয়নের কথা বলেছেন, তাঁদের অধিকারের কথা বলেছেন, তখনই তিনি বর্ণবাদীদের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। শুধুমাত্র এই একটি কারণের জন্যই উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলে থেকে যখনই দলিত শ্রেণির এম.এল.এ. বা এম.পি.-রা তাঁদের নিজ সমাজের উন্নয়নের কথা বলেছেন, তখনই তাঁদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য তাঁরা স্বভাবতই নীরব থাকতে বাধ্য হন।

তাই এখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা যায় যে, একমাত্র বর্ণহিন্দু শ্রেণির জাতবিদ্বেষ ও পূর্বসংস্কারে আবদ্ধ মানসিকতার জন্যই স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে বাবাসাহেবের প্রচেষ্টায় নবভারত গড়ার যে সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তার থেকে শুধুমাত্র দলিত শ্রেণির মানুষেরাই বঞ্চিত হয়েছেন তাই নয়, বঞ্চিত হয়েছেন বর্ণহিন্দু শ্রেণির মানুষেরাও। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এই অসাম্য বর্ণবাদী মানসিকতার জন্যই এদেশ হারালো তার মহান সন্তানকে, আর এদেশের অগণিত মানুষ হারালেন তাঁদের ভাগ্যবিধাতাকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, যখনই নিম্নবর্ণীয় কিংবা দলিত শ্রেণির কোনো ব্যক্তি জ্ঞানে, গুণে, পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তখনই উচ্চবর্ণীয়রা তাঁকে 'অ্যাডপ্ট' (অপরের জিনিস নিজের বলে গ্রহণ করা) করে নিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'শূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধে ঠিক একই কথা লিখেছেন Ñ "শূদ্র জাতির একে বিদ্যার্জন বা ধন সংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালেভদ্রে দুই একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধি মণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না। বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল, তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য।"

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যদি দলিত শ্রেণির অধিকারের কথা না বলতেন, তিনি যদি শূদ্র স্বামী বিবেকানন্দের মতো জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের জঘন্য পরম্পরাকে গোপন রেখে হিন্দুধর্মকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রচার করতেন, তাহলে তিনিও তাঁর মতোই হিন্দুদের থেকে মহৎ গুণের অনেক সার্টিফিকেট পেয়ে যেতেন। যার অর্থ দলিত শ্রেণির স্বার্থে বা তাঁদের অধিকার নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। এইজন্যই বাবু জগজীবন রাম, প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস প্রমুখেরা তাঁদের সমাজের স্বার্থে একটি কথাও বলতে পারেননি। বাবাসাহেব ও অন্যান্য দলিত শ্রেণির নেতাদের মধ্যে এটাই একমাত্র পার্থক্য। বিবর্তিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় এ এক বিচিত্র বিড়ম্বনা, যে সংরক্ষিত মানুষদের বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা এম.এল.এ., এম.পি. বা মন্ত্রী হয়েছেন, সেই মানুষদেরই পক্ষে তাঁরা একটি কথাও বলতে পারেন না। এমতাবস্থায় দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণির মানুষদের উত্থান বর্ণবাদীদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে কীভাবে সম্ভব?

একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে এতটুকুও অসুবিধা হয় না যে, উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দল দলিত শ্রেণির জন্য কিছুই করবে

না। কারণ, তাঁরা জানেন, "সরকারি চাকুরিতে নির্যাতিত শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি হলেই বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য হ্রাস পাবে, ফলে স্বভাববতই এঁদের উপর অত্যাচারকে স্থায়ী করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।" এ কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে শিক্ষিত দলিতেরা নিজ সমাজের স্বার্থকে নীলামে চড়িয়ে কোন মোহে মনুবাদী রাজনৈতিক দলে নাম লেখান? আসলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে চরিতার্থ করতেই এঁরা সমগ্র সমাজকে বিকিয়ে দেন, এমনই বীভৎস এঁদের মানসিকতা। সমাজের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতাই এঁদের নেই। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে, এতকিছুর পর আজও আমরা জেনে-বুঝে অন্ধের মতো ওই সমস্ত আত্মকেন্দ্রিক, লোভী ও নীলামকারী চামচাদের মিষ্টি কথায় ভুলে যাই, আর আমরা আমাদের মূল্যবান ভোটগুলো দিয়ে আমাদেরই শোষণকারীদের ক্ষমতায় বসাই, যাঁরা আমাদের মঙ্গলের কথা কোনোদিনই ভাবেননি। সুতরাং বাবাসাহেবের সেই অমর বাণীর কথা আজ আমাদের স্মরণ করার সময় এসেছে, যাতে তিনি বলেছেনÑ "এ কথা যতখানি সত্য যে, কোনো একটি দেশ অন্য একটি দেশকে শাসন করলে যেমন সে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন হতে পারে না, একথাও ঠিক ততখানি সত্য যে, একটি শ্রেণি অন্য একটি শ্রেণির উপর খবরদারি করে তাদের যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে পারে না।"

রাজনৈতিক সংগঠন হল সবচেয়ে বড়ো সামাজিক সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমেই এদেশের শোষক শ্রেণির লোকেরা কীভাবে দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণির লোকদের নির্বিবাদে শোষণ করে চলেছেন, তা তাঁরা ঘুণাক্ষরেও অনুধাবন করতে পারছেন না। এটা একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র, যা কেবলমাত্র দলিত শ্রেণির বিবেকহীন চামচাদের সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হচ্ছে। চামচ যেমন সুস্বাদু খাবারের আস্বাদন অনুধাবন করতে পারে না, এঁরাও ঠিক তাই। কারণ, স্বজাতিদের জন্য ভালোবেসে কিছু করার যে অপার আনন্দ, সেই অনুভূতিই এঁদের নেই। পরাধীন দেশের নাগরিকরা স্বাধীনতার জন্য যখন সংগ্রাম করেন, তখন তাঁদেরই কেউ শত্রুপক্ষকে যদি সাহায্য করেন বা গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন, তাহলে যে অবস্থা হয় আমাদের দেশের দলিত শ্রেণির চামচাদের অবস্থাও ঠিক তাই। এঁরা ঘুঘুধরা ফাঁদের ঘুঘুর মতো। সুতরাং এঁদের উপর ভরসা করে আমাদের লাভ কী?

আজকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাবাসাহেবকে নিয়ে এত মাতামাতি করছে যে, তাতে মনে হয় তাঁর প্রতি তাঁদের মতো শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রকৃতপক্ষেই কি তাঁরা তাঁর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রাণপণ সংগ্রামে প্রস্তুত, তাঁরা কি তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে বদ্ধপরিকর, না শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করার জন্যই এটা তাঁদের অভিনয়? যদি তাঁরা তাঁর প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীল হন, তাহলে সর্বপ্রথম দেশ থেকে জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো অমানবিক কুসংস্কারকে

আইন করে নির্মূল করুন। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থা চালু করুন। মানুষকে ভালোবাসতে শিখুন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন, আমাদের দেশে জাতপাতের নিরিখে যে বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষণ ও শোষণ হয়ে চলেছে সেগুলো বন্ধ করুন এবং সমস্ত সরকারি অফিসে তাঁর প্রতিকৃতি টানানোর ব্যবস্থা করুন। আসলে এসব হওয়া সুদূর পরাহত। কারণ, এদেশের দুর্ভাগ্য যে, তার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি স্বভাবতই অসৎ এবং বর্ণাশ্রম দোষে দুষ্ট। দেশের অচলায়তন সামাজিক অবস্থার জন্য মূলত তাঁরা ও তাঁদের মনুবাদী সংস্কৃতিই দায়ী।

অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায় 'আম্বেদকরীয় গণতন্ত্র ও ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধে মনুবাদীদের সম্পর্কে লিখেছেন, "ভারতবর্ষে যারা শোষক তথা বর্ণবাদী মানুষ, তারা কখনই মনুবাদী সংস্কৃতি দূর হোক এটা চাইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আম্বেদকর তাঁর Annihilation of Caste গ্রন্থে বলেছেন, সেটা হবে তাদের নিজের পায়ে কুড়ুল মারার সামিল। অতএব, আম্বেদকরীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে এই অমানবিক মনুবাদী সংস্কৃতিকে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির ভেতর থেকে দূর করার দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরই, যারা এর যাতাকলে পড়ে যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য।"

সে যাইহোক, আজ আমরা বুকভরা আশা নিয়ে 'আম্বেদকর আদর্শ প্রচার সংঘ' নামক সংগঠনটির মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন, ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি সবকিছুই প্রচারের আলোয় আনার চেষ্টা করছি। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা বাবাসাহেবের জীবনীমূলক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থখানি প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছি। আমাদেরই অনুরোধে গত দু'বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাহিত্যিক শ্রীসুধীর রঞ্জন হালদার মহাশয় বাংলা ভাষায় গ্রন্থখানি তৈরি করেছেন। তিনি নিজেই ডি.টি.পি.-র কাজ করেছেন, প্রুফ দেখেছেন, গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে যা যা করণীয় সবই করেছেন। অতএব, অনুগ্রহ পূর্বক আপনারা আমাদের এই প্রয়াসকে একখানি বই কিনে ও একখানি বই অপরকে কিনতে উদ্বুদ্ধ করে সংঘকে উপকার করলে, সংঘের এই সদস্য আরও অনেক বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে সাহায্য করতে পারবেন এবং আমরাও আমাদের সংঘের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ থাকব। সাথে সাথে তাঁর পরিশ্রম, ভাবনা, বাবাসাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সবকিছুই সার্থক হবে।

১৪ জুলাই, ২০১৭

পরিমল কুমার রায়
পালপাড়া, চাকদহ, নদিয়া।

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঁচিশশো বছর

চতুর্বর্ণে বিভাজিত হিন্দুধর্মে অসংখ্য জাতপাতের সাথে সাথে আছেন অস্পৃশ্য অর্থাৎ অচ্ছুত সমাজের মানুষেরাও। যুগ যুগ ধরে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের কাছে ঘৃণিত এই অস্পৃশ্যরা হিন্দুসমাজের একদম তলানিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতা বিলোপ করার আগে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রথা পূর্ণমাত্রায় বহাল ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এঁদের বিভিন্ন নাম ছিলÑ কোথাও বহিষ্কৃত, কোথাও পারিয়া, কোথাও অন্ত্যজ, কোথাও পঞ্চম, কোথাও অবর্ণ, কোথাও বা অতিশূদ্র ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতি হিসাবেও তাঁদের পরিচয় দেওয়া হত, যেমনÑ চণ্ডাল, চামার, শবর, মাহার, ধাঙর, মেথর ইত্যাদি। অবিভক্ত বাংলাদেশের নমঃজাতিও এই অস্পৃশ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। নমঃদের আবার চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলেও ডাকা হত। জাতির জনক বলে কথিত করমচাঁদ গান্ধি, এঁদের আদর করে নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন'। এ নামটিও আসলে জন্মগত কারণে একটি লজ্জাজনক নাম। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা বিশজন মানুষ এই অস্পৃশ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত।

যেখানে যে নামেই এঁদের ডাকা হোক না কেন আসলে এঁরা অস্পৃশ্য জাতিই। এঁরা আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেনÑ একদল যাঁদের ছোঁয়া যায় না, একদল যাঁদের কাছে যাওয়া যায় না ও আর একদল যাঁদের চোখে দেখাও পাপ। এঁদের স্পর্শ, ছায়া এমনকি কণ্ঠস্বরও বর্ণহিন্দুদের কাছে অপবিত্র বলে বিবেচিত হত। সুতরাং বর্ণহিন্দুদের দেখলে এঁদের পথ ছেড়ে দূরে সরে যেতে হত। এঁদের ছুঁলে হিন্দুদের জাত চলে যেত। গোবর অর্থাৎ পশুর বিষ্ঠা খেয়ে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তবেই আবার তাদের জাতে উঠতে হত। এটাই হচ্ছে হিন্দুধর্মের বিধান! দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়েই তাঁদের রাস্তায় চলার অনুমতি ছিল। তাও রাস্তায় চলার সময় এঁদের কোমরে পিছনদিকে লম্বা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হত একখানি কাঁটাগাছের ঝাড়ুÑ রাস্তায় তাঁর পায়ের যে ছাপ পড়বে তা মুছে ফেলার জন্য। রাস্তায় থুথু ফেলার অধিকার ছিল না বলে গলায় ঝুলিয়ে নিতে হত একটি মাটির পাত্র, যাতে নিজের থুথু ফেলতে পারেন। কোনো সরকারি কুয়ো থেকে জল খাওয়ার অধিকার তাঁদের ছিল নাÑ তাতে কুয়ো অপবিত্র হবে। কোনো সাধারণ জলাশয় ব্যবহার করাও তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কথা বললে তাতে বায়ুদূষণ হয় বলে পথেঘাটে চলার সময়ে তাঁদের কথা বলাও নিষিদ্ধ ছিল। অন্য লোকজনের কাছাকাছি বসার অধিকারও তাঁদের ছিল না। অনেক দূরে মাটিতে বসাটাই ছিল

তাঁদের জন্য অনুমোদিত ব্যবস্থা। তাঁদের বাসস্থানও ছিল নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর, গ্রামের এক প্রান্তে কিংবা আলাদা পল্লি বা বস্তির কুঁড়েঘরে। সেখানকার নোংরা ডোবাখানার ময়লা জীবাণুযুক্ত জলই ছিল তাঁদের একমাত্র পানীয় জল।

তাঁদের পোশাক-আশাকও ছিল আলাদা। তাঁরা ইচ্ছামতো কোনো ভালো পোশাক পরতে পারতেন না। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা যেসব পোশাক পরতেন, সেসব পোশাক পরা তাঁদের নিষিদ্ধ ছিল। কেননা তাতে উচ্চবর্ণীয়দের সম্মান নষ্ট হত। সোনা কিংবা রুপার গয়না পরার অধিকারও তাঁদের ছিল না। যেসব স্কুলে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ছেলেমেয়েরা পড়ত, সেখানে তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হত না। হিন্দুর দেবদেবীর পূজা, পার্বণ ও ব্রতাদি পালন করলেও মন্দির অপবিত্র হবে বলে হিন্দুদের মন্দিরে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নাপিত-ধোপারা তাঁদের কোনো কাজ করত না। আসলে হিন্দুরা তাঁদের হিন্দু বলেই স্বীকার করতেন না। হিন্দুরা তাঁদের পোষা কুকুর-বিড়ালের যত্ন নিলেও অস্পৃশ্যদের প্রতি কোনো মানবিক আচরণ করতেন না। অর্থাৎ তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য মানুষেরা পশুরও অধম বলে বিবেচিত হতেন। দুঃখের বিষয় ১৯৫০ সালে এই অস্পৃশ্যতা অর্থাৎ ছুঁৎ-অচ্ছুতের বিধান বিলোপের নির্দেশ সংবলিত ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হলেও আজও এই ব্যবস্থা বেশিরভাগ হিন্দুর মনে বহাল তবিয়তে বজায় আছে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাজার হাজার গ্রামে এখনও এই ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় চালু রয়েছে।

যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্য হওয়ার কারণে এইসব মানুষদের লেখাপড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তাঁরা ছিলেন সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত ও অবহেলিত। লেখাপড়া না জানা অস্পৃশ্য হয়ে থাকার জন্য কোথাও সরকারি চাকরির কোনো সুযোগও তাঁদের ছিল না। পুরুষানুক্রমে তাঁরা একই পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হতেন। যেমন ঝাড়ুদারের কাজ, মেথরের কাজ, মরা জন্তুর চামড়া ছোলার কাজ, চামড়া ট্যান করার কাজ, জুতো তৈরির কাজ ইত্যাদি। ভাগ্যবানদের মধ্যে কেউ বর্গা জমি চাষ, কেউ বা জনমজুরির কাজও করতেন। এমনি ভাবে তাঁরা অস্পৃশ্য হয়ে জন্ম নিতেন, অস্পৃশ্য হয়ে বেঁচে থাকতেন এবং অস্পৃশ্য অবস্থায়ই মারা যেতেন।

আধুনিক ইতিহাসে অস্পৃশ্যতার উৎসমূল একটি ধাঁধা বিশেষ। সাধারণত মনে করা হয় জাতিভেদের কারণেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক আর্যেরা জাতপ্রথা জানতেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা পেশা, রুচি, যোগ্যতা অনুসারে নিজেদের নানাভাগে বিভক্ত করেন। যাঁরা বিদ্যার্জন করেন তাঁরা ব্রাহ্মণ, যাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁরা ক্ষত্রিয়, যাঁরা ব্যাবসা করেন তাঁরা বৈশ্য এবং ওই তিন শ্রেণির সেবার কাজে

যাঁরা অংশ নেন তাঁরা শূদ্র নামে পরিচিত হন।

কিন্তু বাস্তবে এই শ্রমবিভাগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ একজন নিতান্ত অজ্ঞ, দুষ্ট প্রকৃতির পতিত ব্রাহ্মণের স্থান ঈশ্বরের পরেই গণ্য হতে থাকে; অপরদিকে একজন নিম্নতম শ্রেণির লোক যতই পাণ্ডিত্য অর্জন করুন না কেন তিনি চিরদিনের জন্য শূদ্র বলে নিন্দিত হতে থাকেন। ফলস্বরূপ মূল চতুর্বর্ণ বিভাগ আঁটোসাঁটো হয়ে বাঁধা পড়ায় পরবর্তীকালে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। এভাবেই চার বর্ণ চার জাতিতে পরিণত হয় এবং বর্তমান নিপীড়নমূলক জাতব্যবস্থা এক বিপরীত আকার ধারণ করার ফলে এর মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এরপর বিভিন্ন পেশা, প্রাদেশিক প্রতিবন্ধকতা, বিভিন্ন জীবিকা ও খাদ্যখাবার, নানা কুসংস্কার ও রীতিনীতি প্রধান চার জাতকে ভেঙে চুরমার করে তিন হাজারেরও বেশি জাতের সৃষ্টি করেছে।

এরূপ মতবাদ আছে যে, আর্যরা ভারতের মূলনিবাসীদের সঙ্গে বর্ণসংকর হওয়ার হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যেই এই নীতি গ্রহণ করেন। মূলনিবাসীরা আর্যদের আধিপত্য মেনে না নেওয়ায় তাঁরা আর্যদের হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করতেন, নারী ও শিশুদের অপহরণ করতেন ও লুটপাট করে উত্যক্ত করতেন। অবশ্য কালক্রমে তাঁরা ভৃত্যের পর্যায় নেমে যান, গ্রামে তাদের আসা-যাওয়াও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁদের উপর অপ্রিয় কাজ দিয়ে ও দুর্বিসহ ব্যবহার করতে করতে তাঁরা অস্পৃশ্য বলে নিন্দিত হন।

অন্য এক মতে, অস্পৃশ্যরা ছিলেন আসলে বিচ্ছিন্ন একদল মানুষ এবং পরে তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন। তাঁদের পতিত অবস্থায় তাঁরা বৈদিক হিন্দুদের সঙ্গে একাত্ম হননি বা হিন্দুরা গোমাংস খাওয়া ছাড়লেও তাঁরা ছাড়েননি বলে সমাজপরিত্যক্ত হয়ে অস্পৃশ্য হন।

হিন্দুসমাজে যেসব কুপ্রথা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অধঃপতন ডেকে এনেছে, তা থেকে মুক্ত করার জন্য পুরুষানুক্রমে ভারতের বহু সুসন্তান প্রবল চেষ্টা করেছেন। খ্রিস্টের জন্মেরও পাঁচশো বছর আগে রাজবংশজাত যুক্তিবাদী গৌতম বুদ্ধ এই কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন এবং অস্পৃশ্যদের তাঁর ধর্মে টেনে নেন। তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মানুষের মুক্তির কথা বলেন। একাদশ শতাব্দীতে রামানুজ মন্দির তৈরি করে অস্পৃশ্যদের কাছে তার দরজা খুলে দেন, একজন অস্পৃশ্য তাঁর শিষ্যও ছিলেন। কর্নাটক রাজার মন্ত্রী বাসবও নিজের মতে এই প্রথা রদের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে ভক্তিপ্রেমের দ্বারা আরও অনেক সাধক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

পরে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর ধর্মীয় অনুগামীদের দ্বারাও এই আন্দোলন প্রবাহ চলতে থাকে। মহাত্মা ফুলে ছিলেন এই বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ আন্দোলনকারী। তিনি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে পুনায় ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যদের জন্য বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাপারে তিনি আত্মীয় ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা অপমানিত, হাস্যাস্পদ ও পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তথাপি তিনি ও তাঁর স্ত্রী অস্পৃশ্যদের মুক্তি ও শিক্ষাদান কার্যে অদম্য চেষ্টা করে যান। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বরোদার মহারাজা সয়াজী গাইকোয়াড় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অস্পৃশ্যদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু সে সময় বর্ণহিন্দু শিক্ষকেরা ওই স্কুলে শিক্ষাদানে রাজি না হওয়ায় তাঁকে মুসলিম শিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

কিন্তু এঁদের সমস্তকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ববাংলার হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার সফলাডাঙা গ্রামে অস্পৃশ্য নমঃজাতির ঘরে জন্মেছিলেন। তিনি শুধু যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তাই নয়, হিন্দুদের বেদবিধি, শাস্ত্রগ্রন্থ, আচার, সংস্কার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রাক্-আর্যযুগের সনাতনধর্মের অনুসরণে ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে যুক্তি-বিজ্ঞানের আলোকে **'মতুয়াধর্ম'** *নামে এক নতুন ধর্মেরই প্রবর্তন করেছিলেন। জাতপাতহীন বিশ্বভ্রাতৃত্বের সেই ধর্মে অস্পৃশ্য নমঃজাতির বেশির ভাগ লোকই আশ্রয় গ্রহণ করেন। শুধু নমঃজাতির লোকেরাই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, হিন্দুধর্মের সকল বর্ণের লোকই সেই ধর্মে আশ্রয় নিয়েছেন, এমনকি কিছু মুসলিমও মতুয়াধর্মে শরণ নিয়েছিলেন।*

এই মতুয়াধর্মই আজীবন প্রচার করে গিয়েছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। পিতার আদেশে তিনি অস্পৃশ্যদের মধ্যে সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে শিক্ষা আন্দোলনের যে ঢেউ তুলেছিলেন, তার ফলে তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রায় দু'হাজারের মতো স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর শিক্ষা-আন্দোলনের ফলে নমঃজাতির মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে যে চেতনা জেগেছিল তার ফলেই নমঃজাতি আজ শিক্ষায় এত এগিয়ে যেতে পেরেছে। (অনুবাদকের সংযোজন)

মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্যরাও তাঁদের দীর্ঘদিনের মোহনিদ্রা ভাঙার উদ্যোগ দেখান। তাঁদের নেতা গোপালবাবা ওয়ালঙ্কার ছিলেন মহাত্মা ফুলের অনুগামী সাহসী প্রচারক। তিনি অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক দূর করতে উদ্যোগী হন এবং বর্ণহিন্দুদের অমানবিক ব্যবহারের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। দয়ানন্দ সরস্বতীও অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তির চেষ্টা করেন। সর্ব দক্ষিণে কর্নেল অলকট অস্পৃশ্যদের জন্য স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হন।

যে ব্রিটিশ শাসকেরা কিছুদিন আগে তাঁদের দেশের ঘৃণ্য দাসপ্রথা উচ্ছেদ করেছেন, ভারতের এই সুদীর্ঘকালীন দুর্ভোগ ভোগকারী অস্পৃশ্যদের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল

কিন্তু সম্পূর্ণ উলটো। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তাঁদের নীতি ছিল অস্পৃশ্যদের নিপীড়নকারী বর্ণহিন্দুদের পরোক্ষ সমর্থনের। ব্রিটিশরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জাতি। মারাঠা সাম্রাজ্য পতনের পর তাঁদের নতুন সাম্রাজ্য স্থায়ী করার কাজ এমন ভাবে শুরু করেছিলেন যাতে জনগণকে ধীরে, নিরাপদে এবং শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে শোষণ করতে পারেন। ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতায় আসায় যে ব্রাহ্মণেরা দুর্ভোগে পড়েছিলেন তাঁদের সন্তুষ্টির দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দেন তাঁরা। বম্বে সরকার তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে নতুন সরকারে কর্মোপযোগী করে তোলে।

সে সময় সাহিত্য ছিল একপেশে এবং শিক্ষা ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারে। সে শিক্ষা অন্য বর্ণহিন্দুদেরও নাগালের বাইরে ছিল। ক্ষমতা ও আধিপত্য ব্রাহ্মণদের এমনই করায়ত্ত ছিল যে, সাতারার মহারাজাকে পর্যন্ত রাত্রে পড়াশুনা করতে হয়েছে। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে সরকার পুনায় একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় চালু করে। কিন্তু অন্য বর্ণের শিক্ষা ব্রাহ্মণদের কাছে এতই ঘৃণ্য ও আপত্তিজনক ছিল যে, সরকারের এই নতুন ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য শ্রেণির সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দিতে ব্রাহ্মণ শিক্ষকেরা শুধু বাধাই দেননি, তাঁদের অধিকাংশ পদত্যাগপত্র পর্যন্ত দাখিল করেছিলেন। যাই হোক, অন্যান্য শ্রেণির হিন্দুদের স্কুল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বলা যায় ব্রিটিশ সরকারের কৃতিত্বেই অব্রাহ্মণ ও অনুন্নত শ্রেণির হিন্দুরা ধীরে ধীরে শিক্ষায় ও সরকারি চাকরিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যা এর আগে কখনও হয়নি।

এই দুর্দশা যদি অন্যান্য বর্ণহিন্দুদের হয়, তাহলে অস্পৃশ্যদের অবস্থা আর কী হবে? তাঁরা তো ধর্তব্যের মধ্যেই আসেন না। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তাঁরা ছিলেন অনেক দূরে। নতুন সরকার ব্রাহ্মণদের চটানোর পক্ষপাতী নয় বলে অন্য বর্ণের, বিশেষ করে অস্পৃশ্যদের শিক্ষার ব্যাপারে পাশ কাটিয়ে চলতেন। ওই সময় শিক্ষক, পরিদর্শক, সরকারি কর্মচারী সবই ছিলেন ব্রাহ্মণ। সর্বসাধারণের শিক্ষা তাঁদের কাছে ছিল অসহ্য।

খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকেরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। ভারতের বহু অঞ্চলে তাঁরা নিম্নবর্ণের, বিশেষ করে অস্পৃশ্যদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এগিয়ে আসেন। তাঁদের একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, তাই তাঁরা ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মিশনারিদের কৌশল, দাক্ষিণ্য এবং তৎপর সাহায্য নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের এতই কাম্য হয়ে ওঠে যে, তাঁরা ব্রাহ্মণদের চেয়ে বিদেশিদেরই বেশি আপন ভাবতে অভ্যস্থ হন।

এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যদের শিক্ষাসমস্যা নতুন সরকারের সামনে মাঝে মাঝেই উঠে আসত। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ধারওয়ারের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক একটি অস্পৃশ্য ছেলেকে ভর্তি করতে আপত্তি করলে বিষয়টি বম্বে সরকারের বিবেচনার

জন্য পাঠানো হয়। অবশেষে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার ঘোষণা করেÑ "আংশিক সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে জাতপাতের কারণে কোনো শ্রেণির মানুষকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া না হলে, সেসব স্কুলের সাহায্য দান বন্ধ করার অধিকার সরকারের আছে।" আরও ঘোষণা করা হয়Ñ "যে স্কুলগুলি পুরোপুরি সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল সেখানে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে।" কিন্তু এই ঘোষণাও বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুদের মানসিক অবস্থার বদল ঘটাতে পারেনি। তাঁদের প্রতিনিধিরা অস্পৃশ্যদের শিক্ষাবিস্তারের এই প্রচেষ্টাকে ভাবপ্রবণ ইংরেজ কর্মচারী ও বাস্তববুদ্ধিহীন দেশীয় সংস্কারকদের এক যুক্তিহীন আন্দোলন বলে বাধার সৃষ্টি করেন।

এমনই এক ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার আম্বাবাদে গ্রামের অস্পৃশ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত **'মাহার'** জাতির এক গরিব পরিবারে ভীমরাও রামজী আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্য ও যৌবন

ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ছিল কোংকন এলাকায়। মাহাররা অস্পৃশ্য হলেও তাঁরা ছিলেন বলশালী, বুদ্ধিমান, লড়াকু, সাহসী ও পৌরুষদীপ্ত জাতি। এই মাহাররাই তখন ব্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বম্বে সেনাবাহিনীর একটি শাখা গঠন করেছিলেন। এই সেনাবাহিনীরই একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ছিলেন ভীমের পিতামহ মালোজী শকপাল। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দু'জনই বেঁচেছিলেনÑ ভীমের পিতা রামজী ও মীরা নামে তাঁর এক বোন অর্থাৎ ভীমের পিসি।

মহারাষ্ট্রের অধিবাসী হলেও ভীমের জন্ম হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের 'মউ' শহরে। তখন তার পিতা রামজী শকপাল সেখানে সামরিক বিভাগে চাকরি করতেন এবং সপরিবারে থাকতেন। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সুবেদার। তাঁর চৌদ্দটি সন্তানের মধ্যে ভীম ছিল চতুর্দশতম সন্তান। অবশ্য চৌদ্দটি সন্তানের মধ্যে মাত্র পাঁচটিইÑ তিনটি ছেলে ও দু'টি মেয়েই জীবিত ছিল। জ্যেষ্ঠ বলরাম, দ্বিতীয় আনন্দ, তারপর দুই মেয়ে মঞ্জুলা ও তুলসী এবং সবার ছোটো ভীম। ভীমের মায়ের নাম ছিল ভীমাবাঈ। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা, নম্রস্বভাবা ও আত্মসম্মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন মহিলা।

রামজী শকপাল যখন সামরিক বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে কোংকনের দাপোলিতে চলে যান, তখন ভীমের বয়স বছর দু'য়েক। পাঁচ বছর বয়সের সময় ভীমকে দাপোলির এক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে তার বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে সে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। সুবেদার রামজী শকপাল সাতারার সৈনিক আবাসে একটি চাকরি নিয়ে সপরিবারে সেখানে চলে যান।

সাতারায় যাবার কিছুদিনের মধ্যেই ভীমের মা ভীমাবাঈয়ের মৃত্যু হয়। তখন ভীমের বয়স মাত্র ছ'বছর। তখন দেখাশোনার জন্য রামজীর বোন মীরাবাঈ এসে পরিবারের সমস্ত ভার তুলে নেন। মীরাবাঈ ছিলেন বেটেখাটো ও কুঁজো, কিন্তু চটপটে মহিলা। মাতৃহীন কনিষ্ঠ সন্তান ভীম তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

রামজী শকপাল সরকারি নর্মাল স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারি সামরিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। সে সময় সামরিক কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শুধু নয়, তাঁদের আত্মীয়স্বজনÑ স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষে শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। সামরিক বিদ্যালয়ে রামজী শকপাল প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছিলেন চৌদ্দ বছর এবং তিনি

সেকেণ্ড গ্রেনেডিয়ার্সে সুবেদার-মেজরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তবে তিনি পরিচিত ছিলেন সুবেদার রামজী নামেই।

সাতারার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে সেখানেই বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে ভীম হাইস্কুলে ভর্তি হয়। স্কুলজীবনেই ভীম অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক যে কত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। একবার গরমের দিনে বড়ো ভাই ও ছোট্ট এক ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে ভীম পিতার কাছে যাবার জন্য গোরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা হয়। পিতা তখন সেখানে কর্মরত ছিলেন। তারা পাদালি স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে মাসুর স্টেশনে গিয়ে নামে। আগে থেকে লেখা চিঠি সময় মতো না পাওয়ায় পিতা স্টেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কী করে সেখানে যাবে তার কোনো উপায় না পেয়ে তারা স্টেশনমাস্টারের সহায়তায় অতি কষ্টে একখানি গোরুরগাড়ি পেয়ে গোরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা হয়।

কিছুদূর যেতেই গাড়োয়ান তাদের কথাবার্তায় টের পেয়ে যায় যে গাড়ির আরোহীরা সুন্দর পোশাক পরা হলেও আসলে অস্পৃশ্যসন্তান। তখনই সে রাগে অন্ধ হয়ে গাড়ি থেকে তাদের মালপত্রসহ উলটে ফেলে দেয়। তার কাঠের গাড়ি-বলদ সবকিছুই তো অপবিত্র হয়ে গেছে এদের ছোঁয়ায়! তখন তারা অনেক অনুনয়-বিনয় করে দ্বিগুন ভাড়া দেবার কথা কবুল করে গাড়োয়ানকে রাজি করায় এবং নিজেরাই গাড়ি চালিয়ে রাত দুপুরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। গাড়োয়ান ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে গাড়ির পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে চলে। পথে জলপিপাসায় তারা কোথাও জল খেতে পারেনি। কারো কাছে জল চাইলে দেখিয়ে দিয়েছে নোংরা জল, কেউবা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমন নিষ্ঠুর আঘাতে ভীমের মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। সেদিনই সে জানতে পারে যে, তারা এমন এক পরিবারে জন্মেছে, যারা সমাজে অস্পৃশ্য। এর কিছুদিন পরেই সে ভীষণ জলপিপাসায় গোপনে এক জলাশয় থেকে জল খেয়ে ধরা পড়ে যায় এবং ভীষণ মারও খায়।

এরপর ভীম জানতে পারে তার মাথার চুল নাপিত কেটে দিলে তার ক্ষুর-কাঁচি অপবিত্র হয় বলে কোনো নাপিত তাদের চুল কাটে না। অথচ এই নাপিতরাই অন্য সকলের চুল কাটা থেকে শুরু করে মোষের লোম ছেঁটে দেওয়ার কাজকেও পবিত্র মনে করে। বাধ্য হয়ে তাই বোনেরাই ভাইদের মাথার চুল কেটে দিত।

ওই স্কুলে একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক ছিলেন; তাঁর পদবি ছিল আম্বেদকর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং উদার মনের মানুষ। তিনি ভীমকে খুব স্নেহ করতেন। টিফিনের সময় তিনি তাঁর খাবার থেকে ভীমকেও খেতে দিতেন। ভীমের পিতার আসল পদবি ছিল শকপাল। এটা পারিবারিক উপাধি। মহারাষ্ট্রের লোকদের পদবি

তাদের গ্রামের নাম অনুসারেই হয়ে থাকে। এজন্য ভীমের গ্রামের নাম অনুসারে তার পদবি ছিল আম্বাবাদেকর। ওই শিক্ষক ভীমকে এত ভালবাসতেন যে, নিজের পদবি অনুসারে স্কুলের খাতাপত্রে ভীমের পদবি 'আম্বেদকর' করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সবাই তো আর এমন উদার হয় না! ভীম আর তার ভাইকে স্কুলে যেতে হত বাড়ি থেকে চটের টুকরো নিয়ে। কোনো বেঞ্চিতে তাদের বসতে দেওয়া হত না। ওই চটের টুকরোয় ক্লাসঘরের এককোণে সকলের থেকে দূরে তাদের বসতে হত। কোনো শিক্ষক তাদের বই-শ্লেট ছুঁতেন না। দূর থেকে ছোঁয়া বাঁচিয়ে যা বলার তা বলতেন, শ্লেটের লেখা দেখতেন। বাতাস অপবিত্র হয়ে যাবে বলে তাদের পড়া মুখস্থ বলতেও বারণ ছিল, কোনো রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও মানা ছিল তাদের। স্কুলে জলপিপাসা পেলে তারা মুখ তুলে হা করে থাকত উপরের দিকে, তখন কেউ দয়া করে উপর থেকে জল ঢেলে দিত মুখে। এভাবেই মেটাতে হত তাদের জলপিপাসা।

এইসব ঘটনায় বালক ভীমের মনে লেখাপড়ার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা এসে যায়। তখন গাছপালা লাগানোর প্রতি ঝোঁক যায় তার। কিছুদিন পরে তাও ভালো লাগে না। তখন গোরু-মোষ চরানো এবং ছাগল পোষাও শুরু করে দেয়। কোনো এক সময় সাতারার রেলস্টেশনে শুয়োরের মাংসও বিক্রি করেছে সে। তার পিসিমা এজন্য ভীষণ অপমান বোধ করলেও স্নেহবশে ভাইপোকে কোনো শাস্তি দেননি।

ইতিমধ্যে ভীমের পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং ছেলেমেয়েদের সৎমায়ের কাছে রেখে যান। মায়ের জায়গায় অন্য এক মহিলা এসে জুড়ে বসবে, তাঁর গয়না পরবে এটা ভীমের পছন্দ ছিল না। তাই কতকটা অভিমান করেই নিজের ভরণপোষণের জন্য পিতার উপর নির্ভর না করে নিজেই নিজের খরচ চালাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে। শুনেছিল বম্বে গেলে মিলে কাজ পাওয়া যায়। তাই ঠিক করলো সেখানে গিয়ে কোনো একটা মিলে গম ভাঙানোর কাজ করবে।

বম্বে যাবার খরচ জোগাড় করার জন্য সে একটি মতলব করেছিল। পিসিমার সাথেই সে রাত্রে ঘুমোয়, তাঁরই পয়সার পুঁটলি থেকে টাকা চুরি করবে বলে মনস্থির করে সে। কিন্তু পরপর তিনরাত্রি বিফল চেষ্টার পরে চতুর্থ রাত্রিতে সে কাজে সফল হলেও দেখা গেল পিসিমার পুঁটলিতে মাত্র দু'টি পয়সা আছে। সুতরাং তার আর বম্বে যাওয়া হল না। পরিবর্তে তার মনে এল লেখাপড়া শিখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরীক্ষায় পাশ করে জীবিকার্জন করা যায় তার চেষ্টা করা। সেদিন থেকেই ভীম আবার পড়াশোনায় ভীষণ মনোযোগী হয়ে ওঠে।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার পরে সুবেদার রামজী পরিবারের সবাইকে নিয়ে বম্বে

যান। মেয়েরাও বম্বেতেই থাকতেন। সেখানে লোয়ার প্যারেলে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে দাবক চাওলে একটি ছোট্ট ঘরে তাঁরাও বাস করতে শুরু করেন। দু'ভাইকে মারাঠা হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। পিতার কাছ থেকে ইংরেজি শিখে ভীম তখন ওই ভাষায় বেশ পাকা হয়ে ওঠে। সহপাঠীদের তুলনায় ইংরেজিতে বেশি জ্ঞান অর্জন করে সে। এই সময়ে স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়াও জ্ঞানার্জনের জন্য অন্যান্য বই পড়ার প্রতিও তার গভীর আগ্রহ জাগে। কিন্তু অস্পৃশ্যতার কারণে কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ার সুযোগ তার ছিল না। এজন্য রামজী খুব কষ্ট হলেও ভীমের জন্য মাঝে মাঝে বই কিনে আনতেন। কখনও মেয়েদের কাছ থেকে ধার করে কিংবা তাদের গয়না বন্ধক রেখেও সেই পয়সায় ভীমের জ্ঞানস্পৃহা মেটাবার জন্য বই কিনে দিতেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ভীম হবে একজন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বিদ্বান মানুষ। এজন্য কঠোরভাবে তার পড়াশুনার প্রতি তিনি লক্ষ রাখতেন।

কয়েকমাস পরেই ভীমকে বম্বের সেরা হাইস্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম এল্‌ফিনস্টোন হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এখানেই ভীম খুব মনোযোগী হয়ে পড়াশুনা শুরু করে। কিন্তু পড়াশুনার জন্য তার কোনো আলাদা ঘর ছিল না। একটিমাত্র ঘরে সবাই মিলে থাকতেন। সেই ঘরেই গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, বাসনকোশন, রান্নার উনুন, জ্বালানি কাঠ সবকিছু রাখা হত। রান্নার সময় ঘর ধোঁয়াটে হয়ে উঠত। তারই মধ্যে অনেক কষ্টে কেরোসিনের বাতি(লম্ফ) জ্বালিয়ে ভীমকে পড়াশুনা করতে হত। জায়গার অভাবে প্রথম রাতে ভীমকে ঘুমিয়ে নিতে হত। তখন তার পায়ের কাছে থাকত একটি ছাগল বাঁধা আর মাথার উপর দেয়ালে ঝুলানো একটি শানপাথর। রাত দুটো পর্যন্ত পিতা জেগে থাকতেন। এরপর ভীমকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি ঘুমোতেন, ভীম পড়াশুনা করত। আবার ভোরবেলা সামান্য ঘুমিয়ে নিয়ে স্নান সেরে স্কুলে চলে যেত।

এই স্কুলটিতে অস্পৃশ্যতার কারণে কোনো অপমান সহ্য করতে হবে বলে কারও ধারণা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখানেও অনেক অপমান তাকে সহ্য করতে হয়েছে। একদিন এক শিক্ষক কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে ভীমকে বোর্ডে আসতে বললে বর্ণহিন্দু ছেলেমেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ব্লাকবোর্ডের পিছনে তাদের টিফিনবক্স রাখা ছিল। তাদের ভয় হল ভীমের ছোঁয়ায় সেগুলি অপবিত্র হয়ে যাবে। তাই ভীম যাবার আগেই সবাই ছুটে গিয়ে টিফিনবক্সগুলি পটাপট একপাশে সরিয়ে ফেলে। এছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ 'ভীমের লেখাপড়া শেখা অর্থহীন', 'অস্পৃশ্য হয়ে কেন লেখাপড়া শিখতে এসেছো' ইত্যাদি বলে প্রায় সময়ই নিরুৎসাহিত করতেন। ভীষণ বিরক্তিকর ও শ্রুতিকটু ওইসব কথা ভীমকে মাঝে মাঝে খুব রাগিয়ে দিত। একদিন রেগে গিয়ে এক শিক্ষককেই বলে ফেলেছিল যে, ওই সব কথা না বলে তিনি যেন তার নিজের কাজে মন দেন।

শ্রমিক এলাকায় বসবাস করার ফলে ভীমের শ্রমিকদের অভাব অনটন ও দুরবস্থার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছিল। তার কয়েকজন শ্রমিক আত্মীয়ের টিফিন ক্যারিয়ার বয়ে নিয়ে মিলে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত সে। নিজেও স্কুলে টিফিনে খেত সামান্য কয়েক টুকরো রুটি ও সবজি।

স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত পড়ার ইচ্ছা থাকলেও ভীম ও তার বড়ো ভাইকে তা পড়তে দেওয়া হয়নি। সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'বেদ'সহ যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। বেদ পড়া বা শোনা শূদ্র ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের সম্পূর্ণ বারণ। তাতে বেদ অপবিত্র হয়ে যাবে যে! এদের কেউ যদি বেদ পড়ে বা শুনে ফেলে তাহলে প্রচণ্ড অমানুষিক শাস্তির বিধানও রয়েছে হিন্দুশাস্ত্রে। সংস্কৃত পড়লে তো বেদও পড়তে হবে! তাই তাদের সংস্কৃত পড়তে দেওয়া হয়নি! ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের জন্যই সংস্কৃত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয় তারা। বদলে তারা পারসি ভাষা পড়তে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য আম্বেদকর বেদ পড়েছিলেন, বিদেশি পণ্ডিতদের ইংরেজিতে অনুবাদ করা বেদ এবং পরে সংস্কৃতও শিখেছিলেন নিজের চেষ্টা ও কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্য নিয়ে।

হিন্দুরা যতই মানসিক অত্যাচার ও অপমান করুক না কেন পিতার উপদেশ ও উদারচেতা কিছু মানুষের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভীম জীবনে উন্নতি লাভের লক্ষ্যে পড়াশুনা চালিয়ে যায়। অবশেষে ১৯০৭ সালে ওই স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তখনকার প্রবেশিকা পাশ এখনকার মেট্রিক বা দশ ক্লাস পাশের সমতুল্য। এর কিছুদিন আগেই বড়োছেলেকে রামজীর পক্ষে আর পড়ানো সম্ভব নয় বলে স্কুল ছাড়িয়ে চাকরির খোঁজে লাগিয়ে দেন এবং দু'জনের প্রচেষ্টায় যাতে ভীম শিক্ষালাভ করতে পারে সেদিকে নজর দেন। ভীম সেই পরীক্ষায় ৭৫০ নম্বরের মধ্যে ২৮২ নম্বর পেয়েছিল। একজন অস্পৃশ্য বালকের পক্ষে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়াশুনো করে ওই নম্বর তোলাও তখন একটি বিরাট ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া পরীক্ষায় ওই নম্বর পেলেও অন্যান্য জ্ঞানের বই পড়ে তার জ্ঞানের পরিধি তখন সহপাঠীদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

একজন অস্পৃশ্য মাহার বালকের পক্ষে সেই সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা ছিল যেমন আশ্চর্যের তেমনি বিশাল গৌরবেরও। এজন্য মাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা বম্বে শহরে এক সভার আয়োজন করে ভীমকে অভিনন্দিত করে সম্মান জানান। ওই সভায় উইলসন হাইস্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণজী অর্জুন কেলুস্কর নামে একজন লেখক ও সমাজসংস্কারকও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভীমের সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আরও উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন। ভীমের সঙ্গে তাঁর একটি বাগানে বসে বই পড়ার সুবাদে আগেই পরিচয় ছিল এবং কিশোর ভীমের পাঠাভ্যাসে মুগ্ধ হয়ে তিনি

স্নেহবশত তাকে পড়ার জন্য বিভিন্ন বই দিতেন। তাঁর নিজের লেখা 'লাইফ অব গৌতম বুদ্ধ' নামক বইখানিও তিনি ভীমকে উপহার দিয়েছিলেন। ওই সময় ভীমের পিতা সুবেদার রামজী তাঁকে জানিয়েছিলেন শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও ভীমকে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে তিনি বদ্ধপরিকর।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর অল্পদিনের মধ্যেই দাপোলির একজন সৎ ও গরিব কুলি ভিকু ওয়ালাঙ্করের মেয়ে রামীর সঙ্গে ভীমের বিয়ে হয়ে যায়। তখনকার দিনের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। পিতার ইচ্ছেতেই ভীম বিয়ে করতে রাজি হয়। তখন ভীমের বয়স ছিল সতেরো এবং বালিকা বধূ রামীর বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। বিয়ের পর রামীর নতুন নাম হয় রমাবাঈ। সে ছিল অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শান্ত একটি মেয়ে।

ভীমের বিবাহ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল এক বিচিত্র জায়গায়Ñ বম্বের বাইকুল্লার মাছবাজারে একটি খোলা ছাদের নিচে। দিনের হাটবাজার শেষ হয়ে গেলে রাতের বেলা বর ও বরযাত্রীরা ওই ছাদের তলায় এক কোণের দিকে জায়গা করে নেন এবং অপরদিকে একটি কোণে বসে যান কনে ও তার আত্মীয়রা। মাছবাজারের নোংরা জলের ছোটো নর্দমাগুলি ছিল তাঁদের পায়ের কাছে। মাছবাজারে পাথরের তৈরি প্লাটফর্মগুলি ছিল তাঁদের বসার বেঞ্চ। সমস্ত মাছবাজারটিই তখন একটি বিবাহ বাসরে পরিণত হয়েছিল। বিয়ের কাজ শেষ হওয়ার পরে ভোরবেলা মাছবিক্রেতারা এসে পৌঁছাবার আগেই সবাই ওই জায়গা ছেড়ে চলেও যান।

নিজস্ব সংকল্প এবং পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ভীমরাও রামজী আম্বেদকর এলফিনস্টোন কলেজে ভর্তি হন। একজন অস্পৃশ্য তরুণের পক্ষে এটা ছিল একটা নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জীবন ও অভূতপূর্ব সুযোগ। প্রবল আগ্রহ নিয়ে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ রোগে পড়ে তাঁর একটি বছর নষ্ট হয়ে যায়। পরে যখন আই.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন তখন তাঁর পিতা অর্থাভাবে পড়েন। ভীমের পড়াশুনো বন্ধ হবার উপক্রম হয়। এই সময় তাঁর সাহায্যার্থে ছুটে আসেন সেই স্কুলশিক্ষক কেলুস্কর।

এর কিছুদিন আগে বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় বম্বের টাউনহলে এক সভায় অস্পৃশ্যদের মধ্যে যোগ্য ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা চালিয়ে যাবার জন্য সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অর্থাভাবের জন্য ভীমের পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জেনে উদার মনের মানুষ স্কুলশিক্ষক কেলুস্কর মহারাজাকে গিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভীমের পক্ষে সুপারিশ করেন। মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় কথায় যা বলতেন, কাজেও তাই করতেন। তিনি ভীমরাওয়ের বক্তব্য শুনে, কয়েকটি

প্রশ্ন করেন ও উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে মাসে তাঁর জন্য পঁচিশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন।

এলফিনস্টোন কলেজের বিদেশি অধ্যাপক মূলার ভীমরাওকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। তিনি তাঁকে বইপত্র ধার দিতেন, এমনকি পোশাক-আশাক দিয়ে পর্যন্ত সাহায্য করতেন। ভারতীয় কোনো অধ্যাপক তেমন কোনো সহযোগিতা তাঁকে করেননি। কলেজের ব্রাহ্মণ হোটেলকিপার তাঁকে চা-জলটুকুও পর্যন্ত দেয়নি।

এই সময় সুবেদার রামজী বম্বের প্যারেলে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর ১নং চাওলে চলে যান। তাঁর পরিবার সেখানে মুখোমুখি দু'টি ঘর নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তার একটি ঘর ব্যবহৃত হত পড়াশুনো ও বৈঠকখানা হিসেবে এবং অন্য ঘরটি গৃহস্থালির জন্য। এ সময় নিবিষ্টমনে ঘরে থেকে পড়াশুনো করার সুযোগ পেলেন ভীমরাও আম্বেদকর। বাইরে থেকে পিতাও তাঁর পড়াশুনোয় কোনো বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। অবশেষে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ভীমরাও বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করলেন।

পরম হিতৈষী বরোদার মহারাজার রাজ্যে চাকরি করার ইচ্ছে ছিল ভীমরাওয়ের। কিন্তু বারবার পিতার কাছে অনুমতি চেয়েও তিনি তা পাননি। তথাপি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভীমরাও ওই রাজ্যের সেনাবিভাগে এক লেফটেন্যান্টের পদে চাকরিতে যোগ দেন। এই পদে চাকরিতে যোগদান করার পেছনে ছিল তাঁর অন্য এক উদ্দেশ্যও। ব্রিটিশ ভারতের উচ্চবর্ণের গোঁড়া হিন্দুরা অধিকাংশ অফিস-আদালতই যেখানে দখল করেছিল, সেখানে কর্মচারী হিসেবে অস্পৃশ্য মাহার ঘরের যুবক ভীমরাও কাজ করতে গেলে যে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের উদ্ভব হতে পারে, তা উপলব্ধি করেই তাঁর এই পদক্ষেপ।

কিন্তু বরোদা রাজ্যে মাত্র দিনপনেরো চাকরি করতে পেরেছিলেন ভীমরাও। সেই সময় টেলিগ্রাম মারফত খবর পান তাঁর পিতা ভীষণ অসুস্থ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বরোদা ত্যাগ করে অসুস্থ পিতাকে দেখতে রওনা হন। পথে সুরাট স্টেশনে পিতার জন্য মিষ্টি কেনার উদ্দেশ্যে নেমে গেলে ফিরে এসে আর ওই ট্রেনটি ধরতে পারেননি। পরদিন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি যখন তিনি বম্বে পৌঁছালেন তখন পিতা মৃত্যুশয্যায়। তাঁকে দেখে ভীমরাও ভীতিবিহ্বল অবস্থায় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পাশে বসলে পিতা তাঁর দুর্বল হাতখানি পুত্রের পিঠের উপর বাড়িয়ে দেন। পরক্ষণেই গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যিনি ছিলেন জীবনের একমাত্র ভরসা, প্রধান উৎসাহদাতা, তাঁর মৃত্যুতে ভীমরাও শোকে অধীর হয়ে পড়েন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আত্মোন্নতি

পিতার মৃত্যুতে ভীমরাও আম্বেদকর তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বনকে হারালেন। এবার তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এতদিন পিতার উপদেশ ও তত্ত্বাবধানে নিজেকে চালিত করেছেন, কিন্তু এখন তাঁর সেই অবলম্বন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। জীবনে চলার পথে যা কিছু করার এখন তা নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে করতে হবে। কিন্তু তাঁর মনে সর্বদাই হিন্দুধর্মের অমানবিক নীতির বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা বিরাজ করত। কী করে অস্পৃশ্যতা দূর করে সবার জন্যে সমান অধিকার আদায় করা যাবে সেই ভাবনাই ছিল তাঁর প্রধান। কিন্তু এসবের জন্য চাই জ্ঞানের আলোক। সেজন্য চাই আরও উচ্চতর শিক্ষা। কী করে সম্ভব হবে সেই শিক্ষালাভ!

এই অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মানসিক উত্তেজনা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। বরোদার স্বল্পকালীন চাকরিতে যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে তাতে আর সেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। অবশেষে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জুনমাসে আর একটি সুযোগ আসে তাঁর জীবনে। বরোদার সেই মহারাজাই কিছু ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার কথা ভাবছিলেন। এজন্য তিনি বৃত্তি ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিলেন। বম্বে শহরে মহারাজার প্রাসাদে গিয়ে একদিন ভীমরাও তাঁর জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে খুলে বলেন। মহারাজা বৃত্তি দেবার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাঁকে আবেদন করতে বলেন। আম্বেদকর আবেদন করলে অন্য আরও তিনজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁকেও উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠাবেন বলে মহারাজা সিদ্ধান্ত নেন। ভীমরাওকে বরোদায় ডেকে পাঠানো হল। 'তাঁকে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হবে ও অধ্যয়ন শেষে ফিরে এসে দশ বছরের জন্য বরোদায় চাকরি করতে হবে'Ñ এই মর্মে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের উপমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

সে সময় যে কোনো ভারতীয়ের পক্ষে এটা ছিল একটা সুবর্ণ সুযোগ! একজন অস্পৃশ্যের পক্ষে তো বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই বটে! তখনকার দিনে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা! একজন অস্পৃশ্য ঘৃণ্য মাহার সন্তান আমেরিকার মতো দেশে যাচ্ছে উচ্চতর জ্ঞান ও বিদ্যার অনুশীলন করতে। এর প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য এতে কোনো সন্দেহই নেই। ভারতের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ভীমরাও আম্বেদকরই সর্বপ্রথম শিক্ষার জন্য আব্রাহাম লিংকন ও বুকার টি ওয়াশিংটনের

দেশ আমেরিকায় গিয়েছিলেন।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আম্বেদকর নিউইয়র্কে পৌঁছান। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস 'হার্টলি হলে' তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন। কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ খাবারই তার অপছন্দের ছিলÑ বিশেষ করে গোমাংসও ছিল সেখানকার খাবারের মধ্যে। তাই তিনি চলে যান কস্মোপলিটন ক্লাবে। সেখানে কিছু ভারতীয় ছাত্র থাকত। এরপর থাকতে শুরু করেন লিভিংস্টোন হল ডর্মিটরিতে এক পারসি ছাত্র নেভাল ভাথেনার সঙ্গে। এই ভাথেনার সাথেই গড়ে উঠেছিল তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব। পরবর্তীকালে তিনি আরও উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাবার জন্য আর্থিক সাহায্যও দিয়েছিলেন আম্বেদকরকে।

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসেই আম্বেদকর জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলেন স্বাধীনতার স্বাদ, এক নতুন জীবন। এখানেই পেলেন সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ। এখানে নেই অস্পৃশ্যতা নামক ঘৃণ্যব্যাধির কোনো প্রকোপ, নেই অস্পৃশ্যতার গ্লানিময় জীবন। সকলের সাথে সমান মর্যাদা নিয়ে চলাফেরা করায় এখানে নেই কোনো বাধা। এখানে সকলের সাথে সমান মর্যাদা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন, লিখতে পারছেন। সমান মর্যাদা নিয়ে সকলের সাথে বেড়াতে যাওয়া, স্নান করা, বিশ্রাম নেওয়া কোনোকিছুতেই বাধা নেই। তিনি সকলের সাথে একই টেবিলে টেবিলক্লথের উপর খাবার রেখে খেতে পারছেন, তাতে কারও জাত যাচ্ছে না। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সেই জীবন ছিল সত্য আবিষ্কারের জীবন। একটা নতুন জগতের সন্ধান পেলেন তিনিÑ যে জগৎ মনের দিগন্তকে প্রসারিত করে। নতুন সম্ভাবনায় সে জীবন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তখন থেকেই আম্বেদকর দলিত শ্রেণির মঙ্গলের কথা ভাবতে থাকেন, কেননা তিনি যে তাঁদেরই একজন। এই সমাজের আরও অনেকে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হবেন এটাই তিনি চাইতেন। সবাই মিলে সমাজ সংস্কারের কাজে লাগলে নিশ্চয় একদিন তাঁদের দুঃখদুর্দশারও অবসান হবে। এজন্য চাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষাদান। পিতামাতাকে শুধু সন্তানের জন্ম দিলেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষায় তাদের সুশিক্ষিত করে তোলাও দরকার। তবেই হবে এ সমাজের মঙ্গল সাধন। আম্বেদকরের চিন্তাধারায় এসবই ছিল ভবিষ্যতের আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার আন্দোলনের উৎস।

আম্বেদকর নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলেন যে, তাঁর মতো নামযশ, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়েও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। এজন্য তিনি তাঁর দায়িত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জ্ঞানলাভই যে তার আসল চাবিকাঠি তাও তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি কঠোর পরিশ্রমের

মাধ্যমে নিজেকে পড়াশোনার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। ধনীর সন্তানদের মতো অলসতা বা বিলাসিতার জীবন তাঁর নয়। তিনি কোনোদিন থিয়েটার দেখতে যাননি বা অযথা ঘুরে বেড়িয়েও সময় কাটাননি। তিনি পেটের খিদে মেটাতেন সামান্য খাবার খেয়ে, তার মধ্যে ছিল এককাপ কফি, দু'টুকরো কেক, সামান্য মাংস অথবা মাছ। প্রতি মাসে তাঁর বৃত্তির টাকা দিয়ে কিছু কিছু বাঁচাতে হত। তাই খরচ কমাতে বাধ্য হতেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি লাভই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান আহরণ করা। দেশে থেকে তিনি ইংরেজি ও পারসি ভাষা নিয়ে বি.এ. পাশ করেছিলেন। এবার পাঠ্য হিসেবে নিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে সবচেয়ে যে অধ্যাপকের সাহায্য বেশি পেয়েছিলেন তাঁর নাম এডুইন আর. এ. সেলিগম্যান। তাঁর প্রতিটি ক্লাস করার জন্য তিনি আম্বেদকরকে সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি ভালো পড়াতেন ও ছাত্রদেরকে সস্নেহে গাইড করতেন। তাই আম্বেদকরও সর্বদাই তাঁকে অনুসরণ করতেন তাঁর ক্লাস করার জন্য। গবেষণা করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি আন্তরিকতার সাথে উপদেশ দিতেন ও এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিতেন।

এভাবেই আরম্ভ হয় আম্বেদকরের জ্ঞানার্জনের সাধনা। দিনে আঠারো ঘণ্টাই তিনি পড়াশোনা করে কাটান। অবশেষে দু'বছর কঠোর পরিশ্রমের পর এক অপরিসীম প্রেরণা নিয়ে সাফল্য এলো তাঁর জীবনে। তিনি "ভারতীয় প্রাচীন বাণিজ্য" (Ancient Indian Commerce) নামক গবেষণা গ্রন্থখানির জন্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ডঃ গোল্ডেন উইজার আয়োজিত নৃতত্ত্ব সেমিনারে (Anthropology Seminar) "ভারতে জাতি, তার উৎপত্তি, গঠন ও ক্রমবিকাশ" (Caste in India, their Mechanism, Genesis and Development) সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্রও পাঠ করেন তিনি। এর মধ্যে তিনি মন্তব্য করেনÑ একমাত্র স্ববর্ণে বিবাহই জাতপাতের মূল কারণ।

এটাই আম্বেদকরের সাফল্যের প্রথম ধাপ। সে সময় তিনি আরও একটি বিষয়ের উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেনÑ সেটি হলো "ভারতের জাতীয় আয়Ñ একটি ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা" (National Dividend of India- A Historic and Analytical Study)। গভীর মনোনিবেশ সহকারে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি এই গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণাপত্রটিকে স্বীকৃতি দান করে। এর আট বছর পরে লণ্ডনের মেসার্স পি.এস. কিং অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড গবেষণাপত্রটি বর্ধিত আকারে "The Evolution of

Provincial Finance in British India" নামে প্রকাশ করে। আম্বেদকর তখন বইখানির প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এজন্য তাঁকে 'ডক্টর অব ফিলোজফি' উপাধিতে ভূষিত করে। শিক্ষাজগতে আম্বেদকরের এই উজ্জ্বল সাফল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মিলে তাঁর সম্মানার্থে এক বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। ভারতের অস্পৃশ্য এক যুবককে আমেরিকার যুবসমাজ সানন্দে তাঁর পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন করে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। বইখানি পরে আরও সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হয় এবং তাঁকে শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বরোদার মহারাজার নামে উৎসর্গ করা হয়। ওই বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভূমিকা লিখেছিলেন সেই অধ্যাপক এডুইন আর.এ. সেলিগম্যান। আম্বেদকর সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যকে কঠোর নিন্দা করে তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন ওই বইয়ে। সেইসঙ্গে সেই দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড আঘাত করেছেন।

আম্বেদকরের বইয়ের তৃষ্ণা ছিল অফুরন্ত। সামান্য অবসর পেলে তিনি শহরের পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে বই পড়তেন এবং পছন্দ হলে কিনে নিতেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরেই তিনি প্রায় দু'হাজার বই কিনেছিলেন। বইগুলি বাক্সবন্দি করে এক বন্ধুর কাছে দিয়েছিলেন ভারতে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বন্ধুটি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন; ভারতে এসে তিনি তার অল্প কয়েকখানি বইই ফেরত পেয়েছিলেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল সাফল্য লাভের পর আম্বেদকর বিদ্যার্জনের জন্য লণ্ডনে যেতে মনস্থির করেন। সেটাই ছিল বিদ্যার্জনের আন্তর্জাতিক পীঠস্থান। সব রকমের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণতম সুযোগই সেখানে ছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি আমেরিকা থেকে লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হন।

লণ্ডনে পৌঁছতেই ব্রিটিশ-গোয়েন্দা পুলিশ ভারতীয় বিপ্লবী দলের লোক সন্দেহে আম্বেদকরকে তাঁর পোশাক-আশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহ তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে দেখে। তখনও বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আমেরিকায় ভারতকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে পরিচালিত 'গদর পার্টি'তে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের জন্য আম্বেদকরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি তাতে যোগ দিতে রাজি হননি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে তাই তিনি সন্দেহের তালিকায় ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া দূরে থাক, আম্বেদকর কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের কথাও ভাবেননি। সেদিন ওই নেতাকে তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন ছাত্র এবং মহারাজা তাঁকে বিশ্বাস করেই তাঁর জীবনে

একটি সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর সেই পবিত্র বিশ্বাসের অমর্যাদা তিনি করবেন না। পড়াশুনোর কাজ তাঁকে অবশ্যই শেষ করতে হবে।

অক্টোবর মাসে লণ্ডন পৌঁছেই আম্বেদকর 'গ্রেস ইন'-এ আইনশাস্ত্র এবং 'লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ অর্থশাস্ত্র পড়ার জন্য ভর্তি হন। লণ্ডনে পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্য বরোদার মহারাজকে বুঝিয়ে তাঁর কাছ থেকে তিনি অনুমতিও নিয়েছিলেন। অর্থনীতিতে তাঁর পড়াশুনো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে দেখে লণ্ডনের অধ্যাপকগণ তাঁকে 'ডক্টর অব সায়েন্স'-এর জন্য প্রস্তুত হতে অনুমতি দেন। একটি বিষয়ের উপর গবেষণার কাজ শুরুও করেন তিনি। সেই সময় বরোদার দেওয়ান তাঁকে জানান যে, তাঁর বৃত্তির সময়কাল শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তাঁকে ভারতে ফিরে যেতে হবে।

পড়াশুনো করার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে ভারতে ফিরে আসতে হয়। অবশ্য অর্থের ব্যবস্থা করে লণ্ডনে পড়াশুনো করার জন্য তিনি আবার ফিরে যাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। চার বছরের মধ্যে ফিরে গিয়ে আবার যাতে অধ্যয়ন শুরু করতে পারেন তার জন্য অধ্যাপক এডউইন ক্যানানের সুপারিশে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই তিনি দেশে ফেরেন। ফিরে আসার সময় বইপত্রসহ তাঁর সমস্ত মালপত্র ইনসিওর করে তুলে দেন 'থমাস কুক অ্যাণ্ড সান'-এর হাতে এবং নিজে বুলন শহর থেকে গাড়ি ধরে মার্সাই পৌঁছে 'এস.এস.কাইজার-ই-হিন্দ' নামক জাহাজে চড়েন।

সে সময় যুদ্ধচলাকালীন ধ্বংসলীলা চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। বোমা ও ডুবোজাহাজের আক্রমণের ভয়ে কোথাও যাওয়াও ছিল বিপজ্জনক। সে সময়ে ভূমধ্যসাগরে একটি জাহাজ প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়ে পড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সংবাদ আম্বেদকর পরিবারে এসে পৌঁছালে পরিবারের সবাই ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। পরে খবর নিয়ে জানা যায় যে, আম্বেদকর অন্য জাহাজে আসছেন আর যে জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে সেটিতে ছিল তাঁর মালপত্র।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের **২১** অক্টোবর আম্বেদকর কলম্বো হয়ে বম্বে পৌঁছান। শিক্ষাজগতে তাঁর সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সম্ভজী ওয়াগমারে ও তাঁর সঙ্গীসাথিরা এক সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন বম্বের তৎকালীন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর চুনিলাল শেতলবাদ। কিন্তু আম্বেদকর ওই সভায় উপস্থিত হননি। সভাশেষে বক্তা ও গুণগ্রাহীরা তাঁর গরিবি বাসস্থানে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দিত করে আসেন।

চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী আম্বেদকর চাকরি করতে বরোদায় যাবেন বলে ঠিক

করেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার ট্রেনের ভাড়ার টাকাও তাঁর ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময় "মেসার্স টমাস কুক অ্যাণ্ড সন" তাঁর নষ্ট হয়ে যাওয়া লাগেজের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়। তিনি একসঙ্গে দুঃখ এবং আনন্দের সঙ্গে সেই টাকা গ্রহণ করেন। দুঃখের কারণ নিউইয়র্ক ও লণ্ডনে যে অমূল্য বইগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি তাঁকে হারাতে হয়েছে। আনন্দ এইজন্য যে ওই টাকার কিছুটা তিনি তাঁর স্ত্রীর হাতে দিতে পারবেন এবং বাকি টাকায় বরোদায় যাবার ট্রেনের ভাড়াও হয়ে যাবে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আম্বেদকর বরোদায় যান। বরোদার মহারাজা তাঁর লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্টেশনে গিয়ে আম্বেদকরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে। কিন্তু একজন অস্পৃশ্য মাহারকে কে অভ্যর্থনা জানাতে যাবে? সুতরাং তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশনে কেউ ছিল না। বরং একজন মাহার যুবক বরোদায় আসছেন এই খবর রটে গিয়েছিল সারা শহরে। সে কারণেই তাঁর সঙ্গী বড়োভাই ও আম্বেদকরের কোনো হোটেল বা ছাত্রাবাসে থাকার জায়গা মিলল না। বাধ্য হয়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন একটি পারসি হোটেলে। সেখানেও আত্মপরিচয় লুকিয়ে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

চুক্তি অনুযায়ী দশ বছর বরোদায় চাকরি করার কথা। মহারাজা চেয়েছিলেন প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলে তাঁকে অর্থমন্ত্রী করবেন, তাই আপাতত তাঁকে সামরিক সচিব রূপে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু অস্পৃশ্য সমাজে জন্ম বলে সেখানেও তাঁর সবকিছুই ওলটপালট হয়ে যায়। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী, এমনকি সামান্য চাপরাশিদের কাছ থেকেও তিনি এমন ব্যবহার পেতে লাগলেন যেন তিনি একজন কুষ্ঠরোগী। গরিব নিরক্ষর চাপরাশিরা অফিসের কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদি হাতে করে আম্বেদকরকে দেওয়াটাকে একটা পাপের কাজ বলে মনে করল। সেজন্য তারা ফাইলের বাণ্ডিল ও অন্যান্য কাগজপত্র তাঁর টেবিলে দূর থেকে ছুঁড়ে দিতে শুরু করে। অফিসে তাঁকে কেউ খাবার জলও দিত না। এই অপমানক্লিষ্ট পরিবেশ অসহ্য হয়ে ওঠায় তিনি সাধারণ পাঠাগারে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু এরপর একদিন চূড়ান্ত অপমানে অপমানিত হলেন আম্বেদকর। তিনি যে পারসি হোটেলে উঠেছিলেন, তাদেরই লোকজন একদিন লাঠিসোটা নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে জানতে চায় তিনি আসলে কে। আম্বেদকর উত্তরে তিনি একজন হিন্দু বললেও তারা তা শুনতে চায় না। তারা গালাগালি দিতে থাকে বদমাস, জোচ্চোর বলে। তারা আরও বলে, "আমরা জানি তুই একজন ঘৃণ্য অস্পৃশ্য। কেন তুই আমাদের হোটেল অপবিত্র করেছিস। এক্ষুনি এই মুহূর্তে তোর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে যা।" আম্বেদকর নিজেকে সংযত করে তাদের কাছে আটঘণ্টা সময় ভিক্ষা চাইলেন। তিনি মহারাজার কাছে এ বিষয়ে লিখে জানালেন। মহারাজা সেই লেখা পাঠালেন

দেওয়ানের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। দেওয়ান দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন, এ বিষয়ে তিনি কিছু করতে অক্ষম। সেদিন ওই শহরের কোনো হিন্দু বা মুসলিম তাঁকে থাকার জন্য এতটুকু ঠাঁই দেয়নি। শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত আম্বেদকর এক গাছতলায় বসে অঝোরে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। মাথার উপরে আকাশ আর পায়ের তলায় মাটি ছাড়া তাঁর আর কোনো আশ্রয় সেদিন ছিল না। তিনি ওই সব অজ্ঞ, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও কুপ্রথায় আচ্ছন্ন লোকগুলোর চেয়ে সহস্রগুণে উন্নত একজন বিদ্বান ব্যক্তি, তথাপি তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অর্জিত বিদ্যা সত্ত্বেও তিনি বর্ণহিন্দুদের কুসংস্কারকে এতটুকুও টলাতে পারেননি। এজন্য তিনি আরও বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন।

এমন চরম অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়ে নিরুপায় আম্বেদকর গভীর হতাশা নিয়ে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বম্বে ফিরে গেলেন। যে কেলুস্কারের সহায়তায় তিনি সয়াজীরাও গাইকোয়ারের নজরে এসেছিলেন, তাঁর মাধ্যমেই আবার তাঁর প্রতি যে দুর্বিসহ আচরণ করা হয়েছে তা জানালেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। অতঃপর কেলুস্কারের চেষ্টায় বরোদার এক প্রগতিশীল অধ্যাপক নিজ বাড়িতে আম্বেদকরকে পেয়িংগেস্ট হিসাবে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আম্বেদকর যখন পুনরায় বরোদা রেলস্টেশনে গিয়ে পৌঁছান, তখন সেই অধ্যাপকের লেখা একটি চিরকুট পান। তাতে তিনি তাঁর স্ত্রীর বিরোধিতার জন্য সেখানে যেতে নিষেধ করেন। অগত্যা আম্বেদকর বরোদা স্টেশন থেকেই আবার ফিরে আসেন। এভাবেই তিনি উপকারী মহারাজার কাছ থেকে বিদায় নেন।

বম্বে পৌঁছাবার ক'দিন পরেই আম্বেদকরের বিমাতা মারা যান। তাঁর উদ্ধত স্বভাবের জন্য গোটা পরিবারটিই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তথাপি আম্বেদকর যথরীতি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ওই সময়ের ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। ওই সময় ব্রিটিশ সরকার এক গভীর সংকটে পড়ে। যুদ্ধকালীন বিপর্যয়ে সরকার তখন হতোদ্যম। অন্যদিকে ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন, বিপ্লবীদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ ইত্যাদিতে উৎপীড়িত। এই সময় ব্রিটিশ সরকারের স্টেটসেক্রেটারি মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট 'হাউস অব কমন্স'-এ ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত নীতির মধ্যে ভারতে দায়িত্বশীল ও প্রগতিশীল সরকার গঠনের ক্রমোন্নতিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এরপরেই মণ্টেগু বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ যাচাই করতে ভারতে আসেন। সেই সময় সব রকমের প্রতিষ্ঠান ও যুগপরম্পরা বঞ্চিত শ্রেণির সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়া এই প্রথম প্রবলবেগে বেরিয়ে আসতে থাকে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর

ও ডিসেম্বর মাসে সকল মতাবলম্বীরা ক্ষোভের সঙ্গে তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আবেদন-নিবেদন করেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেই সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিরাও বেরিয়ে এলেন। বিদেশ থেকে প্রত্যাগত নবীন আম্বেদকর তখন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ।

ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অস্পৃশ্যদের পক্ষে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাদের মধ্যে একটি ছিল মাদ্রাজ প্রদেশের **'পঞ্চম কলভি অভিভারতী অভিমান সংঘ'**। এই সমিতি যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তন হোক না কেন, ব্রাহ্মণদের কবল থেকে অস্পৃশ্যদের রক্ষা করার আবেদন জানায়। রাজনীতিতে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব মানেই বিষধর সাপের হাতেই ব্যাঙের অভিভাবকত্ব ন্যস্ত করা। মাদ্রাজের ষাট লক্ষ আদিবাসীর প্রতিনিধি **'আদি-দ্রাবিড় জনসংঘ'** তীব্র প্রতিবাদ জানায় এই বলে যে, বর্ণহিন্দুরা তাঁদের কুষ্ঠরোগীর মতো ঘৃণা করে ও তাদের উন্নতির জন্য কোনো সুযোগই দেয় না। বাংলা থেকেও অস্পৃশ্যদের একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রতিনিধিত্ব করেছিল। 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস মিশন'-এর পক্ষ থেকে এন.জি.চন্দভারকর মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হঠাৎ তখন দলিত শ্রেণির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে। সাংগঠনিকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন করার জন্য দলিত সমস্যা তখনও পর্যন্ত তাদের চিন্তাভাবনায় ছিল না। কিন্তু মুসলিমদের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিতে কংগ্রেস-লিগ চুক্তি অনুসারে দলিত শ্রেণির প্রতি হঠাৎ কংগ্রেসের প্রেম যেন উথলে উঠে। অথচ এর আগে অস্পৃশ্যদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ভ্রূক্ষেপই ছিল না কংগ্রেসের।

কংগ্রেস-লিগের দাবি বিবেচনা করে দেখার জন্য দলিত শ্রেণির মানুষ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে বম্বেতে দু'টি সম্মেলন ডাকেন। প্রথম সম্মেলনটি ডাকা হয় নারায়ণ গণেশ চন্দভারকরের নেতৃত্বে। উক্ত সম্মেলনে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার একটি প্রস্তাবে বলা হয় সংখ্যানুপাতে আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা। অন্য একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস-লিগকে সমর্থনের কথা বলা হয়, কিন্তু পরিবর্তে অস্পৃশ্য শ্রেণির উপর সামাজিক প্রথা ও ধর্মের নামে যে অবিচার ও দুর্ব্যবহার করা হয় তা দূর করার জন্য বর্ণহিন্দুদের মনের উপর যাতে ন্যায়নীতিপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিফলন ঘটে সে সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা।

এর ক'দিন পরেই অপর সম্মেলনটি ডাকা হয়। ওই সম্মেলনে বর্ণহিন্দুদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করা হয় ও সরকারের কাছে তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দানের জন্য আবেদন করা হয়।

প্রথম সম্মেলনের সময় আম্বেদকরের মা মারা যাওয়ার শোকপর্ব চলছিল। তা ছাড়া কংগ্রেস পরিচালিত অস্পৃশ্যদের কোনো সভায় যোগদান করার সম্ভাবনাও তাঁর ছিল না। আর দ্বিতীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য যদিও তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল ছিল, তথাপি ওই সম্মেলনে যোগদান করার অবস্থা তাঁর ছিল না।

প্রথম অস্পৃশ্য সম্মেলনের দাবি অনুসারে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক সম্মেলনে একটি সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নেয়। এই সিদ্ধান্তটি কংগ্রেস-লিগ পরিকল্পনার প্রতি অস্পৃশ্য মানুষেরা যে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিলেন তার এক প্রতিদান।

কংগ্রেস-লিগ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আম্বেদকরের প্রতিক্রিয়া ছিল এরকমÑ পরিকল্পনায় কিন্তু এটা বলা হয়নি যে, ইচ্ছামতো কার্যনিবর্বাহক সমিতি গঠন করা, কিংবা সেটাকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা আইনসভার হাতে থাকা উচিত। তিনি বলেন যে, ওই পরিকল্পনাটি ত্রুটিযুক্ত, কারণ এতে কার্যনির্বাহক সমিতি ও আইন পরিষদকে বিভিন্ন (দলীয়) শক্তির কাছে দায়বদ্ধ থেকে তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবের তিনমাস পরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ও ২৪ মার্চ বম্বে শহরে ভারতের 'ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন'-এর এক সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড়। ভারতের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যথা ভিটলভাই প্যাটেল, এম.আর.জয়াকর, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য আরও অনেকে যোগদান করেন। ডঃ হ্যারল্ড এইচ ম্যান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকার শ্রীশংকরাচার্য, কার্ভির ডঃ কুর্তকোটি প্রভৃতি ব্যক্তির শুভেচ্ছাবার্তাও এসেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার নারায়ণ গণেশ চন্দভারকর বলেন যে, তাঁরা সমগ্র দেশবাসীর বিবেক, যুক্তি ও হৃদয়ের কাছে আবেদন জানাতে সম্মিলিত হয়েছেন এবং সমস্ত ভারতবাসীর কাছে অস্পৃশ্যতারূপ কলঙ্ককে দূর করার আবেদন করছেন। মহারাজা বলেনÑ বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার কাছে এবং সামাজিক উন্নয়নের পুনর্জাগরণের মুখে অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কার ও শ্রেণিভেদ ধর্মান্ধতা টিকে থাকতে পারে না। কারণ ওইগুলি আমাদের হাজার হাজার দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনে তিলক, খাপার্ডে এবং এ.ভি.ঠক্করও সভায় যোগ দেন। তিলক বলেন, স্বয়ং ঈশ্বরও যদি অস্পৃশ্যতা সহ্য করেন, তাহলে তাকে ঈশ্বর বলা যাবে না। তিনি আরও বলেন, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, অতীতকালে ব্রাহ্মণদের স্বৈরতন্ত্রই এই প্রথার জন্ম দিয়েছে। অস্পৃশ্যতা একটা সামাজিক ব্যাধি এবং এটাকে দূর করতেই হবে। সম্মেলন শেষে অস্পৃশ্যতা বিরোধী একটি ফতোয়া জারি করা হয়, তাতে দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা অস্পৃশ্যতা মেনে চলবেন নাÑ এই মর্মে সব

বিখ্যাত নেতারা স্বাক্ষর করেন। কিন্তু অনুগামীদের চাপে তিলক তাতে স্বাক্ষর করেননি। কর্মবীর ভি.আর. সিন্ধে এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন।

আম্বেদকর বর্ণহিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত অস্পৃশ্যদের উন্নয়নের আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এর বিরোধী। সেজন্যই তিনি ওই সম্মেলনে যোগ দেননি। তিনি তাঁর মানসিক শক্তি ও উজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগানোর সঠিক সুযোগের আশায় গতিবিধি লক্ষ করে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমেই সমাজে একটি মর্যাদার আসনে তাঁর উন্নীত হওয়া দরকার। তার জন্য স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনও চাই। সেক্ষেত্রে আইন ব্যাবসা তাঁকে সাহায্য করতে পারত, কিন্তু আইন পড়া তাঁর সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং সে উপায় রইল না। প্রথমে এক পারসি ভদ্রলোকের মাধ্যমে তিনি দু'টি ছাত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন, সেইসঙ্গে ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেবার জন্য একটি বিজনেস ফার্মও খোলেন। তাতে প্রচুর আয় হলেও সমস্ত ব্যবসায়ীরা যখন জানতে পারেন যে, আম্বেদকর একজন অস্পৃশ্য, তখন সেটিকে বন্ধই করে দিতে হয়। কিছুদিনের জন্য তিনি একজন পারসি ভদ্রলোকের হিসাবনিকাশ দেখাশোনা ও অফিস সংক্রান্ত যোগসূত্রের কাজও করেন।

এই সময় তিনি 'The Journal of Indian Economic Society' নামক পত্রিকায় বার্ট্যাণ্ড রাসেলের 'Reconstruction of Society' নামক বইটির একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। এরপর 'ভারতের জাতিসমূহ' (Castes in India) নামক গবেষণাপত্রটি পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রণ করেন এবং 'ক্ষুদ্র জমা ও তার প্রতিকার' (Small-Holdings in India and their Remedies) নামক একটি নিবন্ধ তাতে যোগ করেন।

বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত এইসব কাজ সত্ত্বেও আম্বেদকরের জীবন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেনি। জীবনের এই হতোদ্যম অবস্থায় তিনি জানতে পারেন যে, বম্বের সিডেনহাম কলেজে অর্থনীতি ও ব্যাবসা বিভাগের একটি অধ্যাপকের পদ খালি আছে। তিনি ওই পদটির জন্য আবেদন করেন। বম্বের পূর্বতন গভর্নর সিডেনহামের সঙ্গে আগেই লণ্ডনে আম্বেদকরের পরিচয় হয়েছিল। এই সময় তাঁকে অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখলেন তিনি যেন সিডেনহাম কলেজের ওই পদটিতে তাঁকে নিয়োগ করার জন্য বম্বে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। সমস্ত বন্দোবস্ত ও তাঁর ইণ্টারভিউ ভাল হওয়ায় গভর্নমেণ্ট তাঁকে ওই কলেজে পলিটিক্যাল ইকোনমিকস-এর অধ্যাপক পদে নিয়োগ করে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আম্বেদকর অস্থায়ীভাবে ওই পদ গ্রহণ করলেন, কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করে পুনরায় লণ্ডনে গিয়ে অসমাপ্ত আইন ও অর্থশাস্ত্রে তাঁর পড়াশুনো সমাপ্ত করবেন।

প্রথমে সিডেনহাম কলেজের ছাত্ররা তাঁকে সাগ্রহে গ্রহণ করেনি। উন্নত সমাজ থেকে আসা বর্ণহিন্দু ও অন্যান্য ছাত্ররা 'একজন অস্পৃশ্য অধ্যাপক কী শিক্ষা দেবে' Ñ এই অবজ্ঞায় তাঁর ক্লাস বর্জন করে। কিন্তু ক্রমে আম্বেদকরের গভীর অধ্যয়ন ও সুচিন্তিত পদ্ধতিতে চমৎকার ব্যাখ্যাদান শীঘ্রই ছাত্রদের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়। সুন্দর পোশাকে সজ্জিত যুবক অধ্যাপকের অগাধ জ্ঞান, গাম্ভীর্য প্রভায় দীপ্ত চক্ষু অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে দ্রুতগতিতে পরিচিতি লাভ করে। এর ফলে অন্যান্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা এসে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর ক্লাসে যোগ দিতে থাকে। কিন্তু তাঁর অধ্যাপনার এই সফলতাও অস্পৃশ্যতাকে কমাতে পারেনি। অধ্যাপকদের জন্য রাখা জলপাত্র থেকে আম্বেদকরকে জল খেতে দিতে কয়েকজন গুজরাটি অধ্যাপক আপত্তি করেছিলেন।

আম্বেদকরের কাছে অধ্যাপনাটাই জীবনের লক্ষ্য ছিল না, এটা ছিল একটা সাময়িক উপায় মাত্র। বিবেকবর্জিত বিদ্রূপ ও সীমাহীন অবমাননা তাঁকে অস্পৃশ্যতা সমস্যাটির মূল কারণ খুঁজে বের করার জন্য সব সময় তাড়িয়ে বেড়াত। তিনি অস্পৃশ্যদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন। তিনি মৃতকোষে প্রাণের স্পন্দন জাগাতে এবং জীবিতদের উত্তেজিত করতে আরম্ভ করলেন।

দলিত শ্রেণির কল্যাণ ও অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজে কোলাপুরের মহান মানবতাবাদী শাহু মহারাজ অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি দলিত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং জাতিভেদ প্রথায় সৃষ্ট কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা, পুরোহিতদের অত্যাচার ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য থেকে দলিত শ্রেণিকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সকল কার্যালয়ে বিভিন্ন পদে তিনি অস্পৃশ্যদের নিযুক্ত করেন, উকিল হিসাবে তাঁদের আইনজীবীর সনদ দেন এবং প্রকাশ্যে তাঁদের সঙ্গে আহারাদি করেন। তিনি অস্পৃশ্য ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা, ফ্রি লজিং ও ফ্রি হোস্টেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যে তিনি হস্তীচালকের সম্মানও একজন অস্পৃশ্যকে দিয়েছিলেন।

এই সময় মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম অনুসারে সদস্য নির্বাচন অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত 'সাউথ বোরো কমিটি' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ও দাবিদাওয়াগুলি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিচ্ছিল। সেখানে আম্বেদকর দলিত শ্রেণির পক্ষে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতিক হারে সংরক্ষিত আসনের দাবি জানান। সে সময় বম্বের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি যে চিঠি লেখেন তাতেই 'হোমরুল' (স্বায়ত্বশাসন)সম্পর্কে তাঁর দাবি কী তা জানা যায়। ওই চিঠিতে তিনি বলেন, 'হোমরুল' দাবি করার আগে অগ্রসর শ্রেণির কর্তব্য হচ্ছে নিম্নতর দলিত শ্রেণির যে জনগণ, যাঁরা একই ধর্ম ও রীতিনীতি পালন করেন, একই

দেশবাসী ও স্বাধীনতার জন্য একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের প্রতি সাম্য ব্যবহার। তিনি আরও বলেন, একজন ব্রাহ্মণের স্বায়ত্বশাসনের যে অধিকার, একজন মাহারেরও সেই স্বায়ত্বশাসনের জন্মগত অধিকার আছে। এজন্য অগ্রসর শ্রেণির কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের শিক্ষাদান, সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও মানসিকভাবে উন্নত করে তোলা। যতদিন পর্যন্ত তারা এই নীতি গ্রহণ না করবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতের পক্ষে স্বায়ত্বশাসন লাভ করা সুদূরপরাহতই থাকবে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আম্বেদকর দত্তবা পাওয়ারের মাধ্যমে কোলাপুরের মহারাজার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। আম্বেদকর যে একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন, তার জন্য মহারাজার কাছ থেকে কিছু অর্থসাহায্যও পান। তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি **'মূকনায়ক'** নাম দিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। যদিও আম্বেদকর পত্রিকাটির ঘোষিত সম্পাদক ছিলেন না, তবুও পেছনে থেকেই তিনি এটি পরিচালনা করতেন এবং সেটাই ছিল তাঁর মুখপত্র। সে সময়টি তাঁর পক্ষে এত প্রতিকূল ছিল যে, অর্থের বিনিময়েও পত্রিকাটির প্রকাশনার ব্যাপারে বিজ্ঞাপন ছাপতে 'কেশরী' পত্রিকার মালিক বালগঙ্গাধর তিলকও অস্বীকার করেছিলেন।

'মূকনায়ক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আম্বেদকর অত্যন্ত জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তিনি লেখেন যে, ভারত হচ্ছে অসাম্যের আবাসভূমি। হিন্দুসমাজ হচ্ছে সিঁড়ি ও প্রবেশদ্বারহীন কয়েকতলা বিশিষ্ট প্রাসাদ। একজন যে তলায় জন্মেছে সেই তলাতেই তাকে মরতে হবে। হিন্দুসমাজের তিনটি অংশ Ñ ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য। যারা বলে যে, তাদের দর্শনে আছে Ñ প্রাণী এবং সমস্ত সজীব পদার্থেই ঈশ্বর বাস করেন, তারাই আবার স্বধর্মীয়দেরই অস্পৃশ্য মনে করে, তাদের তিনি করুণার পাত্র বলে মনে করেন। জ্ঞানদান বা সাক্ষরতা দান ব্রাহ্মণদের আসল লক্ষ্য নয় Ñ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে রাশি রাশি সম্পদ সঞ্চয় ও একচেটিয়া অধিকার লাভ করা। অব্রাহ্মণদের অনগ্রসরতার কারণ হচ্ছে শিক্ষা ও ক্ষমতার অভাব। দলিত শ্রেণিকে চিরদাসত্ব, দারিদ্র ও অজ্ঞতা থেকে রক্ষা করতে এবং তাঁদের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে প্রয়োজন বলিষ্ঠ প্রয়াস।

'মূকনায়ক' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন, ভারতের পক্ষে কেবল স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয় Ñ ধর্ম, সমাজ, অর্থ, রাজনীতি Ñ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকল মানুষের থাকতে হবে সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। প্রত্যেকটি মানুষকে তার উন্নতিলাভে ও জীবনযাপনে দিতে হবে সমান পরিবেশের সুযোগ। ব্রিটিশদের অন্যায়ের জন্য যদি ব্রাহ্মণদের আপত্তি ও আক্রমণের কারণ থাকতে পারে এবং সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহলে ব্রাহ্মণদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রাহ্মণ্যশাসনের বিরোধিতা করে দলিত শ্রেণির মানুষেরা তার শতগুণ ন্যায়সঙ্গত কাজ করবে। যদি ব্রিটিশ সুরক্ষা

ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে এতদিন যারা অস্পৃশ্যদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে, এবার তারা নিশ্চয়ই তাদের পদদলিত করবে। অন্য আর একটি প্রবন্ধে আম্বেদকর বলেন যে, স্বরাজের দ্বারা যদি দলিত শ্রেণির মানুষদের কোনো মৌলিক অধিকার স্বীকৃত না হয়, তবে তা তাঁদের পক্ষে স্বরাজ নয়, নতুন দাসত্ব।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ কোলাপুর স্টেটের মানগাঁও-এ অস্পৃশ্যদের এক সম্মেলনে আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। সাহু মহারাজ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাহু মহারাজ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, "আপনারা মুক্তিদাতা রূপে আম্বেদকরকে পেয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি দাসত্বের শিকল ভেঙে আপনাদের মুক্ত করবেন। কেবল তাই নয়, আমার বিবেক বলছে যে, এমন সময় আসবে যখন আম্বেদকর দেশের একজন প্রথম সারির নেতারূপে বিরাজ করবেন।" মহারাজা, রাজকর্মচারী ও জায়গীরদারসহ সকল বর্ণের মানুষ এবং আম্বেদকরের নেতৃত্বে সমস্ত অস্পৃশ্যরা সেদিন একত্রে আহারপর্ব সেরে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

সেই সময় 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস মিশন'-এর পক্ষ থেকে সিন্ধের প্রস্তাব ছিল, আইনসভার সদস্যদের দ্বারা অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি মনোনীত হবে, সরকার বা কোনো অস্পৃশ্য প্রতিষ্ঠান তা করতে পারবে না। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কোলাপুরের মহারাজার সভাপতিত্বে নাগপুরে একটি জরুরী সর্বভারতীয় অস্পৃশ্য সম্মেলনে আম্বেদকর সিন্ধের মনোভাবকে নিন্দা করে এক আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন। সভা একটি বিশেষ প্রস্তাবে সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই বিতর্কে তার্কিক হিসেবে আম্বেদকরের নিপুণতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ মেলে।

আম্বেদকর মনে করতেন যে, বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য যতই কঠোর পরিশ্রম করুক না কেন তারা অস্পৃশ্যদের মনের কথা কখনও বুঝতে পারে না। সেইজন্যই দলিত মানুষদের উন্নয়নের জন্য বর্ণহিন্দু পরিচালিত যে কোনো সংগঠনের তিনি বিরোধী। নাগপুরের এই সম্মেলনই 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস মিশন'-এর দিক থেকে অস্পৃশ্যদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার সুযোগ আসে। সম্মেলনের শেষে আম্বেদকর দলিত শ্রেণির শক্তিগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। মধ্যপ্রদেশে মাহারদের মধ্যে আঠারোটি উপজাতি ছিল। তিনি তাঁদের নেতাদের আহ্বান করে সকলকে একত্রে ভোজন করান। কিন্তু মাহারদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি একত্রে ভোজন করলেও অস্পৃশ্যদের অন্যান্য সমাজ তা করেননি।

অধ্যাপক হিসাবে আম্বেদকর ভালো বেতন পেলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী।

প্যারেলের শ্রমিক এলাকায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট চাওলে মুখোমুখি দু'টি ঘরে বাস করতেন তিনি। সংসার চালাবার জন্য বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ তিনি তাঁর স্ত্রীর হাতে দিতেন। স্ত্রী রমাবাঈ ছিলেন কর্তব্যপরায়ণা, আত্মসম্মানবোধসম্পন্না, স্বল্পবাক, দৃঢ়মনা, ধর্মপরায়ণা ও নিঃস্বার্থপরায়ণা। তাঁর জীবন আর্থিক অনটনের মধ্যে কাটলেও শান্তি ও ঐক্যের সাথে স্বামীর মৃত ভাইয়ের পরিবারের যত্ন ও প্রতিপালনে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন।

আম্বেদকর যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন এই সাধ্বী মহিলাকে চরম দারিদ্রের মধ্যে কাটাতে হলেও কখনও কোনো অভিযোগ তিনি করেননি। স্বামীর নিরাপত্তা ও শ্রীবৃদ্ধিই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। যখন তাঁর স্বামী আমেরিকায় যাত্রা করেন তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় রমেশ। কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। স্বামীর প্রত্যাবর্তনের পর আর একটি পুত্রসন্তান জন্মে, তার নাম ছিল গঙ্গাধর। সেও শৈশবে মারা যায়। তখন তাঁর যশোবন্ত নামে আর একটি মাত্র পুত্রসন্তান থাকে। তার স্বাস্থ্যের জন্য তিনি সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতেন। তথাপি তিনি যথাসাধ্য মিতব্যয়ী ছিলেন। স্বামীর অধ্যয়নে কোনো রকমে বিঘ্ন ঘটে এইজন্য তিনি নিজেকে সব সময় দূরে সরিয়ে রাখতেন। পরিবারের কারও অসুস্থতার সংবাদ স্বামীর কানে দিতেন না এবং দেখতেন অন্য কেউ যেন স্বামীর অধ্যয়নের ব্যাঘাত না ঘটায়। স্বামীর চেষ্টায় তিনি একটু লিখতে পড়তেও শিখেছিলেন।

অবশেষে তরুণ অধ্যাপক আম্বেদকর কিছু অর্থ সঞ্চয় করলেন, কোলাপুরের মহারাজার সাহায্য পেলেন এবং বন্ধু নেভাল ভাতেনার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অর্থশাস্ত্র ও আইন অধ্যয়নের জন্য পুনরায় লণ্ডন যাত্রা করলেন। তাঁর ধর্মপরায়ণা ও ধৈর্যশীলা স্ত্রী যে সাহায্য করলেন তার মূল্যও কম নয়। শিশুপুত্র যশোবন্ত ও বড়ো ভাইয়ের পরিবারের দেখাশোনা করে তাঁর দিন কাটতে থাকে।

ইতিমধ্যে বরোদা রাজ্যের রাজকর্মচারীরা মহারাজার স্বার্থরক্ষা ও অর্থের সুব্যবস্থার জন্য অত্যধিক আগ্রহে আম্বেদকরকে দেওয়া বৃত্তির টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেও ইতস্তত করলেন না। তাঁরা সিডেনহাম কলেজ কর্তৃপক্ষ, বম্বের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ও প্রখ্যাত শ্রমিক-নেতা এন.এম. যোশীকে আম্বেদকরকে দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য লিখলেন। মহারাজা বিষয়টি জানতেন না এবং তিনি কাগজপত্রে 'টাকাটা শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছে বলে পরিশোধের কোনো প্রশ্ন আসে না' বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের ঈর্ষাপরায়ণ মস্তিষ্কের মানুষগুলি কিছুদিন আম্বেদকরের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। অবশেষে স্বয়ং মহারাজার কাছ থেকে প্রতিরোধ আসায় তাঁরা বৃত্তিপ্রাপ্ত পড়ুয়াটিকে

হয়রান করার মতলব ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

লণ্ডনে পৌঁছে আম্বেদকর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যাণ্ড পলিটিকাল সায়েন্স'-এ অর্থশাস্ত্রে তাঁর অধ্যয়ন শুরু করেন এবং 'গ্রেস ইন'-এ আইন পড়ার চুক্তি করেন। এরপর তিনি দৃষ্টি দেন লণ্ডন মিউজিয়ামে। সেখানে সংরক্ষিত আছে অতীতের বিজ্ঞানসম্মত মহান সব চিন্তাভাবনা এবং প্রদর্শিত হয় প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ। কার্ল মার্কস, ম্যাৎসিনি, লেনিন ও সাভারকার সেখানেই জ্ঞানের সন্ধান করেছেন। যখনই সম্ভব হত আম্বেদকর মিউজিয়ামে গিয়ে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে বই পড়ার মধ্যে ডুবে থাকতেন।

তাঁর কাছে সময় ছিল অমূল্য সম্পদ। অর্থ ও সময় বাঁচাবার জন্য তিনি দুপুরে আহার করতেন না। সে সময় তিনি এক ভদ্রমহিলা পরিচালিত একটি আধা বোর্ডিং-এ থাকতেন। বম্বের অস্নোদকরও পেয়িংগেস্ট হিসাবে ওই বোর্ডিং-এ থাকতেন। বোর্ডিং-এর ওই মহিলা ছিলেন ভয়ানক রুক্ষ প্রকৃতির। প্রাতরাশের সময় তিনি আবাসিকদের দিতেন এক টুকরো মাছ, এককাপ চা এবং জেলি মাখানো এক টুকরো রুটি। ওই সামান্য খাবার খেয়ে আম্বেদকর সকাল সকাল সবার আগে মিউজিয়ামে যেতেন। বিনা বিশ্রামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে পড়াশুনো করতেন এবং এত অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনো করতেন যে, কখন সন্ধে হয়ে যেত তা তিনি খেয়াল করতে পারতেন না, রক্ষীরাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিত। তিনি সকলের শেষে কোটের পকেট ভর্তি নোট লেখা কাগজপত্র নিয়ে শুষ্কমুখে ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় মিউজিয়াম ত্যাগ করতেন।

আম্বেদকরের অনুসন্ধানের কাজ কেবল মিউজিয়ামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি এবং নগরের অন্যান্য লাইব্রেরিতেও অর্থশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য নানা বই পড়তেন ও গবেষণার বিষয় অনেক তথ্য গ্রহণ করতেন।

দিনের বেলা এই ভয়ানক পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় আধঘণ্টা ভ্রমণ করতেন খোলা বাতাসে। তারপর সেই মহিলার বাড়িতে ডিনার খেতেনÑ এককাপ বভ্রিল, কিছু বিস্কুট ও মাখন। এই নিষ্ঠুর ও মিতব্যয়ী খাদ্যব্যবস্থার কথা পরবর্তীকালে আম্বেদকরের কথায় জানা যায়Ñ "ওই গৃহিনী ছিলেন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহিলা। আমি সর্বদা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, তিনি নরকে যাবেন।"

তারপর তাঁর দ্বিতীয়বার পড়া আরম্ভ হত ঘরে বসে। রাত দশটার পরে খিদের জ্বালায় তাঁর মাথা ঘুরতে থাকত, শরীর পাক দিয়ে উঠত। তিনি খিদেয় পাগল হতেন। তাঁর এক ভারতীয় পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে এক বাণ্ডিল পাঁপড় দিয়েছিলেন।

তিনি একখানা পাতলা টিনের থালায় সেগুলি ভাজতেন। এককাপ চা ও চারখানা পাঁপড় তাঁর প্রচণ্ড খিদের নিবৃত্তি ঘটাত। তারপরে চলত আবার বিরামহীন বইপড়া। এই পড়া সকালবেলা পর্যন্ত চলত। যখন তাঁর সহ-আবাসী অস্নোদকর গভীর নিদ্রাভোগের পর হঠাৎ জেগে উঠে দেখতেন আম্বেদকর তখনও মনোযোগের সঙ্গে তাঁর পড়া চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন সহানুভূতির সঙ্গে আম্বেদকরকে বিশ্রাম নিতে বলতেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিতেনÑ দারিদ্র ও সময়ের স্বল্পতা হেতু তাঁকে যথাসত্বর পাঠ শেষ করতে হচ্ছে, সেজন্য তাঁর এই কঠোর অধ্যবসায়।

কখনও কখনও তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ নেভাল ভাতেনার কাছে সাহায্য চাইতেন। তিনিও উদার মনে তাঁকে সাহায্য করতেন। একবার খুব বিনয় করে চিঠি লিখে তাঁর কাছে দু'হাজার টাকা ধার চাইলেন জার্মান মুদ্রা কিনবেন বলে। কেননা ওই সময় জার্মান মুদ্রার দাম খুবই কমে গিয়েছিল এবং অচিরেই আবার তা বাড়ারও সম্ভাবনা ছিল।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দরিদ্র বালক রূপে জীবন আরম্ভ করে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ গণ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেছেনÑ জীবনে সাফল্য নির্ভর করে দু'টি জিনিসের উপরÑ পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা। আম্বেদকর এতটা মিতব্যয়ী ছিলেন যে মাসে মাত্র আট পাউণ্ডে তাঁর চলে যেত। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য ছিল অটুট। তিনি পোশাকের জন্য খুবই কম খরচ করতেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পায়ে হেঁটে যেতেন। কোনো রেস্তোরায়, ভোজসভায়, খাবার বা ফুর্তিতে কিংবা থিয়েটারে গিয়ে পয়সা ও সময় নষ্ট করতেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই জীবনে এরূপ স্পষ্ট করে দেখাতে পেরেছেন যে, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও কীভাবে তাঁর ভিতরের শক্তির উত্থান ঘটিয়ে ভবিষ্যত ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হয়। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, অপরিসীম কষ্টস্বীকার ও উন্নতমানের চিন্তাভাবনাই মহামানবদের জীবনে সাফল্য এনে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাধান্য লাভের সংগ্রামের মধ্যেও তিনি তাঁর জীবনের আসল লক্ষ্যের কথা ভুলে যাননি। মহান ব্যক্তিরা ভোগবিলাসের জন্য মহান হন না, মহান হন তাঁদের কর্মের জন্য। লণ্ডনে পৌঁছে তৎকালীন ভারত-সচিব মন্টেগু চেমস ফোর্ড এবং সেই সময় লণ্ডনে উপস্থিত থাকা বিট্ঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে ভারতের অস্পৃশ্যদের দুঃখ-ক্ষোভ নিয়ে আলোচনা করেন।

দীর্ঘদিন ভারত থেকে অনেক দূরে কঠোর পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকলেও ভারতে যাঁরা অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য কাজ করছিলেন তাঁদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তিনি প্রায়ই এস.এন. শিবকর্তারকে লণ্ডন থেকে আন্দোলন ঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নির্দেশ দিতেন। এই শিবকর্তার অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে

সংগ্রামে বিশ বছর তাঁর সঙ্গী ছিলেন। আম্বেদকর 'মূকনায়ক' পত্রিকার পরিচালনার ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদ্যোগী এবং পত্রিকা পরিচালনায় ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। বাড়িতে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন যে, কোনো পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে পত্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা খুবই বেদনাদায়ক। প্রচেষ্টা সফল হোক বা না হোক, অজ্ঞ লোকেরা কাজের মূল্য দিক বা নাই দিক, কর্তব্য অবশ্যই করে যেতে হবে। কোনো লোকের উদ্দেশ্য যখন মহৎ হয় এবং তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয়, তখন শত্রুরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনে ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দলিত শ্রেণির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়। গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রীয় আইনসভায় চৌদ্দজন সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মধ্যপ্রদেশে চারজন, বম্বে ও বিহারে দু'জন করে এবং বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে এক জন করে সদস্য মনোনীত হলেন। মাদ্রাজে ন'টি বিশেষ দলিত শ্রেণি থেকে দশজন মনোনীত হলেন।

আম্বেদকরের গবেষণার কাজ ক্রমে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। "Provincial Decentralisation of Imperial Finance in British India" নামে একটি গষেণাপত্র ইতিমধ্যে সমাপ্ত হওয়ায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'মাস্টার অব সায়েন্স' ডিগ্রি দেওয়া হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত রচনা "The Problem of the Rupee" লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। একই সময়ে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দেওয়ারও সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকা এবং একজন সহপাঠী তাঁকে আইনের বই ধার দেবেন বলে কথা দিয়েও দেননি, তাই তিনি ওই পরীক্ষা দিতে পারেননি।

ইতিমধ্যে পড়াশোনা যখন শেষ হবার মুখে সেই সময় তিনি ইউরোপের আর একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা করলেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি জার্মানিতে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে লণ্ডনে ফিরে যান। লণ্ডন বিশ্বদ্যিালয়ে থিসিস জমা দিয়ে তিনি আবার বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে মাত্র মাসতিনেক ছিলেন, এমন সময়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর লণ্ডনস্থ অধ্যাপক এডুইন ক্যানন তাঁকে ডেকে পাঠান। কারণ, তাঁর থিসিসে কঠোর ভাবে বর্ণিত বিশ্লেষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পরীক্ষকদের কাছে অপরাধ বলে গণ্য হয়ছে। তাঁরা আম্বেদকরের রচনার উপসংহার ঠিক রেখে থিসিসটি নতুন করে লিখে জমা দিতে বলেন। কয়েকদিন আগে তিনি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সামনে "Responsibilities of a Responsible Government in India" নামে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। তাতে শিক্ষাজগতে একটি আলোড়ন তৈরি হয়, তাঁকে বিপ্লবী বলে সন্দেহ করা হয়।

এমনকি লণ্ডন স্কুল অব সায়েন্সের অধ্যাপক হেরল্ড জে ল্যাস্কি মন্তব্য করেন যে, ওই পত্রে যে চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে তা রীতিমতো বিপ্লবাত্মক।

কিন্তু গবেষণাপত্রটি নতুন করে লেখার জন্য তিনি আর লণ্ডনে থাকতে পারেননি। তাঁর আর্থিক সঙ্গতি তখন নিঃশেষিত। প্রাণান্তকর চেষ্টায় যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন বই কিনতে গিয়ে তাও ফুরিয়ে যায়। ভারতে তাঁর পরিবারও অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। সুতরাং ওই গবেষণার কথা মাথায় রেখে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বম্বে ফিরে আসেন। কিছুদিন পর সেখান থেকেই আবার "The Problem of the Rupee" থিসিসটি লিখে জমা দেন। পরীক্ষকগণ তা গ্রহণ করে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত করেন। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায়ী মেধাশক্তিই অবশেষে এনে দিল বিজয় গৌরব। এই গবেষণাপত্রে আম্বেদকর দেখিয়েছেন যে, টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময় ক্ষেত্রে কীরূপে অর্থের বেশির ভাগই ব্রিটিশের হাতে চলে যাওয়ায় ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আম্বেদকর এখন একজন ব্যারিস্টার, লণ্ডনের 'ডক্টরেট অব সায়েন্স', আমেরিকার 'ডক্টরেট অব ফিলোসফি' এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তিনি আইন ব্যবসায়ী, অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং ভারতীয় সমাজতত্ত্বেও জ্ঞানী ব্যক্তি। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতবর্গকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং ভারতীয় দুর্গ আক্রমণে তিনি এখন সুসজ্জিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যুগপুরুষ

আম্বেদকর এবার আইন ব্যাবসা শুরু করবেন বলে ঠিক করেন। অস্পৃশ্যদের উন্নয়নে এটাই তাঁকে অর্থ, উপায় ও সময় দেবে, সেটাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু সনদ লাভ করার পয়সাও তখন তাঁর কাছে ছিল না। এবারও সেই উপকারী বন্ধু মিস্টার নেভাল ভাতেনাই তার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর দেওয়া টাকায়ই তিনি সনদ লাভ করে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। কিন্তু অস্পৃশ্যতা কাঁটা, গায়ের রঙ, আইনের ক্ষেত্রে নবাগত এবং বিচারালয়ের সহানুভূতিশূন্য পরিবেশে তাঁর কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে তিনি হতাশ হননি। কারণ, তিনি বাল্যকাল থেকেই জানতেন পরিশ্রমে কর্মদক্ষতা জন্মে। তাই তিনি জীবনের এই ক্ষেত্রেও তা অর্জনের জন্য উদ্যোগী হলেন।

আম্বেদকর বম্বে কোর্টে আপিলকারকের পক্ষ অলম্বন করেন, কারণ মূল মোকদ্দমাকারীর পক্ষ গ্রহণে সফলতা অর্জন নিজের দক্ষতার চেয়ে প্রভাবের উপর বেশি নির্ভর করে। সে সময়ে এটাই সকলের ধারণা ছিল যে, ইউরোপীয় ব্যারিস্টারদের আর্জি ইংরেজ বিচারকের কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হতো। আসলে যুক্তি অপেক্ষা সাদা চামড়ায় কাজ হতো বেশি। যতদিন তিনি হাইকোর্টের সামনের সারিতে যেতে পারেননি, ততদিন মফস্সলের মোকদ্দমা নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, কারণ অস্পৃশ্য হওয়ার দরুণ আইজীবীরা তাঁর সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা বা বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার করতেন না।

এইসময় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলিতে দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিদের দ্বারা বিভিন্ন দাবিদাওয়া উত্থাপন করা হয়। বম্বে আইন পরিষদে সর্বপ্রথম অস্পৃশ্য সমাজের মনোনীত সদস্য ডি.ডি.গোলাপ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এভাবে বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি আদেশ বলে অস্পৃশ্যদের কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়ার চেষ্টাও হয়।

এস.কে. বোলে নামক বম্বে আইন-পরিষদের এক সদস্য ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট অস্পৃশ্যতাকে ভারতের কলঙ্ক আখ্যা দিয়ে একটি প্রস্তাব আনেন। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হবার ভয় না করে আর্যসমাজীদের সাথে মিলে সকল শ্রেণির লোকের সঙ্গে একত্রে খাওয়াদাওয়াও করেছিলেন। ওই প্রস্তাবে সমস্ত সাধারণ জলাশয়, কুয়ো, ধর্মশালা ইত্যাদি যেগুলি সরকারি অর্থে তৈরি ও পরিচালিত, সেগুলি এবং কোর্ট ও হাসপাতালেও অস্পৃশ্যদের জন্য সমান অধিকার স্বীকৃত হয়।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দলিত শ্রেণির বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা ছিল। খিলাফত আন্দোলনে অধিকার সম্পর্কে গান্ধির সঙ্গে হৃদ্যতা ঘটায় উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মোহাম্মদ আলি অস্পৃশ্যদের হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করেন। গান্ধির ঈশ্বরবিশ্বাসী মুসলিম কর্মী গান্ধির উপস্থিতিতেই এই বর্বর ইচ্ছা প্রকাশ করলেও গান্ধির মধ্যে কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি। মাদ্রাজে একবার গান্ধিকে মানপত্র দেওয়ার সভায় সভাপতিত্ব করেন ইয়াকুব হোসেন। তিনি গান্ধির উদ্দেশে বক্তব্যের মধ্যে ভারতের অস্পৃশ্যদের ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করতে মুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ভারতের ইতিহাসে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দটি ছিল ঘটনাবহুল বছর। আন্দামানে বারো বছর জেল খাটার পর বীর সাভারকার মুক্তিলাভ করেন। ওই বছর ৬ জানুয়ারি রত্নগিরিতে এসে তিনি আবার অন্তরীণ হন। তার আগে কয়েকদিনের জন্য তাঁকে যারবেদা জেলে আনা হয়েছিল। খিলাফত-স্বরাজ আন্দোলনে ব্যর্থতার পর গান্ধিও প্রায় দু'বছর ওই জেলে বন্দি ছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে ১৯২৪ সালের ১১ জানুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধি ও সাভারকার অসহায় পরিস্থিতিতে পড়ে দু'জনেই সমাজ উন্নয়নে মন দিলেন। সাভারকার হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর সংগঠন 'হিন্দু সংগঠন' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। দলিত মানুষদের উন্নতি ঘটানোই ছিল এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইসব মানুষদের কল্যাণ ও অধিকার আদায় করার জন্য তিনি আন্দামানে দীপান্তর হওয়ার আগে থেকেই লড়াই করছিলেন। গান্ধিও তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে দলিত শ্রেণির উন্নতির জন্য কাজ শুরু করেন।

আম্বেদকর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। অস্পৃশ্যদের দুরবস্থা দূর করা ও সরকারের কাছে তাঁদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় অস্পৃশ্য সংগঠন তৈরি করার জন্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি বম্বের দামোদর হলে একটি সভা আহ্বান করেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর একটি সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুসারে ১৯২৪-এর ২০ জুলাই **"বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা"** নামে একটি সমিতি গঠিত হয় ও ১৮৬০-এর একবিংশ ধারায় এটি রেজেস্ট্রিকৃত হয়। তার কার্যকারিতা বম্বে প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তার কার্যালয় হলো দামোদর হলের ১২ নং ঘরে। ওই সমিতির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিলঃ Ñ

ক) ছাত্রাবাস তৈরি করে দলিত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিবেচিত পন্থা অবলম্বন করা।

খ) গ্রন্থাগার, সামাজিক মিলনকেন্দ্র ও অধ্যয়নকেন্দ্র স্থাপন করে দলিত শ্রেণির মধ্যে সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো।

গ) কৃষি ও শিল্পকেন্দ্র খুলে দলিত শ্রেণির অর্থনৈতিক উন্নতি করা।

ঘ) দলিত শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশার কথা সরকারের কাছ তুলে ধরা।

'বহিষ্কৃত হিতকারণী সভা'র সভাপতি হলেন চিমনলাল হরিলাল শেতলবাদ, এল.এল.ডি. এবং সহকারী সভাপতি হলেন মেয়ার নিসিম, জে.পি.; রুস্তমজী জিনওয়ালা, সলিসিটার; জি.কে. নরিম্যান; ডঃ আর.পি. পরাঞ্জাপে; ডঃ ভি.পি. চ্যবন ও বি.জি. খের, সলিসিটর। তিনি পনেরো বছর পরে বম্বে প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হলেন আম্বেদকর, এস.এন. শিবতর্কার সেক্রেটারি এবং এন.টি. যাধব হলেন কোষাধ্যক্ষ।

এই কেন্দ্রীয় সংগঠনটি দলিত শ্রেণির মানুষদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে অন্যান্য ভারতীয় সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতায় পৌঁছে দিতে ও তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। সংগঠনটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয় যে, কমিটি ও বোর্ডে যে অধিক সংখ্যক দলিত শ্রেণির শ্রমিকদের নেওয়া হয়েছে তার কারণ, এই সভা বিশ্বাস করে যে, যারা একই প্রকার দুর্ভোগে ভুগছে, তাঁদের মধ্য থেকে কর্মী ও সভ্য নেওয়া না হলে কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকৃত উন্নতি করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এর উদ্দেশ্যও উপলব্ধি করতে পারে না। কোনো সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে তার নির্বাচকমণ্ডলী, লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও কর্মসূচির উপর। সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা মনে করতেনÑ উচ্চশ্রেণির সমর্থন ও সহানুভূতি ছাড়া এর সুবিশাল কর্মসূচি সুসম্পন্ন হতে পারে না।

দলিত শ্রেণির উন্নতির জন্য অনেক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ছিল। তথাপি আম্বেদকর একটি নতুন সংগঠন তৈরি করলেন। কারণ, কয়েকটি সংগঠনের লক্ষ্য ছিল সমাজ সংস্কার করা। কিন্তু হিন্দুদের পারিবারিক সংস্কার সাধন এবং হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসÑ এ দু'টির মধ্যে আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য ছিল। তাঁর মতে রানাডে প্রমুখ পরিচালিত সমাজ সংস্কারক ও তাঁর 'সোশ্যাল কনফারেন্স'-এর উদ্দেশ্য ছিলÑ বিধবাবিবাহ, নারীজাতির সম্পত্তির অধিকার, নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং অন্যান্য বিষয়। কিন্তু তাঁদের সংগঠনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ ও সাম্যের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন। 'সোশ্যাল কনফারেন্স' অর্থাৎ সামাজিক সম্মেলন নিঃসন্দেহে এমন একটি সংগঠন যার লক্ষ্য হিন্দুসমাজের বিবেকবোধকে জাগিয়ে তোলা, কিন্তু তার কার্যক্রম ছিল উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওই সামাজিক সম্মেলন শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির দ্বারা গঠিত, জাতিভেদ উচ্ছেদ বা বড়ো ধরনের কোনো কাজ তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। মূলত তাঁরা হিন্দুসমাজের ক্ষতিকর

সংস্কারগুলির উচ্ছেদ ও সমাজের পুনর্গঠন কাজের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সমাজের উঁচুতলা থেকে কাজ আরম্ভ করেন, নিচুতলা থেকে নয়।

'প্রার্থনা সমাজ'-এর কর্মীরা ও 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর উদ্যোগীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে মানবিক আদর্শেই কাজ করছিলেন। ছত্রপতি শাহু মহারাজ ও সয়াজীরাও গাইকোয়াড় অস্পৃশ্যদের উন্নয়নের জন্য অবিশ্রান্ত কাজ করছিলেন। এই কাজকে তাঁরা ধর্ম ও কর্ম বলে মেনে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া অতীতে এক শ্রেণির পেশাদার সংস্কারক ছিলেন, যারা কথায় বিশ্বপ্রেমিক, আড়ম্বরপ্রিয় যুক্তিবাদী, দলিত শ্রেণির প্রতি মৌখিক সহানুভূতি পরায়ণ, মৌলিক মতাদর্শী Ñ শাসক শ্রেণি ও আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের খুশি করার জন্যই তাঁরা তা করতেন। ওই সমস্ত দেশসেবকগণ Ñ রাজা, সমাজ সংস্কারক, মানবপ্রেমিক, মহাত্মা এবং যুক্তিবাদীগণ তাঁদের নিজস্ব ধারায় রোগনির্ণয় করে নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সবই বৃথা। রোগ ছিল পাকস্থলীতে, ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন মাথায়। অনেকে তাঁদের আদর করেছেন, কেউ কেউ একত্রে খাবার খেয়েছেন, কেউ তাঁদের জীবনযাপন প্রণালী, গৃহ ও পোশাকের সংস্কার করেছেন, কেউ কীভাবে স্নান করতে হয় তাই শিখিয়েছেন। কিন্তু কেউ তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেননি।

এইসব উদার সেবাকার্য সত্ত্বেও দলিত শ্রেণির মানুষদের অন্তরে নিজেদের মুক্তির জন্য আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আশার সঞ্চার করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে পরনির্ভরতা, অন্যের অভিভাবকত্বে বিশ্বাস ও আনুকূল্য পাওয়ার মনোভাব তৈরি হয়েছিল। অস্পৃশ্যরা ওটাই জানতেন, কিন্তু পরনির্ভরতা ও আত্মনির্ভরতার তফাত জানতেন না। আত্মনির্ভরতাই যে উৎকৃষ্ট পন্থা, সেটা জানাই ছিল তাঁদের আসল প্রয়োজন।

এই সময় দেশে রক্ষণশীল মনোভাব ছিল পাথরের মতো অনড়। প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম রাজনৈতিকগণ যখন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, হিন্দুরা এক তৃতীয়াংশের বেশি হিন্দুদেরকে নিজেদের সমাজের বলে স্বীকার করেন না, ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের অধিকারকে অস্বীকার করেন এবং তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেন না, তখন রাজনীতি করা বর্ণহিন্দুদের বিবেকই একটু পীড়া বোধ করত। বর্ণহিন্দুদের মনোভাব এরূপ উদাসীন ও কঠিন ছিল যে, তাঁরা ভাবতেন অস্পৃশ্যদের ভাগ্যের কথা অবসর সময় ভাবলেই চলবে।

সেইজন্য 'হিন্দুমহাসভা' ও 'আর্যসমাজ' হিন্দুসমাজকে সংহত করার কাজে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমহাসভা হিন্দুদের কাছে একটি আবেদনমূলক প্রস্তাব পাশ করেছিল, যাতে বলা হয়েছিল Ñ অস্পৃশ্যদের জন্য স্কুল, মন্দির ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা খুলে দেওয়া হোক; কিন্তু উদ্যোগের অভাবে

তা কার্যকর হয়নি। হিন্দুমহাসভার নেতাদের এই মহান ইচ্ছা থাকলেও বেশির ভাগ হিন্দুদের মধ্যে ছিল বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী। তা ছাড়া প্রচুর সংখ্যক কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক হিন্দু কর্মীরা তখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত। সমাজসংস্কার কাজের চেয়ে বিদেশিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনসাধারণের নীরব, গোপন ও প্রকাশ্য সহানুভূতি বেশি লাভ করা যায়। স্বভাবতই হিন্দুমহাসভার কর্মীদের কাজ ছিল কঠিন। সেই জন্য তাঁরা পরম্পরায় বিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল তাঁদের প্রথম সারির কিছু নেতাদের গোঁড়ামি তাঁদের অন্তরে এতটাই প্রোথিত যে, তা সংশোধনের অযোগ্য। তাঁরা নিজেদের একান্ত প্রয়োজন না পড়লে সংস্কারকদের সাথে মেলামেশা করতেন না। ফলে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাঁদের ঘোষিত আদর্শ দূরেই থেকে গেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য সৎ হলেও প্রয়োগবিধি ঠিক ছিল না। দলিত মানুষদের বন্ধন মুক্তির সক্রিয় সংগ্রাম অপেক্ষা তাঁদের প্রস্তাব পাশ করা ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। সুতরাং অন্যান্য দল অপেক্ষা অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তির কাজে তাঁদের অবদান বেশি হলেও, তাঁদের দাবির তুলনায় তা কিছুই নয়। তাঁরা চাইছিলেন ভাঙা ঘরকে কোনো রকমে চুনকাম করে সাজিয়ে রাখার মতো করতে। কিন্তু ভাঙা ঘরকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়া দরকার। তাঁদের উদাসীনতা ও উপেক্ষা দেখে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁদের গোষ্ঠী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পরমানন্দ ও পরে সাভারকার পরিচালিত হিন্দুমহাসভাকে 'ওয়ার্লড প্রেস' গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা পরিচালিত বলে বর্ণনা করেছিল।

এই সমস্যার প্রতি কংগ্রেসী নেতাদের মনোভাব ছিল আরও ক্ষতিকর। মুসলিমদের খিলাফত দাবি প্রতিষ্ঠায় কেবল ভারতীয় মুসলিমদের অস্তিত্ব, গুরুত্ব ও তাঁদের জীবনই বেশি প্রয়োজনীয় বলে কংগ্রেস মেনে নেয়। তাঁদের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজজীবন, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম সবই ছিল একটি মাত্র মানদণ্ডে বাঁধা Ñ তা হচ্ছে মুসলিমদের মোল্লাতান্ত্রিক ধর্মান্ধতার তুষ্টিসাধন। সুতরাং দলিত শ্রেণির মানুষ কী অসুবিধা ভোগ করে তা তাঁদের গ্রাহ্যের মধ্যে তো ছিলই না, উপরন্তু তাঁরা যে খ্রিস্টান বা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হচ্ছে, সে দিকেও তাঁদের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁরা গান্ধিজির অস্পৃশ্য উন্নয়নের আন্দোলনকেও অনুসরণ করেননি। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের চল্লিশটি বার্ষিক সম্মেলন হয়েছে, কিন্তু দেশের এই মানুষগুলি পানীয় জল পাচ্ছে কিনা তা জানার আগ্রহও তাঁদের ছিল না। তাঁদের আগ্রহ ছিল মুসলিমদের ধর্ম ও খিলাফত সম্পর্কে; কারণ, তাতেই হিন্দুদের লাভ।

আগেই বলা হয়েছে Ñ গান্ধি, সাভারকার ও আম্বেদকর এই তিন শক্তি অস্পৃশ্য উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করেন। গান্ধি জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী। গান্ধির

উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ প্রথা বজায় রেখে অস্পৃশ্যতা দূর করে দলিত শ্রেণিকে পঞ্চম একটি বর্ণে স্থান দেওয়া। যে গোঁড়া ধনবানেরা গান্ধির আন্দোলনের প্রধান খুঁটি, তাঁদের না চটাবার দিকে গান্ধি সব সময়ই সচেতন ছিলেন। হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন বা রীতিনীতি পালটানো তাঁর লক্ষ্য ছিল না। জগতের শিক্ষাগুরু হিসাবে লক্ষ লক্ষ অজ্ঞ, মূক মানুষদের মুসলিম বা খ্রিস্টান হবার ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে তিনি কখনও আঙুল তোলেননি। তা ছাড়া গান্ধির সংগঠন ফলপ্রসূ হওয়ার চেয়ে বেশি প্রচারসর্বস্ব ছিল। গান্ধি ছিলেন বড়োজোর একজন সংস্কারক মাত্র, কিন্তু সাভারকার ও আম্বেদকর ছিলেন বিপ্লবী। সংস্কারক পুরোনো কাঠামোকেই জোড়াতালি দিয়ে গঠন করেন, কিন্তু বিপ্লবী পুরোনো কাঠামোকে ভেঙে নতুন করে গড়েন।

সাভারকার ছিলেন দেশপ্রেমিক, বাস্তব এবং বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ। তাঁর কল্পনা ছিল হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সমাজ ভেঙে একটি শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করা, যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সকল হিন্দুসমান হবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দুজাতির ঐক্যের মাধ্যমে একটা দুর্ভেদ্য শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু রত্নগিরি জেলায় অন্তরীণ থাকায় তাঁর সঞ্চারিত শক্তি, বিপ্লব ও আন্দোলনের প্রভাব দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল মানুষদের কাছে তেমন ভাবে পৌঁছায়নি।

আম্বেদকরের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি অস্পৃশ্যদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল নিজের মানুষদের ভাবনার মতোই। কী করে তাঁদের নিঃস্বার্থ ও অসীম ভালোবাসা পাওয়া যায় তা তিনি জানতেন। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি তাঁদের নিঃস্বতা, চরম দারিদ্র ও অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁদের শোচনীয় অবস্থা দেখে মানসিকভাবে দগ্ধ হয়েছেন; তাঁদের চেতনা সঞ্চার করেছেন এবং তাঁদের মন ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় আঘাত করেছেন। এমন একজন নেতা তাঁদের সামনে হাজির হয়েছেন, যিনি অনেক দেখেছেন, ভুগেছেন এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত শক্তি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পৃথিবী বিখ্যাত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানমণ্ডিত সর্বোচ্চ নৈতিক শক্তিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য মানুষদের দুঃখদৈন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যাঁরা ছিলেন কার্যত ক্রীতদাস, তাঁদের আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিলেন তিনি।

আম্বেদকর পরনির্ভরতাকে ঘৃণা করতেন এবং উচ্চবর্ণ হিন্দু সংস্কারকদের বর্জন করে চলতেন। অস্পৃশ্য শ্রেণির নামে যে সমস্ত সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যেখানে অস্পৃশ্যরা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে সমবেত হতেন, সেগুলির প্রতি ছিল তাঁর চরম ঘৃণা। আত্মনির্ভরতা সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি Ñ এই মহান ভাবধারায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রোগের সঠিক নিদান বার করেন। তিনি ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা

পেয়েছিলেন যে, যাঁরা অন্যায়ের শিকার, সেই ভুক্তভোগীরা যদি নিজেরাই তাঁদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা না করেন, তবে সে অন্যায় দূরীভূত হয় না। **যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রীতদাসের বিবেক তার দাসত্বের জন্য ঘৃণায় জ্বলে না ওঠে, ততক্ষণ তার মুক্তির আশা নেই। "ক্রীতদাসকে ক্রীতদাস বললেই সে বিদ্রোহ করবে"** Ñ এটাই ছিল তাঁর বাণী। আত্মোন্নতির জন্য অস্পৃশ্যদের তিনি উপদেশ দিতেন। আত্মনির্ভরতা, আত্মোন্নয়ন ও আত্মসম্মানবোধই ছিল তাঁর সংগ্রামের প্রতীক। এই তিনটি অস্ত্রের সাহায্যেই তিনি তাঁদের কর্মে প্রেরণা দিতেন।

অস্পৃশ্যদের এই নবীন নেতা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আপত্তিসূচক, বিরক্তিকর ও প্রতিবাদের সুরে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতেনÑ "তোমাদের শোচনীয় দৃশ্য, করুণ মুখ ও কাতর কণ্ঠ শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তোমরা স্মরণাতীত কাল থেকে যন্ত্রণায় ছটফট করছ, তবুও তোমাদের অসহায় অবস্থাকে ভাগ্য বলে মেনে নিতে লজ্জাবোধ করছ না। মাতৃগর্ভে তোমাদের বিনাশ হল না কেন? কেন তোমরা তোমাদের এই ঘৃণ্য, দুঃখ ও অবজ্ঞাজনক জীবনটাকে আরও বেশি দুর্ভোগপূর্ণ, দারিদ্রময় ও দাসত্বে শৃঙ্খলিত করছ? তোমরা যদি নতুন জীবন ও যৌবনশক্তি ফিরিয়ে আনতে না পারো, তবে মৃত্যুই তোমাদের শ্রেয়। এ দেশের ছোটোবড়ো সকল মানুষের মতো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান লাভের অধিকার তোমাদেরও আছে। যদি তোমরা সম্মানজনক জীবনে বিশ্বাস করো, তাহলে আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাস স্থাপন করো।" তাঁর এই বাক্যবাণ তাঁদের দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করে।

আম্বেদকর স্বেচ্ছায় সচেতনভাবেই দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেননি। বিদেশি শাসনে যারা ক্ষমতাহীন, তারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্যই ব্যস্ত ছিল। বিদেশিরা বিদায় নিলে তাদের হাতে ক্ষমতা আসবে। তাদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস ছিল না আম্বেদকরের। ভারতের ইতিহাস থেকে তিনি এই শিক্ষাই লাভ করেছেন যে, মহান রাজা ও জাকজমকপূর্ণ রাজ্যের সৃষ্টি এ দেশে অনেক হয়েছে, কিন্তু তাঁরা চিরকাল অস্পৃশ্য হয়ে কুষ্ঠরোগীর মতো ব্যবহারই পেয়ে আসছেন। সমাজ থেকে বহিষ্কৃত অস্পৃশ্যদের নাগরিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কোনো অধিকারই নেই। আম্বেদকরের লক্ষ্য ছিল ওইসব অধিকার অর্জন করা; তাঁর লোকদের মস্তিষ্ক, অন্তর ও হাত দু'টিকে মানুষের অধিকার অর্জনে প্রস্তুত করে তোলা। তাদের খাঁটি মানুষ করে তোলা, এই ছ'কোটি (তখন হিন্দুর সংখ্যা ছিল তিরিশ কোটি) দাসকে দেশের মানুষ হিসাবে তৈরি করা। তিনি জানতেন রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসরফা করতে হবে এবং বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তিনি বুঝেছিলেন যে, ব্রিটিশের

বিরুদ্ধে গেলে তাঁকে একসঙ্গে দু'টি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাই ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করাকেই তিনি বিজ্ঞতার পরিচায়ক বলে মনে করেন এবং ওই সহযোগিতাই তাঁর অধিকার লাভে সহায়ক হবে।

এইসব লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও ধুলোবালির মধ্যে গড়াগড়ি যাওয়া মানুষগুলি, গোবরের স্তুপ ও কুঁড়েঘরের মধ্যে যাঁরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মুক্তির মাধ্যমেই জাতির শক্তি, স্বাস্থ্য, ধন, মান ও কৃষ্টি বৃদ্ধিলাভ করবে, সেই মহান কার্য সম্পাদনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুধর্মকে নতুন শক্তি দান করা, তার ভবিষ্যত উজ্জ্বলতর করা, রাহুগ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করা, তার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করা, আড়াই হাজার বছর ধরে যে কলঙ্ক কালিমা জমে আছে, তা মুছে ফেলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কি মহান উদ্দেশ্য নয়? আম্বেদকর উদাত্তকণ্ঠে অস্পৃশ্যদের আহ্বান জানালেন এবং জাতিভেদ প্রথা অনুরাগী নির্দয় বর্ণহিন্দুদের সাবধানবাণী শোনালেন। গান্ধির আবেদন ছিল বর্ণহিন্দুদের হৃদয়ের প্রতি, সাভারকারের আবেদন তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের উপর। কিন্তু আম্বেদকরের আবেদন অস্পৃশ্যদের অন্তর স্পর্শ করেছে আগে, তারপর তার প্রকাশ ঘটেছে বাইরে। কিন্তু অন্যান্য সংস্কারকদের আবেদন বাইরে থেকে গিয়েছে ভিতরের দিকে; তা কখনও নিপীড়িতদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে এখানেই আম্বেদকরের তফাত।

'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'র জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় আত্মসম্মানবোধের এক নবজাগরণ। সভা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি শোলাপুর হাইস্কুলে দলিত শ্রেণির ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করে। ওই সভা ছাত্রদের পোশাক-আশাক, কাগজ-কলম প্রভৃতি জিনিস ও বোর্ডিং-এ থাকার খরচ বহন করত। ছাত্রাবাসের খরচের জন্য শোলাপুর পৌরসভা মাসিক চল্লিশ টাকা মঞ্জুর করে। জীবাপ্পা সুভা আইডেল নামে একজন অস্পৃশ্য কাউন্সিলর এর দেখাশোনা করতেন।

দলিত শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে সমাজসেবার আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং জ্ঞান ও বিদ্যা অনুশীলনের জন্য ওই সভা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সভার নির্দেশে ছাত্রেরা 'সরস্বতী বিলাস' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। তদুপরি বম্বেতে একটি অবৈতনিক গ্রন্থাগার, একটি মাহার হকিক্লাব প্রতিষ্ঠা করে অস্পৃশ্যদের জুয়াখেলা, মদ্যপান, অন্যান্য পাপ ও অস্বাস্থ্যকর শ্রান্তি বিনোদন থেকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করে।

দলিত শ্রেণির মানুষেরা এবার আম্বেদকরের দিকে আকৃষ্ট হলেন। লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসার পর প্রথম যে সভা তিনি করেছিলেন, সে সভায় সংগঠনের লোক ছাড়া দলিত শ্রেণির কেউ যোগ দেননি। কিছু লোক সভাগৃহের চারপাশে

দরজার কাছে বসেছিলেন, ধূমপান করছিলেন এবং কেউ কেউ এককোণে বসে গল্প করছিলেন। কোনো সংবাদপত্র বা পুঁজিপতির সাহায্য ছাড়াই তিনি গ্রামের ছোটো ছোটো পল্লিতে, শহরে তাঁর লোকদের জাগরিত করে, আঘাত দিয়ে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। বম্বে প্রেসিডেন্সির নিপানীতে তিনি প্রথম প্রাদেশিক দলিত শ্রেণির অধিবেশনে যোগ দিয়ে তাঁদের পরিচালিত করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রত্নগিরি জেলার মালওয়ানে অস্পৃশ্যদের প্রথম সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। এরপর একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তির অনুরোধে তিনি গোয়ায় যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিবতর্কার। সেখানে কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করে তাঁরা বম্বে ফিরে আসেন।

সে বছরের দলিত শ্রেণির জন্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম ছিল অনগ্রসর সমাজের পেরিয়ার রামস্বামী পরিচালিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভাইকামে যে রাস্তায় অস্পৃশ্যদের চলাচল নিষিদ্ধ ছিল, সেই রাস্তায় চলার অধিকার প্রাপ্তির দাবিতে। এর নৈতিক চাপ এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি এত জোরালো ছিল যে গোঁড়া হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের চলার জন্য রাস্তাটিকে উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়।

এই সময় অন্য একটি ঘটনা ঘটে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে মুর্গেশান নামে একজন অস্পৃশ্য প্রথাগত নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাজের এক হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করেন। তাঁকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মন্দির অপবিত্র করার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনা বিবেকে সম্পন্ন স্পৃশ্য ও আত্মসম্মানকামী অস্পৃশ্য Ñ উভয় শ্রেণির লোকদেরই বিচলিত করেছিল। আম্বেদকর এইসব ঘটনার অগ্রগতি সযত্নে লক্ষও করেছিলেন।

আম্বেদকরের আত্মোন্নতির বাণী ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সে বছর এপ্রিল মাসে তিনি জেজুরি পরিদর্শনে যান এবং সেখানে এক সভায় প্রস্তাবে বলেন যে, অস্পৃশ্যদের বসবাসের জন্য উপনিবেশ গড়ে তুলতে আলাদা ভূখণ্ডের অনুসন্ধান করতে হবে। তাতে সমর্থন জানিয়ে এক বক্তা বলেন যে, অস্পৃশ্যতা দূর করতে যদি তাঁরা অসমর্থই হন, তাহলে নেতাদের ইচ্ছানুসারেই কাজ করতে হবে। আলাদা বাসস্থানের চিন্তা ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার। এ থেকে বোঝা যায় যে, সেই পরিস্থিতিতে স্বয়ং নেতাই কতটা বিপন্ন ও বিরক্ত ছিলেন।

আইন ব্যবসায়ে তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন আম্বেদকর। এই বছরে একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলা হাতে নেন তিনি। কে.বি. বাগড়ে, কেশবরাও জেধে ও দিনকররাও জাভালকার নামে তিনজন অব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে জনৈক ব্রাহ্মণ একটি মামলা দায়ের করে। 'ব্রাহ্মণগণই দেশের ধ্বংসের কারণ' এই প্রকারের নিন্দাসূচক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার জন্য তাঁরা অভিযুক্ত হন। বাদীর পক্ষে পুণার এল.বি. ভোপতকর নামে একজন নামজাদা উকিল ছিলেন। মামলা শুনানীর জন্য সেসন জজের কোর্টে এলে

আম্বেদকর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যুক্তি প্রদর্শন করে বাগ্মীতা সহকারে বিবাদীকে সমর্থন করে ১৯২৬ -এর অক্টোবরে জয়লাভ করেন। এই জয় সামাজিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মক্কেল ও আম্বেদরের পক্ষে ঘোষিত হয়। ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি তখন উন্নতির শিখরে। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে হলেও তিনি হাইকোর্টের আইনবিদ হিসাবে সামনের সারিতে এগিয়ে এলেন।

সামাজিক বিপ্লবের আবেগ সমাজকে আন্দোলিত করে তুলেছে। 'বোলের সিদ্ধান্ত' থাকা সত্ত্বেও অনেক লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি তখন পর্যন্ত দলিত শ্রেণির জন্য কোনো রকমের নাগরিক অধিকার পূরণের জন্য এগিয়ে আসেনি। যদিও তারা কতকগুলি সাধারণ জলাশয়, পুকুর, স্কুল, হাসপাতাল ও ধর্মশালা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব পাশ করে, কিন্তু দলিত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাদের সত্যিকারের কোনো সদিচ্ছা ছিল না। আগের প্রস্তাবটি কাগজে কলমেই পড়ে থাকায় বোলে সাহেব ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট বম্বের আইনপরিষদে আর একটি প্রস্তাব আনেন Ñ তিন বছর আগে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল, সেই অনুসারে কাজ না করায় লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিকে সরকার যেন আর অর্থ মঞ্জুর না করে।

অধিকাংশ হিন্দু সদস্য প্রস্তাবটিকে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন, একজন মাত্র সদস্য সভাকে অনুরোধ করেন যে, এ প্রস্তাব যেন কার্যকরী না হয়। কারণ, তাহলে এ নিয়ে প্রবল আপত্তি উঠবে। কিন্তু তখন সিন্ধুপ্রদেশের হায়দারাবাদ জেলার নুরমোহম্মদ তীব্র কটাক্ষ করে শ্লেষাত্মক ভাষায় অব্রাহ্মণ সদস্যদের বললেন, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁরা সকল প্রকার অধিকার আদায় করছেন, কিন্তু দলিত শ্রেণির প্রতি কোনো ন্যায়পরায়ণতার দাবি প্রত্যাখ্যান করছেন কোন যুক্তিতে? তারপর তিনি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার মতো ধীরকণ্ঠে বলেন Ñ "আমি মনে করি সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন উচ্চশ্রেণির অত্যাচারের কারণে যাঁরা সমাজের নিম্নস্তরে নেমে এসেছেন এবং আজও নেমে চলেছেন, তাঁরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করবেন। তখন হিন্দুসমাজ মুসলিম বা খ্রিস্টান মিশনারিদের এই বলে অভিযুক্ত করবেন যে, এরা দলিত শ্রেণির মানুষদেরকে ধর্মান্তরিত করতে উৎসাহিত করেছে।"

হিন্দুসমাজের এই কলঙ্কিত ছবিটি একজন মুসলমানের দ্বারা অঙ্কিত হল Ñ এটা অপ্রীতিকর হলেও বাস্তব, অন্তর্ভেদী ও ভয়ানক। প্রাদেশিক আইনপরিষদের এই ছবি এবং দেশের অন্যান্য অংশের দৃশ্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে, হিন্দুসমাজের পুনরুত্থানের ধারা কীভাবে গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা অতিক্রম করে আম্বেদকরকে পথ করে নিতে হয়েছিল। এই কাজ করার জন্য দরকার ছিল অসীম সাহস, অবিচল আস্থা ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষের।

আম্বেদকর তখনও সেই ইমপ্রুভমেণ্ট চাওলে বাস করছিলেন। এই বি.আই.টি. চাওলগুলি হচ্ছে বড়ো বড়ো ত্রিতল বাড়ি, প্রত্যেকটিতে একঘর বিশিষ্ট আশিটি করে থাকার ঘর। তাতে বর্তমান কালের কোনো সুযোগ ছিল না। প্রত্যেক তলায় দু'টি করে শৌচালয় এবং স্নান করা, কাপড় কাচা, রান্নার বাসনপত্র ধোয়ার জন্য দু'টি করে জলের ট্যাপ। ওখানকার ভাড়াটেরা অধিকাংশই দলিত শ্রেণির মিলের শ্রমিক। আম্বেদকরের অফিস ঘরটি ছিল কাছেই একটি বাড়িতে, তার মালিক বম্বের একজন সমাজকর্মী। গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন এই বাসগৃহে। আগে যোগাযোগ না করে যাঁরা আসতেন, তাঁরা অস্পৃশ্যদের এই নেতাকে ঘরোয়া পোশাকে দেখতেন। সেই অবস্থায় বারান্দায় হাতলবিহীন বেঞ্চে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা হত। ঘরের প্রতিটি জিনিসই ছিল খোলামেলা ও সাদাসিধে।

জনগণের নেতা ও আইনজীবী হিসাবে আম্বেদকর যখন নানাপ্রকার কাজে জড়িত ছিলেন, সে সময় শিক্ষাবিভাগে নিয়োজিত হবার বা আইন-পরিষদের সদস্য কিংবা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের সদস্য হবার সুযোগ আসে। সেই সময় বম্বের সিডেনহাম কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হয়। ওই পদের জন্য আম্বেদকরের চেয়ে আর কোনো যোগ্য প্রার্থী ওই প্রদেশে তখন ছিলেন না। ওই কলেজে তিনি একবার অধ্যাপকও ছিলেন, তথাপি শিক্ষাবিভাগের তখনকার প্রগতিশীল সদস্য ডঃ আর.পি. পরাঞ্জপাইও ওই পদে আম্বেদকরকে নিয়োগ করতে সক্ষম হলেন না। কেলুস্কর মহাবালেশ্বরে গিয়ে পরাঞ্জপাইয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে দেখা করলেও তিনি এ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন। পরে পরাঞ্জপাই তাঁকে বম্বের এলফিনস্টোন কলেজে অধ্যাপকের পদ দিতে চাইলে আম্বেদকর তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেলুস্করকে তিনি লেখেন যে, সমাজের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে তিনি সংকল্পবদ্ধ। এজন্য ভবিষ্যতে তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো চাকরি তিনি করবেন না। পরে তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে 'ব্যাটলিবয় অ্যাকউন্ট্যান্সি ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটে' পার্ট-টাইম লেকচারারের চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি ব্যাবসা সংক্রান্ত আইন শিক্ষা দিতেন। ১৯২৮-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি সেখানে চাকরি করেন।

এই সময়ে আম্বেদকরের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, তার নাম রাখা হয়েছিল রাজরত্ন। তাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এই পুত্রের আগে রমাবাঈ-এর একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছিল, তার নাম ছিল ইন্দু। কিন্তু শৈশবেই সে মারা যায়। রমাবাঈ-এর স্বাস্থ্য তখন খারাপ যাচ্ছিল। তাই দুই ছেলে রাজরত্ন ও যশোবন্তসহ তাঁকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য অন্যত্র পাঠানো হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৬ সালে জুলাই মাসে আম্বেদকরের প্রিয়তম পুত্র রাজরত্ন

মারা যায়। তিনি শোকে এতই মুহ্যমান হয়েছিলেন যে, মৃত পুত্রের দেহটিকে ছাড়তেই চাইছিলেন না। অনেকদিন পর্যন্ত সেই ঘরেও তিনি প্রবেশ করেননি। এর আগেও তাঁরা দু'টি পুত্র ও একটি কন্যাকে হারিয়েছেন। মোট চারটি সন্তানকে হারিয়ে তাঁরা অনেকদিন পর্যন্ত শোকাকুল অবস্থায় কাটান। মাঝে মাঝে আম্বেদকরের মন হতাশায় ভরে উঠত। গভীর চিন্তায় নতুন আলোর সন্ধানে তিনি সামান্যমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে পড়ার ঘরের চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চল হয়ে বসে কাটিয়ে দিতেন। দু'টি বেঞ্চের উপর শুয়ে বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

সেই গরিবের ব্যারিস্টার আম্বেদকরের কাছে দূরদূরান্তের নিপীড়িত অভাবগ্রস্ত মানুষেরা ছুটে আসতেন। তাঁদের দুঃখকষ্টে গভীরভাবে ব্যথিত এই মানুষটি তাঁদের দুঃখ-বেদনার কথা শুনতেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে আইনের পরামর্শ দিতেন। নামমাত্র পারিশ্রমিকে, অনেক সময় বিনা পারিশ্রমিকেও গভীর নিষ্ঠার সাথে তাঁদের মামলা পরিচালনা করতেন। তিনি তাঁর নিজের লোকদের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি দেখাতেন। তাঁদের সযত্ন ও মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত করতেন। গরিব মানুষগুলি তাঁর সরলতা ও একনিষ্ঠতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে যেতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দাসত্বের বিরুদ্ধে জাগরণ

কোরগাঁও ওয়ার মেমোরিয়াল হলে দলিত শ্রেণির একটি সভার অধিবেশনে নববর্ষের সূচনা হয়। ওই অনুষ্ঠানে দলিত শ্রেণির প্রখ্যাত নেতৃবর্গ যোগ দেন। আম্বেদকর সেই সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রোতাদের বলেন যে, তাঁদের সম্প্রদায়ের শত শত লোক সৈন্যবিভাগে ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু সেই ব্রিটিশেরাই অকৃতজ্ঞের মতো তাঁদের অসামরিক সম্প্রদায় রূপে আখ্যা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করাটা যদিও গৌরবের বিষয় নয়, তথাপি বর্ণহিন্দুরা তাঁদের অস্পৃশ্য করে রাখার ফলে জীবিকার আর কোনো উপায় না থাকায় শেষ আশ্রয় হিসাবে তাঁরা ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন। সবশেষে তিনি তাঁর লোকদের এই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সরকারকে বাধ্য করতে আহ্বান জানান।

এই সময় বম্বের গভর্নর আম্বেদকরকে বম্বে আইনপরিষদে মনোনীত করেন। ১৯২৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বম্বের দলিত শ্রেণির শিক্ষকগণ এই ঘটনায় উৎসব করার জন্য একটি সভা আহ্বান করে তাঁদের নেতার হাতে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুসারে ১৯ এপ্রিল বম্বের প্যারেলে দামোদর হলে মিউনিসিপ্যাল শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক, দলিত শ্রেণির শিক্ষার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী এস.বি. পেণ্ডুরকরের নেতৃত্বে সভা আহূত হয়। নেতাকে টাকার তোড়া উপহার দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস আম্বেদকর তাঁর গুরুদায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। তিনি দলিত শ্রেণির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, আম্বেদকরের লক্ষ্য পূরণ করতে প্রতিটি মানুষ অংশ গ্রহণ করে যেন নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেন। শিক্ষকগণ তাঁর কাজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে আম্বেদকর তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেই অর্থ 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'য় দান করেন।

আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে দলিত শ্রেণির মানুষেরা মাথা তুলে তাকাতে শুরু করেছেন। এই সময়ে আম্বেদকরের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, সেটা ছিল মাহাদ অভিযান। এটির মূল হচ্ছে বম্বে আইনপরিষদে বোলে কর্তৃক উত্থাপিত এবং বম্বে সরকার কর্তৃক গৃহীত মহান প্রস্তাব। ১৯২৩ সালে বোলের প্রস্তাব অনুসারে এবং অল্প পরিবর্তনের পর ১৯২৬ সালে ওই প্রস্তাব পুনর্নবীকরণ করে মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটি অস্পৃশ্যদের কাছে চৌদার পুকুর উন্মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবটি কাগজে কলমেই থেকে গিয়েছিল। বর্ণহিন্দুদের বিরোধিতার জন্য অস্পৃশ্যরা তাঁদের অধিকার

থেকে বঞ্চিত হয়েই ছিলেন।

এজন্য কোলাবা জেলার দলিত শ্রেণির লোকেরা ১৯২৭ সালের ১৯ - ২০ মার্চ মাহাদে একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেন। আগের মাসেই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ আম্বেদকরকে সভার তারিখ জানিয়ে দেন। সুরেন্দ্রনাথ টিপনিস, সুবেদার সাবাদকর, অনন্তরাও চিত্রের বিশেষ তত্ত্বাবধানে সভার ব্যবস্থাপনা হয়েছিল। গত দু'মাস ধরে কর্মী ও নেতৃবৃন্দ নিকটবর্তী পাহাড়-উপত্যকার প্রতিটি পাড়ায় দলিত শ্রেণির লোকদের কাছে সভার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। ফলে পনেরো বছরের বালক থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত শতাধিক মাইল দূরের ও নিকটের সবাই রুটির থলে কাঁধে ঝুলিয়ে মাহাদে এসে জড়ো হন। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সকল জায়গা থেকে দলিত শ্রেণির প্রায় দশ হাজার ডেলিকেট, কর্মী ও নেতা এসে যোগ দেন।

সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা ও সমস্ত উপায় গ্রহণ করা হয়েছিল। সভার প্রয়োজনের জন্য বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে চল্লিশ টাকার জল কেনা হয়েছিল। কারণ সভায় উপস্থিত অস্পৃশ্যদের জন্য জল পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। স্থানীয় দেবতা বীরেশ্বরের নামে তৈরি প্যাণ্ডেলে দুপুরে সভা আরম্ভ হয়।

সভাপতির আসন থেকে আম্বেদকর অর্ধনগ্ন, বিপন্ন, উৎসুক জনতার সামনে তাঁর সরল, সংক্ষিপ্ত ও তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ আরম্ভ করেন। তিনি যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সেই দাপোলির অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, যেখানে কোনো মানুষ তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত করেন, সেই সুন্দর দৃশ্যের পরিবেশ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে, ভালোও বাসে। তিনি শৈশবের দিনগুলি স্মরণ করে বলেন Ñ "আমরা অস্পৃশ্য বলে নিন্দিত। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন উন্নত শ্রেণি ছাড়া অন্যদের তুলনায় আমরা শিক্ষাদীক্ষায় বেশি অগ্রসর ছিলাম। দেশের এই অঞ্চলটি তখন আমাদের কাজকর্ম ও শক্তিতে ঠকঠক করে কাঁপত।"

এরপরে তাঁর লোকজনের কাছে যে বাণী তিনি প্রচার করেন, তা মহারাষ্ট্রের পাহাড়, উপত্যকা ও গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন Ñ "সামরিক বিভাগ থেকে বাদ দেওয়াতেই আমাদের পতন আরম্ভ হয়েছে। সামরিক বিভাগই আমাদের উন্নতির সুযোগ করে দিয়েছিল। আমাদের বুদ্ধি, ক্ষমতা, সাহস ও ঔজ্জ্বল্য সেনা-অফিসার হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়। সেই সময় অস্পৃশ্যেরা মিলিটারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হতে পারতেন এবং মিলিটারি ক্যাম্পে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও উপকারী। অস্পৃশ্যদের কাছে সামরিক বিভাগের দরজা বন্ধ করে দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আমরাই ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছি।"

এরপর তিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে বলেন Ñ "জীবনশুদ্ধির তিন রকমের পথ

অনুসরণ না করলে আমাদের স্থায়ী উন্নতি লাভ সম্ভব নয়। আমাদের আচার-আচরণের গতানুগতিকতাকে পালটে উন্নত করতে হবে, কথায় ও সুরে মার্জিত হতে হবে এবং চিন্তাভাবনাকে উন্নত করতে হবে। তোমাদের মৃতজন্তুর মাংস খাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে হবে। নিজেদের মধ্যে কাউকে ছোটোবড়ো ভাবা ত্যাগ করতে হবে। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া রুটির টুকরো আমরা কখনও খাবো না, এ প্রতিজ্ঞা আমাদের নিতে হবে। আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মজ্ঞান অর্জন করতে পারলেই আমাদের আত্মোন্নতি হবে।" এরপর তিনি তাঁর লোকদের বলেন, গভর্নমেণ্ট যাতে সেনাবিভাগ, নৌবিভাগ ও পুলিশ বিভাগের সরকারি চাকরিতে তাঁদের লোকদের নিয়োগ করে সেজন্য যেন তাঁরা আন্দোলন করেন। সরকারি চাকরি ও শিক্ষা লাভ করার গুরুত্ব যাতে তাঁরা উপলব্ধি করেন সেজন্যও তাঁদের সচেতন করেন। মাহারদের আত্মসম্মানে সামান্য খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, সামান্য রুটির টুকরোর জন্য মানবিক অধিকার বিকিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অপমানজনক। চিরাচরিত দাসমনোবৃত্তি ত্যাগ করতে এবং বাটান ত্যাগ করে চাষের জন্য জঙ্গলে জমি খুঁজে নিতে তাঁদের কাছে আবেদন রাখেন। উপসংহারে তিনি আবেগপূর্ণ কন্ঠে বলেন, "পিতামাতা যদি ছেলেমেয়েদেরকে তাঁদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় দেখে যাওয়ার বাসনা পোষণ না করেন, তাহলে পশুর সঙ্গে তাঁদের কোনো পার্থক্য থাকে না।"

সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বর্ণহিন্দুদের কাছে আবেদন রাখা হয়, তাঁরা যেন অস্পৃশ্যদের সমস্ত রকম নাগরিক অধিকার দিতে সাহায্য করেন, চাকরিতে নিয়োগ করেন, অস্পৃশ্য ছাত্রছাত্রীদেরকে খাবার দেন ও মৃত জন্তু নিজেরাই যেন কবর দেবার ব্যবস্থা করেন। সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়Ñ মৃত পশুর মাংস খাওয়া বন্ধে আইন পাশ করার জন্য, অস্পৃশ্যদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে, দলিত শ্রেণির ছাত্রাবাসগুলিতে আর্থিক অনুদান দিতে এবং বোলে প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দিতে। এগুলি কার্যকরী করতে দরকারে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারাও যেন জারি করা হয়।

প্রথমদিন কয়েকজন বর্ণহিন্দু বক্তা দলিত শ্রেণির দাবি সমর্থন করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সেই রাতে কর্মসমিতির যে সভা বসে সেখানে উচ্চবর্ণের নেতাদের মনোভাব জেনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সভার সমস্ত লোক দলবদ্ধ ভাবে অস্পৃশ্যদের জল গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চৌদার পুকুরে যাবেন। পরদিন সকালে দু'জন বর্ণহিন্দু প্রবক্তাকে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করতে অনুরোধ জানায়। অসবর্ণ বিবাহের বিষয়টি বাদে দু'জনেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯২৪ সালের মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাব অনুসারে দলিত শ্রেণির কাছে চৌদার

পুকুর উন্মুক্ত করণের ভিত্তিতে অস্পৃশ্যদের জল গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিনিধিগণ সেই অনুসারে শান্তিপূর্ণ ভাবে জল গ্রহণের জন্য চৌদার পুকুরের দিকে অভিযান শুরু করেন।

অস্পৃশ্যদের মনে দাসত্ব, জাতিভেদ ও পুরোহিততন্ত্র বিরোধী ভাব জাগরণের মন্ত্রণাদাতা আম্বেদকর আজ সেই জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেখান থেকে স্পৃশ্য হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম Ñ সবাই জল নেয়, অথচ যুগ যুগ ধরে একই ধর্মাশ্রিত, একই দেবতার উপাসক হয়েও তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেলেও অস্পৃশ্যরা একফোঁটা জল পান না। যে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যুগযুগ ধরে অবিচারের পদতলে পিষ্ট হয়ে আর্তনাদ করছিলেন, আজ তাঁরা তাঁদের মানবীয় নাগরিক অধিকার লাভের জন্য যে চেষ্টা করছেন, এর মতো আশ্চর্যজনক ঘটনা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। হিন্দুদের তথাকথিত সম্মানজনক রীতির বিরুদ্ধে পৌরুষদীপ্ত, আক্রমণশীল যোদ্ধা আম্বেদকর একদল সেনাসহ এগিয়ে চলেছেন। যে দশ হাজার মানুষ চারটি সারিতে বিভক্ত হয়ে তাঁদের মহান নেতার অনুসরণ করছেন, নিপীড়িত সেই মানুষেরা গভীর আবেগতাড়িত হয়ে উঠে আসা এক অতুলনীয় শক্তি।

রাজনৈতিক অভিযানগুলি গতিশীল ও অতিরঞ্জিত, কিন্তু আম্বেদকরের অভিযান বেশি কঠিন ও বিপজ্জনক। স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দুসমাজে, সামাজিক অবাস্তবতা, বহু প্রাচীন অন্যায় ও অনমনীয় রীতি দুর্বল শ্রেণির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের রক্তঝরা ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা ধর্মীয় বিধান বলে মানতে বাধ্য করা হয়েছে। কোনো পরাধীন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও অভিযান অনেক পরিমাণে সহজ, কারণ জাতীয় উত্থানে অধিকাংশ লোক প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে তার প্রতি সহানুভূতিশীল। জনগণ রাজনৈতিক মুক্তিদাতাদের চলার পথ গোলাপজলে সিঞ্চিত করতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত মানুষ সমাজকে অমঙ্গল, কুসংস্কার, পচা ঐতিহ্য, কু-রীতিনীতি থেকে বাঁচাতে কঠোর প্রচেষ্টা চালান, তাঁদের বেলা এর ঠিক বিপরীত অবস্থা। কারণ, তাঁদের কাজকর্মের গতিধারা ও আন্দোলন সমাজের অধিকাংশের বিশ্বাস ও ধর্মমতের বিরোধী। রক্ষণশীলতা, পুরোনো রীতিনীতি ও পরম্পরাকে ত্যাগ করতে তারা কিছুতেই রাজি নয়।

যুগ যুগ ধরে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করে বেঁচে থাকতে বাধ্য হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তর থেকে নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলতে আম্বেদকর ব্রতী হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন সেই মুক্তিদাতা যিনি এই মহান বিশ্বনীতি প্রচার করেছেন যে, স্বাধীনতা দান হিসাবে পাওয়ার জিনিস নয়, তা সংগ্রাম করে আদায় করে নিতে হয়। আত্মোন্নতিও অন্যের আশীর্বাদ কিংবা দয়ায় হয় না, তাও সংগ্রাম ও কর্মের দ্বারা পেতে হয়। ওই নিষ্ক্রিয় ও নিদ্রিত জনগণের সাহসের অভাব। তাঁদের নতুন দৃষ্টি ও লক্ষ্যের দরকার। আম্বেদকর

এখন তাঁদের মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি নিজে কাজ করে কর্মোদ্দীপনা দিচ্ছেন এবং নিজ কর্মের দ্বারাই শক্তিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁদের শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে। তিনি যে মহান ব্রত পালনের দায়িত্ব নিয়েছেন তা অনেকটা যুদ্ধের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইতিহাসে এই প্রথম অস্পৃশ্যেরা তাঁদের নিজেদের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযানে চলেছেন। সকলেই শৃঙ্খলা, শক্তি ও উদ্যম প্রদর্শন করে মাহাদের রাস্তা অতিক্রম করে চৌদার পুকুরে গিয়ে থামেন। শিক্ষিতদের মধ্যে জ্ঞানদীপ্ত, পৃথিবীর যে কোনো পণ্ডিতের সমকক্ষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হিন্দু, অথচ সাধারণ জলাশয় থেকে জলপানে অধিকারহীন, হিন্দুদের সাধারণ পাঠাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ ব্যক্তি আম্বেদকর সেই পুকুরের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। যে সমস্ত মানুষ তাদের ধর্মে সকল প্রাণীর প্রতি করুণা প্রদর্শনের কথা আছে বলে গৌরব বোধ করে, সেই অত্যাচারী ও দুর্ধর্ষদের নীচতা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন যে, তারা স্বধর্মীয়দের কুকুর বিড়ালের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে। আম্বেদকর সেই পুকুর থেকে জল গ্রহণ করে পান করলেন। সেই বিশাল জনতা তা অনুকরণ করে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

এর ঘণ্টাদুই পরে কতকগুলি বদমায়েশ প্রকৃতির বর্ণহিন্দু একটা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দিল যে, অস্পৃশ্যেরা বীরেশ্বর মন্দিরে প্রবেশের চক্রান্ত করেছে এবং সেই বদমায়েশরা লাঠিসোটা নিয়ে জড়োও হল। মাহাদের সমস্ত গোঁড়া হিন্দুরাও সশস্ত্র হয়ে উঠল। ক্রমে সারা শহর সশস্ত্র গুণ্ডায় ভরে গেল। তাদের ধর্ম বিপন্ন, তাদের দেবতা অপবিত্র হল বলে হৃদয় বিদীর্ণ করে সোরগোল তুলে তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। **ওই দেবতাপ্রিয় মানুষগুলি, যে মুসলিমরা তাদের কাফের বলে দেবমূর্তি ভেঙে দেয়, গোহত্যা করে, তাদের সঙ্গে একত্রে পুকুরের জল গ্রহণে তাদের আত্মসম্মানে বাধে না। যখন খ্রিস্টানগণ বাইবেলের বাইরে কোনো ধর্ম দৈত্যের কাজ বলে প্রচার করে, তখন তাদের অহংকার গলার কাছে শুকিয়ে যায়। তারাও এ পুকুর থেকে জল নেয়। কিন্তু যখন একই রাম ও কৃষ্ণের উপাসক এই স্বধর্মীয় ভাইয়েরাÑ ওই পুকুর থেকে জল নিতে যান তখন তাদের দেবতা অপবিত্র হয়, তাদের গৃহে স্বর্গীয় দেবতার বিপদের ছায়া পড়ে এবং জগৎসভায় তারা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না!** কিন্তু এই যুক্তিসম্মত মতবাদ মাহাদের গোঁড়া হিন্দুসমাজের কাছে অভিশাপের মতো। তাদের ধর্মের প্রতি মিথ্যা অজুহাতে এবং বীরেশ্বর দেবতাকে অপবিত্র করার গুজবে ক্রোধান্বিত হয়ে অস্পৃশ্যদের সভার প্যাণ্ডেল বর্ণহিন্দুরা লণ্ডভণ্ড করে ভেঙে দেয়। অনেক প্রতিনিধি তখন ছোটো ছোটো দলে শহরে ছিলেন, কেউ কেউ ফিরে যাবার জন্য মোটঘাট বাঁধছিলেন। কিছু লোক তখনও খাবার খাচ্ছিলেন। বেশির ভাগ প্রতিনিধিই তখন

শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। গুণ্ডারা সুযোগ বুঝে প্যাণ্ডেলের লোকদের আক্রমণ করে, খাবার ফেলে দেয় মাটিতে ও প্রচণ্ড মারধর শুরু করে।

মাহাদের রাস্তায় ইতস্তত চলা অস্পৃশ্য প্রতিনিধি, নারী ও শিশুরা এই ঘটনায় ভীত হলেন। তাঁদের মধ্যে বিক্ষিপ্তরাই বেশি মার খেয়েছিলেন। তাঁরা আশ্রয়ের জন্য মুসলিমদের বাড়িতে ছুটলেন। স্থানীয় মামলাতদার (প্রশাসনিক পদ বিশেষ) ও পুলিশ-ইন্সপেক্টর গুণ্ডাদের থামাতে অসমর্থ হয়ে আম্বেদকর যে ডাকবাংলোয় অবস্থান করছিলেন, সেখানে গিয়ে দেখা করেন। আম্বেদকর অফিসারদের বলেন, "আপনারা আপনাদের লোকজনদের সংযত করুন, আমি আমার লোকদের সংযত করছি।" এরপর দু-তিনজন কর্মীসহ তিনি ঘটনাস্থলে যান। রাস্তায় একদল গুণ্ডা তাঁকে ঘিরে ধরলে তিনি ধীরভাবে তাদের বলেন যে, মন্দিরে প্রবেশ করার কোনো পরিকল্পনা তাঁদের নেই। এরপর তিনি বাংলোতে ফিরে যান। তখন পর্যন্ত এই ঘটনায় প্রায় কুড়িজন অস্পৃশ্য গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

গুণ্ডারা তখন রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে শুরু করে ও বিচ্ছিন্নভাবে ঘরমুখী অস্পৃশ্যদের আক্রমণ করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, তাদের বিশ্বস্ত অনুচরদের খবর পাঠায় যে, সভায় যারা যোগদান করেছেন সবাইকে যেন শাস্তি দেওয়া হয়। এর ফলে ঘরে ফেরার আগেই বহু মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়।

ইতিমধ্যে প্রতিনিধিদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আম্বেদকর যখন বাংলোয় পৌঁছান তখন প্রায় শ'খানেক লোক তাঁর আদেশের জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছেন, প্রতিশোধ নিতে তাঁদের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে এবং হাত নিশপিশ করছে। কিন্তু তাঁদের নেতা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাঁদের কাছে আবেদন জানান। আম্বেদকরের একটি উত্তেজনাপূর্ণ কথায় মাহাদ সেদিন রক্তবন্যায় ডুবে যেতে পারত। তখনও অস্পৃশ্যদের অনেক প্রতিনিধি শহরে ছিলেন। প্যাণ্ডেলে এবং বাংলোতে সমবেত জনতা গুণ্ডাদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারতেন। অস্পৃশ্যদের মধ্যে শত শত লোক প্রথম মহাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সৈনিক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের নেতার আদেশে আশ্চর্য রকমের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছিল। তাঁদের সংগ্রাম ছিল সাংগঠনিকভাবে অহিংসাপূর্ণ। স্বপ্নেও তাঁরা আইনভঙ্গের কথা ভাবেননি। রাত্রে সকলেই তাঁদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। আম্বেদকর সহকর্মী অনন্তরাওয়ের সঙ্গে বাংলো ত্যাগ করে থানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২৩ মার্চ তিনি বম্বে চলে যান।

এই ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশের জন্য ন'জন গোঁড়া হিন্দুকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে পরাক্রমশালী পাঁচজনের চারমাসের কারাদণ্ড হয়। এ প্রসঙ্গে আম্বেদকর বলেছিলেন, জেলার সর্বোচ্চ কর্তা যদি অহিন্দু না হতেন, তাহলে অস্পৃশ্যরা

নিরপেক্ষ বিচার পেতেন না। তিনি আরও বলেন যে, পেশোয়া রাজত্ব থাকলে তাঁকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারা হত। পেশোয়া রাজত্বে অস্পৃশ্যরা দিনের বেলা মাত্র কয়েক ঘণ্টা পুনা শহরে প্রবেশ করতে পারতেন এবং যখন প্রবেশের অনুমতি পেতেন, তখন থুথু ফেলার জন্য গলায় একটি মাটির পাত্র ও রাস্তা সাফ করার জন্য কোমরে একখানি ঝাঁটা ঝুলিয়ে রাখতে হত।

এইভাবে অস্পৃশ্যদের নাগরিক অধিকার রক্ষার সর্বপ্রথম বড়ো সম্মেলনটি শেষ হয়। এই সম্মেলন ছিল মহান ও গুরুত্বপূর্ণ, ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনা আম্বেদকরের ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন আনে; এমনকি সামাজিক ও জাতীয় সংগঠনগুলিরও পথনির্দেশ করে। বাংলা ভাগ, সাভারকার ও তিলকের বিদেশিবস্ত্র পোড়ানো, ক্ষুদিরামের বোমা ছোঁড়া, ১৯৩০ সালের গান্ধির ডাণ্ডি অভিযান এবং ১৯৪৩ সালের সুভাষচন্দ্রের মুক্তি আন্দোলনের মতোই এটিও ছিল ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মূক মানুষের মুক্তিদাতার নেতৃত্বে নিপীড়িত মানবগোষ্ঠী ভারতের ইতিহাসের পাতায় এক আখ্যায়িকা রচনা করলেন। তাঁরা শুধু অভিযোগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন তাই নয়, তার অবসান ঘটানোর জন্য নিজেরাই উদ্যোগী হলেন; সাহস সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের চলার পথের ধূলি ঝেড়ে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁদের মুক্তিদাতার আরব্ধ সংগ্রাম তাঁদের অন্তর স্পর্শ করল এবং আত্মসম্মানবোধ ও অত্মোন্নতির জন্য অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হল। মাহাদের অপমান ও নীচ ব্যবহার তাঁদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করল। আত্মোন্নতি ও আত্মকৃষ্টি বাড়াবার জন্য তাঁরা মনোনিবেশ করলেন। এই সম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসাবে অস্পৃশ্যদের মরা-পচা মাংস খাওয়া বন্ধ হলো, মরা জন্তুর চামড়া ছাড়ানো ও রুটির টুকরো ভিক্ষাও বন্ধ হলো। মাহাদের এই সংগ্রাম দলিত শ্রেণিকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে নিয়ে এলো।

আম্বেদকর বম্বে পৌঁছে দেখলেন পরিবারের সবাই খুবই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর বড়োভাই কতকটা বিহ্বল। তিনি ছোটো ভাইয়ের কাজে আপত্তি করে নিজের ব্যবসায়ে মন দিতে বললেন এবং সামাজিক কোনো কাজে বাধা দিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু আম্বেদকর তাঁকে সামনাসামনি কিছু না বললেও তিনি চলে যাবার পর বলেন, তাঁর ও সমাজের মঙ্গলের জন্য কী ভালো তা তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি দু'দিন শয্যাশায়ী অবস্থায় অনিদ্রায় কাটিয়েছিলেন। স্বামীকে ফিরতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের মধ্যে গোঁড়া ও ধর্মান্ধ লোকেরা এবার সামাজিক বয়কটের

ডাক দিয়ে অস্পৃশ্যদের গ্রামে ঢোকা বন্ধ করে দেয় ও তাঁদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। তাঁদের কাছে শস্য বিক্রি করার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে, কারণে অকারণে তাঁদের সঙ্গে কলহ সৃষ্টি করে অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করে জেলও খাটায়। কয়েক মাস ধরে মাহাদে অস্পৃশ্যদের প্রতি হিন্দুদের অন্যায়, নির্লজ্জ ও অমানবিক কাজে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। ওই আলোচনা সারা দেশে একটা বিশেষ সংবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এমন একটা তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়, যা গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের অন্তরে জ্বলন্ত ঘৃণার উদ্রেক করে। মহারাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কতকগুলি অস্পৃশ্যদের এই দুঃসাহসিক কাজের নিন্দা করে, কতকগুলি আইনের আশ্রয় নেয়, কতকগুলি শহরে যা ঘটেছে তা ভালো কাজ হয়নি বলে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে। অন্যেরা অস্পৃশ্যদের অধিকার লাভের এই সংগ্রামকে অভিনন্দন জানায়। অস্পৃশ্যদের প্রকাশ্য সভাগুলিতে সরকারকে ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখার জন্য চাপ দেওয়া হয়, মাহাদের গোঁড়া হিন্দুদের এই লজ্জাজনক কাজের জন্য নিন্দা করা হয়। অস্পৃশ্যদের ও তাঁদের নেতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বোলে প্রস্তাব কার্যকরী করতে ও আইনভঙ্গকারী দুষ্কৃতিদের শাস্তি দিতে অনুরোধ করা হয়। বম্বে প্রদেশের গ্রামে, তালুকে, শহরে এরূপ অনেক সভা হয়েছিল।

আম্বেদকরের এই সংগ্রামকে নির্ভীকভাবে সমস্ত অন্তর দিয়ে সমর্থন করেছিলেন সাভারকার। তাঁর মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে তিনি বলেন, অস্পৃশ্যতা কেবলমাত্র যুগধর্মের জন্য নিন্দিত ও বিলুপ্ত হবে না, তা সত্যধর্মের নির্দেশেই বিলুপ্ত হবে। ইতর প্রাণীর প্রস্রাব দিয়ে পবিত্র হওয়ার মনোভাব অত্যন্ত হাস্যকর, মানুষের দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া ঘৃণ্য মনে করা আরও বেশি ঘৃণার কাজ। এজন্য তিনি মাহাদে অস্পৃশ্যদের সত্যাগ্রহ সমর্থন করে বলেন যে, নিজধর্মের লোকদের সকল মানবিক অধিকার স্বীকার করা হিন্দুদের অবশ্য কর্তব্য।

হিন্দুদের পক্ষ থেকে অস্পৃশ্যদের ছোঁয়ায় চৌদার পুকুরের জল অপবিত্র হয়েছে বলে ঘোষণা করা হলো। ওই পুকুরের জল বিশুদ্ধ করার জন্য বীরেশ্বর মন্দিরে গোঁড়া হিন্দুদের এক সভা বসে। পার্থিব অপবিত্র বস্তুকে শুদ্ধ করার তাদের একটি উপায় হলো গোবর, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত Ñ এর সাথে জলের মিশ্রণ। এতেই নাকি সকল বস্তু শুদ্ধ হয়। সেই মতো একশো আট কলসি জল পুকুর থেকে ফেলে এই কলসিগুলি গোবর, গোমূত্র, দুধ ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করে পুকুরে ডুবিয়ে ব্রাহ্মণেরা গগনভেদী মন্ত্র পাঠ করবে। তারপর ঘোষণা করা হবে যে, বর্ণহিন্দুদের জন্য জল বিশুদ্ধ করা হলো। অবশ্য মুসলিম ও খ্রিস্টানদের পক্ষে শুদ্ধ করার পশ্ন ওঠে না। কারণ, তাঁদের দৃষ্টিতে মানুষের ছোঁয়ায় জল অপবিত্র হয় না। তাঁরা আগের মতোই

জল ব্যবহার করতেন।

মাহাদের সকল হিন্দুই কিন্তু অস্পৃশ্যদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেননি। বরং বাপুরাও যোশীর মতো কয়েকজন বর্ণহিন্দু নেতা অস্পৃশ্যদের প্রতি সহানুভুতি দেখাতে গিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। গোঁড়া হিন্দুরা মানবতার দিক দিয়ে পাথরের মতো নিশ্চল। তাদের কাছে যুক্তিহীন অন্ধ পরম্পরা সত্যের চেয়েও মহত্তর। সময়ের পরিবর্তনশীলতা তাদের উপর কোনো রেখাপাত করে না।

আম্বেদকরকে তখন বিপুল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তাই তিনি একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। মতবাদ ও আদর্শ প্রচার করা এবং দলের অভাব অভিযোগ জানানোর জন্য ওই সময় প্রকৃত নেতার পক্ষে একটি সংবাদপত্র অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রহীন নেতা ডানাহীন পাখির মতো। ১৯২৭ সালের ৩ এপ্রিল বম্বে থেকে তিনি 'বহিষ্কৃত ভারত' নামে একটি মারাঠি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দলিত শ্রেণির মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তিযুক্ত বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, আগামীতে, ১৯৩০ সালে যে রাজনৈতিক সংস্কার সূচিত হবে, অস্পৃশ্যরা যদি তাতে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে না পরেন, তাহলে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, মণ্টেগু চেমসফোর্ড-এর শাসন সংস্কারে তাঁদের অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ হবে। তার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণের জন্য দেশের ঘটনাবলি দলিত শ্রেণির মানুষদের গোচরে নিয়ে তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়াদি সরকার এবং জনসাধারণকে অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

আম্বেদকর তাঁর মতামত ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আন্দোলনের সমালোচকদের যথাযথ জবাব সংবাদপত্রের মাধ্যমে দিতে লাগলেন। তিনি বলেন যে, মন্দির ও জলাশয় অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দিতে হবে, কারণ তাঁরাও হিন্দু। তিনি সম্পাদকীয়গুলিতে সতেজ ও নির্ভীক ভাষায় বোলের প্রস্তাব প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেন এবং তা প্রয়োগের ব্যাপারে স্থানীয় সদস্যদের বিশ্বাস না করতে বলেন, কারণ তারা সঙ্কীর্ণচেতা, প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও দলিত শ্রেণির মানুষের স্বার্থবিরোধী গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত। পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দুষ্কৃতিকারী, অনধিকার প্রবেশকারী ও ওই আইন কার্যকরী করার বাধাদানকারীদের শাস্তি দিতে অনুরোধ করেন।

যেসব সমালোচকেরা তর্ক করতেন যে, অস্পৃশ্যরা গোমাংস এবং পচামাংস খান বলে তাঁদের ওই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার উত্তরে তিনি বলেন যে, যে অস্পৃশ্যরা আদৌ মাংস খান না, তাঁদের কেন বঞ্চিত করা হয়েছে? গোমাংস

ভক্ষক মুসলিম ও খ্রিস্টানরা কেন তাদের কাছে অস্পৃশ্য হলো না? কেউ কেউ বলেন যে, ওই পুকুর সাধারণের সম্পত্তি নয়। আম্বেদকর তার উত্তরে বলেন, সাধারণের ব্যবহারের জন্য যা কিছু নির্দিষ্ট আছে এবং যা সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত, তা সবই সাধারণের সম্পত্তি, তা কোনো সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত হোক বা না হোক। অনেক লোক আছেন যাঁরা অস্পৃশ্যদের অধিকার পদদলিত করেন আবার গণতন্ত্রের নামে সরকারকে সাধারণের মত অনুযায়ী চলতে পরামর্শ দেন। আম্বেদকর ওইসব লোকদের কাছে প্রশ্ন রাখেন, তাঁদের মুখে ন্যায় ও গণতন্ত্রের বুলি শোভা পায় কি?

এক শ্রেণির হিন্দু আছেন যাঁরা দলিত শ্রেণির প্রতি ন্যায়বিচার করতে না পেরে তাঁদের ভীরুতাকে সুচতুরভাবে আড়াল করে বলেন যে, সমাজ এখনও মৌলিক পরিবর্তনের জন্য তৈরি হয়নি। আম্বেদকর তার উত্তরে বলেন যে, দেশের লোকজন এখন স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত নন, যোগ্যও নন, তবু তাঁরা কেন স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছেন? শতকরা একজন লোকও জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারেন না, তবুও তিলক তাঁদের মুক্তির কথা বলেন। আম্বেদকর একটা যুদ্ধংদেহি মনোভাবের সৃষ্টি করছেন বলে সমালোচনা হলে তিনি বলেন, ধর্মের নামে যখন সমস্ত মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছেন, অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তখন তাঁকে কী করতে হবে? তিলক যদি অস্পৃশ্যদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতেন তবে 'স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার' ধ্বনি না দিয়ে 'জাতিভেদ বিলুপ্তি আমার জন্মগত অধিকার' ধ্বনি দিতেন।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অপমান করার জন্য ও ব্রিটেনে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য তীব্র আপত্তি তোলেন। কিন্তু একই সময়ে তাঁরা স্বদেশবাসী ও স্বধর্মীয়দের একাংশের মানবিক অধিকার অস্বীকার করেন। আম্বেদকর তাদের সামঞ্জস্যহীন, স্বার্থপর ও নির্লজ্জ চরিত্র জগতের সামনে তুলে ধরে ঠাট্টা করতেন।

যাঁরা অস্পৃশ্যতা বর্জনের পক্ষপাতী, সেইসব নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের কাছে আম্বেদকর জোরালো আবেদন রাখেন যে, দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের সহানুভূতি যেন তাঁরা বাস্তবতায় রূপ দেন। দীর্ঘদিন এই প্রথা চালু আছে, সুতরাং আরও কিছুকাল চালু রাখতে হবে, এটা একটা চরম নিষ্ঠুরতা। কেবলমাত্র গুহাবাসী মানুষেরাই এই পাপকাজকে সমর্থন করতে পারে। চিন্তাশীল মানুষদের কাছে এটাই ছিল তাঁর আন্তরিক আবেদন যে, তাঁরা যেন তাঁদের মত ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

সমাজবিপ্লবী আম্বেদকর ভালোভাবেই জানতেন যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বর্ণহিন্দুদের সুবিধাবাদ, স্বার্থপরতা ও মানসিকতার উপর যতটা নির্ভরশীল, শিক্ষা ও

যুক্তিযুক্ত আবেদনের উপর ততটা নির্ভরশীল নয়। সেজন্য তিনি দলিত শ্রেণির মানুষদের এমনভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন, যাতে বর্ণহিন্দুরা বুঝতে পারেন যে, জ্বলন্ত কয়লা যেমন জিহ্বার উপর রাখা বিপজ্জনক, অস্পৃশ্যতাকে পুষে রাখাও তেমনি। বর্ণহিন্দুরা যতদিন অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে মনে না করবেন ততদিন পর্যন্ত সম্মেলনের প্রস্তাব বা সংবাদপত্রের আবেদনে কিছুই হবে না। তিনি বলেন যে, শক্তির ভারসাম্য দলিত শ্রেণির হাতেই, এজন্য তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সুবিধা অনুযায়ী শক্তির ব্যবহার করতে হবে।

আম্বেদকর বলেন, হারানো অধিকার ভিক্ষায় কিংবা সুবিধাভোগীদের কাছে আবেদন করে পাওয়া যায় না, তা অবিরাম সংগ্রামের দ্বারাই পেতে হয়। তিনি বলেন, "ছাগকেই দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়, সিংহকে নয়।"

নবনির্বাচিত আইনপরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ১৯২৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। দলিত শ্রেণির মনোনীত দুই সদস্য ডঃ সোলাঙ্কি ও আম্বেদকর ওই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৭-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি বম্বে কাউন্সিলে বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আম্বেদকর তাঁর প্রথম বক্তব্য রাখেন। ওই বক্তব্যে তিনি রাজস্ব সংগ্রহে বিশ্বাসযোগ্যতা, তুলনামূলকভাবে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, রেশন পদ্ধতি, বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সাহায্য, মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে বলেন। দলিত মূক মানুষদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ নির্ভীক ও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাঁর এই প্রথম ভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, আলোকপ্রদ ও উত্তেজনাপূর্ণ ছিল।

ওই অধিবেশনের ১০ মার্চের ভাষণে আম্বেদকর শিক্ষায় ধীরগতির কথা উল্লেখ করে বলেন, "শিক্ষা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। সরকারের শিক্ষানীতি এমন হওয়া উচিত যাতে নিপীড়িত শ্রেণির লোকদের উচ্চশিক্ষা যথাসম্ভব কম ব্যয়ে হয়।" তিনি নিপীড়িত শ্রেণির লোকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন রাখেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, "যদি সকল শ্রেণিকে একই স্তরে আনতে হয়, তাহলে বৈষম্যপূর্ণ শিক্ষানীতিই গ্রহণ করতে হবে, যাঁরা নিচে আছেন তাঁদের বেশি সুযোগ দিতে হবে।"

এরপর শিক্ষাদপ্তর সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে তিনি বলেন যে, যে ব্রাহ্মণেরা নিপীড়িত শ্রেণির মানুষদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করেন এবং তাঁদের উন্নয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত নির্দয় ও শ্রদ্ধাহীন, যাঁরা মানুষকে কুকুর-বেড়ালের চেয়েও বেশি ঘৃণা করেন, সেই ব্রাহ্মণদের উপর যদি শিক্ষার ভার দেওয়া হয় তবে সত্যিকারের কোনো উন্নতি হতে পারে না। তিনি ঘোষণা করেন, শিক্ষকগণ হচ্ছেন জাতির চালক, এই কাজে সঠিক লোক নিয়োগ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর নেই। যাঁরা নিপীড়িত

শ্রেণির ছেলেদের বলেন যে, তারা নিম্নশ্রেণির লোকÑ তাদের জন্য শিক্ষা নয়, শিক্ষা কোনো বিশেষ শ্রেণির জন্য মাত্রÑ শিক্ষার মতো এমন মহান গুরুদায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

তখন সংস্কারকদের মাথায় মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। ১৯২৭ সালে কয়েকটি সংবাদপত্রে ঘোষিত হয় যে, বম্বের ঠাকুরদুয়ারে যে মন্দির তৈরি হয়েছে শুরুতেই তার দরজা সকল হিন্দুর কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্টরা তা বিশ্বাসও করেছিলেন। সুতরাং মন্দিরের সম্পাদকের সঙ্গে ফোনে সময় ঠিক করে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে আম্বেদকর শিবতর্কারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। এক বদমায়েস লোক দেখতে পেয়ে আম্বেদকরকে মন্দির থেকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকদের উত্তেজিত করে তোলে এবং আম্বেদকর আক্রান্ত হন। তিনি দৃঢ়ভাবে ওই অবস্থার মোকাবেলা করে বলেন যে, মন্দিরের সম্পাদকের ডাকেই তাঁরা সেখানে গিয়েছেন। কিন্তু জনতা সে কথায় কান দেয়নি। অবশেষে সম্পাদক ভীত হয়ে নতি স্বীকার করেন এবং সাক্ষাৎকার বাতিল করেন। মন্দির-সম্পাদক কথা রাখলেন না। পরে আম্বেদকরের পদার্পণে মন্দির অপবিত্র হওয়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজা করে তা পবিত্র করা হয়।

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে পুনার মাগওয়াদার এক সভায় চামার সম্প্রদায়ের কয়েকজন আম্বেদকরের কাজে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করলে তিনি তা খণ্ডন করেন। নাসিক ও জলগাঁও-এ সকল অস্পৃশ্য ছাত্রদের জন্য যে হোস্টেল খোলা হয়েছে তিনি সেই কাজের বিস্তৃত বিবরণ দেন। বম্বে করপোরেশনে পি.বালুকে পদাভিসিক্ত করতে তাঁর প্রচেষ্টার কথা ও সকল শ্রেণির সঙ্গে সভায় একত্রে ভোজন করা দ্বারা এটা সত্য প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত দলিত নিপীড়িত মানুষদের জন্যই তাঁর আন্দোলন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, জাতিনির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকে আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে চামার সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করা উচিত কিনা। চামারদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কোনো ব্যক্তি যদি সমাজসেবার কাজে এগিয়ে আসেন, তবে তিনি তাঁকে তাঁর জায়গা ছেড়ে দেবেন।

এরপর তিনি অভিযোগটির অপরদিক আলোচনা করে বলেন যে, অব্রাহ্মণ শক্তি যাতে সংঘবদ্ধ হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে অব্রাহ্মণ শক্তির বিরুদ্ধে যে সব স্বার্থান্বেষীরা দলিত শ্রেণিকে ব্যবহার করতে চায়, দলিতরা যেন তাদের হাতের পুতুল না হন এ বিষয়ে সাবধান করে দেন। মুসলিমদের ভয়ে ভীত হয়ে হিন্দুসংঘের নেতারা যে এখন দলিত শ্রেণির গায়ে পড়ে ভাব করছে, আম্বেদকর তাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বম্বের জাতিতে ব্রাহ্মণ এক হোটেলওয়ালা কাপে চা না

দিয়ে কীভাবে তাঁকে গ্লাসে দিয়েছিল সেই কথা বলেন। তিনি বলেন, শুধু শিক্ষার দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ না করলে, তাঁরা কিছুই পাবেন না। তাঁদের চিন্তা, বাক্য ও কাজের দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁরা আর অপমান ও আইনানুগ অক্ষমতা সহ্য করবেন না। শেষের দিকে তিনি আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন যে, সাধারণ জলাশয় থেকে তাঁদের জোর করে জল নিতে হবে এবং জোর করেই সাধারণ ধর্মশালায়ও ঢুকতে হবে। সেটাই হচ্ছে দলিত শ্রেণির আশু কর্মসূচি।

ওই মাসের শেষের দিকে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও ভালো শিক্ষায় উন্নীত করতে আইনসভায় একটি বিল আনা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করে আম্বেদকর কলেজগুলি বিশ্বদ্যিালয় থেকে যে আলাদা অবস্থায় আছে, তা ঠিক নয় বলে প্রস্তাব রাখেন। সমস্ত প্রদেশের স্বার্থজনিত আইন প্রণয়নের দিকে দৃষ্টি রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দলিত শ্রেণির কল্যাণ সম্পর্কেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁদের প্রতি সামান্য অবিচার হলেও তিনি খড়্গহস্ত হতেন। সরকারি বিভাগে দলিত শ্রেণির যোগ্য প্রার্থীরা উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন কিনা, কেরানি পদে লোক নিয়োগের জন্য সিলেকশন বোর্ড আছে কিনা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দলিত শ্রেণির সংখ্যা কেমন, একই রকম ঘটনায় কোনো ম্যাজিস্ট্রেট দু'রকমের ব্যবস্থা নিয়েছেন নাকি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের কাছে জানতে চাইতেন।

একবার একটি ঘটনায় হোম মিনিস্টার জে.ই.বি. হটসনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বই বেঁধে যায়। আম্বেদকর জানতে চান যে, প্রদেশের মধ্যে পুলিশের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে দলিত শ্রেণির লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করতে নিষেধাজ্ঞামূলক কোনো আইন আছে কিনা। হোম মিনিস্টার জানান যে, তেমন কোনো আইন নেই। আম্বেদকর জানতে চান, তাহলে বম্বে শহরের পুলিশ কমিশনার কনস্টেবল পদের চাকরিতে দলিত শ্রেণির লোকদের কেন নিচ্ছেন না। হটসন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে জবাব দেন Ñ "বিষয়টা অত্যন্ত জটিল। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, এখানে অনেক বাস্তব সমস্যা আছে, যা সভার সমস্ত সদস্যই জানেন। সভা এসব শ্রেণির লোকদের ব্যাপকভাবে পুলিশে নিয়োগের জন্য তালিকাভুক্ত করার পক্ষেই আছে। এ ব্যাপারে আইনগত কোনো বাধা নেই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতার ঘোষণা

চৌদার পুকুরের তথাকথিত পবিত্রকরণের সংবাদে দলিত শ্রেণির মানুষদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। আম্বেদকরের অন্তরে ওই আঘাত এত নিদারুণ ভাবে বেজেছিল যে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে বলেন যে, এই অসহিষ্ণু প্রতিকার ব্যবস্থা ব্যাধির চেয়ে বেশি মারাত্মক হতে পারে। আম্বেদকর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন, দীর্ঘদিনের এই ব্যাধি কেবলমাত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা দূর করা যাবে না। এই ব্যাধির শিকড় অত্যন্ত গভীরে, এজন্য শুধু ব্যাণ্ডেজ আর সরল পরিকল্পনায় আরোগ্য করা যাবে না। ভয়ানক রোগের জন্য দরকার ভয়ানক চিকিৎসা ব্যবস্থার।

মহারাষ্ট্রের অব্রাহ্মণ নেতা জাভালকর ও জেধে এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণদের বাদ দেবার শর্তে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন, তবে সংগ্রাম হবে অহিংস। মাহাদে একটি বড়ো রকমের সম্মেলন শেষে এই সংগ্রাম আরম্ভ হবে। আম্বেদকর বলেন যে, সব ব্রাহ্মণই অস্পৃশ্যদের শত্রু এটা ঠিক নয়। যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা উঁচুনিচু জাতের ধারণা পোষণ করে এবং সুবিধাবাদী ও বৈষম্যের সমর্থক তিনি তাদের ঘৃণা করেন। কিন্তু ওইসব দোষ থেকে মুক্ত ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে অগ্রহণযোগ্য নয়।

সেই অনুসারে ১৯২৭ সালের ২৬ জুন 'বহিষ্কৃত ভারত' পত্রিকায় ঘোষণা করা হয় যে, বর্ণহিন্দুদের দ্বারা চৌদার পুকুর থেকে জলগ্রহণ করার জন্য মাহাদের পুকুরটিকে পবিত্রকরণের মাধ্যমে সমস্ত দলিত শ্রেণির গায়ে যে কলঙ্ককালিমা লেগেছে, যাঁরা তা দূর করতে চান এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের উপর শারীরিক নির্যাতনের নিন্দা করতে চান, তাঁরা যেন বম্বেতে 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'র অফিসে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। এও ঘোষণা করা হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালিত হবে।

আম্বেদকর বলেন যে, প্রশ্ন হচ্ছেÑ ধর্ম কি মানুষের জন্য, না মানুষ ধর্মের জন্য। যে ধর্ম তাঁদের রক্ষা করবে, সেই ধর্মের জন্য দলিত শ্রেণির লোকেরা প্রাণ দেবেন। কিন্তু যে ধর্ম তাঁদের সম্মান দেবে না বরং ঘৃণা করবে, সেই ধর্মকে তাঁরা গ্রাহ্য করবেন না। তিনি বলেন, "আমাদের চিরদিনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত কিনা।" তাঁর মতে, ব্রাহ্মণরা হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মূল সুর। সেই সুরে তাল-লয়ের সমন্বয় না হলে সমস্ত সমাজ বিশৃঙ্খল হবে। তিনি বলেন যে, অপরিষ্কৃতকে পরিষ্কৃত করা, পতিতকে টেনে তোলা ও অস্পৃশ্যদের

সমান সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করাই প্রকৃত কৃষ্টি।

ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালের ৪ আগস্ট মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটি ১৯২৪ সালের চৌদার পুকুর অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। আম্বেদকর বম্বের দামোদর হলে ১১ সেপ্টেম্বর ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি জনসভা ডাকেন। সেই সভায় মাহাদ পুকুরে দলিত শ্রেণির দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর চারদিন পরে আম্বেদকরের অফিসে কমিটির সভায় ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর সত্যাগ্রহ চালাবার তারিখ ঘোষণা করা হয়।

প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন যে, এই সত্যাগ্রহ পরিচালনায় গোলমাল হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনি আশা করেন যে, যাঁরা সত্যের জন্য বলপ্রয়োগ করবেন, সরকার তাঁদেরই সাহায্য করবেন। কিন্তু সরকার যদি সত্যাগ্রহ নিষিদ্ধ করেন, সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সত্যাগ্রহীদের কারাবরণ করতে হবে। যাঁরা তা উপলব্ধি করবেন, তাঁরাই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, অস্পৃশ্যতা এত বড়ো ঘৃণ্য জিনিস যে, ওই কলঙ্ক মোচনের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেও কিছু যায় আসে না। কোনো প্রকারে দিনযাপন ও কাকের মতো হাজার বছর বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। দেশের সম্মান, সত্য বা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবন মহান ও অমর হতে পারে। মানবাধিকার রক্ষার জন্য কত মহৎ জীবন কর্তব্যের বেদিতে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। কোনো কাজ না করে জড় বৃক্ষের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে মহৎ কাজে যৌবন উৎসর্গ করা অনেক ভালো।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, দলিত শ্রেণির এই কাজে যদি সরকার বাধা দেয়, তাহলে বিষয়টি জাতিসংঘে পাঠানো হবে। যদি বর্ণহিন্দুরা বাধা দেয় তাহলে এটা পরিষ্কার হবে যে, হিন্দুসমাজ পাথর-প্রাচীরের মতো এবং তা গ্রহণ করা অর্থহীন; তাহলে অস্পৃশ্যদের অন্য ধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবতে হবে।

আম্বেদকরের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রগুলি প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়। তার উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, ধর্মান্তর গ্রহণ করলে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু যেহেতু দলিত শ্রেণির লোকেরা হিন্দুসমাজে থাকতে চান, সেজন্য তাঁরা সাম্য ও নাগরিক অধিকার চান আর সেজন্যই তাঁদের সংগ্রাম। "তোমরা যদি বলো যে তোমাদের ধর্ম আমাদেরই ধর্ম তাহলে অধিকারও একই হবে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হচ্ছে? যদি তা না হয়, তাহলে কোন যুক্তিতে বলো যে তোমার লাথি-ঝাঁটা খেয়ে একই ধর্মে থাকতে হবে?" তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন, "যে ধর্ম তার দু'জন অনুগামীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা পক্ষপাতদুষ্ট। যে ধর্ম কোটি কোটি মানুষকে কুকুর ও অপরাধী অপেক্ষা বেশি ঘৃণা করে এবং অসহনীয় দুর্ভোগ ভোগ করায়, তা

ধর্ম নয়। ধর্ম কখনও সেরূপ অন্যায় নিয়মের অনুমোদন দিতে পারে না। ধর্ম ও দাসত্ব পরস্পর বিরোধী।"

ধর্ম সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন যে, ধর্ম হচ্ছে এমন কিছু যা তোমাকে এই জগতে মর্যাদা দেবে ও তারপরে আনবে মুক্তি। প্রত্যেক ধর্মের এটাই হচ্ছে মূল শর্ত। তিনি বলেন, "অস্পৃশ্যতাই অস্পৃশ্যদের উন্নতির সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এটা সমাজে স্বাধীন ভাবে চলার অধিকার দেয়নি, নির্জন কারাগারে বাস করতে বাধ্য করেছে। শিক্ষালাভে বঞ্চিত করেছে, বঞ্চিত করেছে রুচি অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পরে কে মুক্তি দেখেছে? হিন্দুশাস্ত্র অত্যন্ত ক্ষতিকর ভাবে প্রচার করেছে যে, তিন বর্ণের সেবা দ্বারাই শূদ্রের মুক্তিলাভ হবে। অস্পৃশ্যতা হচ্ছে দাসত্বের আর এক নাম। কোনো জাতি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে উন্নত হতে পারে না। সুতরাং তোমরা যদি অস্পৃশ্যদের উন্নতি চাও, তবে সমাজে স্বাধীন নাগরিকের মতো তাঁদের সাথে ব্যবহার কর, তাঁদের ভাগ্যকে তাঁদের নিজেদেরকেই গড়ে নিতে দাও।"

আম্বেদকর বলেন, "অস্পৃশ্যতা Ñ অস্পৃশ্যদেরকে, হিন্দুসমাজকে এবং সর্বোপরি জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দলিত শ্রেণির লোকেরা যদি তাঁদের আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা লাভ করেন, তাহলে শুধু তাঁদেরই শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হবে না, তাঁদের শ্রম, বুদ্ধি ও সাহস জাতির শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। বর্তমান অস্পৃশ্যতার কালিমা মুছে ফেলার জন্য যে প্রবল শক্তির প্রয়োজন, তার প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে তবে তাতে তাঁদের শিক্ষার উন্নতি এবং জাতীয় উন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নতিও এনে দেবে। নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে তাঁদের অন্য ধর্ম গ্রহণেরও প্রয়োজন হবে না। তাঁরা যে কর্তব্য সম্পাদনে সংকল্পবদ্ধ তা কেবল মানবিকই নয়, তাঁদের নিজেদের কল্যাণের জন্য শুধু নয়, তা জাতির স্বার্থেও বটে। এটা তাঁদের হিন্দুসমাজের প্রতিও একটা মস্তবড়ো অবদান।"

লোকমান্য তিলকের পুত্র শ্রীধরপন্থ এই সময়ে আম্বেদকরের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছিলেন আম্বেদকরের বন্ধু ও গুণমুগ্ধ এবং সমাজ সংস্কারে একজন উৎসাহদাতা। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'কেশরী' পত্রিকার ট্রাস্টিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি একদল অস্পৃশ্য বালক গায়কদলকে তিলকের বিখ্যাত গাইকোয়াড় ওয়াড়ে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে তিনি যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার জন্য পুনার দলিত শ্রেণি তাঁকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানান।

আম্বেদকর তখন নতুন প্রজন্মের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য তাঁর শক্তিকে

কাজে লাগান। ১৯২৭ সালের ২ অক্টোবর পুনার দলিত শ্রেণির ছাত্রদের সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এটা ছিল দলিত শ্রেণির সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে আম্বেদকরের ভাবাদর্শ ও ব্যক্তিত্বের নিকট সংস্পর্শে আনবার একটি পদক্ষেপ। যে মানুষটি তাঁদের চরম দারিদ্র ও ভয়ানক অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে মানবিক অধিকার আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শিক্ষিত লোকেরা সেই মানুষটিকে এক নজর দেখার সুযোগ পেলেন। পতাকা ও বর্ণাঢ্য বস্ত্রে অহল্যা আশ্রমকে সুসজ্জিত করা হলো। স্বেচ্ছাসেবী দল তাঁদের নেতা ও পরিত্রাতাকে 'গার্ড অব অনার' দিলেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীধরপন্থ তিলক, সোলাঙ্কি ও পি.এন. রাজভোজ। আম্বেদকর তাঁর বক্তৃতায় দলিত শ্রেণির ছেলেরা তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব কেমনভাবে পালন করবে, তার উপর জোর দেন। জীবনে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম এবং দলিত শ্রেণির উন্নতি ও ভাগ্য গড়ার কাজে অবদান রাখতে তারা বাধ্য। তিনি আশা করেন, দলিত শ্রেণির মহিলারাও তাঁদের গৃহকর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করেও একটু সময় করে সমাজসেবায় ব্যয় করবেন।

এরপর আম্বেদকর তিলকের গাইকোয়াড় ওয়াড়ে শ্রীধরপন্থের আমন্ত্রণে একটি চা-চক্রে যোগ দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এর অল্প কয়েকমাস পরেই এই সম্ভাবনাময় যুবক দুঃখজনকভাবে তাঁর জীবন শেষ করে দেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি বন্ধু আম্বেদকরকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

সেই মাসেই পুনার দলিত নেতা এস.জে. র‍্যাম্বল-এর আমন্ত্রণে কৃষিবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ডঃ হ্যারল্ড এইচ মান-এর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ডাকা সভায় আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে ডঃ মান যে নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন তার উল্লেখ করে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। ডঃ মানও তাঁর বক্তৃতায় মাহার সম্প্রদায়কে আম্বেদকরের মতো যোগ্য নেতার অধীনে কাজ করার উপদেশ দেন।

'ইউনাইটেড কিংডম'-এর লেবার পার্টির সাংসদ মিঃ মার্ডি জোন্স ভারত পরিদর্শনে এলে 'ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস্ ইন্স্টিটিউট'-এর তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দিতে ১৯২৭ সালের ৪ নভেম্বর দামোদর হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জোন্স সেখানে বলেন যে, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার সমসংখ্যক লোক এই অমানুষিক ব্যবহার পাচ্ছেন দেখে তিনি খুবই ব্যথিত। তিনি উপসংহারে বলেন যে, অস্পৃশ্য সমাজ যাঁকে উপহার দিয়েছে, সেই শক্তিধর মহামানবই এই দাসত্ব থেকে তাঁদেরকে শীঘ্রই মুক্ত করতে পারবেন।

মাহাদ সংগ্রামের প্রস্তুতির সাথে সাথেই অমরাবতী মন্দিরে প্রবেশের ব্যাপারটিও শিরোনামে উঠে আসে। বিগত তিনমাস ধরে এ সংগ্রাম ধূমায়িত হচ্ছিল এবং

মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অম্বাদেবী মন্দিরের ট্রাস্টিদের কাছে নোটিশও দেওয়া হয়। ২১ আগস্ট তাদের কাছ থেকে উত্তর আসে যে অতীতের পরম্পরা ভেঙে দলিত শ্রেণিকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য পাঞ্জাবরাও দেশমুখের মতো নেতারা, বেরারে মন্দির প্রবেশের উদ্যোক্তাগণ ও অস্পৃশ্যদের নেতা জি.এ. গাভাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য অমরাবতীতে একটি সভা ডাকেন। সভায় একটি আপসমীমাংসা হলেও শেষ পর্যন্ত তা ভেস্তে যায়। সেজন্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সংগ্রাম সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে একটি সম্মেলন ডাকার উদ্যোগ নিলেন। তদনুসারে ১৯২৭ সালের ১৩ নভেম্বর অমরাবতীর ইন্দ্রভবন থিয়েটার হলে মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের উদ্যাক্তাদের এক সম্মেলন বসে এবং সেখানে সভাপতিত্ব করার জন্য আম্বেদকর আমন্ত্রিত হন। এক বিপুল সংখ্যক জনতা সমাজের নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সভার কাজ শুরু হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার টিকাড়ে, সৌবাল উকিল, কে.বি. দেশমুখ, দেওরাও নায়েক, ডি.ভি. প্রধান ও আর.ডি. কাউলি। ডঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ প্রারম্ভিক ভাষণে ঘটনা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আম্বেদকরের নাম প্রস্তাব করেন। নানাসাহেব অমৃতকর তা সমর্থন করেন।

কোলাহলপূর্ণ তুমুল করতালির মধ্যে আম্বেদকর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে, মন্দিরের দেবতাকে যাঁরা পূজা করতে চান, কোনো বৈষম্য, বাধানিষেধ বা শর্ত ছাড়াই তাদের তা করতে দেওয়া উচিত। হিন্দুদের পৃথক কামরায় ঠেলে দেওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার হিন্দুরা সেখানকার সরকারের কীভাবে নিন্দা করেন তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, "যে জরুরি বিষয়টির উপর আমরা জোর দিতে চাই, তা হচ্ছে, মূর্তিপূজা করে আপনারা আনন্দ পাবেন তা নয়, সোজা বিষয়টি হলো কোনো অস্পৃশ্যের উপস্থিতিতে মন্দির অপবিত্র হয় না বা মূর্তির পবিত্রতাও নষ্ট হয় না। এজন্যই আমরা আলাদা মন্দির করার বিরোধিতা করি এবং বর্তমান থাকা মন্দিরেই প্রবেশের কথা জোর দিয়ে বলি।"

ওই প্রশ্নে আইনগত দিকের বিষয়ে তিনি বলেন যে, এটা সত্যি যে ওই মন্দির অস্পৃশ্যদের সহায়তায় তৈরি হয়নি; তাহলেও মন্দিরগুলি সমস্ত হিন্দুর এবং তা হিন্দুধর্মের স্বার্থের জন্যই তৈরি, এই সোজা সত্যের জন্য তার দরজা তাঁদের জন্যও খোলা থাকবে। যদিও কোনো কোনো মন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তবু তা হিন্দুদের জন্যই তৈরি। যেহেতু তাঁরা তাঁদের অস্পৃশ্য হিন্দু বলে ডাকেন সেজন্য তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করে দেবদেবীর পূজা করারও অধিকারী। তিনি সংস্কৃতির দিক লক্ষ করে সুন্দর বাচনভঙ্গিতে বলেন, "হিন্দুত্ব স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলের কাছে একই রকম। হিন্দুত্বের প্রসার ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য অস্পৃশ্য বাল্মীকি, 'ব্যাধ গীতা'র ভবিষ্যদ্‌দর্শী

চোখামেলা ও রোহিদাস, ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ, ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ, বৈশ্য হর্ষ এবং তুকারামের মতো শূদ্রেরও অবদান আছে।" "সিদনক মাহারের মতো অগণিত বীরপুরুষেরা হিন্দুদের রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন। হিন্দুত্বের নামে নির্মিত মন্দিরÑ যার শ্রীবৃদ্ধি স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকল শ্রেণির হিন্দুদের ত্যাগে অর্জিত, জাতপাত নির্বিশেষে সকলের জন্য তার দরজা উন্মুক্ত থাকা উচিত।"

তিনি আরও বলেন, যদি তাঁরা এটা ধরে নেন যে, আগে তাঁরা ব্যবহার করেননি, তাই তাঁদের এ অধিকার নেই, তাহলে অতীতে তাঁরা কোনো রাস্তায় চলাচল করেননি বলে ওই রাস্তায় চলতে পারবেন না, এমনটা ঠিক নয়। রাস্তার বেলায় যা সত্য, মন্দির ও সাধারণ জলাশয়ের বেলায়ও তাই।

পরদিন অম্বাদেবী মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান জি.এস. খাপার্দের পরামর্শে পরবর্তী কোনো এক তারিখ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। আম্বেদকরের জয়ধ্বনিতে সভা শেষ হয়। বিদায়ের পূর্বে 'মহারাষ্ট্র কেশরী'র সম্পাদক চ্যবন এবং কে.বি. দেশমুখ কর্তৃক আম্বেদকর চা-পানে আপ্যায়িত হন।

এই সভা চলাকালীন একটি টেলিগ্রাম মারফত আম্বেদকরের বড়োভাই বালাসাহেবের মৃত্যুর খবর আসে। তাঁর স্মৃতির সম্মানার্থে ১৪ নভেম্বরের সভা বন্ধ রাখা হয়। তাঁর বড়োভাই ছিলেন শক্তিমান, নির্ভীক ও দয়ালু। অসম্ভব পড়ুয়া, সুন্দর বক্তা ইত্যাদি বহু ঘটনায় তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। সেনাবিভাগের বাদক, গায়ক, বম্বে মিউনিসিপ্যালের কেরানি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি দুই স্ত্রী ও পুত্রকে হারিয়ে একটি কন্যা রেখে অবসর গ্রহণের মাত্র ছ'মাস আগে পঞ্চান্ন বছর বয়সে মারা যান। আম্বেদকরের দ্বিতীয়বার লণ্ডনে অবস্থানকালে বালাসাহেব অস্পৃশ্যদের নেতা হন। আম্বেদকর অমরাবতী থেকে ফিরে গিয়ে ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সহযাত্রীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

মাহাদে প্রস্তাবিত সম্মেলন এবং সত্যাগ্রহের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে, মাহাদও ততই উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। সংগ্রামের বিরোধীরা ১৯২৭ সালের ২৭ নভেম্বর বীরেশ্বর মন্দিরে এক সভা করে আম্বেদকর ও অস্পৃশ্যদের চৌদার পুকুর থেকে জল গ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ করতে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু দলিত শ্রেণির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে সমাপ্ত হয়। পুনার কয়েকজন হিন্দু নেতা বর্ণহিন্দুদের ওই সংগ্রামে বাধাদান করতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি।

৭ ডিসেম্বর জেলাশাসক মাহাদ পরিদর্শনে এলে দু'পক্ষের নেতারা বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করেন। তিনি বর্ণহিন্দুদের আইনের আশ্রয় গ্রহণ

করতে বলেন এবং চৌদার পুকুর থেকে অস্পৃশ্যদের জলগ্রহণ বন্ধ করতে কোনো আদেশ জারি করতে অস্বীকার করেন। সেই জন্য ১৯২৭ সালের ১২ ডিসেম্বর গোঁড়াপন্থী নেতারা আম্বেদকর, শিবতর্কার, কৃষ্ণজী এস. কদম ও গন্য মালু চম্ভার প্রমুখ দলিত শ্রেণির নেতাদের বিরুদ্ধে মাহাদের দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন করে। মামলার বিচার স্থগিত রেখে আদালত বিবাদীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেই অনুসারে আম্বেদকর, শিবতর্কার ও কৃষ্ণজী এস. কদমের উপর পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত দলিত শ্রেণির লোকেরা বা তাঁদের পক্ষে ওই তিন নেতা চৌদার পুকুরে যেতে অথবা জলগ্রহণ করতে পারবেন না বলে নোটিশ জারি হয়। গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুচতুরভাবে আম্বেদকরের উপর দু'টি লড়াই চাপিয়ে দেয়। একদিকে ছিল উদাসীন বিদেশি সরকার এবং অপরদিকে ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিচালিত বর্ণহিন্দুর দল।

সম্মেলনের জন্য কোনো হিন্দু জমিদার প্যাণ্ডেল তৈরির জায়গা না দেওয়ায় অতি কষ্টে একজন মুসলিমের কাছ থেকে জায়গা জোগাড় করা হয়। সম্মেলনের সাথে যুক্ত কোনো লোকের কাছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কোনোকিছু বেচাকেনা করতেও অস্বীকৃত হওয়ায় অভ্যর্থনা কমিটি দশদিনের মতো খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিস দূর থেকে সংগ্রহ করে আনেন। জেলার সমস্ত প্রধান সরকারি কর্মকর্তারা ১৯ ডিসেম্বর মাহাদে সমবেত হন। চৌদার পুকুরের চারপাশে পুলিশ-পাহারা রাখা হয়। ২১ ডিসেম্বর থেকে প্রতিনিধি ও দর্শকগণ স্রোতের মতো মাহাদে আসতে থাকেন। জেলাশাসক প্রতিদিন তাঁদের ক্যাম্প পরিদর্শন করে প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

২৪ ডিসেম্বর সকালে আম্বেদকর দু'শো প্রতিনিধি ও নেতাসহ বম্বে ত্যাগ করেন। পরদিন মাহাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরে দাসগাঁও স্টেশনে দুপুরে তিনি অবতরণ করেন। সেখানে উদ্বিগ্ন মুখে হাজারতিনেক সত্যাগ্রহী তাঁদের নেতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নেতাকে দেখে তাঁরা গভীর আনন্দে তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

সংবর্ধনার পর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জেলাশাসকের একখানি চিঠি আম্বেদকরকে দিয়ে অবিলম্বে জেলাশাসকের মাহাদ অফিসে তাঁর সাথে দেখা করতে অনুরোধ করেন। আম্বেদকর সহকর্মী সহস্রবুদ্ধকে নিয়ে তাঁর অফিসে যান। জেলাশাসক সংগ্রাম স্থগিত রাখতে উপদেশ দিয়ে যুক্তি ও চাপের সৃষ্টি করলেন। তবে সভায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে সুযোগ দিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিনিধিদের শোভাযাত্রা পুলিশ অফিসার পরিবেষ্টিত হয়ে দাসগাঁও স্টেশন থেকে গগনভেদী ধ্বনিসহযোগে বিকেল আড়াইটেয় মাহাদে গিয়ে পৌঁছায়। বিশাল জনতা 'শিবাজী মহারাজকি জয়' ধ্বনি দিয়ে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে।

জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করার পর আম্বেদকর সত্বর প্যাণ্ডেলে গিয়ে তাঁর জন্য

ব্যবস্থা করা বিশেষ খাবার খেতে অস্বীকার করে সাধারণ অনুগামীদের সঙ্গে একত্রে বসে খাবার খান।

সাড়ে চারটেয় সভার কাজ আরম্ভ হয়। তখন পনেরো হাজার লোকের কানফাটানো জয়ধ্বনি, চিৎকারের মধ্যে নেতা সেই সম্মেলনকে সম্বোধন করতে উঠে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনতাও শান্ত হয়। সেই জনতার অধিকাংশের পিঠে কোনো বস্ত্র নেই, মাথায় পুরোনো ছেঁড়া পাগড়ি, না কামানো দাড়ি, কিন্তু তাঁদের রোদেপোড়া মুখে আশা ও উৎসাহের অন্ত নেই। আম্বেদকর গম্ভীর ও তেজস্বী ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। যারা বাধা দেয়, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "এতকাল চৌদার পুকুরের জল খাইনি বলে আমরা মরে যাইনি। আমরাও মানুষ তা প্রমাণ করার জন্যই চৌদার পুকুরে যেতে চাই।"

তিনি তাঁর বক্তৃতায় ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, রাজনীতির শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা ও পরিচালনা করা। শুধুমাত্র অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি বা একত্রে ভোজনের দ্বারাই এ পাপের সমাপ্তি ঘটবে না। সকল বিভাগের চাকরি, যেমনÑ আদালত, সেনাবিভাগ, পুলিশ, ব্যাবসাÑ সকল দরজা অস্পৃশ্যদের জন্য খুলতে হবে। সবশেষে বলেন, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠন করতে হবে।

মানবাধিকার ঘোষণা দ্বারা প্রথম প্রস্তাব পাশ হয়। এই সম্মেলন ঘোষণা করে যে, অন্যায়ের প্রাধান্য, ধর্মীয় চেতনাহীনতা, রাজনৈতিক অনগ্রসরতা ও অর্থনৈতিক অপ্রাচুর্যই এই ভারতের শোচনীয় দুর্দশার কারণ। এর প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে, 'জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল মানুষ সমান'Ñ এই নীতি ঘোষণা করা। এই সম্মেলন সকল পুরোনো ও আধুনিক হিন্দুশাস্ত্রের কর্তৃত্ব বর্জন করে এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থারও সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। এই প্রস্তাব শিবতর্কার উত্থাপন করেন এবং ভাইরাও গাইকোয়াড়, এন.টি. যাধব ও মিসেস গঙ্গুবাঈ সাভাণ্ট সমর্থন করেন।

এরপর হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলতার উপর প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। সম্মেলন ঘোষণা করে যে, মনুস্মৃতির নির্দেশে আছে শূদ্র বেদ শুনলে বা পাঠ করলে তাঁর কানে গলন্ত সীসা ঢেলে দিতে হবে। যে শ্রুতি শূদ্রকে নিন্দা করে তাঁদের আত্মসম্মান নষ্ট করেছে, তাঁদের আর্থিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দাসত্বকে চিরস্থায়ী করেছে, তা প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে। এই প্রস্তাবের উপর সহস্রবুদ্ধ, রাজভোজ ও থোরাট জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। বর্ণহিন্দুর কাছে অগাধ শ্রদ্ধার এবং দলিত শ্রেণির কাছে চরম ঘৃণ্য মনুস্মৃতির তীব্র নিন্দা করা হয়। মনুস্মৃতিই হিন্দুদের আইন এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেড় হাজার বছর আগে সংকলিত ওই অন্যায় নিয়মবিধি কালের পরিবর্তনে বাস্তবে অচল হলেও গোঁড়াদের কাছে আজও তা অতি সৎ, সর্বব্যাপ্ত ও সর্বজ্ঞ।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজও যারা অব্রাহ্মণ ও অতিশূদ্রদের উপর ওইসব নিয়মবিধির প্রয়োগ করে, তারা নিজেরাই আবার তা লঙ্ঘন করেও তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। মনুস্মৃতি অনুসারে রাসায়নিক দ্রব্য, তরল পদার্থ, রঙিন বস্ত্র, ফুল, গন্ধদ্রব্য ও অস্ত্রের ব্যাবসা ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ। তথাপি বস্ত্রব্যবসায়ী, ঔষধ বিক্রেতা, দুগ্ধব্যবসায়ী, হোটেল পরিচালক, গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী এবং ছুরি-কাঁচি দ্রব্যের ব্যবসায়ী কোনো ব্রাহ্মণই তার সামাজিক মর্যাদা হারায় না। এমনকি বস্ত্র-কারখানার মালিক তিলকও অব্রাহ্মণদের বেদ পাঠ করা ও বৈদিকমতে পূজাপার্বণাদি করাকে সমর্থন করেন না।

মনুস্মৃতি পোড়ানোর প্রস্তাবক সহস্রবুদ্ধ তথাকথিত হিন্দুর পবিত্র শাস্ত্রকে বৈষম্য, নিষ্ঠুর ও অন্যায়ের প্রতীক বলে জোরালো ভাষায় নিন্দা করেন। অন্যান্য বক্তারাও মনুস্মৃতির আদেশ-নির্দেশাদির প্রবল নিন্দা করেন। এরপর রাত ন'টায় প্যাণ্ডেলের সামনে বিশেষ একটি গর্তে সাজানো চিতার উপর অস্পৃশ্য সন্তদের হাত দিয়ে মনুস্মৃতি পোড়ানো হয়।

এমন এক বিস্ফোরক ঘটনা ভারতের সমস্ত বাক্যবাগীশ, পণ্ডিত, আচার্য ও শঙ্করাচার্যদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। ব্রাহ্মণ্যবাদের কড়া বিরোধী ভাস্কররাও যাধব পর্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, হিন্দুশাস্ত্রের উপর এ এক বৈদেশিক আক্রমণ, হিন্দুশাস্ত্রে খারাপের চেয়ে ভালোটাই বেশি।

সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের অন্যতম আম্বেদকর, জরাজীর্ণ মন্দির থেকে মিথ্যা দেবতাদের এভাবেই হাতুড়ি মেরে বিদায় করে দিচ্ছিলেন। আত্ম-অহঙ্কারী, গোঁড়ামিপূর্ণ প্রথার কারবারি ও পরিবর্তনে অনিচ্ছুকদের প্রতি এই ধর্মদ্রোহিতার আঘাত মার্টিন লুথারের পরে এক বিরাট ঘটনা। ভারতের বর্ষপঞ্জিতে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর একটি বিশেষ দিন, কারণ এইদিন আম্বেদকর পুরোনো স্মৃতি (মনুস্মৃতি) আগুনে পুড়িয়ে এই বিশাল মানবসমাজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে নতুন আকারে হিন্দু-সংহিতা গড়ার দাবি জানিয়েছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাবে ছিল হিন্দুসমাজে মাত্র একটি শ্রেণিই থাকবে। চতুর্থ প্রস্তাবে বর্তমানের পৌরোহিত্য পেশা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হবে এবং কেউ চাইলে তাঁকে পুরোহিত হবার সুযোগ দিতে হবে।

পরদিন সম্মেলন আরম্ভ হলে আম্বেদকর প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি প্রতিনিধিদের মনের উপর রোখাপাত করতে ওই কাজের মহত্ত্ব সম্পর্কে বলেন। কাউকে লাঠি ব্যবহার না করতে এবং কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকে কারাবরণ করতে হবে এবং এজন্য তিনি কোনো কারণ দর্শাবেন না বা মুক্তির চেষ্টা করবেন না। সবাইকে অধিকার ও সম্মান লাভের জন্য প্রস্তুত দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে এই সংগ্রামে

সকলের সম্মতি ও কষ্টস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকাও প্রয়োজন মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া কোনো মূল্যবান বস্তু লাভ করা যায় না। সত্যাগ্রহের পক্ষে বারোজন নেতা মতপ্রকাশ করলেও চারজন এর বিরোধিতা করেন।

সবশেষে তিনি বলেন, অল্পসংখ্যক লোক বিরুদ্ধ মত জানালেও অধিকাংশই সত্যাগ্রহের পক্ষে। তারপর তিনি বলেন, "আমি বলছি বলেই আগুনে ঝাঁপ দেবেন না। যদি আপনারা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন যে, আপনাদের কাজ ন্যায়সঙ্গত, তবেই তা করবেন। আমরা সেই মানুষ চাই যাঁরা অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারেন।"

দুপুরবেলা মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত অব্রাহ্মণ নেতা জেধে ও জাভালকার, বম্বে থেকে মাহাদে এসে প্যাণ্ডেলে পৌঁছান। তাঁরা দলিত শ্রেণির ওই ন্যায়সঙ্গত দাবি সমর্থন করে বিদ্বান ও যোগ্য নেতা আম্বেদকরের নেতৃত্বে সকলকে সংগ্রাম করতে বলেন; তিনি নিশ্চয়ই তাঁদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সফল হবেন।

ইতিমধ্যে কুড়িজন কর্মীকে সত্যাগ্রহে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়। একঘণ্টার মধ্যে চার হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি সংগ্রামের জন্য তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। অনেকে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য চিৎকার করে বলছিলেন যে, পুকুর দখল না করে কিংবা কারাবরণ না করে তাঁরা গ্রামে মুখ দেখাবেন না।

জেলাশাসককে সম্মেলনের মনোভাব জানানো হলে তিনি সভায় বক্তৃতা করে বলেন, "বম্বে আইনপরিষদের প্রস্তাব অনুসারে সাধারণের পুকুর, স্কুল, রাস্তাÑ সবকিছুরই দরজা সকলের জন্য খোলা। কিন্তু বারোজন ব্যক্তি একটি মামলা দায়ের করে বলেছেন যে, পুকুরটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেজন্য কোর্টের রায় না বেরোনো পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা করা উচিত। আপনারা জানেন যারা আগে আপনাদের আক্রমণ করেছিল, তাদের শাস্তি হয়েছে। আইন ভঙ্গ করলে আপনাদেরও শাস্তি হবে। তাই কোর্টের রায় না বেরোনো পর্যন্ত আপনাদের এই ব্যাপারে বিরত থাকতে বন্ধুভাবে প্রস্তাব দিচ্ছি।"

জাভালকর মারাঠাদের সত্যাগ্রহ সমর্থনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ও তা স্থগিত রাখার আবেদন জানান। সুবেদার ঘাটজীও একই কথা বলেন। জেলাশাসককে তখন আম্বেদকর প্যাণ্ডেলের বাইরে নিয়ে যান। কিন্তু সন্ধে সাতটা পর্যন্ত বক্তার পর বক্তা সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে যাঁরা বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তাঁদের তিরস্কার করে যাচ্ছিলেন। আম্বেদকর পরদিন সকালে আলোচনার জন্য সভা স্থগিত রাখেন।

প্রধান নেতৃবৃন্দ রাতের বেলা এক একান্ত আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেন যে, আদালতের মামলার দৃষ্টান্তে সত্যাগ্রহ স্থগিত থাকুক, পরিবর্তে শোভাযাত্রা সহকারে পুকুরের চারপাশ পরিক্রমা করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত জেলাশাসককে জানিয়ে দেওয়া হয়। ২৭ ডিসেম্বর আম্বেদকর দাঁড়িয়ে সত্যাগ্রহের প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাহার করে সত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে অন্য প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। অশান্ত এবং উত্তেজিত প্রতিনিধিদের প্রতি আবেদনের সুরে তিনি বলেন, "আপনারা সাহসী জনসাধারণ। যাঁরা অধিকার আদায়ের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তাঁরা নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আঘাত করবার আগে দু'বার আপনাদের ভাবতে হবে। আপনারা জানেন যে, গান্ধি পরিচালিত সত্যাগ্রহ বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হওয়ায় তাঁর পিছনে জনসমর্থন ছিল। আমাদের সত্যাগ্রহ বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে হওয়ায় বাইরের সমর্থন নেই। এই ব্যাপারটা চিন্তা করে আমি মনে করি সরকারকে অসন্তুষ্ট করে আমাদের বিরুদ্ধ দলে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। তাতে আমাদের উপকার হবে না।

"সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে হীনম্মন্যতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে করা ঠিক হবে না। আমার সম্পর্কে বলতে পারি যে, আমি তিন প্রকারে বিপদের সম্মুখীন হতে পারি Ñ আদেশ ভঙ্গ করা, আইনব্যবসায়ীর নিয়ম ভঙ্গকারী রূপে আইনে সোপর্দ হওয়া ও কারাবরণ করা।" তিনি শান্তস্বরে বলেন, "ভাইসব, আপনারা নিশ্চিত হোন যে, সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার অর্থ এই নয় যে, আমরা সংগ্রাম ত্যাগ করছি। ওই পুকুরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলতে থাকবে।"

প্রতিনিধিদের মনে নৈরাশ্যের ঢেউ বয়ে গেল। কারও বা এই পিছিয়ে যাওয়াতে ক্রোধের সঞ্চার হলো। তবু নেতার কথায় সাড়া দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো পথ ছিল না। তাঁরা শোভাযাত্রা করতে প্রস্তুত হলেন। বম্বের স্বেচ্ছাসেবকেরা আগে আগে চললেন। মাঝে মাঝে জয়ধ্বনিসহ প্লাকার্ড হাতে ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা পুকুরের কাছে পৌঁছে ঘুরে এলো। বর্ণহিন্দুরা তখন ঘরের দরজা বন্ধ করেই ছিল। গোঁড়া হিন্দুরা অন্তরে বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছিল। দেড়ঘণ্টা পরে শোভাযাত্রাটি কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়ে দুপুরের সময় প্যাণ্ডেলে ফিরে এলো।

সন্ধ্যায় আম্বেদকর মাহাদের চামার সম্প্রদায়ের বাসস্থানে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁদের কাছে জানতে চান যে, তাঁরা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চান, না সোনার খাঁচায় পোষা প্রাণীর মতো থাকতে চান। চামারেরা জুতা ও স্যাণ্ডেলের ব্যবসায়ী। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও তাঁরা বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে থাকেন। তাঁরা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। প্রতি পঞ্চাশজন মাহারের মধ্যে মহারাষ্ট্রে মাত্র একজন চামার।

রাত দশটায় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিনিধি ও সহানুভূতিকারকদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলন শেষ হয়। এর অল্পক্ষণ

পরেই আম্বেদকর প্রায় তিন হাজার মহিলাদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। এরূপ সভা আধুনিক ভারতে সেই প্রথম। আম্বেদকর তাঁদের সরল ভাষায় বলেন, "নিজেদের কখনও অস্পৃশ্য ভাববেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করবেন। স্পৃশ্য মহিলাদের মতো সুন্দর পোশাক পরবেন। পোশাক তালি দেওয়া হোক, তা যেন পরিষ্কার হয়। আপনাদের পোশাক-পরিচ্ছদের স্বাধীনতায় কেউ বাধা দিতে পারে না এবং ধাতুর অলঙ্কারেও তাই। মনের চর্চায় ও আত্মনির্ভরতায় মন দেবেন। স্বামী বা ছেলে মাতাল হলে তাঁদের খেতে দেবেন না। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন। পুরুষ-নারী সকলের পক্ষেই শিক্ষা সমান প্রয়োজন। কী করে লিখতে পড়তে হয় তা যদি জানতে পারেন তাহলে অনেক উন্নতি হবে। আপনারা যেমন হবেন সন্তানাদিও তেমন হবে। সৎভাবে তাদের জীবন গঠন করুন, ছেলেরা যেন পৃথিবীতে একটি দাগ রাখতে পারে।" সকলে বিস্ময় দৃষ্টিতে দেখেন যে, মহিলাদের আশ্চর্যজনক পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের মুকুটহীন রাজা ও নেতার নির্দেশে তাঁদের শাড়ির রীতি বদলে গেছে।

এইভাবে মাহাদ আন্দোলন শেষ হয়, সেইসঙ্গে ভারতের একটি যুগেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। আম্বেদকর ঘোষিত মানব অধিকারের সাম্যের ঘোষণার পরে ওই একই সপ্তাহে মাদ্রাজের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষিত হয় ভারতবাসীর লক্ষ্যÑ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতা প্রথম ঘোষণা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দ্বিতীয় ঘোষণা।

মাহাদের সংগ্রামে অস্পৃশ্যদের উপরে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সরকারের উপরও প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে এবং গোঁড়া হিন্দুদের উপর এক রূঢ় আঘাত হানে। দলিত শ্রেণির জাগরণ এবং আত্মবিশ্বাস এত প্রবল হয় যে, তা আর দমিয়ে রাখার সম্ভাবনা থাকল না। সভায় যোগদানকারী বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ এটা উপলব্ধি করলেন যে, তাঁদের প্রতি এতদিন যে অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, তার বাধা দিতে তাঁরা সক্ষম। তাঁরা বুঝলেন যে, তাঁরা একা ননÑ অন্যান্য জেলা থেকেও তাঁদের ভাইয়েরা বিপদের সময় ডাক দিলে সাড়া দেবেন। সরকারও উপলব্ধি করে যে, ওই সমস্ত লোকদেরও গুরুত্ব আছে, সুতরাং তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতিও সরকার আরও বেশি করে দৃষ্টি দিতে শুরু করে।

কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে আম্বেদকরের নামযশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দলিত সমাজে তাঁর নেতৃত্ব তখন অনস্বীকার্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর জাগতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায় ও দলিত শ্রেণির মানসপটে আম্বেদকর জাদুকরীয় প্রভাব ফেলে। মাহাদই প্রমাণ করে যে, আম্বেদকর যেমন একজন রাজনীতিবিদ, তেমনি একজন পণ্ডিত অধ্যবসায়ী

ও কর্মীও। তাঁর মধ্যে জীবন ও সাহিত্য সুন্দরভাবে মিশে আছে।

মনুস্মৃতি পোড়ানো সম্পর্কে আম্বেদকর নিজেই বলেছিলেন যে, শুধুমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়ে তা করা হয়নি। মনুস্মৃতি সত্যি বর্ণহিন্দুদের অধিকারের সনদ স্বরূপ বটে, কিন্তু তা অস্পৃশ্যদের দাসত্বের ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ। ১৯৩৮ সালে সাংবাদিক টি.ভি. পার্বতীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "মনুস্মৃতি পোড়ানো ছিল ইচ্ছাকৃত। তা ছিল অত্যন্ত সাবধানী, শক্তিশালী ও বর্ণহিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী পদক্ষেপ। মাঝে মাঝে ওইরূপ তীব্র পদ্ধতির দরকার। দরজায় আঘাত না দিলে কেউ দরজা খোলে না। অবশ্য এটা ঠিক নয় যে, মনুস্মৃতির সবটুকুই খারাপ, তাতে কোনো ভালো জিনিস নেই বা মনু নিজে একজন সমাজতত্ত্ববিদ ছিলেন না। আমরা তা পুড়িয়েছি এই কারণে যে, ওই গ্রন্থ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের পিষে মারছে। ওই গ্রন্থের কুশিক্ষা গ্রহণের ফলেই আমরা জঘন্য দারিদ্রের কবলে জর্জরিত। সেজন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জীবনকে তুচ্ছ করে ওটাকেই আঘাত করেছি।"

এই ঘটনা ১৯০৬ সালে বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সাভারকারের বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর সঙ্গে তুলনীয়। আম্বেদকরের উদ্দেশ্যও ঘৃণা ও দাসত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা। মনুস্মৃতির মধ্যে সামাজিক অন্যায় বিধান আছে বলেই তিনি ওই গ্রন্থ আক্রমণ করেন। দু'জন মহারাষ্ট্রীয় শক্তিশালী যুক্তিবাদী মানুষের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি এই বিদ্বেষ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সাভারকর এবং আম্বেদকর উভয়েই ছিলেন সমাজবিপ্লবী, যুক্তিবাদী ও পুরোনোকে ভেঙে নতুন করে গড়ার পক্ষপাতী। কিন্তু প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে দু'জনের সামান্য মতভেদ ছিল।

মনুস্মৃতি পোড়ানোয় সকল হিন্দু সংস্কারকদের মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। সাভারকারের গোরু সম্পর্কিত রচনায় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি তীব্র আক্রমণ এবং জাতীয় স্বার্থে গোমাংস খাওয়ার উপদেশে সমাজসংস্কারকেরা ভীত হয়ে ওঠেন। মনুস্মৃতি পোড়ানো ও গোমাংস খাওয়ার উপদেশ প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া ও পরম্পরাগত বিধির অনুগামীদের কাছে ভয়ানক বৈদেশিক আক্রমণাত্মক মনে হলো। আম্বেদকরের শাস্ত্র আক্রমণ থেকে সাভারকারের আক্রমণ ছিল আলাদা। সাভারকার তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থাদি যুক্তি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করে জাতির জন্য কল্যাণকর রীতি পালন করতে এবং যা কিছু জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও ঐক্যের বাধা সৃষ্টি করে, তা পরিহার করতে বলতেন। সাভারকার দলিত হিন্দু ও হিন্দু নারীজাতির প্রতি মনুর বিধান আরোপ করতে রাজি ছিলেন না।

কিন্তু নির্যাতিত সমাজের প্রতীক আম্বেদকর, যিনি সারাজীবন নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি প্রচণ্ড শক্তিতে শাস্ত্রগ্রন্থাদি চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন। পক্ষান্তরে যে সাভারকার এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরা জাতিভেদ প্রথায় বিন্দুমাত্র নির্যাতিত হননি, তিনি জরাজীর্ণ

শাস্ত্রগ্রন্থাদিকে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থাদি হিসাবে ঘরের কোণে রেখে দিতেন। যদি তাঁরা পরস্পর বিপরীত সমাজে জন্মাতেন, তাহলে সেই শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি আম্বেদকরের যে আচরণ, সাভারকারও সেই আচরণই করতেন।

মাহাদ প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয়নি। সম্মেলন শেষে আম্বেদকর তাঁর দলবল নিয়ে কাছাকাছি একটি জায়গায় খনন কার্য দেখতে যান। জায়গাটি বুদ্ধের সমসাময়িক বলে গণ্য করা হয়। সেখানকার দৃশ্য দেখে আম্বেদকর অভিভূত হয়ে তাঁর লোকদের বলেন, বুদ্ধের শিষ্যেরা চিরকুমার থেকে কীভাবে নিঃস্বার্থ সমাজসেবা করে গেছেন।

দলটি এরপর ভারতের পবিত্র স্থানগুলি দেখার জন্য যাত্রা করেন। যে শিবাজী ছিলেন বর্তমানকালের হিন্দুদের ত্রাণকর্তা, স্বাধীনতার প্রতীক, আত্মসম্মানবোধের উৎস এবং অমর প্রেরণার ঝরনাধারা, এটা ছিল সেই মহান শিবাজীর রাজধানী-দুর্গ। আম্বেদকর যখন ওই জায়গায় যাচ্ছিলেন, তখন সেখানকার পরিস্থিতি ভালো ছিল না। শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সেখানে বিরোধিতার আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল। যারা মাহাদ সংগ্রামে বাধা দিতে পারেনি, তারা তিক্ততার জ্বালায় জ্বলছিল। কানাকানি হচ্ছিল যে দলিত শ্রেণির নেতাকে আক্রমণ করার জন্য বর্ণহিন্দুরা ঝোপের মধ্যে ওৎ পেতে আছে। নেতার প্রতি আক্রমণ হতে পারে এই সন্দেহে দলিত শ্রেণির লোকেরা গ্রামে খবর পাঠান। অস্পৃশ্যরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাত্রে দুর্গে এসে সমবেত হন। রাত্রিতে আম্বেদকর ও তাঁর দলবল পথিমধ্যে নাটে পল্লিতে অবস্থান করেন।

পরদিন সকালে তাঁরা রায়গড় দুর্গে আরোহণ করেন। যে জায়গাটি এক সময় হিন্দুস্থানের কর্মচঞ্চল প্রাণকেন্দ্র ছিল, সে স্থানটি দেখে আম্বেদকর বিচলিত হলেন। ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত, ধ্বংসাবশেষ, বিরাট প্রবেশদ্বারগুলি ফাঁকা, ঐশ্বর্যযুক্ত প্রাসাদের স্তম্ভগুলি বিচ্ছিন্ন, ইতিহাসের অদৃশ্য ছবিগুলি অতীতের জ্বলন্ত ইতিহাস হয়ে দর্শকদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রাত্রে দলের লোকেরা দুর্গের মধ্যে কাটান। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে তারা শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাত্রিতে কে একজন সেই জড়াজীর্ণ দুর্গের একটি কক্ষে গভীর নিদ্রাভিভূত দলের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। মৃদু শব্দও শোনা যায়। সমস্ত দর্শকেরা ভয়ে বিমর্ষ ও পাথর হয়ে যান। নিচের লোকগুলি ফিসফিস করে বলে যে, তারা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু দলটি জানেনি তারা কারা। রাত্রিশেষে সকাল হলো। দেখা গেল লোকগুলি তাদের রক্ষাকারী। তাদের ভক্তি অসীম। তাদের সাবধানতা সময়োচিত হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত তাদের নেতা ও দলের কোনো ক্ষতি হয়নি। নিরাপত্তায় এত আনন্দ হয়েছিল যে, অস্পৃশ্য রমণীরা তাদের নেতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ আনুগত্য নিবেদন করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

চৌদার পুকুরের দাবির ঘটনার বিষয় নিয়ে আম্বেদকর নিম্ন আদালতে এই মোকদ্দমায় প্রায় তিন বছর লড়াই চালিয়ে যান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভোরের তারকা

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে নাসিকের কাছে হিন্দুদের তীর্থস্থান ত্র্যম্বকে সন্ত চোকামেলার নামে একটি মন্দির তৈরির জন্য দলিত শ্রেণির লোকদের একটি সভা ডাকা হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আম্বেদকর বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। আলোচনা শেষে সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মন্দির তৈরির চেয়ে অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজে প্রবল শক্তি নিয়োগ করাটাই হবে সেই সন্তের প্রতি বিশেষ স্মৃতিরক্ষার কাজ। প্রথমত আম্বেদকর আলাদা মন্দির করার বিরোধী, দ্বিতীয়ত মন্দির তৈরি একটা বিশাল খরচের বোঝা, তৃতীয়ত আম্বেদকর মূর্তি উপাসকের চেয়ে বেশি উপযোগিতাবাদী।

আম্বেদকরের দৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রের ভাগবদ্ধর্মের সাধুসন্তগণ (১৩০০ - ১৬০০) কখনও জাতিভেদ প্রথা বা সামাজিক বৈষম্য ও একশ্রেণির উপর আর এক শ্রেণির যে অন্যায় আধিপত্য বিস্তার, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রচার চালাননি। ওই সন্ত সাধকেরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেননি। তাঁদের চেষ্টা ছিল ব্রাহ্মণ শূদ্র একই ঈশ্বরের ভক্ত হোক। এই কাজে সফলতা পাওয়ায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল ভক্তদের উপর ব্রাহ্মণের আধিপত্য আরও জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতিভেদ বিলুপ্তি প্রসঙ্গে আম্বেদকর বলেন যে, সন্তদের সংগ্রামে সমাজের উপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। মানুষের জীবনের মূল্য স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রকাশিত Ñ ভক্তি হলেই তা পাওয়া যায় না। সাধুসন্তগণ তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো লড়াই করেননি। উপরন্তু তাঁদের লড়াই দলিত শ্রেণির উপর অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের চুপ করিয়ে দেবার সুযোগ পায়। তারা বলতে থাকে সন্ত চোখামেলার মতো উন্নতি করতে পারলে শূদ্ররাও সম্মান পাবে। আম্বেদকর বলেন, ভক্তিবাদের অনুগামী সাধুসন্তগণ জাতপাতের সংস্কারে আবদ্ধ থাকায় ন্যায়, মানবতা ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় যে শুধু অন্ধই ছিলেন তাই নয়, তাঁরা অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনাকে আরও অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে গিয়েছেন।

রামদাসের ধর্মমত সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ওই ধর্ম প্রবর্তনের শুরু থেকেই তাঁর অনুগামীরা জাতিভেদ প্রথার কুসংস্কারের জন্য কুখ্যাত ছিলেন এবং তার প্রবর্তক নিজেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃতির ভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। রামদাসের মতে একজন পতিত ব্রাহ্মণও স্বর্গ-মর্ত্যে অন্য বর্ণের লোকদের থেকে শ্রেষ্ঠ, এমনকি দেবতারাও ব্রাহ্মণকে অভিবাদন জানায়।

এই সময়ে আমেরিকান মহিলা মিস. মিলারের সঙ্গে টুকোজিরাও হোলকারের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মহারাষ্ট্রে প্রগতিশীল ও গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক বাধে। মহারাজা যে ধাঙর সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের মধ্যেও এ সম্পর্কে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে মীমাংসার জন্য ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে বারামতীতে একটি সভা হয়। ওই সভায় আম্বেদকর এবং বোলে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রগতিশীলদের সঙ্গে ওই দুই নেতাও মহারাজার বিবাহ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন।

সেই রাতেই বারামতীর দলিত শ্রেণির লোকেরা বোলের সভাপতিত্বে আম্বেদকরকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁরা তাদের নেতার অজস্র প্রশংসা করে অস্পৃশ্যদের মধ্যে এম.কে. যাধব প্রথম ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। এটা যোগ্য ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে উচ্চপদে নিযুক্ত করার জন্য আম্বেদকরের অবিরাম দাবিরই ফল। ওই উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ গভর্ণর সার লেসলি উইলসনের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধও হয়। গভর্ণর তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে একজন সরকার নির্বাচিত সভ্যের পক্ষে ওইরূপ সমালোচনা করা আশ্চর্যের এবং নিয়মবিরুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেন। আম্বেদকর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, সভায় তার কাছে যা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে, তাই তিনি বলেছেন। নির্ভীকতার সঙ্গে তিনি বলেন যে, উইলসন সরকার দলিত শ্রেণির উন্নতির জন্য কিছুই করেনি, সেজন্যই ওই শ্রেণির যোগ্য সক্ষম ব্যক্তিরা উচ্চপদে নিযুক্ত হতে পারেননি। আম্বেদকর যাদবের ঘটনা তুলে ধরেন। তাতে সরকারের মনে রেখাপাত করায় দলিত শ্রেণির প্রার্থীদের কর্মে নিযুক্ত করার জন্য সরকারের মতের পরিবর্তন ঘটে। দরজায় আঘাত না করলে কেউ দরজা খুলে দেয় না।

আইনপরিষদে গরিবদের অবস্থা উন্নয়নের সংগ্রামের কোনো সুযোগ আম্বেদকর নষ্ট হতে দিতেন না। নারী-শ্রমিকদের 'মাতৃত্বকালীন বেনিফিট বিল' উত্থাপনকালে বিলের সমর্থনে তিনি অত্যন্ত তেজস্বীতার সঙ্গে বলেনÑ "আমি মনে করি যে, জাতির স্বার্থেই মাতৃত্বের সময়ে ও পরে তাঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন এবং এই বিল ওই উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।" যদিও আম্বেদকর এই মত পোষণ করতেন যে, এই খরচ সরকারেরই বহন করা উচিত, তথাপি তিনি বলেন যে, মহিলাদের স্বল্পবেতন অথচ অতিরিক্ত মুনাফার জন্য মেয়েদের যারা কাজে নিয়োগ করে তাদের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া মোটেই অন্যায় নয়।

কিন্তু যে বিলটির উপর তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, সেই বিলটি স্বয়ং আম্বেদকর উত্থাপন করেছিলেন। সেটি ছিল 'বম্বে হেরেডিটারি অফিসেস অ্যাক্ট, ১৮৭৪'-এর সংশোধনী বিল। ১৯২৮ সালের ১৯ মার্চ তিনি এটি পেশ করেন।

এই 'হেরেডিটারি অফিসেস অ্যাক্ট' অনুসারে কোনো মাহার কর্মচারীকে সারা দিনরাত দাসত্ব করতে হত। কোনো মাহার চাকরের অনুপস্থিতিতে তার পিতা বা

পরিবারের অন্য কাউকে ওই সরকারি কাজ করার জন্য বাধ্য করা হত। এই কঠোর, দুঃসাধ্য ও বিরামহীন কাজের জন্য তাঁরা বাটান (Watan) নামে একখণ্ড জমি পেতেন এবং গ্রাম থেকে কিছু শস্য ও জীবিকার জন্য দু'আনা থেকে দেড়টাকা পর্যন্ত মাসোহারা পেতেন। ফলে অলসতা হেতু তাঁদের জীবনের উদ্দীপনা নষ্ট হত, তাঁরা আত্মসম্মান হারাতেন এবং তাঁদের লক্ষ্য এবং কর্মক্ষমতা ওই তুচ্ছ কাজে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ত। এই ভূমিদাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য আম্বেদকর এই বিল উত্থাপন করেন।

এই বিল উত্থাপনের আগে আম্বেদকর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে বিলের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিচয় করিয়ে দেন। স্বার্থান্বেষীমহল দ্বারা অজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিল সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি ও সন্দেহ দূর করার জন্য আগের বছর তালুক ও জেলাশহরগুলিতে অনেকগুলি সভাসমাবেশও করা হয়েছিল।

১৯২৭ সালের ৫ নভেম্বর রাও বাহাদুর এস. কে. বোলের সভাপতিত্বে বম্বের কামাথিপুরে পাঁচ হাজার মাহার বাটানদারদের এক বিরাট সভা হয়। ১৯২৭ সালের ১৩ নভেম্বর নাসিক জেলার বাটানদারদেরও এক সম্মেলন হয়। তিন হাজার মাহার বাটানদারদের অন্য এক বিরাট সভা জলগাঁও-এ হয়েছিল, সেখানে আম্বেদকর বিলের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

বিলটি আইনপরিষদে উত্থাপন করার আগে এভাবেই তিনি প্রবল আন্দোলন করেছিলেন। ১৯২৮ সালের ৩ আগস্ট আম্বেদকর বলেছিলেন যে, অতি সামান্য পারিশ্রমিকের জন্য মাহারদের দিনরাত সরকারের দাসীর মতো খাটতে হয়। তিনি তাদের চরম দারিদ্রের উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁদের আয়ের মাত্র দু'টি পথ Ñ প্রথমটি 'ইনাম জমি' (Inam lands), দ্বিতীয়টি 'বালুতা' (baluta), বাটানদার মাহারদের গ্রাম থেকে শস্য সংগ্রহ। আইনসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, দেশের প্রাচীন সম্রাটেরা ওই জমি ওই মাহারদের দান করেছেন। সরকার তাঁদের জমির পরিমাণ বাড়াচ্ছে না কিংবা তাঁদের পারিশ্রমিকের প্রতিও বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দিচ্ছে না, অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে। মাহারদের লোকসংখ্যা প্রচুরভাবে বাড়ছে, তাঁদের যে জমি দেওয়া হয়েছিল তা ভাগের পর আরও ভাগ হয়ে ওই বাটান জমি থেকে যে সামান্য আয় হয় তা হিসেবের মধ্যেই আসে না।

এই জন্য তিনি আইনসভার কাছে আবেদন করে বলেন, "স্যার, আমি এক জঘন্য প্রথার কথা উত্থাপন করছি, যার মধ্যে কোনো প্রকার ন্যায়পরায়ণতা নেই। যদি সরকার প্রয়োজন বোধ করে যে, লোকগুলি এর জন্য কাজ করুক, তাহলে সরকারকে অবশ্যই এই মাহারদের বেতন দেবার দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ, রায়তের উপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া

উচিত নয়; কিন্তু এই প্রথার দ্বারা তাই হচ্ছে।”

এজন্য আম্বেদকর প্রস্তাব করেন যে, পূর্ণ খাজনায় ওই পদে চাকুরিয়াদের ওই বাটান জমি দেবার ব্যবস্থা করে তাঁদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। তাঁর মতে ষাট হাজার মাহার ওই বাটান পান। কিন্তু এর এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। মাহারদের জমির উপর ধার্য কর থেকে ও ‘বালুতা’ থেকে তাঁদের বেতন দেওয়া উচিত, যা গ্রামের বাসিন্দাদের বহন করতে হয়। এরূপ হলে সরকারি তহবিলে বাড়তি চাপ পড়বে না।

আম্বেদকর বলেন, “স্যার, সরকারের যদি এঁদের (শিক্ষক ও তালাটিস) অর্থনৈতিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে চাকরিতে পারিতোষিক দেবার শক্তি, সাহস ও সহানুভূতি থাকে তাহলে মাহারদের বেলায় সেই শক্তি, সাহস ও সহানুভূতি নেই কেন? আমি বুঝতে পারি না, যে প্রথা মহামান্য সম্রাটের প্রজাদের মধ্যে একটি শ্রেণিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে রাখে এবং দাসত্ব করতে বাধ্য করে, সরকার কেন সেই প্রথার একটি পক্ষ হয়েই চলবে। আমি মনে করি, আইনগত কিংবা নৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই বিলের চতুর্থ ধারাটি যা আমি দাখিল করেছি, তা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাত শূন্য।”

আম্বেদকর অত্যন্ত ভাবাবেগের সাথে বলেন যে, মাহারেরা এই বিল পাশ করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বিল পাশ না হলে সরকারকে তাঁরা সাধারণ ধর্মঘট করার হুমকি দিচ্ছেন ও তিনিও পদত্যাগ করবেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই বিল মাহারদের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বাটান প্রথা তাদের এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে বিরাট বাধা স্বরূপ। তিনি আশা করেন, পরিষদ এই বিল সর্বসম্মত ভাবে পাশ করাবে।

দু’ঘণ্টা ধরে দেওয়া এই বক্তৃতা এত ওজস্বী, সরল ও বাগ্মীতাপূর্ণ ছিল যে, সমস্ত সদস্যগণ সম্পূর্ণ নীরবে তা শুনছিলেন। ৪ আগস্ট প্রাথমিক আলোচনা শেষে আম্বেদকর প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, আইনসভার তেইশজন সদস্যের একটি সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠানো হোক। ১৯২৯ সালের জুনমাসের প্রথমদিকে ওই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে হবে। বিলটির পরিণতি দুঃখজনকÑ সিলেক্ট কমিটির চেহারাই সম্পূর্ণ পালটে দেওয়া হয়। বালুতার প্রশ্নেই বিরোধ বাধে, আম্বেদকর তাকে খাজনাতে রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন এবং কমিটির মত যে, পুরো খাজনায় বাটান জমি তাদের না দিয়ে অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে দেওয়া উচিত। সুবিধাভোগী ও গোঁড়াপন্থীরা বিলের প্রতি শীতল মনোভাব দেখান এবং অল্পসংখ্যক সদস্য সরকারের পক্ষ সমর্থন করেন। মুসলিম সদস্যগণ বিলের বিরোধিতা করেন, কারণ, কিছুদিন আগে সাইমন কমিশনের কাছে দেওয়া রিপোর্টে আম্বেদকর তাঁদের জাতীয়তা বিরোধী বলে আক্রমণ

করায় তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। অবশেষে ১৯২৯ সালে ২৪ জুলাই আম্বেদকর দাঁড়িয়ে বলেন, "স্যার, আমি বিলটি প্রত্যাহার করছি।" এক শতাব্দীর সিকিভাগ চলে গেল, কিন্তু মাহারদের দুর্বিষহ অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল, কোনো দৃষ্টিও দেওয়া হলো না।

ভারতের বিক্ষুব্ধ অবস্থাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের ধারাটিকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে সংশোধন করতে মনস্থ করে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাট্যুটরি কমিশন' বা জন সাইমনের সভাপতিত্বে সাইমন কমিশনের ঘোষণা করে। দু'জন আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্য ও চারজন কমন্স সভার সদস্য, পার্লামেণ্ট আইন বিশেষজ্ঞ স্যার জন সাইমনের অধীনে তাঁরা কাজ করবেন এবং এও ঘোষিত হয় যে, উক্ত কমিশনের সুপারিশক্রমে প্রস্তাবগুলি ওয়েস্টমিনিস্টারের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে দাখিল করতে হবে। সেখানে ভারতীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

১৯১৯-এর আইনে ভারতের সমস্যার পর্যালোচনার জন্য সাইমন কমিশন প্রথমবার বম্বে আসে ১৯২৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। কমিশনের অভারতীয় চরিত্র ভারতের প্রায় সব সংগঠনের কাছে অমর্যাদাকর বলে মনে হয়। কংগ্রেস দল প্রতিটি ক্ষেত্রে সব রকমে কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং কমিশন ভারতে এলে Ñ কালো পতাকা, অভিশাপ ও পোস্টারসহ 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনিতে সাইমন কমিশনকে সম্ভাষণ জানানো হয়। কংগ্রেস প্রমাণ করে সারা ভারতে তারা সংগঠিত বিরোধী শক্তি। কোনো কোনো স্থানে পুলিশকে গুলি পর্যন্ত ছুঁড়তে হয়। ১৯২৮-২৯-এর শীত ঋতুতে কমিশনের দ্বিতীয়বার ভারতে আসার সময় পর্যন্ত এই কালো অভ্যর্থনা অব্যাহত থাকে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস দলের আহ্বানে ফেব্রুয়ারি মাসে ও পরে মে মাসে সর্বদলীয় সভা ডাকা হয় এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অধীনে একটি কমিটি গঠন করে তার উপর ভারতের জন্য স্বরাজ সংবিধানের একটি খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত নেহরু কমিটি একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করে।

সংবিধান তৈরির এটাই ছিল প্রথম ভারতীয় প্রচেষ্টা। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের ভাঙন এড়ানো। দলিত বা নিপীড়িত শ্রেণি সম্পর্কে নেহরুর রিপোর্টে বলা হয়, "আমাদের প্রস্তাবনায় সংবিধানে আইনসভায় দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থা আমরা রাখিনি। এটা বিশেষ নির্বাচন বা মনোনয়নের দ্বারা করা যেতে পারে।" কিন্তু এই দু'টি পদ্ধতি ক্ষতিকর ও খারাপ বলে কমিটি ওই বিধির আর প্রসার করছে না। তারা বলে যে, দলিত শ্রেণির ক্ষতিসাধন করে এমন সব সমস্যার পক্ষে

তাদের এই অধিকার ঘোষণা সর্বরোগহর ওষুধের মতো কাজ করবে। অস্পৃশ্যদের সমস্যার প্রতি কংগ্রেস পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী তখনই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, যখন দেখা যায় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মুসলিম, পারসি, খ্রিস্টান, শিখ, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, অব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠানের দ্রাবিড় মহাজন সভা প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু আম্বেদকর পরিচালিত বা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্য কোনো দলিত শ্রেণির প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ হয়নি। এটা স্মরণীয় যে, দশ বছর আগে সাউথবরো কমিশনের কাছে আম্বেদকর সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন।

এই সময়ে ১৯২৮ সালের জুন মাসে আম্বেদকর বম্বের আইন কলেজে স্বল্পকালীন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর লোকদের মুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন শহরে গ্রামে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য আইনব্যবসায়ে মনোযোগ দিতে তিনি সময় পাননি। নিপীড়িত মানুষদের নেতা, বিরাট পণ্ডিত, তাঁর দলীয় পত্রিকার সম্পাদক Ñ সুতরাং মামলা হাতে নেবার সময় ছিল তাঁর খুবই কম। এই সমস্যা মেটাবার জন্যই তিনি ওই পদ গ্রহণ করেন।

সাইমন কমিশনের সাথে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ব্রিটিশ-ভারতের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করে। প্রত্যেক আইনপরিষদও সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য একটি করে প্রাদেশিক কমিটি গঠন করে। বম্বে আইনপরিষদ অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আম্বেদকরকেও একজন সদস্য মনোনীত করে।

ইতিমধ্যে আম্বেদকর তাঁর অগ্নিগর্ভ, নির্ভীক এবং স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করায় তাঁকে ব্রিটিশের দালাল, বিশ্বাসঘাতক, পিশাচ ও প্রতারক আখ্যা দেওয়া হয়। একদিন আইন কলেজে সকালের ক্লাশে ঢুকলে আইনের ছাত্ররা তাঁর ক্লাশ বর্জন করে এবং এক অতি উৎসাহী দেশপ্রেমী ছাত্র সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর নিন্দা করে। বলাবাহুল্য, এ খবর পরদিন সমস্ত খবরের কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হয়!

দলিত শ্রেণির আঠোরোটি সংস্থা ওই কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেয় ও স্মারকলিপি জমা দেয়। তার মধ্যে ষোলোটি দলিত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব রাখে। ‘বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা’র পক্ষ থেকে আম্বেদকর সাইমন কমিশনের কাছে দলিত শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত আসনসহ যুক্ত নির্বাচনের দাবি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয় যে, জাতির কাজের দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হয়েছে, তারা ওই মূক মানুষদের কথা ভুলে থাকে এবং ১৯১৯ সালের আইনটি ব্রিটিশ-ভারতের এক পঞ্চমাংশ মানুষ Ñ দলিত শ্রেণির প্রতি অবিচার করেছে। ‘বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা’ বম্বে আইনপরিষদের ১৪০টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন দাবি করে জোরালোভাবে মনোনয়ন প্রথার বিরোধিতা করে এবং দলিত শ্রেণির জন্য নির্বাচন-নীতি ব্যাপকতর

করার দাবি জানায়। ওই 'সভা' রাজনৈতিক শিক্ষার কথা বলে এবং মন্ত্রীত্ব পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাধিকার বলে অনুন্নত সমাজের জন্য মন্ত্রীত্ব পদেরও দাবি করে।

পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বমূলক এইসব দাবির পরেও ওই সভা দেশের আগামী দিনের সংবিধানে আরও কয়েকটি ধারা যোগ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, যেগুলি প্রদেশের রাজস্বের ভিত্তিতে প্রথম দায়িত্ব হিসাবে দলিত শ্রেণির শিক্ষাব্যবস্থাকে রাখা এবং দলিত শ্রেণির লোকদের সৈন্য, নৌ ও পুলিশবাহিনীতে নিয়োগ করার অধিকার এনে দেবে।

'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা' সাইমন কমিশনকে হিন্দুসমাজের কয়েকটি ভালো দৃষ্টান্ত দেখে প্রলোভিত না হওয়ার জন্য সাবধান করে দেয় এবং হিন্দুরা যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, নিপীড়ন করে, যার ফলে দলিত শ্রেণির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তা যেন ভুলে না যায়। 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা' সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু-নেতৃত্বে বিশ্বাস রাখে। সেই স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, "দলিত শ্রেণির কেউই সন্দেহ করেন না যে, কোনো সৎ হিন্দু-সরকারের অধীনে তাঁরা সুখী হতে পারবেন না।" আসল ঘটনা হলো, আইন ও প্রতিষ্ঠান সৎ লোকের চেয়ে অসৎ লোকদের হাতেই বেশি সময় থাকে।

'মাদ্রাজ কেন্দ্রীয় আদি দ্রাবিড় মহাজন সভা' দলিত শ্রেণির জন্য মনোনয়ন প্রথার দাবি করে। 'বম্বে প্রাদেশিক অব্রাহ্মণ পার্টি' স্মারকলিপিতে দলিত শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত আসনসহ পৃথক নির্বাচন দাবি করে। মুসলিম লিগ সিন্ধুকে পৃথক করার ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি জানায়।

১৯২৮ সালের ২৩ অক্টোবর সাইমন কমিশনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও বম্বে প্রাদেশিক কমিটি পুনায় আম্বেদকরের সঙ্গে আলোচনা করেন। কমিটির কাছে 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা' ও 'ডিপ্রেসড ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে স্যার জন সাইমন আম্বেদকরকে ওই প্রদেশে দলিত শ্রেণির লোকসংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তারপর স্যার হরি সিং গৌর নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি করেন।

প্রশ্নঃ ডঃ আম্বেদকর, আপনি কি 'দলিত শ্রেণি' (Depressed Classes) ও 'অস্পৃশ্য' শব্দ দু'টি সমার্থবোধক বলে মনে করেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রঃ দলিত শ্রেণির জন্য আপনি যে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন তা কি অস্পৃশ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ আপনি কি বলেন যে, কতগুলি আদিবাসী অস্পৃশ্য নয়?

উঃ কোনো কোনো অংশে তারা হতে পারে। আমি তাদের হয়ে কিছু বলতে চাই না।

পরে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরগুলি কমিটি ও আম্বেদকরের মধ্যে হয়েছিল।

প্রঃ এই পরিসংখ্যান হিসাবে ভারতের, বিশেষ করে বম্বে প্রেসিডেন্সির সংবিধানে এদের প্রতিনিধিত্বের জন্য কী উপায় অবলম্বন করা উচিত?

উঃ প্রথমত যে জিনিসটি আমি দাখিল করেছি, সেটা হচ্ছে যে, আমরা দাবি করি যে, হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক একটি সংখ্যালঘু শ্রেণি। দ্বিতীয়ত আমি এই বলতে চাই যে, ব্রিটিশ-ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু শ্রেণি থেকে দলিত শ্রেণির সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ রক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন, কারণ এরা শিক্ষায় অত্যন্ত পিছিয়ে, আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত গরিব, সামাজিকভাবে দাসত্ব শ্রেণিভুক্ত ও রাজনৈতিক দিকে এমন দুর্ভোগ ভোগ করে যা অন্য কোনো শ্রেণি ভোগ করে না। যদি বয়স্কদের ভোটাধিকার হয়, তাহলে আমরা সংরক্ষিত আসনের দাবি করি।

প্রঃ যদি বয়স্কদের কোনো ভোটাধিকার না হয়?

উঃ তাহলে আমরা পৃথক নির্বাচনের দাবি করি।

প্রঃ বিশেষত আপনি সরকারি চাকরির জন্য দাবি করেন, এর কারণ কী?

উঃ কারণ, আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, আইন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দলিত শ্রেণির লোকদের অসুবিধা ঘটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রঃ আপনি দলিত শ্রেণির সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারেন?

উঃ যে জাতিগুলি সমাজকে অপবিত্র করে তারাই।

প্রঃ মাহার এবং মঙ জাতের মধ্যে কি বিয়ে হয়?

উঃ না, বর্ণহিন্দুরা তাদের মধ্যে বিষ ছড়িয়েছে।

প্রঃ তারা কি একত্রে ভোজন করে?

উঃ হ্যাঁ, আজকাল করে।

প্রঃ আপনি কি দলিত শ্রেণিকে যথার্থ হিন্দু শ্রেণিভুক্ত বলেন?

উঃ আমি নামের তালিকা গ্রাহ্য করি না, যতক্ষণ আমি হিন্দুধর্মের বাইরে আছি ততক্ষণ আমি নিজেকে হিন্দু কিংবা অহিন্দু বললে কিছুই যায় আসে না।

প্রঃ আপনি যদি হিন্দুধর্মের বহিভুতই হন, তবে তো আপনি হিন্দু-আইনের অধীন নন ...... তাহলে আপনি কোন আইনে শাসিত হবেন?

উঃ আমরা হিন্দু-আইনে শাসিত হচ্ছি।

হিন্দুসমাজসংস্কারকদের কাজ সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন যে, ওগুলি মঞ্চের বক্তৃতা মাত্র।

ওইসময় আম্বেদকর আইন ব্যবসায়ের কাজে সামান্যই সময় পেতেন। যখনই কোনো মামলা তিনি হাতে নিতেন, মক্কেলের সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। অবশ্য কোর্টে যুক্তি প্রদর্শনের সময় তাঁকে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করতে হতো, কারণ কোনো জরুরি রাজনৈতিক আলোচনা অথবা সামাজিক কাজের জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি কোর্ট ছেড়ে যেতে হতো। কিন্তু কোনো কারণে মক্কেলের ক্ষতি হয় এমন কিছু তিনি করতেন না। একদিন, যখন তাঁকে পুনায় সাইমন কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা, সে সময় থানা সেশনকোর্টে একটি হত্যা মামলায় বিবাদীর পক্ষে বিতর্ক করতে হয়েছিল। মামলাটি অত্যন্ত জটিল, কারণ আসামিদের ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। অপরদিকে সাইমন কমিশনের সামনে তাঁর লোকদের পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগও তিনি হাতছাড়া করতে পারেন না। যদিও বাদী পক্ষের সরকারি সওয়ালের পরই তার জবাবি বক্তব্য রাখার রীতি, তথাপি তিনি জেলা-জজের কাছে তাঁর বক্তব্য আগে রাখার অনুমতির আবেদন করেন। জজ তা মঞ্জুর করেন। যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য রাখার পর আম্বেদকর পুনায় গিয়ে সাইমন কমিশনে সাক্ষ্য দেন। তিনি তাঁর সাফল্যে এতই বিশ্বাসী ছিলেন যে, ওই মামলার অধিকাংশ আসামি খালাস পেয়েছিল।

আম্বেদকর দলিত শ্রেণির লোকদের নাগরিক অধিকার লাভের জন্য সব সময় সচেতন ছিলেন এবং বিপদের মুখোমুখি হয়েও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁদের শিক্ষা দেবার কোনো সুযোগ কখনও নষ্ট করতেন না। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণেশ উৎসবে সংস্কারপন্থী ও গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে সকল হিন্দু গণেশপূজা করতে পারে কিনা এই নিয়ে বিরোধ বাধে। কিন্তু আম্বেদকরের প্রচেষ্টা ও ভীতি প্রদর্শন, সামাজিক সাম্য, লিগ ও বোলের মতো সমাজসংস্কারকদের মাধ্যমে প্রশ্নটির বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মীমাংসা হয় এবং অস্পৃশ্য হিন্দুরাও প্যাণ্ডেলের মধ্যে পূজা করার অধিকার পান।

অন্য একটি কাজে এ সময় আম্বেদকরকে মনোযোগী হতে হয়েছিল। সে সময় বম্বের বস্ত্রশিল্পে পনেরো হাজার কর্মী ছ'মাস ধরে ধর্মঘট করে মিল অচল করে দেন। মিলমালিকেরা প্রত্যেক শ্রমিককে তিনটি তাঁতে কাজ করার নতুন নিয়ম চালু করেন। মিলকর্মীরা এই নতুন প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। 'গিরনি কামগড় মহামণ্ডল' নামে শ্রমিক ইউনিয়ন এই বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ধর্মঘট শুরু করে। এই ধর্মঘটের সময় দলিত শ্রেণির কর্মীরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েন এবং সবচেয়ে গরিব শ্রমিকেরা ধর্মঘট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কামনা করতে থাকেন।

আম্বেদকর ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু কাপড়ের কলের দীর্ঘ আশি বছরের ইতিহাসে দলিত শ্রেণির লোকদের কাপড় বোনার মতো লাভজনক কাজ করতে দেওয়া হয়নি, এটাই তাঁর মনকে পীড়া দিত। কোনো শ্রমিক সংগঠন অস্পৃশ্যদের

এই কলঙ্ক ও বস্ত্রশিল্পে তাঁদের উন্নতির মারাত্মক বাধা দূর করার কোনো প্রচেষ্টাও করেনি। এ ছাড়া আম্বেদকরের মতে সাম্যবাদ ও ধর্মঘট অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি জানতেন যে, শ্রমিক আন্দোলন পুরোনো পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে শ্রমিক আন্দোলন অর্থনৈতিক লাভের চেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে বেশি ঝুঁকছে। রাজনৈতিক লাভের লক্ষ্যে ধর্মঘট অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবার ফলে দলিত শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছিল। সুতরাং আম্বেদকর একটা স্বাধীন কর্মপন্থার কথা ভাবছিলেন।

দলিত শ্রেণির শ্রমিকদের পক্ষে কাজে যোগদান করাই ছিল উপযুক্ত ব্যবস্থা। ই.ডি. স্যাসুন মিল গ্রুপের ম্যানেজার মিঃ ফ্রেডারিক স্টোন্স আম্বেদকরকে তাঁর লোকদের ধর্মঘট তুলে নিয়ে কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। বম্বের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী নেতা বোলের সহায়তায় আম্বেদকর সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে সেই ধর্মঘটের বিপদসঙ্কুল এলাকায় চলাফেরা করতে আরম্ভ করেন। আম্বেদকর দশ বছর ধরে বম্বের শ্রমিক এলাকায় বসবাস করে শ্রমিকদের শক্তি ও দুর্বলতার খবর রাখতেন। কতকগুলি সাহসী লোকের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে তিনি তাঁর লোকদের কাজে যোগদানের চেষ্টা করে অবশেষে সফলতা পান।

সেটা ছিল তিক্ততা ও উত্তেজনার সময়। ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কোয়ার্টার ছিল তাঁরই বাসস্থান ও অফিসের কাছে। ফুটপাতের উপর অবস্থানরত ক্ষুব্ধ তিক্ত কর্মীদের পাশ দিয়ে তিনি যাতায়াত করতেন। যখন তিনি বাসায় খেতে যেতেন কয়েকজন নির্বাচিত লোক তাঁকে পাহারা দিতেন। একদিন বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার সময় তাঁদের বলেন যে, কেন তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করছেন। তাঁরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে চুপ করে থাকেন। বুদ্ধের মতো আম্বেদকর বলেন, "এই বোকামি বন্ধ করো। আমার জন্য তোমাদের জীবন বিপন্ন কর না। আমার মৃত্যু কে ঠেকাতে পারে? তেমন সাবধানতার কোনো দরকার নেই।" তবু তাঁর সুরক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকে।

সাইমন কমিশনের কাছে আম্বেদকরের সাক্ষ্য এই ধর্মঘটের মধ্যেই চলেছিল। ব্রিটিশের শ্রমিক নেতা মিঃ এটলি, পরবর্তীকালে যিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি এই সাইমন কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। এটলি ডঃ আম্বেদকরকে কয়েকটি দরকারি প্রশ্ন করেন। তাঁদের এই মতবিনিময়ের মধ্যে শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কেও কথা হয়েছিল।

এটলিঃ দলিত শ্রেণির লোকেরা কি ইণ্ডাস্ট্রি, কটনমিলে শ্রমিকের কাজ করেন?

আম্বেদকরঃ তাঁদের সকলেই। দলিত শ্রেণির লোকরা সবাই শ্রমিক।

এটলিঃ আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি, আমি ইণ্ডাস্ট্রির কথা বলছি। আপনার দলিত শ্রেণির লোকেরা অনেক সময় গ্রামে ভিন্ন কাজ করেন। কিন্তু খুব

বেশি সংখ্যক লোক কি ইণ্ডাস্ট্রিতে নিযুক্ত?

আম্বেদকরঃ একটা বিরাট সংখ্যায়।

এটলিঃ অস্পৃশ্য বলে কি তাঁরা কোথাও বাধা পান?

আম্বেদকরঃ না। সবচেয়ে বেশি বেতনের বস্ত্রবয়ন বিভাগ থেকে দলিত শ্রেণির মানুষ সম্পূর্ণ বাইরে থাকেন। সে শুধু সুতোকাটা ও অন্যান্য বিভাগে ঢুকতে পারেন।

এটলিঃ কেন?

আম্বেদকরঃ অস্পৃশ্যতার জন্যই।

সাইমন কমিশনের কাজ শীতকাল পর্যন্ত চলে। প্রাদেশিক কমিটিগুলিও তাদের রিপোর্টের খসড়া তৈরি করছিল। সাইমন কমিশনের সাথে সহযোগিতা করার জন্য বম্বে আইনপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি সংবিধান সমস্যা সম্পর্কে আধিকারিক ও বাইরের লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে ১৯২৯ সালের ৭ মে রিপোর্ট দাখিল করে। কমিটি সিন্ধুকে (প্রদেশ) পৃথক করার পক্ষে সহানুভূতিশীল হলেও অর্থনৈতিক কারণে তা অবাস্তব বলে মত প্রকাশ করে। কর্ণাটককে পৃথক করা সম্পর্কে কমিটি বলে যে, ওই দাবি তেমন জোরালো নয়। কমিটি যুক্ত নির্বাচনে দলিত শ্রেণির জন্য দশটি এবং ১৪০ টি আসনের মধ্যে পৃথক নির্বাচনে মুসলিমদের জন্য শতকরা ৩৩ টি আসন সংরক্ষণ সমর্থন করে।

আম্বেদকর কমিটির সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন বলে রিপোর্টে স্বাক্ষর করেননি। তিনি তাঁর নিজের মত ও সুপারিশসহ ১৯২৯ সালের ১৭ মে আলাদা রিপোর্ট দাখিল করেন। বম্বে প্রদেশ থেকে কর্নাটকের পৃথকীকরণ সম্পর্কে তিনি এই যুক্তিতে আপত্তি করেন যে, একটা প্রদেশে একটি মাত্র ভাষা বাস্তবে রূপ দেওয়া অসম্ভব। মূল প্রদেশ থেকে যদি রাজ্যগুলিকে আলাদা করা হয় তাহলে মূল প্রদেশের কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দেশপ্রেমিক হিসাবে আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল, বর্তমান সময়ে জরুরি কাজ হচ্ছে সকলের পক্ষে এক জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়া। নিজেকে হিন্দু, মুসলিম, কানাড়ি না ভেবে সর্বপ্রথম নিজেকে ভারতবাসী ভাবা। তারপর হিন্দু, মুসলিম, কানাড়ি ভাবতে হবে। তাই যদি আদর্শ হয় তাহলে এমন কাজ করা উচিত নয়, যাতে পৃথক সত্ত্বাবোধ জেগে ওঠে কিংবা স্থানীয় দেশপ্রেমে জটিলতার সৃষ্টি করে।

সেই সময়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সিন্ধুর পৃথকীকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটি একটি সাম্প্রদায়িক দাবি। পাঁচটি প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এটি একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ মাত্র। তিনি জাতিকে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ওই মতলবটি নির্দোষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, এর পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।

তিনি তাঁর সমর্থনে কলকাতায় মুসলিমলিগ সভায় গান্ধিপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আজাদের উক্তি উদ্ধৃতি করে বলেনÑ নয়টি হিন্দুপ্রধান প্রদেশের বিরুদ্ধে পাঁচটি মুসলিমপ্রধান প্রদেশ আছে। ওই নয়টি প্রদেশে হিন্দুরা মুসলিমদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করবে, পাঁচটি প্রদেশের মুসলিমরাও হিন্দুদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করবে। এটা কি মুসলিমদের পক্ষে একটা মস্তবড়ো লাভ নয়? মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটা কি এক নতুন অস্ত্র নয়? গান্ধিপন্থী জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের চরিত্রের উপর এটা একটা অনুসন্ধানী আলো।

আম্বেদকর মুসলিমদের পৃথক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন যে, কীভাবে ইউরোপের বিভিন্ন মানুষ এক সরকারের অধীন পৃথক নির্বাচনের দাবি না করে একসঙ্গে বসবাস করছেন। তিনি বলেনÑ "এটা ভালোভাবে লক্ষ করা হয়নি যে, ভারতই একটি মাত্র দেশ নয়, যেখানে মুসলিম সংখ্যালঘু। অন্যান্য অনেক দেশ আছে যেখানে এই একই অবস্থা। আলবেনিয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। বুলগেরিয়া, গ্রীস এবং রুমানিয়ায় সংখ্যালঘিষ্ঠ, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া এবং রাশিয়ায় তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। সেখানকার মুসলিম কি পৃথক নির্বাচনের আবশ্যকতা বোধ করেন? সমস্ত ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে যে, ওই দেশের মুসলমানেরা পৃথক নির্বাচন দাবি না করেই বসবাসের সুব্যবস্থা করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোনো সংখ্যানুপাতিক আসনও তাঁরা দাবি করেননি। আমার মতে ভারতের মুসলিমগণ রীতি ভঙ্গ করেছেন এবং বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন।" তিনি বলেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব একটা চিরস্থায়ী অশুভ ব্যাপার হয়ে থাকবে।

আম্বেদকর আরও বলেন, "যদিও আমি কোনো কোনো শ্রেণির জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবি করি, কিন্তু আমি পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে ওই প্রতিনিধিত্ব দাবি করি না। এই অগণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের পরিকল্পনা করতে গেলে আঞ্চলিক নির্বাচন এবং পৃথক নির্বাচন দু'টিই চরম ব্যবস্থা, যা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। সংরক্ষিত আসনসহ যুক্ত নির্বাচনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তার কম হলে হবে অপর্যাপ্ত এবং বেশি হলে ভালো সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।"

তখনকার নীতি, তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্বে তাঁর রিপোর্ট ছিল যুক্তিবাদী এবং দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ। তা ছিল উভয় দিকের ভারসাম্যের পরিচায়ক ও সঠিক পথনির্দেশক। তা প্রকাশ হলে আম্বেদকরের প্রবল শত্রু, কঠোর সমালোচক ও বিরোধী সংবাদপত্রÑ সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। আম্বেদকর তখন মস্তবড়ো রাজনীতিবিদ, মহান দেশপ্রেমিক, অতলস্পর্শী অস্পৃশ্যদের মধ্যে হীরকের মতো প্রতীয়মান হলেন। তাঁর সময়ে তিনি হলেন উল্কার মতো এবং মহান উপদেষ্টা। সেই রিপোর্ট তাঁর দেশের ভাগ্যনির্ধারক হলো। এটা নিশ্চিতভাবে এক ঐতিহাসিক পথনির্দেশিকা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জমি, শ্রম ও শিক্ষা

আম্বেদকরকে তাঁর চেষ্টা, শক্তি ও প্রতিভার বেশির ভাগই তাঁর লোকদের সাংবিধানিক এবং আইনপরিষদ সংক্রান্ত অধিকার আদায়ের জন্য ব্যয় করতে হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের পিছিয়ে থাকা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। কারণ শিক্ষাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় এবং উন্নতি লাভের শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার। সুতরাং তাঁর লোকজনদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা তিনি করতেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে তিনি দু'টি হোস্টেল স্থাপন করেন এবং ১৯২৮ সালের ১৪ জুন 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা' ভেঙে দিয়ে 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করে তার মাধ্যমেই তাঁর সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। হাইস্কুলে শিক্ষার ভার বহনে অক্ষম দলিত শ্রেণির ছেলেদের উপকারের জন্য তিনি বম্বে সরকারের কাছে 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস এডুকেশন সোসাইটি'কে হোস্টেল তৈরিতে সাহায্য করার জন্য আবেদন করেন।

সরকার ১৯২৮ সালের ৮ অক্টোবর ওই পরিকল্পনা মঞ্জুর করে এবং গভর্নর ঘোষণা করেন যে, মাধ্যমিক স্কুলের দলিত শ্রেণির ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দিতে পাঁচটি হোস্টেলের পরিকল্পনা তিনি মঞ্জুর করবেন।

১৮৬১ সালের ২১তম ধারার চেরিটেবল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে আম্বেদকরের এডুকেশন সোসাইটি একটি মঞ্জুরিকৃত প্রতিষ্ঠান। এটি একটি বোর্ড অব ট্রাস্টি দ্বারা পরিচালিত হত, যার সদস্য ছিলেন মেয়র নিসিম, শংকর সায়েন্না পার্শা, ডঃ পুরুষোত্তম সোলাঙ্কি ও আম্বেদকর এবং উনিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটি এদের সাহায্য করতেন। আম্বেদকর নিজে ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক এবং শিবতর্কার ছিলেন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। এই সদস্যগণ ছিলেন অত্যন্ত খাঁটি মানুষ এবং তাঁদের নেতার আদর্শ ও শক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁদের অকপটতা এবং প্রচেষ্টা সরকারের বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হওয়ায় প্রস্তাবিত পাঁচটি হোস্টেলের জন্য সোসাইটিকে বছরে ন'হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।

খরচ চালাবার পক্ষে এ টাকাটা অপর্যাপ্ত ছিল। সুতরাং আম্বেদকর নানা জায়গা থেকে দান সংগ্রহ করেন। তিনি উদার হৃদয় জনগণ, সুশিক্ষাপ্রাপ্ত স্থানীয় ব্যক্তি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং মহান লোকদের সাহায্যপ্রার্থী হন। ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতিগণ এই উপযুক্ত কাজে দলিত শ্রেণির ছাত্রদের বেতন কমিয়ে দিয়ে এবং হোস্টেল তৈরির জমি ও অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করে যথেষ্ট

সহানুভূতি দেখান।

সোসাইটি ছাত্রদের খাদ্য ও আবাসনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থেরও ব্যবস্থা করে। বর্ণহিন্দুদের প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমস্যায় ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং অর্থের প্রয়োজনে তিনি মুসলিম ও পারসি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাছেও সাহায্যের আবেদন রাখেন। ছাত্রদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা করাও ছিল খুব কঠিন ব্যাপার। কোনো বর্ণহিন্দু জমিদার এই উদ্দেশ্যে বাড়ি ভাড়া দিতে চান না, দিলেও ভাড়া অত্যন্ত বেশি। এই সমস্যার জন্য তিনি স্থানীয় বিভিন্ন সদস্যের কাছে এবং জেলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেন। ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ডর এক সদস্যের কাছে সাহায্য পাওয়ার আশা পোষণ করে তিনি বলেন, "দলিত শ্রেণির উন্নতি দেশের সমস্ত আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।" অন্য এক সদস্যকে প্রভাবিত করার জন্য তিনি বলেছিলেন, "দলিত শ্রেণির শিক্ষা প্রসঙ্গ যেমন আমার পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আপনার পক্ষেও এবং এজন্য আপনাকে সচেতন করার প্রয়োজন আমি মনে করি না।"

ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আম্বেদকরের নিজস্ব সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। ছোটো ছোটো চাকরি এবং সৈন্যবিভাগের কাজের জন্য তিনি যে দাবি করেছিলেন, সেগুলি দলিত শ্রেণির জীবনের মান উন্নত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি জানতেন যে, যত বেশি শিক্ষা বিস্তার হবে, তাঁর লোকজনদের তত বেশি উন্নতির সম্ভাবনা ও সুযোগও সহজতর হবে। কিন্তু তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, তাঁর লোকজন যত বেশি রাজনৈতিক সাম্য ও শক্তি অধিকার করতে পারবে তত বেশি সরকারি প্রচেষ্টা ও সহায়তায় তাঁদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে। সেই জন্যই তিনি তাঁর সময় ও প্রতিভা শিক্ষায় অগ্রগতি অপেক্ষা রাজনীতির দিকে বেশি নিয়োজিত করেছিলেন।

অস্পৃশ্যদের শিক্ষা সমস্যা অন্য একটি দিক থেকেও বিশেষ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। ভর্তি করার জন্য সরকারি আদেশ থাকা সত্ত্বেও স্কুলগুলি দলিত শ্রেণির ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে অস্বীকার করত। এজন্য আম্বেদকরকে স্কুলে স্কুলে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কর্মবীর সিন্ধে এবং বীর সাভারকার মহারাষ্ট্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দলিত শ্রেণির ছাত্রদের শিক্ষা লাভের জন্য সংগ্রাম করে অনেকটা কৃতকার্য হয়েছিলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বম্বের বলপাখাড়িতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের দলিত শ্রেণির লোকদের এক বিরাট জনসভায় আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতাকালে তিনি দলিত শ্রেণির লোকদের পার্থিব সুখসুবিধা ও অধিকার আদায়, অন্যান্য সমাজের সাথে সমান মর্যাদা লাভ এবং হিন্দুসমাজকে এক বিরাট পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য

কঠোর সংগ্রাম করতে উপদেশ দেন।

আইনের অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রদের মনে স্থায়ী ও আকর্ষণীয় ছাপ রাখতে সমর্থ হন। ওই বিষয়ে গভীর ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় ছাত্রদের সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে তাঁর শিক্ষাদান নতুন চিন্তা ও মনের প্রসারতা ঘটাতে সক্ষম হয়। ১৯২৯ সালের মার্চের শেষে অধ্যাপক রূপে তাঁর অফিসের কার্যকাল শেষ হয়। ডক্টর অধ্যাপকের পরবর্তী চার বছর রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ভারতীয় সংবিধানের সংস্কার কার্যের আলোচনার জন্য যে গোলটেবিল বৈঠকের জয়েন্ট কমিটিতে প্রচণ্ড বিতর্ক চলে, সেখানেই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

১৯২৯ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে আম্বেদকর কতকগুলি সভা পরিচালনা করেন ও যোগদান করেন। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে চিপলুনে রত্নগিরি জেলাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। সম্মেলনের প্যাণ্ডেলের জায়গা পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয়। গোঁড়া হিন্দুদের মনে সন্দেহ হয় যে আবার মাহাদের মতো ঘটনা ঘটবে এবং যদি শহরে অস্পৃশ্যদের সম্মেলন হয় তাহলে তাদের কুয়ার জল অপবিত্র হবে। যেন শত্রুর আক্রমণ হয়েছে এমন ভাবে অনেক যত্নে সাবধানতার সাথে তাদের কুয়াগুলি তারা বন্ধ করে রাখে। আম্বেদকর এবং তাঁর দলের লোকজন চিপলুনের ডাকবাংলোয় দু'দিন অবস্থান করেন।

বিনায়করাও বার্ভে ও বি.জি. খাটু নামে স্থানীয় দু'জন প্রগতিশীল উকিল সম্মেলনে যোগ দেন। ওম্‌স্বামী রাগজি প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করেন এবং বর্ণহিন্দুদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আম্বেদকর সভাপতির বক্তব্যে বলেন, "আপনাদের অবশ্যই নিজেদের দাসত্ব নিজেদেরকেই নির্মূল করতে হবে। আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকা অত্যন্ত অপমানজনক। জীবনে আত্মসম্মান সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয়। এটা ছাড়া মানবজীবন সম্পূর্ণ মূল্যহীন। আত্মসম্মান রক্ষা করে বাঁচতে গেলে বহু বিপদ অতিক্রম করতে হয়। কঠোর ও নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ শক্তি, বিশ্বাস ও স্বীকৃতি লাভ করে।" তিনি কোংকনের 'খোটি' নামে কথিত ভূমি-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন, যা তাঁদের রক্ত শোষণ করছে এবং তিনি ওই প্রথা নির্মূল করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি তাঁদের মঙ্গলের জন্য কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলার কথা বলে ঘোষণা করেন, "আমি যদি আপনাদের লজ্জা ও দুঃখের বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এখানে আসি তবে আমার জীবননাশের ভয় দেখানো হয়। মানুষ মরণশীল। প্রত্যেককে একদিন মরতেই হবে। কিন্তু মানুষকে উন্নততর জীবন ও মহান আত্মসম্মানবোধের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমরা ক্রীতদাস নই, আমরা যোদ্ধা জাতি। সাহসী লোকের পক্ষে আত্মসম্মানবোধহীন ও দেশপ্রেমহীন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বেশি অসম্মানজনক আর কিছুই নেই।"

তিনি প্রস্তাব দেন যে, যদি তাঁরা বর্ণহিন্দু ও হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান, তবে তাঁদের পক্ষে উচিত অন্য কোথাও দূরে ভালো জায়গায় চলে যাওয়া। তিনি বলেন, তিনি সিন্ধু ও ইন্দোর রাজ্যে তাঁদের জন্য কৃষিজমি সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। তিনি তাঁদের প্রতিবেশী মুসলিমদের দৃষ্টান্ত দেখান, যাঁরা আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন এবং ধনী হয়ে আবার কোংকনে ফিরে এসেছেন। সিন্ধুতে বসতি স্থাপনের ধারণা আম্বেদকরের মনে হয়েছিল যখন তিনি অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে সেখানে সার্ভে করতে গিয়েছিলেন। শুক্কুর বাঁধে হাজার হাজার একর বালুময় জমি উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার আশা করা হচ্ছিল। ইন্দোরের মহারাজার সঙ্গেও অস্পৃশ্যদের জমির জন্য তাঁর নতুন চুক্তি হওয়ায় তিনি আশান্বিত হয়েছিলেন।

সম্মেলন শেষে প্রতিনিধিদের মধ্যে পবিত্র উপবীত (পৈতা) বিতরণ করা হয়। আম্বেদকরের একজন ব্রাহ্মণ সহকর্মী দেওরাও নায়েক আচার্যের ভুমিকা পালন করেন এবং ছ'হাজার প্রতিনিধিকে বৈদিকসংগীতের মাধ্যমে উপবীত ধারণ করানো হয়।

রাতে বিনায়করাও বার্ভে আম্বেদকরকে আন্তরিক ভাবে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে যোগদান করে আম্বেদকর বলেন যে, ওইরূপ সকল বর্ণের একত্রে ভোজনে যোগদানের অর্থ এই নয় যে, ব্রাহ্মণের সাথে ভোজনে কারও মুক্তি হবে। তার দ্বারা সামাজিক মিলন সহজ হবে ও সাম্যনীতি লালিত হবে।

পরদিন আম্বেদকর সেই একই জায়গায় একটি কৃষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দলিত শ্রেণির কল্যাণের জন্য কাজ করাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, তিনি গরিব পরিবারে জন্মেছেন এবং বম্বের ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট চাওলে গরিবদের মধ্যেই বাস করেছেন। তিনি বলে চলেন, "আমি আপনাদের ব্যথাবেদনার কথা জানি। খোটি প্রথা আপনাদের রক্ত শোষণ করছে। ভোগ-দখলের শর্ত সংক্রান্ত এই ভূমি-ব্যবস্থার বিলুপ্তি আপনাদের শান্তি ও উন্নতি এনে দেবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত নিজের ভাগ্য নির্ধারণে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। সেই সময় আইনসভায় সঠিক প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য আপনারা বিশেষ যত্ন নেবেন, যে সব প্রতিনিধি এই খোটি প্রথা বিলুপ্তির জন্য একাগ্রচিত্তে আপনাদের জন্য সংগ্রাম করবেন।"

চিপলুন থেকে বম্বে ফিরে এসে আম্বেদকর 'গিরনি কামগর ইউনিয়ন' পরিচালিত বম্বে বস্ত্রশিল্পের ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বামপন্থী কমিউনিস্টরা ১৯২৯ সালের ২৬ এপ্রিল মিলকর্মীদের দ্বিতীয় ধর্মঘট করতে বাধ্য করে। আগের ধর্মঘটে অসন্তুষ্টির ফলশ্রুতি হিসাবে কতকগুলি কর্মীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আম্বেদকর কর্মীদের

অধিকার আদায়ের জন্য ধর্মঘটকে সমর্থন করেন। তাই তিনি বলেন যে, ধর্মঘট-অস্ত্র পরিমিত ভাবে কর্মীদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে হবে, কমিউনিস্ট নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। তাঁর সহজাত চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তিনি বারবার বলেন যে, কমিউনিস্টরা ধর্মঘট চালাচ্ছেন তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, কর্মীদের কল্যাণের জন্য নয়।

কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘট আম্বেদকরের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ, অস্পৃশ্যতার জন্য দলিত শ্রেণির জনগণ মিলের মধ্যে লাভজনক কাজে যে বাধা পান, তার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা কখনও সোচ্চার হননি। কেন তিনি ধর্মঘটের পক্ষপাতী নন তার দ্বিতীয় কারণটি ছিল প্রথম ধর্মঘটের জন্য দলিত শ্রেণির লোকদের অবস্থা আরও বেশি শোচনীয় হয়েছিল, কারণ ঋণদাতা ও মহাজনের চাহিদা বেড়ে গিয়ে তাঁদের ঘাড়ে বেশি বেশি বোঝা চাপে এবং সম্মানেরও হানি হয়। এজন্য আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে, তাঁদের অবস্থা ভালো করার জন্যই তাঁদের ধর্মঘট করার অধিকার আছে। ভালোর দিকে তাঁদের পরির্তন দরকার। কিন্তু তাঁদের আর কোনো ক্ষতি না করেই তা করা উচিত। রোগীর কোনো ক্ষতি না করে রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন। আর.আর. ভাখেল ও শ্যামরাও পারুলেকর নামক দু'জন শ্রমিক নেতাকে সঙ্গে নিয়ে আম্বেদকর 'গিরনি কামগর ইউনিয়ন' পরিচালিত ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালান। ১৯২৯ সালের ২৯ এপ্রিল টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়ন দামোদর হলে কর্মীদের এক সভা ডাকে। সেই সভার সভাপতিরূপে আম্বেদকর ধর্মঘট চালাবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করেন।

শ্রমিক বিরোধ চলাকালীন সময় আম্বেদকর চিটাগাঁও-এ এক বড়ো সম্মেলনে ভাষণ দেন। তাঁর লোকজনদের তিনি বলেন যে, কারও আত্মসম্মান বাঁচাবার শিক্ষাই একমাত্র বিষয় নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে কারও অবদান যদি তাঁর নিজের সম্মান এবং শ্রদ্ধা জাগাতে পারত, তাহলে সমাজের বিদ্বান ও প্রতিষ্ঠিত লোকদের দ্বারা তিনি নিজে এত অসম্মানিত হতেন না। তাঁদের চলার পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে এবং জীবন থেকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক দূর করতে তিনি প্রতিনিধিদের কাছে আকুল আবেদন করেন।

১৯২৯ সালের ২৯ মে জলগাঁও-এ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের দলিত শ্রেণির দ্বারা একটি সম্মেলন আহূত হয়। বম্বের ধর্মঘটের ব্যাপারে আম্বেদকর অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই সভার সভাপতিত্ব করার জন্য সময় করে নেন। বর্ণহিন্দুদের কাছে তাচ্ছিল্যজনক ব্যবহার পাওয়ার জন্য এই সম্মেলনে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। বক্তৃতার উপসংহারে আম্বেদকর সম্মেলনকে পরিষ্কারভাবে বলেন যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে তাঁদের অভাব-অভিযোগগুলি দূর

করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে হিন্দুসমাজ যদি তাঁদের দারিদ্র, যন্ত্রণা, দুঃখ ও সামাজিক বাধা দূর না করে তবে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ ও সম্মানের জন্য তিনি তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণের উপদেশ দেন। বম্বে ধর্মঘটের পরিস্থিতির জন্য তাঁর উপস্থিত থাকার প্রয়োজনে আম্বেদকর পরদিন বম্বে ফিরে যান।

জলগাঁও-এর হিন্দুরা এই অনুভূতির তেমন কোনো গুরুত্ব দেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, অতিরিক্ত নাগরিক অধিকার লাভের জন্য দরকষাকষি করার এটা একটা বালসুলভ কৌশল মাত্র। কিন্তু সময়সীমা পার হয়ে গেলে ১৯২৯ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে প্রায় বারোজন মাহার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাতে সনাতনপন্থী সংস্কারকেরা ভয় পেয়ে যান। কিছু সময়ের জন্য হলেও যুক্তি ও বাস্তবের দিকে তাঁরা দৃষ্টি ফেরান। যাঁরা ভেবেছিলেন যে, একজন মাহারের মৃত্যুতে দূষণের কলঙ্ক দূর হয়েছে, তাঁরা আর দ্বিধা কিংবা দেরি না করে দু'টি জলাশয় দলিত শ্রেণির জন্য খুলে দেন। আম্বেদকর এটাকে বিলম্বিত বলে আখ্যা দেন এবং বলেন যে, তা স্বেচ্ছামূলক কাজও নয়। তিনি বলেন যে, হিন্দুরা যদি ন্যায়, সাম্য ও মানবতার পরিচয় দিতেন তবে এমন ঘটনা ঘটত না। তিনি মুসলিম ও খ্রিস্টানধর্মের চাপকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, এর ফলে দলিত শ্রেণি কিছুটা সুবিধা লাভ করেছে।

এই সম্মেলনগুলি আম্বেদকরের আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে। দলিত শ্রেণির লোকেরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে শপথ ভঙ্গকারীদের বয়কট করার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা মৃত জন্তু বহন করতে অস্বীকার ও পৈতা ধারণ করায় বর্ণহিন্দুরা তাঁদের নানাভাবে হয়রান করতে থাকে। তাঁদের অভিযোগ ও অসন্তোষের ভিত্তিতে বোলের সভাপতিত্বে বম্বের এক সভায় আম্বেদকর দলিত শ্রেণিকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিপীড়কদের সাবধান করে দেন।

আম্বেদকর ও তাঁর বন্ধুদের পরিচালিত 'সোসাল ইকোয়ালিটি লিগ'-এর কার্যকলাপে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যাঁরা এর উদার ও বিপ্লবাত্মক আদর্শে বিচলিত তাঁরা ওই প্রতিষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করেন। তার উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, যিনি মুখে যা প্রচার করেন কাজেও তাই করেন, তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। কিছু লোক সৎ নীতি স্বীকার করে, কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করে না, এজন্য সৎ নীতি কখনও বিফল হয় না। কিছু লোক বলেন যে, পৃথিবী থেকে বৈষম্য কখনও দূরীভূত হবে না। আম্বেদকর তাঁদের বলেন যে, যখন নীতিহীনতা চিরকাল সকল দেশে সব সময়েই প্রচলিত রয়েছে, তবে কেন তাঁরা নীতিবাদ প্রচার করেন? তিনি তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন যে, সামাজিক সাম্য হচ্ছে স্থিতিশীল সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর। সমাজকে দৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজের সর্বাংশে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সাম্যনীতি প্রয়োগ করতে হবে।

সেপ্টেম্বর মাসে এক খুনের মামলায় আম্বেদকর সেসনকোর্টে বিচারের ব্যাপারে রত্নগিরি যান। সাভারকার এই সুযোগে আম্বেদকরকে বিটোবা মন্দিরে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কয়েকশো লোকের স্বাক্ষরিত এক আমন্ত্রণপত্র পাঠান। সেখানে সাভারকারপন্থীরা এক সমাজ-সংস্কার সংগ্রামে জয়লাভ করেছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীলেরা এক নিষেধাজ্ঞা জারির চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। সারা শহর জুড়েই ব্যাপারটা আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনই আম্বেদকর বম্বে যাবার জন্য তারবার্তা পেলেন। রত্নগিরি বঞ্চিত হলো দু'জন বিপ্লবীর মূল্যবান বক্তৃতা শোনার সুযোগ থেকে।

সেই বছরই বম্বের এক প্রকাশ্য স্থানে আম্বেদকর গণপতির মূর্তিপূজার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন। দাদার সর্বজনীন গণেশ উৎসবের সভাপতি 'সোস্যাল ইকোয়ালিটি লিগ'কে জানিয়েছিলেন যে, কমিটি গত বছরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন। কাজেই যেখানে মূর্তিপূজা হবে সেই ঘরের মধ্যে বা কাছাকাছি কোথাও অস্পৃশ্য হিন্দুদেরকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। মূর্তিপূজার দিন সকালে পরিবেশ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উৎসবের কর্মকর্তারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন। তাঁরা পুলিশ ডাকেন এবং প্যাণ্ডেলে গুণ্ডাবাহিনী বসান। প্যাণ্ডেলের বাইরে প্রায় হাজারখানেক অস্পৃশ্য হিন্দু ভিতরে প্রবেশের দাবি জানাতে থাকেন। আম্বেদকর, বোলে এবং অন্যান্য নেতারা সেখানে উপস্থিত হন। অনেক কষ্টে আম্বেদকর সেই বিপুল জনতাকে শান্ত করেন এবং গোঁড়াপন্থী নেতা ডাঃ জাভলির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। অস্পৃশ্যের নেতা মানুষের সাধারণ অধিকারের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। আলোচনা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। অবশেষে গোঁড়াপন্থী নেতারা যখন দেখেন যে প্রতি মিনিটে জনতার চাপ বেড়েই চলেছে, তখন তাঁরা বিকেল তিনটের সময় তাঁদের সিদ্ধান্ত বদল করেন এবং অস্পৃশ্যরা বিজয়গৌরবের আনন্দে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করেন।

ডঃ পি.জি. সোলাঙ্কি বম্বে প্রেসিডেন্সির দলিত শ্রেণি (অস্পৃশ্য) ও আদিবাসীদের শিক্ষা, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও তাঁদের উন্নতির জন্য সুপারিশ করতে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বম্বে সরকার নিয়োজিত স্টার্টি কমিটির সেই কার্যপ্রণালী নিয়ে আম্বেদকর তখন ব্যস্ত ছিলেন। এ.ভি. ঠক্কর, যিনি ঠক্কর বাপ্পা নামেই অধিক পরিচিত, তিনি আম্বেদকর ও সোলাঙ্কির সঙ্গে ওই কমিটিতে ছিলেন। কমিটির সদস্য হিসাবে আম্বেদকর বেলগাঁও, খান্দেশ ও নাসিক জেলা পরিদর্শন করেন। যদিও তিনি কমিটির সদস্য, তথাপি সেই পরিদর্শনের সময়ে তিনি নিজেই অপমানজনক ব্যবহারের শিকার হন। লোকাল বোর্ডের কোনো প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে শ্রেণিকক্ষে ঢুকতে দেননি। শিক্ষকটি একটি ছাত্রকে শ্রেণিকক্ষে

বসতে না দিয়ে কেন বারান্দায় বসালেন কোনো এক অভিভাবকের এই নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেই স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। কমিটির সদস্যগণ যখন পূর্বখান্দেশ পরিদর্শন করছিলেন তখন দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে।

১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর চল্লিশগাঁওয়ের লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে তাঁদের এলাকায় নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সকল টাঙাচালকই অস্পৃশ্য নেতাকে বহন করে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। অবশেষে বোঝাপড়া করা হলে এক টাঙাচালক একজন অস্পৃশ্যকে টাঙা চালাতে দিতে রাজি হয়। কিন্তু সে লোকটির টাঙা চালানোর অভ্যাস না থাকায় ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছোটায় পাথরের পাকা শানে পড়ে গিয়ে আম্বেদকরের ডান পায়ের একটি হাড় ভেঙে যায়। এজন্য তিনি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন লাঠির সাহায্য ছাড়া তিনি চলাফেরা করতে পারেননি।

স্টার্টি কমিটি ১৯৩০ সালের মার্চমাসে যে রিপোর্ট দাখিল করে, তাতে বলা হয়, দলিত শ্রেণির লোকেরা হিন্দু রীতিনীতি, আইন এবং উৎসবাদি পালন করলেও তাঁরা পৃথকভাবে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় সামাজিক কোনো সুবিধা পান না বলেই দাসত্বই তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে। কমিটি মন্তব্য করে যে, সর্বসাধারণের স্কুলগুলিতে তাঁদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। বৃত্তিসংখ্যা বৃদ্ধি করতে ও মাধ্যমিক স্কুলে দলিত শ্রেণির ছেলেদের জন্য হোস্টেল খুলতে, মিল, রেলওয়ে ওয়ার্কশপে, শিল্পে, শিক্ষালয়ে বৃত্তির ব্যবস্থা, বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং ওই সমস্ত ব্যবস্থার জন্য স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করার সুপারিশ করে।

এ ছাড়াও কমিটি গ্রাম্য কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব, একটি মানিলেণ্ডারস অ্যাক্ট ও মিউনিসিপ্যাল কনজারভ্যান্সি স্টাফদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুপারিশ করে। কমিটি সুপারিশ করে যে, পুলিশ ও মিলিটারিতে দলিত শ্রেণির লোকদের নিয়োগ করতে হবে এবং শহরে তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিটি মন্তব্য করে যে, পতিত ও বনাঞ্চলের জমি দলিত শ্রেণির লোকদের দিতে হবে এবং তাঁদের উন্নতির জন্য শুক্কুর বাঁধের জমিরও সদ্ব্যবহার করতে হবে।

দুর্ঘটনার জন্য আম্বেদকর যদিও বাইরের কাজ করতে পারেননি, তবু তিনি অলস ভাবেও বসে ছিলেন না। মহামানবদের একটি বড়ো গুণ হলো দুর্দমনীয় উদ্যম। তিনি এই সময় পুরোহিততন্ত্র বিলোপের জন্য একটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে 'বম্বে ক্রনিকল' পত্রিকায় একজন পারসি ভদ্রলোক পারসি পুরোহিতের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি পুরোহিত প্রথা বিলুপ্তিকরণের জন্য একটি সংস্থা গঠনের উপর জোর দেন ।

আন্দোলনকে সমর্থন করে "একটি পৌরোহিত্য বিরোধী সংস্থা প্রয়োজন"

(Wanted an Antipriest Craft Association) নাম দিয়ে আম্বেদকর ‘বম্বে ক্রনিকল’ পত্রিকায় লেখেন যে, নৈতিক চরিত্রে, শিক্ষায় বা অন্য কোনো দিক থেকেই হিন্দু পুরোহিতেরা পারসি পুরোহিতদের চেয়ে উন্নত নয়। আরোপিত অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বংশানুক্রমিক হিন্দু-পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ অসংখ্য ও ভয়াবহ। পুরোহিত প্রথা সভ্যতার একটি বাধা স্বরূপ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পরিবারের পিতা হয় এবং যথা সময়ে মারা যায়। কিন্তু সারাজীবন দুষ্ট দৈত্যের মতো পুরোহিতের ছায়া তার জীবনটাকে ঢেকে রাখে।

পৌরোহিত্য কর্মে রত পুরোহিতদেরকে আম্বেদকর মানবতার দুর্ভাগ্যজনক নমুনা বলে অভিহিত করে বলেন যে, অদৃশ্য শক্তি এবং অসহায় মানুষের মাঝখানে থেকে প্রতারণার চর্চা করে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। বিয়ের মতো আনন্দোৎসব হোক বা মৃত্যুর মতো দুঃখজনক ঘটনাই হোক, সে সমানভাবেই সুযোগ নেয়, যেন তারা পুরোহিতের বলির পাঁঠা। পারসি লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লেখেন, একজন মৃত পারসি জীবিত পারসির চেয়ে আর্থিক দিক দিয়ে পরিবারের বেশি বোঝাস্বরূপ। উপসংহারে তিনি পুরোহিততন্ত্র থেকে ভারতকে মুক্ত করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষিত হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের কাছে আবেদন জানান।

এই সময় পুনার দলিত শ্রেণির নেতা শিবরাম জানবা কাম্বলে এবং রাজভোজ, বর্ণহিন্দু নেতা ভি.ভি. সাঠে, দেশদাস রানাডে, জি.এন. কানিতকার, কেশবরাও জেধে, ও এন.ভি. গ্যাডগিল (পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় খনি ও ওয়ার্কস মন্ত্রী হন) প্রমুখদের সাথে আলোচনা শেষে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পুনার পার্বতীদেবীর পূজায় দলিত শ্রেণির অধিকার লাভের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করেন। মন্দির প্রবেশের বিরোধীরা ভয় দেখিয়ে চিৎকার করে সত্যাগ্রহীদের পাথর ছোঁড়ে। তার ফলে গ্যাডগিল, রানাডে ও আর্যসমাজী নেতারা আহত হন, রাজভোজ গুরুতর আহত হলে তাঁকে হাসপাতালে নিতে হয়।

জনসাধারণের বিভিন্ন সভায় সত্যাগ্রহীদের প্রতি গোঁড়া হিন্দুদের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। আম্বেদকর ‘স্টার্টি কমিটি’র কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং বর্ণহিন্দুদের দ্বারা সত্যাগ্রহ পরিচালিত হচ্ছিল বলে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলেন। তথাপি বম্বের একটি সভায় তিনি উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বলেন, বম্বের দলিত শ্রেণির লোকদের মানবিক অধিকার লাভের সংগ্রামে কেবলমাত্র আন্তরিক সমর্থন করলেই চলবে না, আর্থিক সাহায্য দেওয়া ও প্রয়োজনে সত্যাগ্রহীদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য দলে দলে পুনায়ও যেতে হবে। আম্বেদকর বলেন যে, যাঁরা বলেন, “ধৈর্য ধরুন ও স্পৃশ্যদের (বর্ণহিন্দুদের) হৃদয় পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকুন”, তাদের নিন্দা না করে পারা যায় না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে

ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেবার শেষ কথা শুনিয়ে দিয়েছে। আম্বেদকর কড়াভাবে বলেন, “সে ক্ষেত্রে দলিত শ্রেণির লোকদের মন্দির-প্রবেশের মতো সামান্য মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করতে বলাটা কি ঠিক?” শেষে তিনি বলেন যে, তিনিও বম্বের সমতা সংঘের সভাপতি হিসাবে সত্যাগ্রহ করে দেখাবেন যে সাফল্য লাভ হয়েছে।

এই সত্যাগ্রহ পুনায় প্রথম নয়, সাভারকার ওই রকমের সত্যাগ্রহ রত্নগিরিতে করেছেন। ওই প্রকার সত্যাগ্রহ করওয়ার, অমরাবতী এবং বাংলার মুন্সীগঞ্জ ও খুলনায় হয়েছিল। পুনা সত্যাগ্রহ আরম্ভ হলেও মন্দির বন্ধ করে দেওয়ায় তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তবে এই বিষয়ে আন্দোলন শুরু করার ভাবনা কিন্তু আম্বেদকর পরিত্যাগ করেননি।

নবম পরিচ্ছেদ

বিশ্ব-মতামতের বিচারালয়ে

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক হিসাবে করমচাঁদ গান্ধি দেশের মুক্তির জন্য সত্যাগ্রহ (অসহযোগ) আন্দোলন শুরু করেন। সমগ্র দেশ এক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। অগণিত মানুষ পুলিশের গুলির মুখে পড়েন ও কারাবরণ করেন।

গান্ধির ডাণ্ডি অভিযানের দশদিন আগে ভারতের সামাজিক আন্দোলনের জনক আম্বেদকর নাসিকে মন্দির-প্রবেশের আন্দোলন শুরু করেন। নাসিকের দলিত শ্রেণির জনগণ একটি সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করে সমিতির সম্পাদক ভৌরাও গাইকোয়াড়ের মাধ্যমে বিখ্যাত কালারাম মন্দিরের ট্রাস্টিকে জানিয়ে দেন যে, যদি তাঁরা একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ওই মন্দিরের দরজা অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে না দেন, তবে তাঁরা সত্যাগ্রহ করবেন। ওই একই সময়ে নাসিকে শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে দলিত শ্রেণিকে পূজা দেওয়ার জন্যও ডাক দেওয়া হয়। সত্যাগ্রহ কমিটির ওই ডাকে সাড়া দিয়ে নাসিকের দলিত শ্রেণির পনের হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও প্রতিনিধি এক সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে এসে সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দত্তরাও নায়েক, রাজভোজ, শিবতর্কার, পতিত পাবন দাস এবং বি.জি. খের।

১৯৩০সালের ২ মার্চ রবিবার আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সকাল দশটায় এক সভা হয়। বিকেল তিনটেয় সমবেত জনতা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে এক মাইলের উপরে দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রার আগে আগে বাজছিল সামরিক কায়দায় ব্যাণ্ড, তার পিছনে একদল স্কাউট, তার পিছনে পাঁচশো নারী-সত্যাগ্রহী ও তার পিছনে জনতার এক বিশাল বাহিনী। সেই শোভাযাত্রা যখন মন্দিরের পূর্বদিকের গেটের কাছে আসে তখন জেলাশাসক, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, সিটি-ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে এসে উপস্থিত হন। মন্দিরের সব ক'টি গেট বন্ধ থাকায় শোভাযাত্রীরা গোদাবরী ঘাটের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে শোভাযাত্রা সভায় পরিণত হয়।

রাত এগারোটায় নেতৃবৃন্দ সবদিক বিবেচনা করে মন্দিরের প্রত্যেক গেটে অহিংস সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩০ সালের ৩ মার্চ এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথম দলে চারটি গেটে ১২৫ জন পুরুষ ও পঁচিশজন করে মহিলা নিযুক্ত হন। আট হাজারের বেশি সত্যাগ্রহী ওই পালা পূরণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সত্যাগ্রহীরা যখন স্তোত্র পাঠ ও ভজন গান করে প্রবেশদ্বারে পৌঁছান তখন তিন হাজারের বেশি অস্পৃশ্য সমবেত হন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা

করার জন্য দু'জন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট সকাল থেকে সেখানে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রেনাল্ডস মন্দিরের ঠিক সামনে তাঁর অফিস বসিয়েছিলেন।

মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকায় স্পৃশ্য হিন্দুরাও প্রবেশ করতে পারছিলেন না। নেতৃবৃন্দ এই অবস্থা দূর করার জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বর্ণহিন্দুদের জন্য দরজা খোলা হলে একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হত।

রাতে শঙ্করাচার্য ডঃ কুর্তকোটির সভাপতিত্বে নাসিকে একটি সভা বসে। কিন্তু গোঁড়াপন্থীদের প্রাধান্যের জন্য সেই সভা নারকীয় হয়ে ওঠে। গোঁড়াপন্থীরা ভয়ঙ্কর ভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সভায় জুতো ও ঢিল ছুঁড়তে থাকে। তাদের মনোভাব এমন যে, স্বয়ং রামচন্দ্রও যদি অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দির খুলে দিতে বলতেন তবে তাঁকেও ছুঁড়ে ফেলা হত।

সত্যাগ্রহ একমাস ধরে চলে। ৯ এপ্রিল রামচন্দ্রের রথযাত্রা। বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে উভয় সম্প্রদায়ের পালোয়ানেরা রথ টানবে। ওই দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার লোক দুপুরে প্রধান গেটের কাছে জমায়েত হন। আম্বেদকর তাঁর নির্বাচিত পালোয়ানদের সাথে গেটের কাছে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁরা রথ ছোঁয়ার আগেই দাঙ্গাবাজ বর্ণহিন্দুরা কলহ বাধিয়ে দেয় এবং গোপন পরিকল্পনা অনুসারে একটা সরু কণ্টকময় খারাপ রাস্তায় রথ নিয়ে যায়, যার গেটে সশস্ত্র পুলিশ ছিল। কাদ্রেকর নামে এক ভাণ্ডারি সম্প্রদায়ের যুবক পুলিশের ঘেরাটোপ ভেদ করে এগিয়ে যান। মুহূর্তের মধ্যে অস্পৃশ্য জনতা অনবরত পাথর ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে রথের পিছু নিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে। ভয়ানক আহত কাদ্রেকর রক্তাক্ত হয়ে যান। আম্বেদকর তাঁর লোকজনদের সাহায্যে রক্ষা পেলেন কিন্তু তাঁর ছাতাটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি অল্প আঘাত পান। শহরে অস্পৃশ্য ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অবাধ মারামারি চলতে থাকে।

ওই সত্যাগ্রহে সমস্ত জেলার বর্ণহিন্দুদের মনে বিষময় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সমস্ত হিন্দুর সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করায় অস্পৃশ্য ছাত্রদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাঁদের রাস্তা বন্ধ করা হয় ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসও তাঁদের দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। কোনো কোনো গ্রামের অস্পৃশ্যরা নিগৃহীতও হন। এই দুর্ভোগের মধ্যেও নাসিকের সংগ্রাম চলতে থাকে। মিটমাটের জন্য ডঃ মুঞ্জে এবং শঙ্করাচার্য ডঃ কুর্তকোটি একটা চেষ্টা করেন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি কোটিপতি বিড়লাও আম্বেদকরের সাথে দেখা করেন। কিন্তু দলিতেরা এত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে, গোঁড়া হিন্দুরা সারাবছর সেই মন্দির বন্ধ রাখেন এবং ১৯৩৫ সালের অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলন চলতে থাকে।

নাসিক সত্যাগ্রহ চলার সময় সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরপরই দলিত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা ভাবেন। সেই অনুসারে কে.জি. নাদগুলির সভাপতিত্বে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি পুনার নেতা কাম্বলের সাথে আলোচনা করে নাগপুরে দলিত শ্রেণির সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং আম্বেদকর সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই সাথে সর্বসম্মতিক্রমে গোলটবিল বৈঠকে দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে আম্বেদকরকে লণ্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

দীর্ঘদিন পরে ১৯৩০ সালের মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিশন ভারতীয় শক্তি, জাতীয়তা ও লক্ষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা দেখিয়ে ভারতীয় মতকে উপেক্ষা করে। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে চুক্তি না করেই পৃথক নির্বাচন সমর্থন করে। নেহরুর রিপোর্ট সমাধান সম্মত পথ নয় বলে কমিশন মন্তব্য করে।

কমিশন কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে অস্পৃশ্যসহ হিন্দুদের ২৫০ টি আসনের মধ্যে শতকরা ৬০ হিসাবে ১৫০ টি আসন নির্ধারণ করে। তারা অস্পৃশ্যদের জন্য যৌথ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নরের কাছ থেকে নেওয়া যোগ্যতা সম্পর্কীয় শংসাপত্র ছাড়া দলিত শ্রেণির কেউ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না।

বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকার দরুণ আইনসভার দৈনন্দিন কাজে আম্বেদকর বেশি উৎসাহ দেখাতে পারেননি। বম্বে আইনসভার ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের অধিবেশনে মাত্র পাঁচদিন তিনি যোগ দেন। নাসিক সংগ্রাম নিয়েই তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। মাধ্যমিক স্কুলের সাহায্যের ব্যাপারে একবারই তিনি বিতর্কে অংশ নেন।

১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট আম্বেদকরের সভাপতিত্বে নাগপুরে দলিত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ স্বায়ত্ব শাসিত জাতিরূপে গঠিত হওয়া সম্ভব। যদি যুগোশ্লাভিয়া, এস্টোনিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লুথানিয়া এবং রাশিয়া তাদের জাতি, ভাষা, কৃষ্টি, বিশ্বাসের বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও একটি স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হতে পারে, তবে ভারতের পক্ষেও তা সম্ভব। তিনি এই কথার উপর জোর দেন যে, অবস্থার বৈষম্য ও জাতিবৈষম্য চিন্তা করেই স্বায়ত্ব শাসিত ভারতের সংবিধান রচনা করতে হবে। অল্প সংখ্যক বর্ণহিন্দুর হাতে বেশি ক্ষমতা অর্পিত হওয়ার আশঙ্কার কথাও বলেন তিনি।

কোনো দেশকে অন্য দেশ শাসন করলে যেমন সে দেশের মঙ্গল হয় না, তেমনি কোনো শ্রেণিকে অন্য শ্রেণি শাসন করলেও তাঁদের মঙ্গল হয় না। প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি যেমন বর্তমান গণতান্ত্রিক দেশের মৌলিক নীতি,

তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিও একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বায় বিশ্বাসী। সুতরাং জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য তাকে সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু ভারতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির শাসিত রাষ্ট্রে এর বিপরীতটাই লক্ষিত হয়। তাই এই বিশ্বাসও ভ্রমাত্মক যে, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণ হবে দু'টি কক্ষে অবস্থিত মানুষের মতো, তাদের কোনো যোগাযোগ থাকবে না। ভারতের বড়োলোকদের দল যাঁরা ক্ষমতার জন্য চিৎকার করেন, তাঁরা অস্পৃশ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দায়ী, যার জন্য ছয় কোটি মানুষ মানবিকতার প্রাথমিক অধিকার এবং সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। সমসংখ্যক আদিবাসী ও পার্বত্যজাতিও বর্বর যাযাবরের মতো জীবন যাপন করে। সেজন্য আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য সংবিধানে যথেষ্ট রক্ষকবচের ব্যবস্থা রাখা এবং সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য দাবি জানান।

সাইমন কমিশনের সুপারিশ ছিল দলিত স্বার্থের পরিপন্থী। এতে দলিত শ্রেণির যোগ্যতা সম্পর্কে গভর্নরের অনুমোদন দরকার। এমনকি তিনি তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে অ-দলিত কাউকেও মনোনীত করতে পারবেন, এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বজ্রকণ্ঠে আম্বেদকর বলেন, "এটা একটা মনোনয়ন ছাড়া কিছু নয়। যদি কোনো নির্বাচন কেন্দ্রে তিনি মাত্র এক জনকে পছন্দ করেন, তবে সেখানে কোনো নির্বাচন হবে না।" সেজন্য আম্বেদকর তাঁর লোকদের উপদেশ দেন, "কোনো শর্ত বা বাধানিষেধশূন্য ভাবে আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আমাদের হাতেই দিতে হবে, আমরাই আমাদের স্বার্থ ঠিক করার শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং আমাদের ভালোমন্দ বিচারের ভার আমরা গভর্নরের উপরও দিতে পারি না।"

আম্বেদকর ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে বলেন,"আমার বিবেচনায় পূর্ণ স্বাধীনতার বিপদের ঝুঁকির চেয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাস অপেক্ষাকৃত ভালো, কারণ সেখানে স্বাধীনতার বিষয় আছে।"

গান্ধির জাঁকজমকপূর্ণ ডাণ্ডি অভিযানের সময়কার অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে হাজার হাজার লোকের কারাবরণের জন্য আম্বেদকর তার বিরোধিতা করে বলেন যে, এটা সময়োচিত নয়।

অসহযোগ আন্দোলন হচ্ছে একটি বৃহদাকার গণ-আন্দোলন। এর পরিণতি দমনমূলক আচরণ ও একটি পলায়নপর ক্রিয়া। যদি বিপুল আকারে এটি অনুষ্ঠিত হয়, তবে বিপ্লবে পরিণত হয়। রক্তপাতযুক্ত অথবা রক্তপাতহীন বিপ্লবে কোনো পার্থক্য নেই, এর দ্বারা একটা অনিশ্চিত পরিবর্তন আনীত হয়, বিশৃঙ্খলা ও বিপদ ঘটে। বিপ্লব প্রায়ই অনিবার্য হয়ে ওঠে। সব সময় খেয়াল রাখা উচিত যে ওই বিপ্লব সামাজিক কল্যাণকর পরিবর্তনের বদলে যেন অকল্যাণকর না হয়। বিপ্লব একটি দলের হাত থেকে অন্য দলের কিংবা এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির হাতে

ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। অর্থহীন পরিবর্তনে দলিত শ্রেণির সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। ক্ষমতা এমনভাবে হস্তান্তরিত হওয়া উচিত, যাতে ক্ষমতা সকলের মধ্যে বণ্টনের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত পরিবর্তন সাধিত হয়।

কিন্তু ভারতের দলিত শ্রেণির নেতা আম্বেদকর নাগপুরে ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমা করেননি। রানাডের মতো তিনিও ভারতে ব্রিটিশের আগমন ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করতেন। বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কারণ স্বরূপ মনে করতেন, যা ভারতবাসীকে তার সামাজিক আচার-আচরণের জন্য লজ্জাবোধ জাগিয়ে তুলেছে; নৈতিকতা এবং সামাজিক নতুন মূল্যায়ন ও সর্বসাধারণের জন্য একই সরকার ও আইনের আওতায় এনেছে। তথাপি তিনি নির্ভীকভাবে ব্রিটিশ শাসনের অত্যধিক ব্যয়বাহুল্যের কথা বলে তাঁর লোকদের বলেন যে, পৃথিবীর কোনো দেশে ভারতবাসীর মতো দারিদ্রপীড়িত লোক দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ভারতে ব্রিটিশ সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন পাঁচটা দুর্ভিক্ষে দশলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে ছ'টি দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। শতাব্দীর শেষার্ধে আঠারোটি দুর্ভিক্ষে দেড় কোটি থেকে দু'কোটি ষাট লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। যদিও তিনি আইন-শৃঙ্খলার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা করেন, তথাপি দেশের দারিদ্রের স্থায়িত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সুনিশ্চিত আচরণকেই দায়ী করেন। "কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে, দলিত শ্রেণিসহ দেশের সব মানুষ আইন-শৃঙ্খলার জন্য বেঁচে থাকেন না, তাঁরা বেঁচে থাকেন খাদ্যের জন্য।"

আম্বেদকর তাঁর লোকদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, যতক্ষণ ব্রিটিশের হাতে ক্ষমতা আছে, তাদের অন্যায়কে ন্যায্য ভাবা ঠিক নয়। তিনি বলেন, "কেবলমাত্র স্বাধীন সংবিধানেই আপনারা রাজনৈতিক শক্তি লাভ করতে পারেন। অন্যথায় আপনাদের মুক্তি আসবে না। অতীত যেন মনটাকে অধিকার করে না ফেলে। কোনো ভয় বা কৃপালাভের দ্বারা আপনারা চালিত হবেন না। আপনাদের শ্রেষ্ঠ সুযোগের কথা ভাবুন, তাহলে আমি নিশ্চিত যে আপনারা স্বাধীনতাই চাইবেন।"

আম্বেদকর আরও বলেন, কংগ্রেস এ কথা ঘোষণা করেনি যে, কংগ্রেস সদস্যদের বিশেষত্ব হবে অস্পৃশ্যতা দূর করাÑ এ কথা মেনে নিলে তবেই তাকে সদস্যপদ দেওয়া হবে। গান্ধিও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কোনো ধর্মযুদ্ধ করেননি কিংবা স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে কোনো সহৃদয়তা বৃদ্ধির জন্য কোনো অনশনও করেননি। দলিত শ্রেণির নিরাপত্তা রয়েছে সরকার ও কংগ্রেসের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার মধ্যে। তিনি ঘোষণা করেন, "আমাদের কাজ আমরাই ঠিক করব, আমরাই করব।" একটা কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমেই তাঁদের দুঃখদুর্দশার কথা বলতে হবে। যুগ যুগ ধরে তাঁরা মূক রয়েছেন। ন্যায়ত সরকার বা সংস্কারকদেরকে তাঁরা দোষারোপ করতে পারতেন না।

আম্বেদকর বলেন যে, কংগ্রেস একটি জাতীয় আন্দোলন, কোনো রাজনৈতিক দল নয়। তাঁর মোটেই সন্দেহ নেই যে, পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলে তাঁরা অনেকেই নানা শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যাবেন, জনতার সাথে থাকবেন না।

যদিও আম্বেদকর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য জোর দিয়েছিলেন, তবু তিনি বলেনÑ "আমি এই সুযোগে এ কথার উপরে জোর দিচ্ছি যে, দলিত শ্রেণির দুর্ভোগের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাই সর্বরোগহর ওষুধ নয়। সামাজিক উন্নয়নের উপরে তাঁদের মুক্তি নির্ভর করে। তাঁদের খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। তাঁদের জীবন যাত্রার খারাপ অভ্যাসের উন্নতি করতে হবে। তাঁদের জীবনধারার মাধ্যমেই তাঁদের সম্মান ও বন্ধুত্ব অর্জন করতে হবে। তাঁদের শিক্ষিত হতে হবে। শুধু অক্ষরজ্ঞানই সব নয়, উচ্চতর জ্ঞানলাভের জন্য তাঁদের এভাবে উঠতে হবে যে, তাঁদের জাগরণের সাথে সাথে অনেকেই একটা সাধারণ স্তরে উন্নীত হবেন।"

সবশেষে আম্বেদকর বলেন,"এই আন্দোলন আমাদের জনগণের মুক্তি আনবে এবং আমাদের দেশে এমন একটা সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হবে যার ফলে জীবনে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকÑ সকল ক্ষেত্রেই একটি লোকের একটি মূল্যই নির্ধারিত হবে।"

অস্পৃশ্যদের পরিচালিত এই আন্দোলন পুরোনো পন্থাকে বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের একটা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। এই আন্দোলনের প্রথম স্তরে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারকে স্বাধীনতা মঞ্জুর না করতে আবেদন করেছিলেন। আম্বেদকেরর নেতৃত্ব গ্রহণের পর তাঁরা সামাজিক সাম্য ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন এবং ১৯৩০ সালে তাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ঘোষণা করেন। আম্বেদকর এই সম্মেলনে অন্য একটি বিশেষ বিবৃতি দেন যে, বর্ণহিন্দুদের দ্বারা যতই নির্যাতিত হোন না কেন, তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবেন না।

আম্বেদকর সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বলে কয়েকটি সংবাদপত্র তাঁর এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানায়। আম্বেদকরের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি তাঁর বক্তৃতায় আলো এবং উত্তাপ বিকিরণ করতেন। বিশ্ব ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের সমস্যা সম্পর্কে যখন কথা বলতেন তখন কোনো তিক্ততা তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করতে পারত না। যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি তিনি পর্যালোচনা করতেন তখন তাঁর বক্তব্য ছিল উপদেশপূর্ণ, তীব্র, কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমও অপ্রকাশিত থাকতো না।

ঘোষণা অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের দাবি পূরণের জন্য ভারতের

সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

গোলটেবিল বৈঠক উননব্বইজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে তিনটি ব্রিটিশ দল থেকে ষোলোজন, অসহযোগী কংগ্রেস বাদে বিভিন্ন ভারতীয় দলের তিপ্পান্নজন, দেশীয় রাজ্য থেকে কুড়িজন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে উদারনৈতিক হিন্দু দলের তেরোজন Ñ তেজবাহাদুর সপ্রু, মিঃ আর. জয়াকর, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং সি.ওয়াই. চিন্তামণি। মুসলিম প্রতিনিধি ছিলেন Ñ এইচ.এইচ. আগাখান, স্যার মহম্মদ সফি, মহম্মদ আলি জিন্না এবং ফজলুল হক, শিখদের প্রতিনিধি উজ্জ্বল সিং, হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি ডঃ বি.এম. মুঞ্জে এবং খ্রিস্টান প্রতিনিধি কে.টি. পল। আলোয়ার, বরোদা, ভূপাল, বিকানীর, কাশ্মীর, পাতিয়ালার শাসক এবং স্যার আকবর হায়দরী, স্যার সি.পি. রামস্বামী আয়ার এবং মির্জা ইসমাইল দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্যার এ.পি. পাত্র, ভাস্কর রাও, ভি. যাধব অন্যান্যদের স্বার্থ দেখেন। আম্বেদকর এবং রায় বাহাদুর শ্রীনিবাসন দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন।

আম্বেদকর ১৯৩০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভাইসরয়ের কাছ থেকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ পান। গোলটেবিল বৈঠক অস্পৃশ্যদের পক্ষে ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ, এই সম্মেলনেই অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের সংবিধান রচনায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হয়। দু'হাজার বছরের মধ্যে এবারই প্রথম তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তাও মাতৃভূমির শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে।

১৯৩০ সালের ২ অক্টোবর বম্বের অস্পৃশ্যরা আম্বেদকরের নিঃস্বার্থ সেবার জন্য ইংলণ্ড রওনা হবার সময় কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ একটি জমকালো বিদায় অভিনন্দন জানান এবং একটি টাকার তোড়া ও মানপত্র উপহার দেন। সভার সভাপতি ডঃ সোলাঙ্কি এবং বোলের মতো অন্যান্য বক্তাগণ তাঁর উচ্চাঙ্গের মানসিকতা ও নৈতিক গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে ডঃ আম্বেদকর বলেন যে, সামান্য যা কিছু তিনি লাভ করেছেন তা তাঁর অসংখ্য কর্মী ও সহযোগীদের সাহায্যেই করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আইনসভায় ডঃ সোলাঙ্কির অকপট কর্মের প্রশংসা করেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর ডানহাত দেওরাও নায়েকের প্রশংসা করে বলেন, তিনিই তাঁর অনুপস্থিতিতে আন্দোলন পরিচালনা করবেন। যে শঙ্কররাও এস. পার্শা এই আন্দোলনের জন্য অজস্র টাকা খরচ করেছেন, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দেন এবং সেইসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পাক্ষিক 'বহিষ্কৃত ভারত'-এর জায়গায় 'জনতা' নামে শীঘ্রই একটি পত্রিকা বের হবে।

গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন যে, এটা সুনিশ্চিতভাবে দলিত

শ্রেণির অগ্রগতি। তিনি বলেন, দলিত শ্রেণিসহ সকল দলেরই লক্ষ্য হচ্ছে স্বরাজ। পার্থক্য হচ্ছে সংবিধানের প্রকৃতি ও সংবিধানে সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে যে, ওই ক্ষমতা কি নগণ্য সংখ্যক সংখ্যালঘুদের হাতে থাকবে, না সকল শ্রেণির হাতে থাকবে? "আমার কথা বলতে হলে আমি আমার জনগণের অধিকার সম্পর্কে কথা বলব, সেইসঙ্গে আমি স্বরাজের কথা অবশ্যই বলব।" তিনি তাঁর লোকদেরকে কথা দেন যে, তিনি জার্মানী, রাশিয়া, জাপান ও আমেরিকার নেতা ও প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করবেন এবং নিপীড়িত ভারতীয়দের সমস্যা তাদের কাছে তুলে ধরবেন। সম্ভব হলে জাতিসংঘে তাদের সমস্যা তুলে ধরবেন। সবশেষে তিনি তাঁর কর্মীদের আত্মকলহ সম্পর্কে সাবধান করে বলেন যে, নেতৃত্বের লোভ তাঁদের ক্ষমতাকে দুর্বল করবে, তাঁদের পরিস্থিতি খারাপ হবে এবং লক্ষ্যপূরণ হবে না।

১৯৩০সালের ৪ অক্টোবর আম্বেদকর 'এস.এস. ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া' জাহাজে বম্বে ত্যাগ করে লণ্ডন রওনা হন। তাঁর বিদায়ের পক্ষে সময়টা ভালো ছিল না। সমস্ত দেশ তখন গোলমালের মধ্যে। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ সৎভাবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করেন, কংগ্রেস কর্মীরা তাঁদের ঘৃণা করেন, গালি দেন এবং অভিশাপ দেন। পরিস্থিতি এতই উত্তেজনাপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল যে, ৮ অক্টোবর আম্বেদকর এডেন থেকে তাঁর বিশ্বাসী সহযোগী শিবতর্কারকে লেখেন যে, তিনি তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন। তিনি তাঁদের সাবধানে কথা বলতে ও চলতে বলেন এবং রাত্রে সমস্ত কাজ বন্ধ রাখতে বলেন। তিনি লোহার বার দ্বারা পার্টি অফিস বন্ধ রাখতে বলেন এবং তাঁদের সংগঠনের সাথে বিবাদ করা বম্বের কয়েকজন দলিত শ্রেণির নেতার উপর নজর রাখতে বলেন।

আম্বেদকর আবার শিবতর্কারকে চিঠি লেখেন তাঁর ছেলে যশোবন্তকে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম শিক্ষা দেবার জন্য এবং একজন নির্দিষ্ট অফিসারকে তাঁর দু'জন লোকের চাকরি বিষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেন। কংগ্রেসের কোনো লোক যদি তাঁদের আক্রমণ করে কিংবা কারও সাথে যদি বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে সে খবর তাঁকে মার্সেলিস-এর ঠিকানায় জানিয়ে দিতে বলেন।

প্রকৃতপক্ষে কোনো নেতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করলে তাঁর পক্ষে সময়টা ছিল প্রতিকূল। যে সমস্ত উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক বিষয়ে ধীরগতি সম্পন্ন, তাঁদের প্রতি কংগ্রেসের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ অধৈর্য প্রকাশ করেন। কিছু কংগ্রেসিদের মতে দেশপ্রেমিক শুধু কংগ্রেস সদস্যরাই। সেইজন্য গোলটেবিল বৈঠকের সময় যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের ওই কংগ্রেসিরা বোকা, গোলাম, ব্রিটিশের দালাল, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

সুভাষ বসু পর্যন্ত আম্বেদকরকে আক্রমণ করেছেন এই বলে যে, "ব্রিটিশ সরকার আম্বেদকরকে নেতা বানিয়েছেন, যেহেতু জাতীয়তাবাদী নেতাদের হতবুদ্ধি করতে তাঁকে কাজে লাগানো প্রয়োজন।" **এটা কংগ্রেসকর্মীদের একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র যে, যেখানে মুসলিম ও ব্রিটিশরা জড়িত, সেখানে তাঁরা অহিংস, কিন্তু অন্য কোনো ভারতীয় দলের কথা উঠলে সেখানে তাঁরা বদ্ধমূল ঘৃণা ও হিংসাপরায়ণ। সেইজন্য কংগ্রেসি পত্রিকাগুলি মুসলিম প্রতিনিধিদের প্রতি ক্রোধ বা কটূক্তি প্রকাশ করেই না বললে চলে, মুঞ্জে, সপ্রু ও জয়কারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে কিছু করে; কিন্তু আম্বেদকরের বিরুদ্ধে সব সময়ই করে।** ১৯৩০ সালের আন্দোলনের বিষয় গোলটেবিল বৈঠকে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও ডঃ মুঞ্জে তাঁদের বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

১৯৩০ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি লণ্ডনে পৌঁছে অস্থায়ীভাবে ৮ নং চেস্টারফিল্ড গার্ডেনস, মেফেয়ার, লণ্ডন W.I.-এ থাকেন। সেজন্য তাঁর লোকদের থমাস কুক অ্যাণ্ড সন, বার্কেলি স্ট্রিট, লণ্ডন W.I. ঠিকানায় চিঠি লিখতে বলেন।

আম্বেদকর লণ্ডনে দলিত সমস্যার পক্ষে সহানুভূতি সম্পন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ দেখতে পান। সেখানে পৌঁছেই তিনি দলিত শ্রেণির সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটেনের প্রখ্যাত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তথাপি তিনি তারবার্তার মাধ্যমে বম্বে আইনপরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সম্পর্কে ও চৌদার পুকুরের মামলার বিচার সম্পর্কে খবর জানার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। করতে হয়। ১৯৩০ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর প্যানভেলের কাছে ছোট্ট গ্রাম চার্নারে কংগ্রেস যে জঙ্গল-সত্যাগ্রহ করে সেখানে মামলাৎদার ও অন্যান্য কয়েকজন লোক গুলিতে মারা গেলে এই মামলা দায়ের হয়। জনগণের বিরুদ্ধে সরকারের এই মামলা হওয়ায় প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এইজন্য সারাভারতের লোকে এই মামলাটি আগ্রহের সাথে লক্ষ রাখতেন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সেশনজজ স্যানজানার আদালতে এই মামলা পরিচালনা করার জন্য মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত আইনজীবীদের ডাকা হয়। বিবাদি পক্ষে ছিলেন বিখ্যাত প্রবীণ টিলাকাইট, আর.পি. কারাণ্ডিকর, ডঃ আম্বেদকর, কে.এন. ধারাপ, রেগে এবং অন্যান্যরা।

আম্বেদকর সঠিক বুদ্ধিমত্তার সাথে এই মামলায় সাক্ষীদের জেরা করেন এবং দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে উচ্চপ্রশংসা লাভ করেন। যে সরকার দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে গোলটেবিল বৈঠকে নির্বাচিত করে সেই সরকারের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে দাঁড়ানোয় ব্যাপারটি মানুষের কাছে বিশেষ প্রশংসা পায়।

২০ জুন মঙ্গলবার আম্বেদকর ৮, ৯ এবং ১০ নং আসামীর পক্ষ হয়ে বিচক্ষণতার সাথে আদালতে যুক্তি প্রদর্শন করলে তা আসামীর পক্ষে যায়। দীর্ঘদিনের পরিচালিত এই জটিল মামলার ফল অবশেষে প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালের ২ জুলাই

জজ ২৯ জন আসামীকে বিভিন্ন সূত্রে সাজা দেন এবং অবশিষ্ট ১৭ জনকে মুক্তির আদেশ দেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালের ১৯ এপ্রিল বম্বের প্যারেলের গোখেল এডুকেশন সোসাইটি হলে আম্বেদকরের আহ্বানে নেতৃবৃন্দের একটি সভা হয়। এন.শিবরাজনের সভাপতিত্বে ওই সভায় বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র থেকে বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। আম্বেদকর গোলটেবিল বৈঠকে যে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে একটি রিপোর্ট সভায় পেশ করেন। রিপোর্টটি উচ্ছসিত প্রশংসার সাথে সভায় গৃহীত হয়। সভাটি ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে দলিত শ্রেণির জন্য যথেষ্ট প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আবেদন করে ও আগামী গোলটেবিল বৈঠকে দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি করে, সেইসঙ্গে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় ভবিষ্যতে দলিত শ্রেণির মন্ত্রী নেওয়ার সুপারিশ করে। এ ছাড়াও এই সভা আইজাক ফুট, লর্ড রিডিং, লর্ড পিল, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিনিধি দলিত শ্রেণির জন্য গোলটেবিল বৈঠকে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

সভার বাইরে রাস্তায় দেশপ্রেমিক বলে দাবি করা কিছু বাজে লোক সভার কাজে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। আম্বেদকর-সেবাদলের শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবীদের তৎপরতায় তা বানচাল হয়ে যায়। উত্তেজিত স্বেচ্ছাসেবকেরা বাধাদানকারীদের নেতা দেওরুখকরকে ধাওয়া করলে সে ডঃ আম্বেদকরের গাড়িতে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষার জন্য বাবাসাহেবকে অনুরোধ করে। আম্বেদকর তাঁর বিরাধী শত্রুকেও আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

গান্ধির সঙ্গে লড়াই

সেই সময় বম্বে সরকার ঘোষণা করে, নতুন লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলিত শ্রেণির জন্য পুলিশ বিভাগের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আম্বেদকরের অবিরাম চেষ্টা সফল হলো। সামান্য শুরু হলেও অর্থনৈতিক ও মৌলিক দিক দিয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আম্বেদকরের শক্তিকে এখন হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে। তিনি যে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, ভারতে যে কাজ করেছেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে যে সম্মান পেয়েছেন, তাতে দলিত শ্রেণির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসিদেরও একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষিত হলো। মাদ্রাজের একটি সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু বলেন যে, কংগ্রেসের লোকেরা কখনও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের বিশ্বাসঘাতক বা দেশদ্রোহী বলেননি, বলা হয়েছিল যে তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি নন। অন্য একটা বিশেষ পরিবর্তন হলো এই যে, আগামী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য গান্ধি তাঁর শর্তগুলির ব্যাপারেও অনেকটা পিছিয়ে এসেছেন।

জুন মাসে কোচিন রাজ্যের ত্রিচুরের অস্পৃশ্যরা কংগ্রেসিদের সাথে মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত কিনা, সে সম্পর্কে আম্বেদকরের পরামর্শ চাইলে আম্বেদকর তাঁদের কংগ্রেসের উপর নির্ভর না করতে উপদেশ দেন। কারণ, তাতে তাঁদের সম্মান ক্ষুণ্ন হবে, নিজেদের চেষ্টায়ই তাঁদের স্বাধীনতা লাভ করতে হবে।

এই সময়ে 'ডঃ মাহমুদ' ছদ্মনামে এম.এন. রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) ভারতের নেতাদের খবরাখবর জানতে আম্বেদকরের সাথে তাঁর বম্বে অফিসে এসে দেখা করেন। তাঁরা ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন, কিন্তু আম্বেদকর বুঝলেন যে, ডঃ মাহমুদ অস্পৃশ্যদের সমস্যা সম্পর্কে কিছুই চিন্তাভাবনা করেন না। অতিথিটি যাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, সেই ডি.ভি. প্রধানকে পরে আম্বেদকর বলেন যে, তাঁকে দেখে একজন বাঙালি বলেই মনে হয় এবং উত্তর প্রদেশের মুসলিম নেতা বলে যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সত্যি নয়। এর একপক্ষকাল পরেই ডঃ মাহমুদ এম.এন. রায় পরিচয়ে গ্রেপ্তার হন।

এই সময় কংগ্রেসিরা বহিরাগত নেতাদের সঙ্গে সহিষ্ণুতা ও সত্যের পরিচয় দেওয়া এবং অকংগ্রেসি ও অমুসলিম নেতৃবর্গের সাথে অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণার ভাব দেখায়। অস্পৃশ্যদের জন্য তাঁর তৈরি বোর্ডিং পরিদর্শনের জন্য আম্বেদকর আহমেদাবাদ

গেলে স্টেশনে কংগ্রেসিরা তাঁকে কালো পতাকা দেখায়।

এই সময় জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধিদের নাম ঘোষিত হয়। আম্বেদকর, শাস্ত্রী, সপ্রু, জয়কার, শেতলবাদ, মালব্য, সরোজিনী নাইডু, গান্ধি, মির্জা ইসমাইল, জিন্না, রামস্বামী মুদালিয়ার ও অন্যান্যরা লণ্ডনের এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে আম্বেদকরের নাম উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও জনগণের জন্য নির্ভীক যুক্তি ও গণতন্ত্রে বিশ্বাস ব্রিটিশদের ক্ষুব্ধ করেছিল। কিন্তু এবারে ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধান রচনায় সংশ্লিষ্ট ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে তিনি মনোনীত হন।

ভারতের প্রতিটি অঞ্চল থেকে, এমনকি ইংলণ্ড থেকেও আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানানো হয়। বিরোধী সংবাদপত্রগুলিও তাঁর দেশপ্রেম, গণতন্ত্রে নিষ্ঠা ও সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁর উদ্বেগের ব্যাপারে বিশেষ প্রশংসা করে। জেলার একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা, 'কোলাবা সমাচার', যে তাঁর সমাজ সংস্কারের বিরোধিতা করত, সে-ও চার্নার মামলার বিচারের সময় আম্বেদকরের দেশপ্রেমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ওই পত্রিকা সাইমন কমিশনের সময় এবং প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে তাঁর কার্যাবলির প্রশংসা করে বলে যে, আম্বেদকর সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক। দেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি সংগ্রাম করবেন এবং গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্যদেরও সাহায্য করবেন।

ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে মনোনীত হয়েছেন বলে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল' পত্রিকা আম্বেদকরকে অভিনন্দিত করে গভীর শ্রদ্ধা জানায়। পত্রিকা তাঁর সম্পর্কে বলে, "তিনি দেশপ্রেমিক এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য অতি আগ্রহী। ভবিষ্যতে সেনেট ও ফেডারেল এসেমব্লিতে ভোটাধিকারের ব্যাপারে যে আলোচনা হবে, সেখানে দলিত সমাজের এই প্রতিভাবান প্রতিনিধি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবেন।"

'সানডে ক্রনিকল', 'কেশরী' ও অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি আম্বেদকরের মনোনয়নে সন্তোষ প্রকাশ করে। ডঃ আম্বেদকর ও এম.এন. যোশিকে অভিনন্দন জানিয়ে 'সারভ্যাণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি' জার্নাল মন্তব্য করে, "নিম্নশ্রেণি থেকে উঠে আসা একজন শ্রমিক প্রতিনিধি ও অন্যজন দলিত প্রতিনিধি এই দেশের বিবেচনায় উচ্চাঙ্গের রাজনীতিতে নবাগত। তাঁদের উপরেই রয়েছে সকল মানুষের সরল বিশ্বাস, তাঁরা সেই সরল জনগণের স্বার্থেই সংগ্রাম করেন। চারপাশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাসি-বিদ্রুপ তাঁদের শিক্ষানীতি থেকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।" এর আগে 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এর লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের কাজের প্রশংসা করে বলেন যে, আম্বেদকর নির্ভীক, স্বাধীন ও দেশপ্রেমিক নেতা, যাঁর

সাহসিকতা হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের কাছেই অসহনীয় এবং তাঁর গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতাটি ছিল সমস্ত অধিবেশনের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা।"

তখনও স্থির হয়নি যে গান্ধি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন কিনা। বম্বের মালাবার হিলের মণিভবনে অবস্থানরত গান্ধির রাজনীতির কলাকৌশলের দিকেই তখন সকলের নজর। গান্ধি আম্বেদকরের দাবিগুলি কী কী তা জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেজন্য **১৯৩১** সালের ৬ আগস্ট আম্বেদকরের কাছে এক চিঠিতে জানতে চান, রাত আটটায় সময় হলে গান্ধি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। আম্বেদকরের অসুবিধা থাকলে গান্ধিই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন। আম্বেদকর চিঠির উত্তরে গান্ধিকে জানালেন যে, রাত আটটায় তিনি নিজেই গান্ধির সাথে দেখা করতে যাবেন। কিন্তু সন্ধ্যায় প্রবল জ্বর আসায় তিনি খবর পাঠান যে জ্বর কমলেই তিনি গান্ধির সাথে দেখা করতে যাবেন।

১৪ আগস্ট বিকেল দুটোর সময় আম্বেদকর মণিভবনে গান্ধির সাথে দেখা করতে যান। সঙ্গে যান দেওরাও নায়েক, শিবতর্কার, প্রধান, ভৌরাও গাইকোয়াড় ও কাদ্রেকর। চারতলায় আম্বেদকর যখন গান্ধিকে দেখেন, তখন তিনি দলের লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ও ফল খাচ্ছিলেন। ডঃ আম্বেদকর ও তাঁর সঙ্গীরা গান্ধিকে নমস্কার জানিয়ে একটি কম্বলের উপর বসেন।

মুসলিম ও ইউরোপীয়ান নেতা-প্রতিনিধি ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে গান্ধি তাচ্ছিল্যভরেই কথাবার্তা বলেন। ঠিক সেভাবেই তিনি প্রথমে আম্বেদকরের দিকে না তাকিয়ে মিস স্লেড ও অন্যান্যদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আম্বেদকরের লোকদের ভয় হয়েছিল যে, গান্ধির এই অবজ্ঞা আর একটু হলেই একটা বিরোধের সৃষ্টি করবে। তখনই গান্ধি আম্বেদকরের দিকে ফিরে তাকান। এই তাঁকে তিনি প্রথম দেখেন। মামুলি প্রশ্নের পর তিনি মূল বিষয়ে আসেন।

গান্ধি ঃ আচ্ছা, ডঃ, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

আম্বেদকর ঃ আপনার মত শোনার জন্য আমাকে ডেকেছেন। আপনার কী বলবার আছে বলুন। তা না হলে আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব।

গান্ধি ঃ (আম্বেদকরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে) আমি বুঝতে পারছি কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে আপনার কিছু অভিযোগ আছে। আমি আপনাকে বলতে পারি যে, আমার ছাত্রজীবন থেকেই আমি অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে ভাবছি, তখন আপনি জন্মাননি। সম্ভবত আপনি জানেন যে, এই সমস্যাকে কংগ্রেসের কর্মসূচিতে যুক্ত করার জন্য আমি কী প্রচণ্ড চেষ্টাই না করেছি। এটা ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপার এই যুক্তি দেখিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে কংগ্রেস নেতারা আপত্তি করেছেন। তা ছাড়া, অস্পৃশ্যদের উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস অন্তত কুড়িলক্ষ টাকা খরচ করেছে। তাই

আশ্চর্যের এই যে, আপনার মতো লোক কংগ্রেস ও আমার বিরোধিতা করছেন। আপনার বক্তব্যই ন্যায়সঙ্গত হলে তার পক্ষে যদি কিছু বলার থাকে তা বলার স্বাধীনতা আপনার আছে।

আম্বেদকর ঃ মহাত্মাজী, একথা সত্য যে, আমার জন্মের আগেই আপনি অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে ভাবছেন। সকল বৃদ্ধ ও প্রবীণেরা তাঁদের বয়সের উপর গুরুত্ব দিতে পছন্দ করেন। একথাও সত্য যে, আপনার জন্যই কংগ্রেস এ সমস্যার স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলছি যে, কংগ্রেস সমস্যাটির স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি। আপনি বলছেন যে, কংগ্রেস এজন্য কুড়িলক্ষ টাকারও বেশি খরচ করেছে, আমি বলি তা অপচয়ই হয়েছে। ওই পরিমাণ অর্থের সাহায্যে আমি আমার জনগণের আশ্চর্যজনক অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারতাম। সেরকম হলে আপনি আরও আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি যে, কংগ্রেস তার নীতিতে একনিষ্ঠ নয়। যদি কংগ্রেস নিষ্ঠাবান হতো তাহলে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য কংগ্রেসের সদস্য হতে হলে খদ্দর পরা যেমন বাধ্যতামূলক, এটাও তেমনি বাধ্যতামূলক হতো। যে ব্যক্তি কোনো অস্পৃশ্য নরনারীকে তাঁর বাড়িতে কাজে না লাগাবেন অথবা অস্পৃশ্য ছাত্রকে পালন না করবেন কিংবা সপ্তাহে একদিন কোনো অস্পৃশ্য ছাত্রের সঙ্গে আহার না করবেন তিনি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবেন না। যদি এমন কোনো শর্ত থাকতো তাহলে জেলাকংগ্রেস কমিটির সভাপতি অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন, এমন হাস্যকর ঘটনা আপনি এড়াতে পারতেন।

আপনি বলতে পারেন যে, কংগ্রেস শক্তি চায়, সেজন্য এমন শর্ত রাখা বোকামি। তাহলে আমার বক্তব্য, কংগ্রেস নীতির চেয়ে শক্তিই বেশি চায়। আপনার ও কংগ্রেসর বিরুদ্ধে এটাই আমার অভিযোগ। **আপনি বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় না। আমিও বলি যে, আমাদের সমস্যায়ও হিন্দুরা হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন দেখায় না; এবং যতদিন তাঁরা এরূপ কঠোর থাকবেন ততদিন আমরা কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিশ্বাস করতে পারি না। আমরা আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধে বিশ্বাসী**। আমরা বড়ো বড়ো নেতা ও মহাত্মাদের বিশ্বাস করতে রাজি নই। এ বিষয় আমি চরম স্পষ্টবাদী। ইতিহাস বলে যে, মহাত্মারা চলন্ত প্রেতাত্মার মতো ধূলিই উড়ান, মানুষের উন্নতি করেন না। কংগ্রেসের লোকেরা কেন আমাদের আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বাসঘাতক বলেন?

আম্বেদকর তখন উত্তেজিত। তাঁর মুখমণ্ডল লাল ও চক্ষু উজ্জ্বল। তিনি একটু থেমে আবার তিক্ত ও উদ্ধত কণ্ঠে বলতে শুরু করেন।

আম্বেদকর ঃ গান্ধিজী! আমার কোনো স্বদেশ নেই!

গান্ধি ঃ (একটু ফিরে তাঁকে বাধা দিয়ে) আপনার স্বদেশ আছে। গোলটেবিল বৈঠকে আপনার কাজ সম্পর্কে আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে। তাতে আমি জানি যে, আপনি একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক।

আম্বেদকর ঃ আপনি বলছেন যে, আমার স্বদেশ আছে। কিন্তু আমি আবার বলছি আমার তা নেই। কী করে এই দেশকে আমার স্বদেশ বলতে পারি আর কী করেই বা এই ধর্মকে আমার নিজের ধর্ম বলে ভাবতে পারি, যেখানে আমরা কুকুর-বিড়ালের মতো ব্যবহার পাই, যেখানে আমরা পান করার মতো জলটুকু পর্যন্ত পাই না? কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন অস্পৃশ্য মানুষ কখনও এই দেশের জন্য গৌরব বোধ করতে পারেন না। এই দেশের দ্বারা আমরা যে অন্যায় ব্যবহার ও প্রচুর দুর্ভোগ পাই, তাতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি দেশের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে থাকি, তার জন্য দায়ী এই দেশ। দেশদ্রোহী বলার জন্য আমি দুঃখিত নই, কারণ যে দেশ আমাকে দেশদ্রোহী বলে আমাদের কাজের জন্য দায়ী সেই দেশই। আপনি যেমন বলছেন যে আমি জাতীয়তাবাদী কাজ করেছি, তা দেশের পক্ষে সাহায্য ও উপকারী এবং দেশমাতারই কাজ। তা করেছি আমার স্বচ্ছ বিবেকের জন্য, দেশেপ্রেমের জন্য নয়। আমার যে জনগণ যুগ যুগ ধরে পদদলিত হচ্ছেন, তাঁদের মানবাধিকারের জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে যদি দেশসেবার বিপরীত কিছু করে থাকি তা পাপ নয় এবং যদি দেশের কোনো ক্ষতি না করে তা হল আমার বিবেক। আমার বিবেকের তাড়নাতেই দেশের কোনো ক্ষতি না করেই আমার জনগণের কল্যাণের চেষ্টা করছি।

পরিবেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে। মুখের রঙ পালটে যায়। গান্ধি বিচলিত হয়ে ওঠেন। তিনি আম্বেদকরের বক্তব্য অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। সেই সময়ই আম্বেদকর তাঁকে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি করেন, যা এই সাক্ষাৎকারের মূল উদ্দেশ্য।

আম্বেদকর ঃ প্রত্যেকেই জানেন শিখ এবং মুসলিমরা অস্পৃশ্যদের চেয়ে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর। গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস ওই দাবি মেনে নিয়েছে। প্রথম অধিবেশনে দলিত শ্রেণির রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে তাঁদেরও রাজনৈতিক রক্ষাকবচ ও যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব মেনে নিয়েছে। আমাদের মতে তা দলিত শ্রেণির পক্ষে উপকারী। আপনার কী অভিমত ?

গান্ধি ঃ আমি হিন্দুদের থেকে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক পার্থক্যের বিরুদ্ধে। তা চরম আত্মহত্যার সামিল হবে।

আম্বেদকর ঃ (উঠে দাঁড়িয়ে) সোজা-সরল উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এটাই ভাল হলো যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় আমরা কে কোথায় আছি তা জানতে

পারছি। আপনার কাছ থেকে বিদায়!

আম্বেদকর বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল নিপীড়িত মানুষদের মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের কঠোর সংকল্পের উজ্জ্বল ছাপ।

এক গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সাক্ষাৎকার শেষ হয়। গান্ধি ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির সর্বময় নিয়ন্ত্রক, জনগণের মুকুটহীন সম্রাট। জনগণ ছিলেন তাঁর মোহিনী শক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ। গান্ধির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অর্থ চিরস্থায়ী অসন্তোষ ও তিক্ততার সৃষ্টি মাত্র। এই সাক্ষাৎকার গান্ধি ও আম্বেদকরের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গান্ধি ভেবেছিলেন আম্বেদকর হরিজন নন। লণ্ডনে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ভেবেছিলেন আম্বেদকর একজন ব্রাহ্মণ এবং তিনি হরিজনদের ব্যাপারে উৎসুক বলেই রাগতভাবে কথা বলছেন।

রাতের বেলা একটি বিদায়ী সভায় স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে দলিত শ্রেণির মহিলাদের একটি সভায় আম্বেদকর এক উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "যদি আপনারা আপনাদের দাসত্ব সমূলে বিলোপ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করতে তৈরি থাকেন, তাহলে আমি অনেক কষ্টে যে সামান্য একটু সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছি, তা আপনাদেরই পাওনা হবে।" এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি সেই হলেই দলিত শ্রেণির পুরুষদের সভায়ও বক্তৃতা করেন। সোচ্চার বক্তৃতায় তিনি বলেন, তাঁদের অসীম ভালোবাসাই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন, "একশো পঁচিশজন সদস্যের সভায় আমরা মাত্র দু'জন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হোন, আপনাদের কল্যাণের জন্য আমরা স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করব। আজ বিকেলেই গান্ধির সাথে আমার কথা হয়েছে। বর্তমানে আপনাদের উন্নতির জন্য তিনি কিছুই করতে পারবেন না। আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অধিকারের জন্য লড়াই করব। সুতরাং আপনারা আন্দোলন করুন এবং শক্তি সংহত করুন। শক্তি ও সম্মান সংগ্রামের মাধ্যমেই আসবে।"

পরের দিন শনিবার, ১৯৩১ সালের ১৫ আগস্ট। গোলটেবিল বৈঠকের প্রায় সমস্ত প্রতিনিধি এস.এস. মুলতান জাহাজে লণ্ডনে যাচ্ছেন। বম্বের 'ব্যালার্ড পিয়ারে' রাজন্যবর্গ ও বীরদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তাঁদের বন্ধুবান্ধব, অনুগতজনেরা, প্রশংসাকারীরা ভিড় করেছিলেন। যে নেতা গাড়ি থেকে নামার সময় গভীর শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, তিনি আম্বেদকর। যখন তিনি মোল স্টেশনে পৌঁছান, তখন রাস্তার উপরে ও বাইরে প্রায় দু'হাজার স্বেচ্ছাসেবক তাঁকে 'আম্বেদকর কী জয়', 'আম্বেদকর দীর্ঘজীবী হোন' ধ্বনি দিয়ে বিদায় জানান।

জাহাজে স্যার প্রভাশঙ্কর পাট্টানির সাথে আম্বেদকরের দেখা হয়। তিনি

আম্বেদকরকে জিজ্ঞেস করেন, গান্ধির সাথে তাঁর সাক্ষাতের ফলাফল কী হয়েছিল, আলোচনার মাঝখানেই তিনি চলে আসেন বলে ফলাফল জানতে পারেননি। আম্বেদকর তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে অন্য সুর টের পেয়ে বলেন, কেন তিনি মাঝখানে হল ত্যাগ করেছিলেন। নাইট মশাই বিদ্রূপের সুরে বলেন, হিন্দুশাস্ত্রে এমন আছে যে, যদি কোনো নিন্দুক সৎ লোকের নিন্দা করে, তবে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে যদি সেখানেই তার জিহ্বা কেটে নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁর সে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। আম্বেদকর সেই নির্বোধ উক্তিতে উত্তেজিত হন, কিন্তু মুখে কোনোরকম উত্তেজনার চিহ্ন না রেখে জিজ্ঞেস করেন, পাট্টানির হিন্দুশাস্ত্রে ভণ্ড ও নীচ তোষামোদকারীর জন্য কীরূপ শাস্তির বিধান দেওয়া আছে। এই খোঁচায় পাট্টানি ক্রোধান্ধ হয়ে আম্বেদকরকে প্রশ্ন করেন যে, এরকম বর্বর আক্রমণ দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চাইছেন। আম্বেদকর উত্তর দেন, নাইট যা বুঝেছেন, তিনি সেটাই তাঁকে বোঝাতে চান এবং তার মতো তোষামোদকারীদের খপ্পর থেকে গান্ধির মুক্ত হওয়া উচিত। এমন সময় পুলিশকমিশনার উইলসন এসে হস্তক্ষেপ করায় দৃশ্যটি বেশিদূর গড়ায়নি। মহৎ ব্যক্তিরা যদি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে চারপাশের চাটুকারদের থেকে মুক্ত থাকতে পারতেন তবে বিশ্বের যথেষ্ট উপকার হতো।

সপ্রু, জয়াকর ও আয়েঙ্গার ওই একই জাহাজে ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তাঁরা বলেন যে, গান্ধি ও মালব্য যাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন তার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন। সরোজিনী নাইডু ও মালব্যরও একই জাহাজে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গান্ধি যাওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় তাঁরা তাঁদের যাওয়া বাতিল করেন। আম্বেদকর জাহাজে যে সাক্ষাৎকারটি দেন, তাতে গান্ধির গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে রাজি না হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ভারতের স্বার্থের চেয়ে বারদৌলির স্বার্থকে বড়ো করে দেখা অত্যন্ত বোকামির পরিচায়ক। "ক্ষুদ্রতর বিষয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে বৃহত্তর বিষয়ে অমেনাযোগী হওয়া ঠিক নয়, যেটির সমাধান হলে অফিসারদের উপর কর্তৃত্ব এসে যেত, তা কেন হলো না, বুঝতে পারি না।"

আম্বেদকর তাঁর দাবি সম্পর্কে গান্ধির বিরোধিতা করার সিদ্ধান্তের কথা গভীরভাবে ভাবছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সেক্রেটারির মাধ্যমে ভারতে তাঁর লোকদেরকে খবর পাঠালেন, সভাসমিতি করে তাঁদের দাবির প্রতি গান্ধির মনোভাবের নিন্দা করতে। সুয়েজ থেকে তিনি শিবতর্কারকে আর একটি চিঠি দিলেন গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে মাইনরিটি সাবকমিটিকে তিনি যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তার কপি পাঠাতে। তিনি রায়বাহাদুর আর. শ্রীনিবাসনের কাছে তাঁর ফেলে যাওয়া লেদার ব্যাগটিও পাঠাতে বলেন।

জয়াকর, রেওয়ার মহারাজা ও অন্যান্য নেতারা দলিত শ্রেণির 'সমতা সেবাদলের'

যে দৃশ্যটি দেখেছিলেন তাতে জাহাজে বসে সন্তোষ প্রকাশ করেন। শওকত আলি সন্তুষ্ট হন, মুঞ্জেও খুশি হয়ে অন্তরের গোপন আনন্দ প্রকাশ করেন এই ভেবে যে, হিন্দুমহাসভা এমন একটি সুশৃঙ্খল সেবাদল গঠন করতে না পারলেও মুসলিম স্বোচ্ছাসেবকদের সামনে দাঁড়ানোর মতো অস্পৃশ্য হিন্দুদের এমন একটি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়েছে। ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় তাঁকে অভিনন্দিত করেন এই জেনে যে, অস্পৃশ্যরা তাঁর অবদান উপলব্ধি করছেন। তিনি বলেন যে, বর্ণহিন্দুদের মতো তাঁরা উপকারীর প্রতি উদাসীন বা অকৃতজ্ঞও নন।

২৯ আগস্ট আম্বেদকর লণ্ডনে পৌঁছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, বমি ও ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হন। অসুখে তাঁর শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, শিবতর্কারকে তিনি শরীর খারাপের কথা জানিয়ে চিঠি লেখেন। ৭ সেপ্টেম্বর একটু সুস্থ বোধ করলেও তখনও শরীর দুর্বল। তিনি সব সময় অসুস্থতার খবর তাঁর স্ত্রীকে জানাতে নিষেধ করতেন। একটা বিষয়ে তাঁর মন ভারাক্রান্ত ছিল। তা হল, মাহাদ মামলায় সাব-জজকোর্টে হেরে গিয়ে গোঁড়া হিন্দুরা থানের জেলাকোর্টে আপিল করেছিলেন। তখন থানের জেলাজজের রায় বের হবার সময়। তিনি শিবতর্কারকে ফলাফল বেরোলেই জানাবার জন্য লিখলেন।

ইতিমধ্যে গান্ধি, বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু এবং স্যার প্রভাশঙ্কর পাট্টানি সিমলায় ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে মতপার্থক্য সমস্যাটির মোটামুটি একটা মীমাংসা করেন। গান্ধি সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মালব্য ও তাঁর দলবলসহ ২৯ আগস্ট ইংলণ্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে ১৯৩১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছান।

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন ৭ সেপ্টেম্বরে শুরু হয়। এবার সম্মেলনে নতুন প্রতিনিধিদের নিয়ে নেতাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। যেমনÑ মুসলিম লিগের সভাপতি মহম্মদ ইকবাল, খ্রিস্টান প্রতিনিধি ডঃ এস.কে. দত্ত, বিখ্যাত ধনী জি.ডি. বিড়লা, সনাতনপন্থী সংস্কারক পণ্ডিত মালব্য, ভারতের নাইটেঙ্গল সরোজিনী নাইডু এবং স্যার আলি ইমান। এই অধিবেশনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন রহস্যময় গান্ধির উপস্থিতি।

সম্মেলন বসার কয়েকদিন আগে ব্রিটেনে একটা পরিবর্তন ঘটে। একদলীয় শ্রমিক সরকারের পরিবর্তে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড আগের মতোই ক্ষমতায় রইলেন। ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট ওয়েজউড বেন-এর জায়গায় এলেন স্যামুয়েল হোর। চার্চিলের মতো রক্ষণশীল নেতারা ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান কাজ 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি' ও 'মাইনরিটি

কমিটি'তে সম্পন্ন হওয়ার কথা। গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের কমিটিগুলি যে রিপোর্ট দাখিল করে, সেগুলি এই সম্মেলন পরীক্ষা করবে ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবে। ১৯৩১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধি ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে প্রথম বক্তৃতা দেন। তিনি দাবি করেন যে, কংগ্রেস সমস্ত ভারতীয়দের স্বার্থ ও সকল শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি সম্মেলনে বলেন, কংগ্রেস মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ, মুসলিমরা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও আছেন। কংগ্রেস দলিত শ্রেণিরও প্রতিনিধি, কারণ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কংগ্রেসের একটি নীতি। গান্ধি রাজন্যবর্গকে বলেন, "কংগ্রেস রাজ্যগুলির স্বার্থও দেখছে, যেহেতু কংগ্রেস রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ ও পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরত থেকে তাঁদের সেবা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।" তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস মহিলাদেরও প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ ডঃ অ্যানি বেসান্ত ও সরোজিনী নাইডুকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়েছে, এবং যেহেতু তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি, সেইজন্য ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিনিধি।

আম্বেদকর গান্ধির বক্তৃতা থেকে বুঝতে পারলেন হাওয়া কোন দিকে বইছে। ওই একই দিনে আম্বেদকরও ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন। তিনি রাজন্যবর্গদের বলেন যে, তাঁরা যা চান ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি অন্ধভাবে তা দিতে পারে না। এ কথা শোনা মাত্র বিকানিরের মহারাজা দাঁড়িয়ে বললেন, রাজ্যগুলিও ব্লাঙ্ক চেকে সই দেবে না। আম্বেদকর এই কথায় জোর দিয়ে বলেন যে, কোনো রাজ্য ফেডারেলে যোগদানের আগে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁর আবশ্যকীয় সঙ্গতি আছে এবং তাঁর নাগরিকদের সভ্য জীবন যাপনের অধিকার দিতে সে সমর্থ। আম্বেদকর যে বড়ো শর্তের কথা বলেন, সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় রাজ্যের প্রতিনিধি ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হবে, মনোনয়ন দ্বারা নয়। এটা তাঁর দৃঢ় অভিমত যে, মনোনয়ন শাসন ক্ষমতাকে দায়িত্ববোধহীন করে এবং বাইরে একটা মিথ্যা ধারণা তৈরি করে যে, আইনসভা সংখ্যাগরিষ্ঠের সাহায্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, মনোনয়ন প্রথা দায়িত্বশীল সরকারের পরিপন্থী। জমিদারদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাঁরা গোঁড়াদের পক্ষ সমর্থন করেন, যার দ্বারা স্বাধীনতা ও প্রগতিকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সেইজন্য তাঁদের কোনো বিশেষ প্রতিনিধি দেওয়া যায় না। ওই দাবি দেশের স্বাধীনতা ও উন্নতির পরিপন্থী। স্পষ্টত এটাই ছিল রাজ্যগুলির সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা।

যে সমস্ত রাজন্যবর্গ, জমিদার ও তাঁদের হিতৈষী বন্ধুবর্গ রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে ফেডারেল এসেমব্লিতে মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করবেন, তাঁরা মস্ত ধাক্কা খেলেন। ফলে প্রত্যেক বক্তাই আম্বেদকরের বক্তৃতার কিছুটা সমর্থন করেন,

আবার কিছুটা প্রত্যাখ্যান করে বক্তব্য রাখেন। তবে অধিকাংশই মনে করেন যে, তাঁর বক্তৃতা বাস্তবসম্মত ও বিপ্লবাত্মক।

পরদিন গান্ধি মন্তব্য করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিরা ভারতের জাতীয় প্রতিনিধি নন, তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত। গান্ধি লণ্ডনে যাবার আগে তা জানলেও এখন তিনি প্রতিনিধিদের বিদ্রূপ করতে শুরু করেন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের উপর আম্বেদকরের অভিমত সম্পর্কে গান্ধি বলেন যে, তাঁর প্রতি তিনি সহানুভুতিপূর্ণ। কিন্তু গান্ধির যুক্তি গ্যাভিন জোন্স ও সুলতান আহমদের যুক্তির সাথে মিলে যায় Ñ তাঁরা রাজন্যবর্গের মতেই মত দিয়েছেন। গান্ধি ফেডারেশনের জন্য ওই প্রস্তাবে সহানুভূতি জানান বটে, কিন্তু তাঁদের রাজ্যের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে রাজন্যবর্গের প্রস্তাব এই বলে সমর্থন করেন, "তাঁরা কী করবেন না করবেন, সে সম্পর্কে আমাদের বলার কোনো অধিকার নেই।"

গান্ধি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবির উল্লেখ করে বলেন, "কংগ্রেস হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়েছে, তার পিছনে সঠিক যুক্তি আছে। কিন্তু কংগ্রেস ওই নীতি আর কোনোভাবে সম্প্রসারিত করবে না। আমি বিশেষ সুবিধার তালিকার কথা শুনেছি। অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে বলতে গেলে ডঃ আম্বেদকর কী বলছেন তা এখনও বুঝতে পারিনি। কিন্তু কংগ্রেস ডঃ আম্বেদকরের সাথে অস্পৃশ্যদের দায়িত্ব বহন করবে। ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর স্বার্থের মতোই অস্পৃশ্যদের স্বার্থকেও কংগ্রেস সমান গুরুত্ব দেবে। সেজন্য অন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা আমি করবই।"

আম্বেদকর বুঝলেন যে, এটা অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে গান্ধি ও কংগ্রেসের যুদ্ধঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, "গান্ধির এই ঘোষণায় আমি বুঝে গেলাম যে, আলোচনা করার প্রধান মঞ্চ মাইনরিটিস কমিটির সভায় এই প্রশ্নে গান্ধি কী করবেন।"

১৮ সেপ্টেম্বর 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি'তে আম্বেদকর গান্ধিকে প্রশ্ন করেন যে, 'ফেডারেল লেজিসলেচার' এবং 'ফেডারেল এক্সিকিউটিভ' গঠন সম্পর্কে গান্ধি যে বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি কি তাঁর নিজস্ব মত না কংগ্রেসের মত। যখন দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী মুদালিয়র বলেন যে, সরকারি চাকুরিয়াদের দ্বারা যে রাজনৈতিক বিভাগ গঠিত হয়েছে তাঁরা ভারতের যে কোনো জায়গার এবং ভারতের বাইরের সরকারি চাকুরিয়াদের বিভাগের মতোই বিবেকবান ও পক্ষপাতহীন। আম্বেদকর তখনই প্রশ্ন করেন যে, যদি তাই সত্য হয়, তবে দায়িত্বশীল সরকার কেন চাওয়া হয়। তাঁর কথার উত্তরে পণ্ডিত মালব্য বলেন যে, সরকার যদি সমস্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ খরচ করত তাহলে তিনি নিশ্চিত যে, 'দলিত শ্রেণি' কথাটি এ সময়ে শুধু ইতিহাসের পাতায় দেখা যেত। আম্বেদকর

তখন তাঁর নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অস্পৃশ্য। স্যার আকবর হায়দর আম্বেদকরের কথার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, বাস্তবক্ষেত্রে তা সত্য নয়। এর উত্তরে আম্বেদকর বলেন, "বাস্তবতাকে আমি উপলব্ধি করতে অক্ষম Ñ এ অপবাদ আমার নেই।"

ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে আলোচনার সময় আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল তথ্য, স্বার্থ ও মূল্যবান উপদেশে পরিপূর্ণ। রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার, সংবিধান-বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক, লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের রক্ষাকর্তা এবং রাজ্যগুলির জনসাধারণের বন্ধু আম্বেদকর, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্যের দ্বারা সম্মেলনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

১৯৩১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'মাইনরিটি কমিটি'কে তার কাজ শুরু করতে হবে। অধিবেশনের আগে গান্ধির ছেলে দেবদাস গান্ধি আম্বেদকরের বাসভবনে এসে তাঁর সাথে দেখা করেন। সেখানে ঠিক হয় সরোজিনী নাইডুর বাসভবনে ৯ টা থেকে ১২ টার মধ্যে গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হবে। সেই মতো আম্বেদকর গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে যান, কিন্তু গান্ধি সেদিন তাঁর মনের খোলসা করে বলেননি, শুধু বলেন যে, যদি অন্যেরা আম্বেদকরের দাবি মানেন তবে তিনিও মেনে নেবেন।

১৯৩১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মাইনরিটি কমিটির প্রথম সভা বসে। প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ভারতের সংখ্যালঘু সমস্যা তাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। তিনি বলেন, কয়েকজন প্রতিনিধি বলেছেন যে, তাঁরা একমত হতে পারেননি বলে সরকারেরই উচিত মীমাংসা করে দেওয়া। কিন্তু তিনি মত ব্যক্ত করে বলেন যে, সেই মীমাংসা তাদের কারও কারও কাছে গ্রহণীয় হবে না। তাতে আগা খাঁ বলেন যে, সেই রাত্রে মহাত্মা গান্ধি মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করবেন, সুতরাং অধিবেশন স্থগিত থাকুক। তাঁর সমর্থনে মালব্য বলেন যে, সাধারণ আলোচনা তাহলে এখানেই শেষ হোক।

আম্বেদকর হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে গান্ধি ও মুসলিম নেতাদের মধ্যে গোপন আলোচনার খবর জানতেন। সুতরাং অধিবেশন স্থগিত রাখা সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন, "আমরা গতবারেই দলিত শ্রেণি সম্পর্কিত বিষয় মাইনরিটিস সাবকমিটিতে পেশ করেছি। আমার একটি মাত্র কাজ বাকি আছে, বিভিন্ন আইনসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা সম্পর্কে এই কমিটিতে উপস্থাপন করা।"

আম্বেদকর বলেন, তিনি নিজেই শুনে খুব আনন্দিত যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, "আমি শুরুতেই বিষয়টি সরল করে দিতে চাই। যাঁরা এই কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তাঁদের জানা উচিত যে, তাঁরা এই ব্যাপারে মোটেই পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত নন। মি. গান্ধি বা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব যে রকমই হোক না কেন, তাঁরা কিছুতেই এ ব্যাপারে আমাদের বাধ্য করতে পারেন

নাÑ কিছুতেই না। সে কথা এ সভায় আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলছি।” শেষে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, “যাঁরা বেশি দাবি করেন এবং যাঁরা তা দিতে চান, তাঁদের আমি জোর দিয়েই বলছি, আমার অংশ তাঁরা দিতে পারেন না এবং তাঁরা যেন তা দিতে চেষ্টা না করেন।” তাতে সভাপতি ম্যাকডোনাল্ড বলেন, “ডঃ আম্বেদকরের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার, স্বাভাবিক ভাবেই এই সম্পর্কে তিনি কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি।”

১ অক্টোবর গান্ধি আবার এক সপ্তাহের জন্য বৈঠক মুলতুবি চান। তিনি কমিটিকে বলেন যে, মুসলিমদের বিভিন্ন দলের সাথে তাঁর ঘরোয়া আলোচনা চলছে। এ কথায় ডঃ আম্বেদকর বলেন, তিনি সেই জাতীয় মীমাংসায় কোনো বাধা সৃষ্টি করতে চান না। কিন্তু তিনি জানতে চান যে, সেই আনুষ্ঠানিক কমিটিতে দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি থাকবে কিনা। গান্ধি হ্যাঁ বোধক উত্তর দেন। আম্বেদকর গান্ধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিনিধিদের কাছে ব্যাখ্যা করেনÑ “মহাত্মা গান্ধি প্রথমদিন ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে আমাদের বলেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মুসলিম ও শিখদের ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, দলিত শ্রেণি ও ভারতীয় খ্রিস্টানদের স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নন। যখন এক সপ্তাহ আগে আমি মহাত্মা গান্ধির সাথে দেখা করে দলিত শ্রেণি সম্পর্কে কথা বলি তখন এবং মাইনরিটি কমিটির সদস্য হিসাবে গতকাল তাঁর সাথে আলাপের সময় তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, সেটাই তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য।”

এরপর আম্বেদকর বলেন, যদি দলিত শ্রেণিকে ভবিষ্যৎ সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে মাইনরিটি কমিটিতে যেমন স্বীকার করা হয়নি, তাহলে তিনি সেই বিশেষ কমিটিতে যোগ দেবেন না কিংবা এই মুলতুবি প্রস্তাব সমর্থনও করবেন না।

গান্ধির সাথে মুসলিম নেতাদের আলোচনা এক সপ্তাহ ধরে চলে। সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করে যে, আলোচনা উৎসাহজনক পর্যায় পৌঁছেছে। এও প্রচার করা হয় যে, গান্ধি মুসলিমদের চোদ্দ দফা দাবি মেনে নিয়েছেন, সেই সঙ্গে প্রদেশগুলিকে যুক্ত করার জন্য অবশিষ্ট ক্ষমতাও মেনে নেবার সাথে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাও স্বীকার করে নিয়েছেন এবং মুসলিমদের একখানা ব্লাঙ্কচেক দিয়ে দিয়েছেন। শিখ ও মুসলিমদের প্রশ্নে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

৮ অক্টোবর মাইনরিটি কমিটিতে গান্ধি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিভিন্ন দলের সাথে সাম্প্রদায়িক সমস্যার আলোচনায় মীমাংসার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন যে, ব্যর্থতার কারণ হলো, ভারতীয় প্রতিনিধি গঠনের মধ্যে। তাঁরা অনেকেই সেই দল বা গোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রতিনিধি নন, যাঁদের পক্ষ থেকে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন। এমনকি একটা মীমাংসার প্রচেষ্টায় তাঁদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও নয়। এজন্য তিনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য সভা মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করেন। আম্বেদকর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে গান্ধির কথার জবাব দিতে উঠে দাঁড়ান। তিনি বলেন, গত রাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় এটাই ঠিক হয় যে, কোনো প্রতিনিধি এমন কোনো বক্তব্য রাখতে বা সমালোচনা করতে পারবেন না, যাতে কারও ক্রোধের কোনো কারণ ঘটতে পারে; সেই কথা ভঙ্গ করার অপরাধে গান্ধিই অপরাধী।

আম্বেদকর বজ্রকণ্ঠে বলেন, "মি.গান্ধির বক্তব্যে আমি এজন্য ক্ষুব্ধ হচ্ছি যে, কোথায় মাইনরিটি সাবকমিটির সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার বিষয়ে বক্তব্যের পরিবর্তে এই গোলটেবিলের পাশে যে প্রতিনিধিগণ বসে আছেন, তাঁদেরই নিন্দা করছেন।" তিনি বলেন, "যেহেতু প্রতিনিধিগণ সরকার নির্বাচিত সেই হেতু তাঁরা তাঁদের স্বীয় সম্প্রদায়ের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। আমরা সরকার মনোনীত এই দোষারোপ অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমার সম্পর্কে আমি এই কথা বলতে পারি যে, যদি দলিত শ্রেণিকে এই সম্মেলনে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তবে আমার সন্দেহ নেই যে, এখানে আমার স্থান হবেই। সে জন্য আমি বলছি যে, আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি হই বা না হই, আমি আমার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এ সম্পর্কে কেউ যেন ভুল না করেন।"

আম্বেদকর বলতে থাকেন, "মহাত্মা দাবি করেন যে, দলিত শ্রেণির জন্য কংগ্রেস রয়েছে এবং আমি বা আমার সহকর্মীদের চেয়ে কংগ্রেস দলিত শ্রেণির বেশি প্রতিনিধিত্ব করে। সেই দাবির উত্তরে আমি বলতে পারি যে, এটা দায়িত্ববোধহীন মানুষের মিথ্যা দাবিগুলির মধ্যে একটি, যদিও ওই দাবিদারেরা প্রায়ই তাঁদের অস্বীকার করে থাকেন।" আম্বেদকর তখন দেখান যে, যেসব দূরদূরান্তের অস্পৃশ্য এলাকায় তিনি কোনোদিন যাননি এবং যে সমস্ত লোকদের তিনি কোনোদিন দেখেননি, তাঁরা টেলিগ্রাম যোগে তাঁকে সমর্থন করেছেন। তিনি তখন কমিটিকে বলেন, হয় কমিটি এই সমস্যার সমাধান করুক, না হয় ব্রিটিশ সরকারই এর সমাধানের ব্যবস্থা করুক। তিনি ভয় ও নৈরাশ্যের মধ্যে বলেন যে, এই অবস্থার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য দলিতে শ্রেণিরা মোটেই চিন্তিত নন। **কিন্তু যদি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়, তাহলে ওই কাজ এমনভাবে বা এমন বিধানে করতে হবে, যাতে সেই ক্ষমতা কোনো ক্ষুদ্র দল বা অল্পসংখ্যক লোক, হিন্দু বা মুসলিম যাই হোন না কেন, তাঁদের হাতে গিয়ে না পড়ে। ক্ষমতা যেন সমস্ত সম্প্রদায় আনুপাতিক হারে ভোগ করতে পারে।**

প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন করে বলেন যে, তাঁরা যেন কারও ত্রুটি

বা নির্বাচনের কারণ না দেখান। তিনি তাঁদের বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন এবং প্রশ্ন করেন ভারতে আসলে ওই সমস্যা আছে কি নেই। প্রধানমন্ত্রীর স্বরে কিছুটা বিদ্রূপ ছিল, কেউ কেউ অকৃতজ্ঞ বলে মন্তব্য করেন, সেই সাথে গান্ধির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড তিক্ততাও ছিল।

আম্বেদকরের জোরালো প্রচার এখানেই থামেনি। তিনি লণ্ডন থেকে ১২ অক্টোবর 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'কে চিঠি লিখে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ঘটনা জানানÑ "আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, আমাদের মুসলিম বন্ধুদের সাথে তাঁর (গান্ধির) আলোচনায় তাঁদের চোদ্দ দফা দাবি মেনে নেবার শর্ত হলো, তাঁরা দলিত শ্রেণির এবং অন্য সংখ্যালঘুদের দাবির বিরোধিতা করবেন।" শ্লেষাত্মক মন্তব্যে আম্বেদকর বলেন, **"গান্ধি প্রকাশ্যে বলেন যে, 'অন্যেরা সমর্থন করলে আমিও সমর্থন করব।' তারপর যাঁরা সমর্থন করতে ইচ্ছুক, তাঁদের গোপনে লোভ দেখিয়ে ওই দাবি সমর্থন করতে নিষেধ করা, আমাদের কাছে এই কাজ একজন মহাত্মার কাজ নয়, এ শুধুমাত্র দলিত শ্রেণির প্রচণ্ড বিরুদ্ধবাদীরই কাজ। গান্ধি যে কেবল মাত্র দলিত শ্রেণির বন্ধুর কাজ করছেন না তাই নয়, এমনকি একজন সৎ শত্রুর কাজও করছেন না।"**

আম্বেদকর বাড়িতে লেখা এক চিঠিতে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে লিখেছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবে এবং তাঁর ধারণা সেই ব্যর্থতার জন্য গান্ধিই দায়ী থাকবেন। তাঁর মতে গান্ধির পক্ষপাতিত্ব ও সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানে বিভেদমূলক আচরণ, সন্দেহজনক কর্মপদ্ধতি, প্রতিনিধিদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন অপমান ইত্যাদি কারণই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেনি। আম্বেদকর আরও মন্তব্য করেন যে, এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ায় গান্ধির পৈশাচিক আচরণ পরিষ্কার হয়ে যায়। আম্বেদকর মন্তব্য করেন যে, গান্ধির অগণতান্ত্রিক মানসিকতা হ্যারল্ড লাস্কির মতো মানুষের মনে দারুণ আঘাত দেয় এবং বিঠলভাই প্যাটেলের মতো কংগ্রেস নেতারাও এই পরিস্থিতিতে গান্ধির অযোগ্য হস্তক্ষেপকে সমর্থন করতে পারেননি।

আম্বেদকরের দাবির প্রতি গান্ধির বিরোধিতা ভারতের সর্বত্র অস্পৃশ্যদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রায়বাহাদুর এম.সি. রাজার সভাপতিত্বে গুরগাঁওয়ে 'অল ইণ্ডয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস কনফারেন্স'-এ ঘোষণা করা হয় যে, গান্ধির অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব একটি ডাহা মিথ্যাচার। 'প্রথম থেকেই কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের যত্ন নিচ্ছে এবং তাঁদের নেতৃত্ব করে', এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে এই কনফারেন্স। সভাপতি রাজা বলেন, "আমি বলছি এ কথা সম্পূর্ণই মিথ্যা।"

কনফারেন্স আম্বেদকরের দাবি সমর্থন করে ঘোষণা করে যে, দলিত শ্রেণির জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা না হলে তেমন কোনো সংবিধান দলিত শ্রেণি মেনে নেবেন না। টিনেভেলি, রবার্টসন (মাদ্রাজ), লায়ালপুর, কার্নাল, চিদাম্বরম,

কালিকট, বেনারস, কোলাপুর, ইয়োতমাল, নাগপুর, চান্দা, কানপুর, কামতি, বেলগাঁও, ধরওয়ার, নাসিক, হাবলি, আহমেদাবাদ, তুতিকোরিন, কলম্বো এবং ভারতের আরও বহু জায়গায় দলিত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠন সভাসমিতি করে শ'য়ে শ'য়ে তারবার্তা পাঠিয়ে আম্বেদকরকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন কংগ্রেস ও গান্ধিকে বিশ্বাস না করেন।

এইসব তারবার্তাগুলিতেই প্রকাশ হয়ে যায় দলিত শ্রেণির আসল প্রতিনিধি কে। গান্ধিও অল্প কয়েকটি তারবার্তা পেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি গান্ধির জন্য লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আম্বেদকরের সংগ্রাম প্রচারের ফল এমন শক্তিশালী হয়েছিল যে, গান্ধির অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে এবং অস্পৃশ্যদের নেতৃত্বের মুখোশ খসে পড়ে।

এই সময়ে ভারতে নাসিক ও গুরুভায়ুরে অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের মধ্যেই গান্ধির এই মুখোশ খসে পড়া আরও প্রকট হয়ে পড়ে। নাসিকের সত্যাগ্রহ আন্দোলন আবার শুরু হলে একটা ভয়ানক গতিশীলতা দেখা যায়। পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নাসিকে জমায়েত হন। আম্বেদকরের অনুগত সঙ্গী ভাউরাও গাইকোয়াড়, দলিত শ্রেণির নেতা রণখাম্বে, পতিত পাবন দাস এবং বিশ্বাসী সহকর্মী দেওরাও নায়েক Ñ গোঁড়া হিন্দুদের, সরলতার ভাণকারী ভণ্ড হিন্দু নেতাদের চরিত্রও সকলের সামনে প্রকাশ করে দেন। এমন তীব্র আকারে লজ্জাজনক অবস্থা দেখা দেয় যে, ডঃ মুঞ্জে এই চরম সংকটের মধ্যে লণ্ডন থেকে হিন্দুদের অনুরোধ করেন তাঁদের স্বজাতীয়দের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার মেনে নেবার জন্য। আগের সত্যাগ্রহের মতো এবারেও কালারাম মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এ সময় আম্বেদকর তাঁর জনগণের কাছ থেকে হিন্দুদের ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সময়মতো পাঠানোর সমর্থন পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন। তিনি লণ্ডন থেকে তাঁর লোকজনদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে বলেন, "আপনারা যেমন আশঙ্কা করেছিলেন, আমি সেণ্ট্রাল ডিভিশনের কমিশনারের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি যাতে তিনি নাসিক সত্যাগ্রহ বন্ধ করার জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দিতে আমাকে লিখেছেন। আমি সে চিঠির উত্তর পাঠাইনি। কিন্তু এই ডাকেই উত্তর পাঠাবো। আমি তাঁকে বলছি যে, 'আমরা তা বন্ধ করতে পারছি না'। সুতরাং আপনারা আমাদের লোকদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলবেন। আমরা গোঁড়া হিন্দুদের আদেশ যেমন মানতে পারি না, তেমনি সরকারের আদেশও মানতে পারি না।" এই বার্তায় তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘদিন আমরা অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য সরকারকে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু করবার জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সুতরাং আন্দোলন বন্ধ করতে বলারও কোনো অধিকার তার নেই। এর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে

আমরা যে কোনো ক্ষতি স্বীকার করেও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হবোই।”

নাসিক সত্যাগ্রহ অভূতপূর্ব উৎসাহ ও দৃঢ়তার সাথে চলে। জনসভা ও বড়ো বড়ো শোভাযাত্রাও বের করা হয়। অনেক স্বেচ্ছাসেবক ও নেতা গ্রেপ্তার হন। ‘লণ্ডন টাইমস’ পত্রিকায় এই কারাবরণ ও সত্যাগ্রহের অগ্রগতির খবর প্রকাশিত হওয়ায় আম্বেদকরের বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

এতসব বিপুল কাজের মধ্যেও আম্বেদকর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ব্যাখ্যা দেওয়া, বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দেওয়া এবং গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যে বক্তব্য রাখছেন তার সমর্থনে লণ্ডনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। Institution of International Affairs-এ তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা গান্ধির প্লাটফর্ম ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। দলিত শ্রেণির দাবির প্রতি গান্ধির বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে যাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তাঁরা আম্বেদকরের কাছে ছুটলেন তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা শোনার জন্য। যাঁর বাড়িতে গান্ধি অবস্থান করছিলেন, সেই মিস মুরিয়েল লেস্টার, আম্বেদকরের সাথে দেখা করলে আম্বেদকর তাঁর কাছে তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন। গান্ধি ও আম্বেদকরÑ দু’জনেরই এক বন্ধু দুই নেতাকে চা-পানে আমন্ত্রণ করে মিটমাটের চেষ্টা করেন। আম্বেদকর স্বীকার করেন যে, গান্ধি অস্পৃশ্যদের উন্নয়ন ও অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য মানবিক দৃষ্টিতে কাজ করছেন বটে, কিন্তু তাঁরা পশ্নটির মৌলিকতায় একেবারেই আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

১৯৩১ সালের অক্টোবরের শেষে ব্রিটেনের নির্বাচনে টোরিরা ক্ষমতায় আসে। শ্রমিক সরকারের পরাজয়ে আম্বেদকর বলেন যে, তাঁদের কর্মসূচি এত বিজ্ঞানভিত্তিক যে শ্রমিকপার্টির লোকদের এবং সাধারণ ব্রিটিশবাসীর বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল। তাঁর এক চিঠিতে আম্বেদকর বলেন যে, যে সমস্ত দলিত শ্রেণির নেতারা গান্ধিকে সমর্থন করেন তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, গান্ধি দলিত শ্রেণির আলাদা নির্বাচনের শুধু বিরোধিতা করেন না, তিনি তাঁদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বেরও বিরোধিতা করেন; তা না হলে আরও অনেক আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

অধিবেশন চলার সময় ৫ নভেম্বর মহামান্য সম্রাট ভারতীয় প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানান। ঠিক হয় যে, অল্প কয়েকজনই সেই পার্টিতে বক্তৃতা দিতে পারবেন। গান্ধি অনাবৃত মস্তকে হাজির হন। তিনি তাঁর প্রথামতো কটিবস্ত্রে চটি পায়ে উপস্থিত হন। সম্রাট ভারতের অস্পৃশ্যদের অবস্থা সম্পর্কে আম্বেদকরের কাছে জানতে চান। যখন উদ্বেলিত হৃদয়, উচ্চকিত দৃষ্টি ও উচ্ছলিত মুখমণ্ডলে বর্ণনা করা আম্বেদকরের হৃদয়বিদারক কাহিনি শোনেন তখন তিনি থরথর করে কাঁপতে থাকেন। সম্রাট তখন সহৃদয়ভাবে আম্বেদকরের পিতৃপরিচয়, শিক্ষাক্ষেত্র এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সুখ্যাতি অর্জন সম্পর্কে খোঁজ নেন।

প্রকৃতপক্ষে আম্বেদকর গান্ধিকে নির্মম আঘাত করেছিলেন। ঋষিতুল্য হৃদয়ের খদ্দর পরিহিত গান্ধির চরিত্র যিনি সেই সভায় উলঙ্গ করে দিয়েছেন, তিনি তাঁর চেয়ে অল্পবয়সি, কিন্তু সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, দুঃসাহসী ও প্রচলিত সংস্কারের কঠোর সমালোচক।

অপরিমিত উচ্চাশা বিশিষ্ট সংস্কারবিরোধীর সঙ্গে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিরোধ। একজন উচ্চতম শক্তি ও মহিমার অধিকারী, অন্যজন উল্কা সদৃশ ভাস্বর। বৃদ্ধের ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রবাদ স্বরূপ, অন্য দিকে যুবকটি বাস্তবমুখী। উভয়েই ধর্ম ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন। মহাত্মা গান্ধির কাছে ধর্ম ছিল রাজনীতি, কিন্তু আম্বেদকরের কাছে ধর্ম ছিল সমাজের মূল ভিত্তি এবং জীবন ও সমাজের প্রগতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। মহাত্মা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জ্ঞানের প্রশংসা করেন, তাঁর মেধা ও মননকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁর নীতির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। আম্বেদকর গান্ধির শক্তি ও অস্পৃশ্যের মানবীয় কর্তব্য স্বীকার করেও বলেন, **মহাত্মারা চলমান প্রেতাত্মার মতো শুধু ধূলি উড়িয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোনো উন্নতি করতে পারেননি**। গান্ধি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে ছিলেন অজ্ঞ। অপরদিকে সাংবিধানিক ও সমাজবিজ্ঞানে আম্বেদকর পৃথিবী বিখ্যাত মস্তবড়ো পণ্ডিত।

মহাত্মা বলেন যে, তিনি অস্পৃশ্যদের স্বভাবজাত অভিভাবক, অপরদিকে আম্বেদকর বলেন যে, তিনি দলিত শ্রেণির স্বভাবজাত নেতা। মহাত্মার দলিত শ্রেণির নেতৃত্ব ভাবাবেগপূর্ণ ও কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্ব স্বাভাবিক, খাঁটি ও বাস্তব। এই যুবক ভারতীয় রাজনীতির সর্বাধিনায়ককে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং ভারতীয় রাজনীতির সর্বাধিনায়ক তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে ও শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চেষ্টা করেছেন। মহাত্মার অজেয় অহংবোধ তাঁর অগাধ রাজনৈতিক শঠতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। আম্বেদকরের ক্ষমাপূর্ণ অহংকার ঘৃণার সাথে প্রতিযোগিতায় নামে।

মহাত্মার শক্তিশালী প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছায়া ফেলে। আম্বেদকরের অন্তর্নিহিত মানুষটি মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক ব্যবহার উন্মোচিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিষ্ঠুর আঘাত প্রতিধ্বনিত হয়েছে সমস্ত বিশ্বে। যে মহাত্মা তোষামোদ ও স্তুতিতে অভ্যস্ত, তিনি এখন বাস্তব জগত, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও নির্ভীক মনীষার সম্মুখীন হচ্ছেন। সেখানে তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের সীমার বাইরে, ভারতীয় সংবাদপত্র তাঁকে সাহায্য করছে না। পক্ষান্তরে ব্যবসায়িক সংবাদসংস্থা পরিচালিত, বিরোধীদের অতিক্রম করে আম্বেদকর তাঁর নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে উপরে উঠেছেন। কোনো দলীয় সদস্যের অর্থসাহায্য ছাড়াই তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, অদ্ভুত ক্ষমতাবলে, বীরত্বপূর্ণ সাহসে ও সুউচ্চ মনীষায় উপরে উঠেছেন। তাঁর প্রদীপ্ত

বুদ্ধিতে যে কোনো যুক্তিবাদী, বিপ্লবী, মহাত্মা ও আদিষ্ট পুরুষের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তিনি প্রভূত শক্তিমান।

গান্ধি ও আম্বেদকরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে গ্লোর্নি বোল্টন মন্তব্য করেছেন, "দিনের পর দিন আম্বেদকর যশের শীর্ষে উঠেছেন। তিনি অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন এবং ভারতের কল্যাণের জন্য প্রতিটি বক্তব্যেই, রক্ষণশীল বা সমাজতান্ত্রিক, যে কোনো মঞ্চ থেকেই তিনি কথা বলেন না কেন তাতে অস্পৃশ্যদের বেদনার কথাই ফুটে উঠেছে। এটা ছিল বাস্তবতার চেয়ে বেশি আবেগপূর্ণ। গান্ধি অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব করে ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি মঞ্চ থেকে প্রশংসা কুড়োতে পারতেন; কিন্তু আম্বেদকর তার সেই মঞ্চ ধ্বংস করে দিয়েছেন। প্রথমে মুসলিমরা গান্ধির পরাজয়ের আনন্দ উপভোগ করেছেন মনে হলেও ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক প্রতিনিধিই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, আম্বেদকর অন্তত সেই সৌজন্যটুকু গান্ধিকে দেখাবেন, যা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বে অর্জন করেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তথাকথিত জাতীয় সংবাদসংস্থা আম্বেদকরের বিরুদ্ধে লাগামহীন হিংস্র প্রচার অভিযান চালাতে থাকে। তাঁর বিবৃতি ছিল, 'ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি ভাবিত নন'। এজন্য তিনি নিন্দিত হন। তারা বলে যে, আম্বেদকর সংযম ও শালীনতা ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

আম্বেদকর তখন ভারতের সব চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। তিনি অভদ্র, উদ্ধত, অত্যন্ত অশিষ্ট, মানবিক বিচারবুদ্ধিহীন হিসাবে নিন্দিত হন। তাঁকে শয়তান, একনম্বর বদমাস, প্রতিক্রিয়াশীল, ব্রিটিশের দালাল, বিশ্বাসঘাতক এবং হিন্দুধর্ম ধ্বংসকারী নামে অভিহিত করা হয়। এই সময় বিখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক টি.এ. রামনকে তাঁর এক সহযাত্রী জাহাজে তাঁকে বলেছিলেন যে, যদি তিনি কাউক হত্যা করেনÑ তাহলে তিনি হচ্ছেন আম্বেদকর। রমন বলেছিলেন যে, দেশের দশজনের বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা হয়নি, তার চেয়েও বেশি একা আম্বেদকর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

তাঁর জীবনপাত্র এইভাবে তাঁরা তিক্ততায় ভরিয়ে দেন। কিন্তু বিদেশি সাংবাদিকরা এই সংগ্রামকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। একটি সংবাদপত্রের আমেরিকার এক পর্যবেক্ষক লেখেনÑ "গান্ধির কণ্ঠস্বর মাত্র একটি এবং তা বহুজনের বিরুদ্ধে। তাঁরা ক্ষুদ্র মৎস্য হতে পারে এবং মহাত্মা হয়তো একটি শক্তিশালী সংগঠনের পক্ষে কথা বলছেন। আমার মতে মহাত্মার উচিত ছিল গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘুদের জাতীয়তাবাদী অংশের প্রতিনিধিদের একটা বড়ো অংশকে সঙ্গে নিয়ে আসা। তাহলে যাঁরা তাঁর (মহাত্মার) সমালোচনা করছেন, তাঁরাই তার জবাব দিতে পারতেন।"

একই রকমের মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন স্যার চিমনলাল হরিলাল শেতলাবাদ তাঁর 'রিকালেকশন্স অ্যাণ্ড রিফ্লেকশন্স' বই-এ। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে দলিত

শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করার মতো কেউ ছিলেন না। গান্ধি ও কংগ্রেসের দোষারোপ তো প্রকাশ্যেই করেছেন রাজা। আসলে কংগ্রেসের মধ্যে দলিত শ্রেণির নেতারা কেউই আম্বেদকরের কাছে চাঁদের পাশে জোনাকির তুল্যও ছিলেন না।

লণ্ডনের অন্য একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক কংগ্রেসের এক সংবাদপত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এমনকি মুসলিমরাও মহাত্মা গান্ধিকে অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সুশিক্ষিত ডক্টর সাহেব গান্ধির সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছেন এবং মানবিক সহানুভূতিও তাঁর প্রতি ছিল না। তিনি আরও বলেন যে, আম্বেদকর তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষ লণ্ডনে দেখিয়েছিলেন, কারণ ভারতে এমনটি করা সম্ভব ছিল না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ব্যক্তিটির দুর্ভাগ্য যে এই মহানব্রতীর সান্নিধ্যে তিনি আসেননি। তিনি আম্বেদকরকে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেননি।

আম্বেদকর যখনই সুযোগ পেয়েছেন তাঁর বিরোধী সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন তাদের দেবতার প্রতিমূর্তি গান্ধিকে নির্মম আঘাত দিয়ে। ভলটেয়ার, মার্কস ও লেনিন যেমন তাঁদের বিরোধীদের আঘাত করেছেন, গান্ধির প্রতি তাঁর আঘাতও ছিল তেমনি। কয়েক বছর পরে আম্বেদকর গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা বর্ণনা করেনÑ "দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস মিঃ গান্ধিকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এর চেয়ে অপদার্থ লোক আর নির্বাচিত হতে পারত না। ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। গান্ধি বিনয়ের অবতাররূপে আপনাকে উপস্থিত করেন। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর ব্যবহার ছিল বিজয়ের মুহূর্তে এক ক্ষুদ্রমনার। বৈঠকে আসার ঠিক আগে সরকারের সঙ্গে তাঁর মিটমাট হয়ে যাওয়ায় মিঃ গান্ধি সমস্ত অকংগ্রেসি প্রতিনিধিদেরকে ঘৃণা করেছেন। যখনই কোনো সুযোগ হয়েছে তিনি তাঁদের অপমান করেছেন এই বলে যে, তাঁরা কিছুই নন, তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি সেই হেতু তিনি একাই দেশের প্রতিনিধি। প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে তিনি তাঁদের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছেন। জ্ঞানের কথা বলতে গেলে গান্ধি নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করেছেন। তিনি যে সমস্ত সাংবিধানিক ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার অনেকগুলি সম্পর্কে তাঁর কথাবার্তা ছিল অসার। সম্মেলনে মিঃ গান্ধি অনেক আশার কথা বলেন, কিন্তু গঠনমূলক চরিত্রের কোনো প্রস্তাব তিনি রাখতে পারেননি।"

গান্ধির গুরু গোখেল ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, যখন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার ইতিহাস লেখা হবে, তখন গান্ধি একজন ব্যর্থ রাজনীতিবিদ হিসাবেই গণ্য হবেন।

কংগ্রেস নেতা ও সংবাদসংস্থার পক্ষে আম্বেদকরের মতো স্বাধীনতাকামী, সচ্চরিত্র ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে দোষী করা কি উচিত হয়েছে? গান্ধির

সঙ্গে ছিলেন না বলেই কি তিনি দেশের বিরুদ্ধে ছিলেন? তাঁর মতো শক্তিধর, সাহসী ও দৃঢ়চেতা মানুষের পক্ষে অন্য একজন যতই মহৎ ব্যক্তি হোন না কেন, তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে পারেন? দু'টি নক্ষত্র একই পথে চলতে পারে না। কংগ্রেসিরা লোকের মনে এই বিশ্বাসই করাচ্ছিল যে, একমাত্র তাঁদের দলই স্বাধীনতা চায়। আসলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিতে তাঁরাই দেরি করেছেন। বীর সাভারকর এবং তাঁর বিপ্লবী দলই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তাঁদের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে। সকল দলই স্বাধীনতা চায়। কিন্তু তা স্ব-স্ব দলের মনোভাব অনুসারেই চাওয়া হয়েছিল। আম্বেদকরও তাঁর দলের লক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতা দাবি করেন। তিনি বিভিন্ন সম্মেলনে ও গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, স্বাধীন ভারতেই দলিত শ্রেণির উন্নতি হবে। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই শাসনভার যাবে, যারা দলিত শ্রেণির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং তাঁদের কল্যাণ ও স্বার্থবিরোধী। এজন্যই এই দাবির প্রতি তাঁর উৎসাহ মাঝে মাঝে ভাঁটা পড়েছে।

কিন্তু যে বিরোধ আম্বেদকরের ক্রোধের কারণ, তা হল যখন আম্বেদকর দেখেন যে, তাঁর বক্তব্যকে ইংরেজ রাজনীতিবিদরা মুসলিমদের সমর্থনে হিন্দুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন, তখন রামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে তিনি গোপনে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন, যা হিন্দুর পক্ষ সমর্থনে মুসলিমদের বিরুদ্ধেই দেওয়া।

কিন্তু এই বিরোধে কোনো পক্ষেই যদি ন্যায়নিষ্ঠতা থেকে থাকে তা ছিল আম্বেদকরেরই পক্ষে। ভারতের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে রাজা ও রাজবংশের শাসকদের কেউই অস্পৃশ্যদের দাসত্ব জনিত দুঃখদুর্দশা দূর করার কথা ভাবেননি। এই লক্ষ লক্ষ মূক মানুষদেরকে মানবিক অধিকার দেবার জন্য কোনো বর্ণহিন্দু শাসক কোনো আইন প্রণয়ন করেননি। লণ্ডনে আম্বেদকর তাঁর জনগণের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের অবস্থা যে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর মতো মানসিকতাসম্পন্ন, শক্তিমান ও দৃঢ়মনা লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

বর্ণহিন্দুরা শুধু রাজনৈতিক দাসত্বই ভোগ করছিলেন, কিন্তু এদেশে আম্বেদকরের লোকেরা ভোগ করছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব দুইই। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নিপীড়িতদের ভাষা তাঁদের নিপীড়কদের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক হতে বাধ্য। **দেড়শো বছরের রাজনৈতিক দাসত্বের জন্য যদি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ ও সহিংস আচরণ ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে অস্পৃশ্যদের নিপীড়ন ও নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে সহস্রগুণ তিক্ত কশাঘাত অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হবে। দু'হাজার বছর ধরে যাঁরা এই জনগণের সাথে অমানবোচিত ব্যবহার করেছেন, সেই**

নেতাদের সাথে কীভাবে ভদ্র ব্যবহার করা সম্ভব? সেই নিপীড়কদের হাতে যদি পূর্ণ রাজক্ষমতা আসে তাহলে তাঁদের কাছে তাঁরা কী ভালো আশা করতে পারেন? যে সমস্ত মানুষ বিদেশিদের পদাঘাত খেয়ে তাঁদের স্বধর্মীয় গরিব ভাইদের নির্দয়ভাবে পদাঘাত করতে লজ্জাবোধ করেন না, তাঁদের সম্পর্কে অস্পৃশ্যেরা কী বলবে? যখন তাঁরা 'ঐতিহাসিক কারণে' অধিকতর উন্নত সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিতে সম্মত হন, কিন্তু সেই সুবিধাগুলি প্রকৃত দলিত শ্রেণিকে দিতে অস্বীকার করেন, তখন দলিত শ্রেণিকে নিন্দা করার নৈতিক অধিকার কি তাঁদের আছে?

বর্ণহিন্দু নেতারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিলেন, কিন্তু আম্বেদকরের প্রধান কাজ ছিল অস্পৃশ্যদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এমন মানসিকতার মুহূর্ত যুগান্তে একবার আসে মাত্র। তিনি এর সুযোগ হারাবেন? গোলটেবিল বৈঠকে আম্বেদকর তা দেখতে পেয়ে আঁকড়েও ধরেছিলেন তাকে। আম্বেদকরের মতো প্রতিনিধি যদি সেখানে না থাকতেন তবে ভারতে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে অস্পৃশ্যদেরকে টেনে আনতে পারতেন? যাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিলেন, এগিয়ে যাবার জন্য তাঁদের অর্থ, সামাজিক অবস্থান ও শক্তি Ñ সবই ছিল। কিন্তু আম্বেদকর সংগ্রাম করেছিলেন, এদেশে যাঁদের মন, ইচ্ছা, হৃদয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা যুগ যুগ ধরে পদদলিত হয়েছে, তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য। তাঁর ছিল মহত্তর লক্ষ্য, মহত্তর কর্ম, মহত্তর ব্রত, যা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। তাঁর সাফল্যের উপর নির্ভর করে একটি জাতি হিসাবে ভারতের গণতন্ত্র, সাফল্য, শক্তি ও নিরাপত্তা।

স্পৃশ্য নেতাদের পক্ষে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অস্পৃশ্য নেতাদের উপরে তাঁদের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেবার চেষ্টা এবং তাঁরাই অস্পৃশ্যদের মঙ্গল এনে দেবেন Ñ এই কথা বলা অত্যন্ত ঔদ্ধত্য, আত্মম্ভরিতা এবং প্রকাশ্য অত্যাচারের সামিল। কারণ অত্যাচারীরা কখনও মুক্তিদাতা হতে পারে না। এটি একটি শুভ লক্ষণ যে, অস্পৃশ্যদের মুক্তিদাতা অস্পৃশ্যদের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হয়ে সাহসের সাথে মুক্তিসংগ্রাম করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। রাজনৈতিক সমস্যাকে এত বড়ো দুঃসাহসের সাথে যিনি ধারণ করতে সক্ষম এবং সাংবিধানিক সমস্যার সুবিচারক রূপে সেই মূক শ্রেণির নেতাকে পাওয়া একটা নতুন যুগের ইঙ্গিত। সেইজন্য আম্বেদকরের প্রচেষ্টা সমস্ত হিন্দু সমাজের, বিশেষ করে দলিত শ্রেণির স্থায়ী কল্যাণের জন্য। যাঁরা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আশা করেন, তাঁদের পবিত্র কর্তব্য হলো সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ নির্বাচনের দাবি মেনে নেওয়া ও তাঁর সাথে মিলিত হওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের প্রবক্তাগণ তাঁর দাবি মানার পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা করছেন এবং আক্রমণাত্মক অন্যায়

দাবিদার মুসলিম নেতাদের কাছে গোপনে আত্মসমর্পন করছেন।

আম্বেদকর উভয় সংকটে পড়েন। তিনি যদি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বিরোধিতা করে গান্ধির পক্ষ নিতেন, তাহলে তিনি তাঁর জনগণের জন্য ব্রিটিশের কাছ থেকে কিছুই পেতেন না এবং গান্ধিও তাঁদের জন্য শুধু আশীর্বাদবাণী ও শূন্যগর্ভ অসার বাণী ছাড়া আর কিছুই দিতেন না। স্বভাবতই তাঁর কাজের স্বীকৃতি ও দাবি মঞ্জুরের জন্য তাঁর পক্ষে ব্রিটিশের পক্ষ সমর্থনই সঠিক পথ। দ্বিতীয় বিকল্প পথ ছিল গান্ধির সাথে থেকে যৌথনির্বাচনের মাধ্যমে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করা। কিন্তু গান্ধি ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তাঁর যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত তবে এই বিপদ এড়ানো যেত।

মাইনরিটি কমিটির শেষ বৈঠক যখন বসে তখন মুসলিম, দলিত শ্রেণি, একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়, ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অগ্রণী প্রতিনিধিরা একসঙ্গে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তাতে মুসলিম, দলিত শ্রেণি, খ্রিস্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপিয়ানদের সাধারণ নিয়ম-নীতি এবং বিশেষ দাবি উল্লেখ করে বলা হয় Ñ "কোনো ব্যক্তি তাঁর মূল উৎপত্তি, ধর্ম, জাতি বা বিশ্বাসের জন্য সরকারি চাকরি, ক্ষমতা বা সম্মানসূচক কোনো পদ, কিংবা নাগরিক অধিকার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য বাধাগ্রস্ত হবেন না।"

ওই স্মারকলিপিতে সরকারি চাকরিতে, সৈন্যবিভাগে ও পুলিশে দলিত শ্রেণির নিয়োগের এবং পাঞ্জাবে অস্পৃশ্যদের জন্য Punjab Land Alienation Act বর্ধিত করার, সেইসঙ্গে শাসন বিভাগের কর্মচারীদের অস্পৃশ্যদের স্বার্থে অবহেলা করা ও ঔদাসীন্য দেখানোর বিরুদ্ধে গভর্নর বা গভর্নর জেনারেলের কাছে দলিত শ্রেণির আবেদন করার অধিকারের দাবি জানানো হয়।

তা ছাড়া আম্বেদকর ও শ্রীনিবাসন একটি অতিরিক্ত স্মারকলিপিতে প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভায় এবং কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে দলিত শ্রেণি থেকে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নেবার দাবি রাখেন। তাঁরা পৃথক নির্বাচন দাবি করেন, কিন্তু আবার বলেন যে, সংরক্ষিত আসনসহ যৌথনির্বাচন যদি প্রচলন করা হয়, তা যেন গণভোট করার পরেই করা হয়, কিন্তু তাও কুড়ি বছরের বেশি সময়ের জন্য নয়। তাঁদের শেষ দাবি ছিল নামের পরিবর্তন অর্থাৎ 'ডিপ্রেসড ক্লাস' (দলিত শ্রেণি)-এর পরিবর্তে 'নন-কাস্ট হিন্দু' (অ-বর্ণহিন্দু), 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট হিন্দু' (প্রতিবাদী হিন্দু) অথবা 'নন-কনফর্মিস্ট হিন্দু' (বিরুদ্ধবাদী হিন্দু) নামে অভিহিত করা হোক।

গান্ধি যখন দেখলেন যে, সংখ্যালঘু চুক্তিতে (Minorities Pact) দলিত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রয়েছে, তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে হুংকার ছেড়ে মাইনরিটি কমিটিতে বলেন Ñ "আমি আগে যা বলেছি, তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের কাছে গ্রহণীয় যে কোনো সমাধান কংগ্রেস মেনে নেবে, কিন্তু

অন্য কোনো সংখ্যালঘু দলের বিশেষ সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচন সে মেনে নেবে না।" তিনি তখন অস্পৃশ্যদের পক্ষে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে নিদারুণ ক্ষত ও চিরস্থায়ী অশুভ প্রতিবন্ধক আখ্যা দেন। তিনি আরও বলেন যে, অস্পৃশ্যদের যদি অন্য কোনো ভোটাধিকার দেওয়া হয় তিনি সেই ভোটার তালিকার শীর্ষে থাকবেন। তিনি তাঁর সংগ্রামী বক্তৃতায় বলেন যে, আম্বেদকরের ক্ষমতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তিনি জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে তাঁর বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

গান্ধি যুক্তির অস্ত্র সাজিয়ে আম্বেদকরের বিরুদ্ধে বলেছেনÑ "আমি যথার্থ দায়িত্ববোধ নিয়েই বলছি যে, ডঃ আম্বেদকর যে ভারতের সমস্ত অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন এবং তিনি তা নথিভুক্তও করেছেন, সেটি তাঁর সঠিক দাবি নয়। তাতে হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হবে, যা আমি খুশি মনে দেখতে পারব না। অস্পৃশ্যরা মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান হলেও আমি বিশেষ কিছু মনে করি না, তাও আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু প্রতি গ্রামে হিন্দুরা দু'ভাগে বিভক্ত হবে, তা সহ্য করতে পারি না। যাঁরা অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলেন, তাঁরা ভারতকে জানেন না এবং ভারতীয় সমাজ কীভাবে গঠিত তাও জানেন না। সুতরাং আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে এই বলতে চাই যে, যদি আমাকে একাই তাতে বাধা দিতে হয়, তবে জীবন দিয়েও আমি বাধা দেব।"

যে গান্ধি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে আম্বেদকরের চেয়ে তাঁর জনপ্রিয়তার শক্তি কতখানি তা পরিমাপ করার মতো নীচতায়ও নেমেছিলেন, আম্বেদকর তাঁর কথার কোনো উত্তর দেননি। সারা ভারতে অস্পৃশ্যদের সম্মেলন, সভা, টেলিগ্রাম ইত্যাদি থেকে গান্ধির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠেছিল, সেগুলি যে কোনো বিরুদ্ধবাদীকে টলাতে পারত, কিন্তু গান্ধি তাঁর নিজস্ব পথেই চলেছেন। গান্ধি অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ যৌথনির্বাচন সমর্থন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আম্বেদকরের সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা না করে মুসলিমদের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাদের পৃথক নির্বাচন এবং আলাদা প্রদেশসৃষ্টির সংবিধানের আওতায় যাওয়া মেনে নিলেন। তিনি মীমাংসার ইচ্ছা নিয়ে যদি আম্বেদকরের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তবে আম্বেদকরের মেধা ও যুক্তির অস্ত্রে মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দুর্গ ধূলিসাৎ করতে পারতেন।

গান্ধির বক্তৃতায় অন্য একটি বিষয় বেরিয়ে আসে যে, অস্পৃশ্যেরা মুসলিম বা খ্রিস্টান হলে তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। বাস্তবিক পক্ষে এ বিষয়ে তিনি সামান্য প্রতিবাদও করেননি। গান্ধির এই ব্যবহারে অ-কংগ্রেসি হিন্দু নেতাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি তাঁদের কাছে পয়গম্বর, বুদ্ধ বা খ্রিস্টের মতো হতে চান।

তিনি যদি হিন্দুদের ধর্মান্তরের প্রতিবাদ করতেন তাহলে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সাথে বিরোধ বাঁধলে তাঁর মহাত্মাগিরি স্বপ্নের মতো শূন্যে মিলিয়ে যেত।

প্রধানমন্ত্রী যখন দেখলেন যে, সংখ্যালঘু সমস্যার কোনো সর্বসম্মত সমাধান হচ্ছে না, তখন তিনি সমস্ত সংখ্যালঘু কমিটির সদস্যদের কাছে 'তাঁকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা দানের জন্য এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত' এই মর্মে এক একটি অনুরোধপত্রে স্বাক্ষর করে দিতে বলেন। সকল সদস্যের সঙ্গে গান্ধিও ওই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু আম্বেদকরের দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে তিনি ওই পত্রে স্বাক্ষর করেননি। প্রধানমন্ত্রী ১ ডিসেম্বর সম্মেলন স্থগিত রাখেন। ওই অনুরোধপত্রের কেবল আগেই মির্জা ইসমাইলের বাসভবনে গান্ধির সঙ্গে আম্বেদকরের কিছু কথা হয়। গান্ধি আম্বেদকরের সমর্থন লাভের জন্য এক অভিনব প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন যে, সংরক্ষণহীন যৌথনির্বাচন ব্যবস্থায় কোনো অস্পৃশ্য নির্বাচনপ্রার্থী যদি পরাজিত হন তবে আদালতে তাঁর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন। গান্ধি অনেক সময় অসম্ভব বস্তুকে বাকচাতুর্যের দ্বারা দেখাতে চাইতেন, এজন্য আম্বেদকর তাঁর এই অর্থহীন প্রস্তাবে উচ্চহাস্য করেন।

আম্বেদকর লণ্ডনে থাকার সময় বম্বে সরকার তাঁকে জে.পি. (জাস্টিস অব্ পিস) উপাধি দেন। এই ঘটনায় এমনকি এন.এস. কাজরোলকরের মতো কংগ্রেস ভাবাপন্ন ব্যক্তিও তাঁকে অভিনন্দন জানান। আম্বেদকর শিবতর্কারকে জানান যে, তিনি আমেরিকা যাওয়ার জন্য ৫ ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ করবেন এবং একমাসের মধ্যে ভারতে ফিরে আসবেন। তিনি জানান যে, শ্রীনিবাসনের কাছে বত্রিশ বাক্‌সো বই পাঠাচ্ছেন। সেই মতো তিনি বিশ্রামের জন্য এবং তাঁর পুরোনো অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন।

গান্ধি ভারতের পথে যাত্রা করে ১৯৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর বম্বে পৌঁছান। তার কয়েকদিন আগে বম্বের 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' ঘোষণা করে যে, দেশের অন্যান্য অংশ থেকে দলিত শ্রেণির লোকজন গান্ধির প্রতি আস্থা জানানোর জন্য বম্বে আসছেন। তাতে Depressed Classes Institute-এর সম্পাদক শিবতর্কার বম্বের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদককে এই বলে হুমকি দেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তাঁরা গান্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের শোভাযাত্রা করবেন। তিনি গান্ধি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে দলিত শ্রেণির দাবির বিরুদ্ধে গান্ধির বিরোধিতা যুক্তিহীন, একগুয়ে, দুর্বোধ্য, উপহাসযোগ্য এবং ধর্মীয় উন্মত্ততা বিশিষ্ট। তখনকার বম্বের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এম.কে. পাতিল এক বিনম্র চিঠিতে শিবতর্কারকে জানালেন যে, এই অভ্যর্থনা একটা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া কিছু নয়।

উত্তেজনা কিন্তু কমলো না। ২৭ ডিসেম্বর প্রথম রাতের দিকে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা মোল স্টেশনে এসে জড়ো হন। রাত আড়াইটেয় দলিত শ্রেণির প্রায় আট হাজার নরনারীর এক শোভাযাত্রা মোল স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায়। শীতের রাত শেষ হলে গান্ধি সকাল ছ'টায় এসে নামেন। দলিত শ্রেণির লোকেরা তাঁকে কালো পতাকা দেখান। তখন সেখানে শুরু হয় অবাধ মারামারি। অহিংসার পূজারি গান্ধির দেশে ফেরাকে উপলক্ষ্য করে জ্বলে ওঠে হিংসার আগুন! শুরু হয় উভয় পক্ষের লাঠি মারা, পাথর ছোঁড়া, ইট মারা, সোডার বোতল ছোঁড়া ইত্যাদি। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও তার সংবাদপত্রগুলি তাঁদের রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি ছিলেন সংকীর্ণমনা ও অসহিষ্ণু। তাঁরাই দলিত শ্রেণির নেতাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন, তাঁরাই আম্বেদকরকে ব্রিটিশের দালাল, ঘাসে লুকোনো বিষাক্ত সাপ, বিশ্বাসঘাতক, চার্বাক ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। প্রথমে কংগ্রেসের লোকেরাই আহমেদাবাদে আম্বেদকরকে কালো পতাকা দেখিয়েছেন; এটি তারই একটি প্রতিদান মাত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ
সাময়িক যুদ্ধবিরতি

আম্বেদকর ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি রবিবার লণ্ডনে ফিরে আসেন এবং ১৫ জানুয়ারি 'মারসেলিস' জাহাজে চড়ে ২৯ জানুয়ারি বম্বে এসে পৌঁছান। এবার সঙ্গে নিয়ে আসেন চব্বিশ বাক্সো নতুন বই।

সকাল ছ'টায় আম্বেদকরের জাহাজ থেকে নামার কথা। খুব ভোর থেকেই তাঁর অনুগামী ও গুণমুগ্ধদের এক বিশাল জনতা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। রাজনৈতিকভাবে গান্ধিভক্ত হলেও পি.বালু ও কাজরোলকরসহ কয়েকজন দলিত শ্রেণির নেতা তাঁকে মাল্যভূষিত করে জাহাজের ডেকের উপরেই অভিনন্দিত করেন।

আম্বেদকর ও তাঁর সহযাত্রী মৌলানা শওকত আলি মোল স্টেশনে নামেন। মুসলিম নেতা ও দলিত শ্রেণির নেতা তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অভিনন্দিত হন। মুসলিম ও দলিত শ্রেণির বিশাল জনতাকে সম্বোধন করে মুসলিম নেতা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই তার লক্ষ্য সম্পর্কে অবিচল বিশ্বাস থাকা চাই। আম্বেদকর তাঁর লক্ষ্যে যে সংগ্রামী সাহস দেখিয়েছেন তিনি তার প্রশংসা করেন। এরপর শওকত আলি ও আম্বেদকরকে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বেরিয়ে বাইকুল্লায় গিয়ে থামে।

দলিত শ্রেণির কাছে আম্বেদকর তখন শক্তি, আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তখন এটা প্রমাণিত যে তাঁকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না। দলিত শ্রেণির মৃতকোষে নতুন শক্তি, নতুন রক্ত, নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। সেই শক্তি, দৃষ্টি ও চেতনা বিপদ-আপদেও তাঁদের ধরে রাখবে।

বম্বের প্যারেলে সেদিনই সন্ধ্যায় এক বিশাল জনসভায় একশো চোদ্দটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আম্বেদকরকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। সেই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে তাঁর জনগণের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর সেই বিশাল জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, যেটুকু সেবার কাজ তিনি করেছেন, তা সমস্ত কর্মীদের সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। কোনো নেতা নিজে একাই সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী হন না। সুতরাং তিনি তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি যখন মানুষ তখন ভুল করা স্বাভাবিক। হয়তো কোনো সময় তিনি পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী হতে পারেন, সেজন্য তাঁকে যেন ক্ষমা করা হয়।

তিনি বলেন, "গান্ধির বিরোধিতা করেছি বলে কংগ্রেসিদের কাছ থেকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়েছি। সেই অভিযোগের জন্য আমি মোটেই বিচলিত

নই। ওসব মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষপ্রসূত। কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে এটি একটি বড়ো আঘাত যে, স্বয়ং গান্ধি আপনাদের শৃঙ্খল মোচনের কাজে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছেন। আমার বিশ্বাস হিন্দুদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যখন গোলটেবিল বৈঠকের ইতিহাস পড়বেন, তখন আমার কাজ সঠিক উপলব্ধি করবেন।" তিনি আরও বলেন যে, লণ্ডনে তিনি গান্ধিকে চার-পাঁচবার দেখেছেন কীভাবে একখানা পবিত্র কোরান হাতে নিয়ে গোপনে আগা খাঁর সাথে দেখা করেন ও মুসলিম নেতাকে দলিত শ্রেণির প্রতি সমর্থন তুলে নিতে অনুরোধ করেন এবং কীভাবে আগা খাঁ তা প্রত্যাখান করেন। শেষে তিনি তাঁর লোকজনদের কাছে আবেদন করে বলেন যে, তাঁরা যেন তাঁকে দেবতাজ্ঞান না করেন, তিনি দেবত্ব আরোপকে ঘৃণা করেন। সভাশেষে তিনি জেল থেকে মুক্তি পাওয়া নাসিকের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

আম্বেদকরকে দলিত শ্রেণির পক্ষ থেকে দেওয়া স্বাগতভাষণে বলা হয়, "আপনি সম্পূর্ণভাবে আমাদের সামাজিক সাম্য ও মর্যাদার যে দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আপনার বীরোচিত সংগ্রাম ছাড়া তা উপেক্ষিত হতো। আমাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আপনি মানবোচিত সবই করেছেন এবং লণ্ডনে আপনার চেষ্টার ফলেই আমরা নিশ্চয় অদূরভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে একই সারিতে দাঁড়াতে সক্ষম হবো।" উপসংহারে বলা হয়, "এটা বলা মোটেই অতিরঞ্জিত নয় যে, আমাদের সমাজের দায়িত্ববোধ এবং বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি যা এখন সুনির্দিষ্ট হচ্ছে, তা আপনারই প্রাণান্ত চেষ্টা ও উপদেশে হয়েছে।"

লর্ড লোথিয়ানের নেতৃত্বে গঠিত ফ্রানচাইজ কমিটিতে যোগ দিতে আম্বেদকর সত্বর দিল্লি রওনা হয়ে যান। পথে প্রত্যেকটি স্টেশনে দলিত শ্রেণির জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন; বিশেষত নাসিক, ইগাতপুরি, দেওলালি, মানমাড়, ভুসাওল, এবং ঝাঁসী স্টেশনের আয়োজন ছিল অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ও চিত্তাকর্ষক।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে ফ্রানচাইজ কমিটি বিহার পরিদর্শন করে। প্রত্যেক জায়গায়ই দলিত শ্রেণির জনগণ আম্বেদকরকে গভীর উৎসাহে সংবর্ধনা জানান। পরে কমিটি পাটনা হয়ে কলকাতা পৌঁছায়। তাঁর প্রেরণায় দলিত শ্রেণির নেতৃবর্গ ফ্রানচাইজ কমিটির কাছে স্বতন্ত্র নির্বাচন সমর্থন করেন। সংরক্ষিত আসনসহ যৌথনির্বাচনে তাঁদের সংখ্যাগুরুদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে, কারণ তাঁদের ভোট পেতে হলে তাঁদের ইচ্ছাকেই মানতে হবে, নয়তো তাঁদের চামচারাই নির্বাচিত হবেন।

তখন আম্বেদকরের সামনে আর একটি সমস্যা দেখা দেয়। সংরক্ষিত আসনসহ যৌথনির্বাচন নিয়ে ডঃ মুঞ্জে ও এম.সি. রাজার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। রাজা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডঃ মুঞ্জের সঙ্গে তাঁর চুক্তির বিবরণ টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন।

এই চুক্তি আম্বেদকরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে। এর আগে এই রাজাই তারযোগে আম্বেদকরকে পৃথক নির্বাচনের জন্য সমর্থন জানিয়েছিলেন এই বলে যে, গান্ধি তাঁদের দুঃখ-বেদনা না জেনে অনিচ্ছুক দলিত শ্রেণির উপর যৌথনির্বাচন চাপিয়ে দিতে চান। মূলত রাজার দল সংরক্ষিত আসনসহ যৌথনির্বাচন সমর্থন করে। কিন্তু তিনি মত পরিবর্তন করেন। রাজাই কেন্দ্রীয় আইনসভার একমাত্র দলিত শ্রেণির সদস্য, কিন্তু তিনি গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ পাননি। সম্ভবত তার জন্যই কুপিত হয়ে তিনি যৌথনির্বাচনের দাবি ত্যাগ করে পৃথক নির্বাচন সমর্থন করেন। এখন তিনি মূল দাবির পরিবর্তন করেন। আম্বেদকরও তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তিনি সাইমন কমিশনের কাছে যৌথনির্বাচন ও সংরক্ষিত আসনের জন্য রিপোর্ট পেশ করেন এবং মুসলিমদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তোলেন। কিন্তু দলিত শ্রেণির সংরক্ষিত আসনের বিরুদ্ধে গান্ধির আপত্তিতে অবস্থা জটিল হওয়ায় আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনের জন্য অস্পৃশ্যদের ঐক্যবদ্ধ দাবিরূপে উপস্থাপিত করেন।

ভাইসরয়ের বাসগৃহে ফ্রানচাইজ কমিটির সভা হয়। আম্বেদকর দলিত শ্রেণির পক্ষ থেকে আবেদন রাখেন যে, দলিত শ্রেণির বিরুদ্ধে বয়কট করার জন্য শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ভারতীয় পিনালকোডের মধ্যে যুক্ত করা অথবা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, কারণ এই বয়কট দলিত শ্রেণির মৌলিক অধিকার ভোগ করতে বাধা দেয়। ফ্রানচাইজ কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৩২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজে দলিত শ্রেণির দশহাজার মানুষের এক বিশাল সমাবেশে আম্বেদকরকে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা জানানো হয়। মুসলিম, খ্রিস্টান ও অব্রাহ্মণ হিন্দুরাও ওই সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন। 'ডিপ্রেসড ক্লাস আর্মি সার্ভিস' (Depressed Class Army Service)-এর চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব দলিত শ্রেণির প্রতিষ্ঠান, যেমনÑ Depressed Class Army Service Institution, Madras Provincial Depressed Classes Federation, ও Adidravida Malayalam Sabha, Adi Andhra Mahasabha, Arundhateya Mahasabha, Kerala Depressed Classes Association-এর সভাপতিবৃন্দ এবং শ্রমিক সংঘের (Labour Union) নেতৃবৃন্দ একযোগে আম্বেদকরকে সংবর্ধনা জানান। সভায় আম্বেদকর আলাদা নির্বাচন থেকে 'সংরক্ষিত আসনসহ যৌথনির্বাচনে' রাজার সম্মতিসূচক ডিগবাজির কথা জানান। সেজন্য তিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্য উপদেশ দেন। কোনো মনভুলানো মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে তাঁদের ভুলতে নিষেধ করেন এবং সেই নেতাদেরই মাত্র বিশ্বাস করতে বলেন, যাঁরা তাঁদের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করেছেন। সবশেষে গৌতম বুদ্ধ ও রামানুজের মতো বর্ণহিন্দু নেতা, যাঁরা অস্পৃশ্যতার মতো কলঙ্ককে দূর করে তাঁদের উন্নতির চেষ্টা করেছেন,

তাঁদের পরিণতির দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন।

রাজা-মুঞ্জে চুক্তির খবর প্রকাশিত হলে আসাম ও বাংলার দলিত শ্রেণির নেতারা রাজাকে তাঁর সংরক্ষিত আসনসহ যৌথনির্বাচনে মত দেওয়ার জন্য নিন্দা করেন এবং আম্বেদকরের দাবি সমর্থন করেন। 'বেঙ্গল ডিপ্রেসড ক্লাস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি মুকুন্দ বিহারি মল্লিক, এম.এল.এ., U.P. Adi-Hindu Association-এর সভাপতি, All Assam Depressed Class Association-এর সভাপতি, Adi-Dharma Mandal, Punjab-এর সভাপতি, Depressed Class Aid Society-এর সভাপতি, সকলেই রাজার নিন্দা করেন এবং আম্বেদকরের দাবি সমর্থন করেন। 'রত্নগিরি হিন্দুসভা' অস্পৃশ্যদের দাবির পক্ষে বুদ্ধিদীপ্ত সওয়াল করার জন্য আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানায়। আম্বেদকরের এই কাজ বীর সাভারকারেরও সমর্থন লাভ করে।

এই সময় বম্বে সরকার নাসিক জেলার দলিত শ্রেণির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে সিমিংটন (আই.সি.এস.) ও জাকেরিয়া মনিয়ারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির রিপোর্টের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ওই জেলার লোকাল বোর্ডের যে এগারোশোর মতো নলকূপ আছে, ১৯২৩ সালের সরকারি প্রস্তাব সত্ত্বেও সেখান থেকে অস্পৃশ্যরা জল পান না। ওই মাসেই নাসিক সত্যাগ্রহ তৃতীয় স্তরে পৌঁছায় এবং তার নেতা ভাউরাও গাইকোয়াড় ও রাংখাম্বে গ্রেফতার হন। ওই দিনই ১৪ এপ্রিল তাঁদের গ্রেফতারের খবর আম্বেদকরকে দেওয়া হয়। কিন্তু আম্বেদকর বলেন যে, ঘটনার আধিক্য এবং কাজের চাপে তিনি হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দলিত শ্রেণির পৃথক নির্বাচনের দাবির বিরুদ্ধে ফ্রানচাইজ কমিটির হিন্দু সদস্য চিন্তামণি, বাখেল এবং তাম্বের বিরোধিতার ফলে আম্বেদকর ও তাঁদের মধ্যে তীব্র মতান্তর সৃষ্টি হয়। এমনকি আম্বেদকরের সাথে তাঁদের কথা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। আম্বেদকর তাঁর সেক্রেটারিকে জানিয়ে দেন যে, তিনি দুঃখের সঙ্গে বলছেন যে, তিনি একই সময় দু'টি সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছেন না। তাঁর মত এই যে, মন্দির-প্রবেশের সমস্যার চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার সমস্যাটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য তিনি মনেপ্রাণে যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তা থেকে বিচ্যুত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সিমলা থেকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করা একান্ত প্রয়োজন। সে জন্য তিনি তাঁর বিশ্বস্ত কর্মীদের কাছে উদ্দেশ্যটি প্রকাশ না করেই বিদেশে যাবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বলেন। তিনি সে সময় লণ্ডনে থাকা আগা খাঁকেও এক চিঠিতে ওই বিষয়ে তাঁর উপদেশ চান এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে

প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা ও তারিখ জানার জন্যও বলেন। ওই একই সপ্তাহে অন্য এক চিঠিতে ফ্রানচাইজ কমিটির হিন্দু সদস্যদের ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও আক্রমণাত্মক মানসিকতাকে তিনি ঘৃণা করেন। তাঁদের স্বার্থপরতা ও চিন্তাহীনতা দেখে তিনি বিরক্তিবোধ করছেন এবং তিনি হিন্দু সমাজ থেকে দূরে থাকতে চান। এই সময় তিনি মানসিক ও শারীরিক চাপের মধ্যেও কাজ করছিলেন। তা ছাড়া তিনি ডাইরিয়াতেও ভুগছিলেন।

এপ্রিল মাসে 'বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন'-এর চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডঃ কালিচরণ মণ্ডলের সভাপতিত্বে কলকাতার এলবার্ট ইনস্টিটিউট হলে। এই সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে আম্বেদকরের দাবি সমর্থন করে এবং যে সমস্ত সংবাদপত্র অন্যায়ভাবে ডঃ আম্বেদকরের সমালোচনা করে তাদের নিন্দা জানায়। সেইসঙ্গে ঘোষণা করে যে, ওই সমস্যায় কংগ্রেসের ব্যবহার সহানুভূতিহীন এবং অবাস্তব।

ফ্রানচাইজ কমিটির কাজ ১৯৩২ সালের ১ মে শেষ হয়, কিন্তু লর্ড লোথিয়ান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান বলে আম্বেদকর আরও দু-একদিন থেকে যান। ফ্রানচাইজ কমিটি তার খসড়া রিপোর্টে প্রস্তাব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেয়। তাতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচন, আসন বণ্টন ও সীমা নির্ধারণ বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য মত প্রকাশ করা হয়। হিন্দুদের সাথে আম্বেদকরের মতপার্থক্যের জন্য তিনি কমিটির কাছে একটি আলাদা নোট দেন। 'দলিত শ্রেণি'র সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয়ই ছিল কমিটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ১৯১৬ সালের The Indian Legislature Committee-র সিদ্ধান্ত, ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের কমিশনার স্যার হেনরি সার্প এবং সাউথবরো ফ্রানচাইজ কমিটি দলিত শ্রেণির মধ্যে আদিবাসী বা পাহাড়িয়া উপজাতি, অপরাধ প্রবণ জাতি এবং অন্যান্যদের এক সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু লর্ড লোথিয়ানের ফ্রানচাইজ কমিটির মতে শুধুমাত্র অস্পৃশ্যেরাই দলিত শ্রেণিভুক্ত হবে। এটি আম্বেদকরের একটি বড়ো বিজয়। কারণ তিনি তাঁর নোটে কমিটির কাছে জোর দিয়েছিলেন এই বলে যে, অস্পৃশ্যতা "পরীক্ষার প্রয়োগ করতে হবে অবশ্যই সমাজ মানসিকতার অনুসরণে, আক্ষরিকভাবে অস্পৃশ্যতা আর নেই।"

১৯৩২ সালের ৪ মে আম্বেদকর সিমলা থেকে বম্বে ফেরেন। নাগপুরের কাছে কামটিতে 'অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস কংগ্রেস'-এ যোগ দিতে তিনি ৬ মে ক্যালকাটা মেল ধরে বম্বে ত্যাগ করেন। আম্বেদকরের সুবিধার জন্য ওই তারিখ পর্যন্ত সম্মেলন স্থগিত থাকে। কাসারা থেকে নাগপুর পর্যন্ত যাত্রাপথের সমস্ত রেলস্টেশনে সারারাত

অস্পৃশ্য জনতা তাঁকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানায়।

সকাল ন'টায় ট্রেন নাগপুর পৌঁছালে 'আম্বেদকর দীর্ঘজীবী হোন' ধ্বনিতে স্টেশন চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। প্লাটফর্মে আম্বেদকরকে পাঁচহাজার লোকের এক বিশাল জনতা উচ্ছসিত অভ্যর্থনা জানায়। সাখারে আম্বেদকর ও অন্যান্য নেতাদের প্লাটফর্মে বরণ করে নেন। রাজা-মুঞ্জে চুক্তির সমর্থক মুষ্টিমেয় কয়েকজন আম্বেদকরকে কালোপতাকা দেখাবার চেষ্টা করলে তাঁদের স্টেশন থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সিটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন-প্যাণ্ডেলে পনেরো হাজার লোক ধরে এমন বিশাল জায়গার ব্যবস্থা ও সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ভারতের চারদিক থেকে অধিকাংশ দলিত শ্রেণির নেতারা একটি মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একত্র হয়েছিলেন বলে পরিবেশ হয়েছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, দারিদ্র সত্ত্বেও দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিরা বিপুল সংখ্যায় একত্রিত হয়েছিলেন। হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের নেতারা রাজা-মুঞ্জের চুক্তিকে সমর্থন করবে এই আশায় অনেকের গাড়িভাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু ওই ব্যবস্থা দলিত শ্রেণির নেতাদের মধ্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই অধিবেশন বসেছিল এমন একটি জায়গায়, যেটা ছিল ডঃ মুঞ্জে ও রাজা-মুঞ্জে চুক্তির সমর্থনকারীদের এক দুর্গ বিশেষ। All India Depressed Classes Association-এর সেক্রেটারি মি. গাভাইয়ের কাছে লেখা এক চিঠিতে উত্তেজনাবশত আম্বেদকর হুমকি দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর সংগঠন যদি সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানায় তাহলে 'আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরবে এবং আমরা নিজেরাই পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবো।' এটাও প্রচার হয়েছিল যে, গাভাই লর্ড লোথিয়ানের কাছে এই ভয় প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন।

৭ মে সন্ধ্যায় সম্মেলন শুরু হয়। 'মাইনরিটি প্যাক্ট' (Minorities Pact) পৃথক নির্বাচনের যে আভাস দিয়েছিল, রাজা-মুঞ্জে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে প্রায় দু'শো বার্তা সেই দাবি সমর্থন করে, সেই বার্তা পড়ে শোনানো হয়। বুদ্ধমহাসভার সাধারণ সম্পাদক শুভেচ্ছাবাণী পাঠান এবং দলিত শ্রেণির জনগণকে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানান। ছ'টার সময় যখন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি স্বাগত ভাষণ দিতে ওঠেন, তখন রাজা-মুঞ্জে চুক্তির সমর্থক এবং পরবর্তীকালে আম্বেদকর পরিচালিত সর্ব ভারতীয় সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন, সেই রাজভোজ কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য উঠে দাঁড়ান। যতক্ষণ না সভাপতি আসন গ্রহণ করেন ততক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করার জন্য বলা হয়। জনতার মধ্য থেকে তখন

চিৎকার ওঠে Ñ "ওকে বসিয়ে দাও, ওকে বের করে দাও"। রাজভোজ তখন সভা ছেড়ে চলে যান।

সভাপতি হরদাস তখন 'ডিপ্রেসড ক্লাস কংগ্রেস'-এর ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং দলিত শ্রেণির ঐক্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন Ñ "পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা সাঁতরে ডাঙায় উঠব অথবা ডুবে মরব।" দু'ঘণ্টার বক্তৃতায় মুনিস্বামী পিল্লাই দলিত শ্রেণির জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে সরকারের আচরণ সম্পর্কে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি না নেওয়ার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে অন্তত দু'জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি নেওয়ার জন্য তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান।

পরদিন প্রকাশ্য সম্মেলন শুরু হলে রাজভোজ বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ান। তার ফলে প্রচণ্ড হইচই, হাতাহাতি ও প্রকাশ্য নিন্দা শুরু হয়। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট রাজভোজকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। 'ডিপ্রেসড ক্লাস কংগ্রেস' বারোটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে ঘোষণা করা হয় যে, মাইনরিটি প্যাক্টে দলিত শ্রেণির ন্যূনতম দাবির কথা আছে। এতে 'রাজা-মুঞ্জে' চুক্তি বাতিল করা হয়, কারণ ওই চুক্তি দলিত শ্রেণির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। গোলটেবিল বৈঠকে আম্বেদকর ও রায়বাহাদুর শ্রীনিবাসনের সেবামূলক কাজের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়। 'ডিপ্রেসড ক্লাস কংগ্রেস' আম্বেদকর ও মাইনরিটি প্যাক্টের সাথে থাকার শপথ নেয়।

কামটি সম্মেলনের পর আম্বেদকর পুনা, সোলাপুর ও নিপানি পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি দলিত শ্রেণির সভায় বক্তৃতা করেন। এই পরিদর্শনের মধ্যে পুনা পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩২ সালের ২১ মে তিনি পুনা পৌঁছান। সেখানে তাঁকে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। বিরাট শোভাযাত্রা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জয়ধ্বনি দিতে দিতে অহল্যা আশ্রমে পৌঁছায়। সেখানে এ.বি. লাঠের সভাপতিত্বে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। সেখানে লাঠে শ্রোতাদের কাছে প্রকাশ করেন কীভাবে ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদ এবং উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীরা গোপনে তদন্ত করেন যে, তিনি ভারতের বিপ্লবী দলের লোক কিনা। লাঠে আরও বলেন যে, আম্বেদকরের মতো একজন মহাপুরুষকে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের পক্ষে বিশ্বাসঘাতক বলা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। সবশেষে লাঠে বলেন যে, তিনি যে নিপীড়িত জনগণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন, তাঁর এই মানবসেবার কাজ ভারত তথা বিশ্বের কাছে একটা মহান অবদান।

উত্তরে আম্বেদকর বলেন Ñ "বর্তমান হিন্দুভারতে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত ব্যক্তি। আমি বিশ্বাসঘাতক বলে পরিচিত, আমি হিন্দুদের শত্রু বলে নিন্দিত, হিন্দুধর্মের ধ্বংসকারী বলে আমি অভিশাপগ্রস্ত এবং দেশের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। কিন্তু বিশ্বাস

করুন, কিছুদিন পরে যখন এই ধূলি মিলিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের দ্বারা গোলটেবিল বৈঠকের কার্যাবলি নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচিত হবে, তখন হিন্দুর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমার কাজের প্রশংসা করবেন। যদি তা নাও করেন, আমি নিন্দার পরোয়া করি না।" প্রশান্ত মুখে তিনি শেষে বলেন, "এটাই আমার ভীষণ আত্মতৃপ্তি যে, আমার কাজের উপর দলিত শ্রেণির জনগণের গভীর বিশ্বাস আছে এবং আমি যে লক্ষ্যের জন্য দাঁড়িয়েছি তার উপর তাঁদের অক্ষুণ্ন আস্থা আছে। যে নিপীড়িত সমাজে জন্ম নিয়ে আমি বেড়ে উঠেছি এবং বাস করছি, তাঁদের কাজের জন্য মৃত্যুই আমার পরম কর্তব্য বলে মনে করি। নিন্দুকেরা আমার যত কুৎসা ও নিন্দাই করুন না কেন, আমি সেই সত্যধর্ম থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হব না।"

সাম্প্রদায়িক বিষয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সাথে দেখা করার জন্য ২৬ মে ইংলণ্ড রওনা হন। তিনি 'এস.এস. কন্টে রোসো' নামে এক ইটালিয়ান জাহাজে যাত্রা করেন। এই যাওয়ার খবর অত্যন্ত গোপন রাখা হয়, তবুও 'বম্বে ক্রনিকল' কাগজের এক প্রতিনিধি কোনো এক সূত্র থেকে আম্বেদকরের যাওয়ার খবর প্রকাশ করে তাঁর চিন্তাভাবনার উপর আলোকপাত করেন।

রাজার আকস্মিক পরিবর্তন আম্বেদকরকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল এবং লোথিয়ান কমিটির রায়ও তাঁর কাছে তেমন অনুকূল হয়নি। তিনি ভাবলেন যে, এমন মুহূর্ত যুগের মধ্যে একবারই মাত্র আসে। সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় সবকিছু করতে তিনি কৃতসংকল্প হন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, লণ্ডনে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর দাবির গুরুত্ব বাড়বে। লণ্ডনের পথে বাড়িতে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁর ছাপাখানার নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি খুব উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কারণ, তাঁর ভয় ছিল যে, কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী বর্ণহিন্দুরা তা পুড়িয়ে দিতে পারে। তিনি শিবতর্কারকে একটি নতুন ঘর জোগাড় করে নতুন বইয়ের বাক্সোগুলি সেখানে সরিয়ে রাখতে কিংবা অন্যত্র নিরাপদ জায়গায় রাখার নির্দেশ দেন। সব সময়ই তাঁর বইয়ের নিরাপত্তার চিন্তা তাঁকে উদ্বিগ্ন রাখত।

আম্বেদকর ১৯৩২ সালে ৭ জুন লণ্ডনে পৌঁছান। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সব বড়ো বড়ো ব্রিটিশ অফিসার ও ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সাথে দেখা করে লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে তাঁর দাবির সমর্থনে সর্বান্তকরণে সওয়াল করেন। তিনি ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে বাইশ পৃষ্ঠার টাইপ করা একটি বিবৃতি পেশ করেন। কিন্তু তাঁর কাজের ফলাফল সম্বন্ধে তখনই কিছু বলা সম্ভব ছিল না। ১৪ জুন তাঁর লক্ষ্য পূরণের সম্ভাব্য সব কিছু করার পর তিনি দেশে ফিরতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁর কিছু সমর্থক ওখানে তাঁর আরও কিছুদিন থাকার কথা বলায় তিনি স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে ড্রেসডেনে ডাঃ মুলার

প্রতিষ্ঠিত জার্মান স্যানাটোরিয়ামে এক মাস অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। সেখান থেকে প্রয়োজন হলে লণ্ডনে যেতে পারবেন। এজন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি শিবতর্কারকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলেন।

লণ্ডনে ভারতীয়দের এলাকায় গুজব শোনা গেল যে, ডঃ মুঞ্জে লণ্ডনে যাচ্ছেন এবং রাজা তাঁর সঙ্গে যাবেন। আম্বেদকরকে বিপন্ন করার জন্য তিনি রাজাকে ঘৃণা করতেন। এজন্য তিনি তাঁর লোকদের নির্দেশ দেন যে, রাজা যদি লণ্ডনে যান, তবে যাত্রাকালে তাঁকে যেন কালোপতাকা দেখানো হয়। তিনি চিঠিতে লেখেন, তিনি নিশ্চিত যে, বম্বেতে রাজার সম্মেলন করার চেষ্টা তাঁর লোকেরা ব্যর্থ করে দেবে। হলোও তাই। রাজার দল অতি কষ্টে যে সম্মেলন করেন তা পণ্ড হয়। আম্বেদকরের একজন লোক নিহত ও সর্বমোট পঞ্চাশজন লোক আহত হয়। রাজার প্রতি অত্যধিক ঘৃণায় আম্বেদকর বলেন যে, রাজাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মতো লোক তিনি কিছুতেই নন। তথাপি রাজার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য তিনি চেষ্টা করেন।

এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর ভাইপো ও ছেলের কথা ভোলেননি কিংবা তাদের শিক্ষার বিষয়ে অবহেলাও করেননি। তিনি ড্রেসডেন থেকে চিঠিতে তাদের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। মহামানবেরা তাঁদের কাজ এবং লক্ষ্যে এত মগ্ন থাকেন যে, তাঁদের সন্তানদের উন্নতির দিকে ব্যক্তিগতভাবে তত খেয়াল রাখতে পারেন না। তাঁদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে বাস করতে হয়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি আম্বেদকর সুস্থ হয়ে ড্রেসডেন ছেড়ে এক সপ্তাহ বার্লিনে গিয়ে থাকেন, সেখানে তখন হিটলারের অভ্যুদয় হয়েছে। বার্লিন থেকে তিনি লেখেন যে, তিনি ভিয়েনায় যাবেন এবং ভেনিস থেকে 'গঙ্গা' জাহাজ ধরবেন। কিন্তু সেই সময় তিনি কোনো প্রকার অভ্যর্থনা ব্যবস্থায় বিব্রত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ছাত্রজীবনে আম্বেদকর যখন বিদেশ যাত্রা করেছেন, তখন কেউই তাঁর যাওয়া-আসার খবর রাখেনি। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের সময় থেকেই তাঁর যাওয়া-আসার সময় বিদায় জানানো ও স্বাগত জানানোর জন্য হাজার হাজার অনুরাগী ও সাংবাদিকরা উৎসবে পরিণত করে।

আম্বেদকর ১৭ আগস্ট বম্বে পৌঁছান। এর মাত্র তিনদিন আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (Communal Award) কথা ঘোষণা করেন। এই রোয়েদাদ অনুসারে দলিত শ্রেণির লোকেরা প্রাদেশিক আইনসভায় আলাদা আসন এবং দু'টি ভোটদানের অধিকারী হবেন। একটি ভোটে ওই আসনে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা ছাড়াও দ্বিতীয় ভোটের দ্বারা সাধারণ প্রার্থীকেও নির্বাচন করতে পারবেন।

পৌঁছাবার পরদিন আম্বেদকর স্যার স্যামুয়েল হোরকে রোয়েদাদের নবম প্যারাগ্রাফের শেষ অংশ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক দলিত শ্রেণির সদস্যের মনে যে সন্দেহ দেখা দেয় তার ব্যাখ্যার জন্য জরুরি চিঠি লেখেন। তিনি তাঁকে লেখেন যে, রোয়েদাদের মধ্যে যেসব শর্ত যুক্ত হয়েছে, সেগুলি মেনে নিতে দলিত শ্রেণিদের আমি রাজি করাতে পারব না। চিঠির শেষে লেখেন যে, আপনার উত্তর পৌঁছানোর আগেই সারাভারতের দলিত শ্রেণির মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হবে তা যাতে জনসমক্ষে না ঘটে তার চেষ্টা আমি করব।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ভারতীয়দের মধ্যে স্থায়ী বিভেদের সৃষ্টি করে। বলতে গেলে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ভারতে শত্রুতার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে মুসলিম, শিখ, ইউরোপিয়ান ও খ্রিস্টানদের আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। বম্বে ক্রনিকল পত্রিকার মতে উক্ত বাঁটোয়ারায় সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে। সেজন্য সমস্ত লোক ও সংবাদপত্র এর নিন্দা করে।

এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (Communal Award) রাজনৈতিক বিবাদ বৃদ্ধি পায় এবং আম্বেদকর তাতে ভয়ঙ্করভাবে জড়িয়ে যান। গান্ধি ভারতে ফিরে এসে ৪ জানুয়ারি গ্রেফতার হন। গান্ধি অস্পৃশ্য হিন্দুদের বর্ণহিন্দুদের সাথে রাজনীতির গাঁটছড়া বাঁধার সংগ্রাম থেকে বিরত হননি। মার্চের প্রথমদিকে তিনি যারবেদা জেল থেকে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে জানান যে, তিনি জীবন দিয়েও বর্ণহিন্দুদের থেকে অস্পৃশ্য হিন্দুদের পৃথক করা ঠেকাবেন। অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতিতে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ঘোষিত হলে, তিনি ঘোষণা করেন যে, অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচন রদ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমৃত্যু অনশন করবেন। কিন্তু মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে তিনি একটি কথাও বলেননি।

আরও একটি কারণে অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের জন্য গান্ধির আমরণ অনশন ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ 'মাইনরিটিজ কমিটি'র শেষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর উপর সাম্প্রদায়িক মীমাংসার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তিনিও একজন স্বাক্ষরকারী। সুতরাং গান্ধি অবশ্যই তাঁর স্বীকারোক্তি মানতে বাধ্য। কিন্তু রাজনৈতিক হতাশায় তিনি বিশ্বের দৃষ্টি ভারতের দিকে আকর্ষণের জন্য এবং অস্পৃশ্যদের আলাদা নির্বাচন প্রচেষ্টায় আম্বেদকরের চেষ্টায় বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গান্ধির এই ধাপ্পাবাজির অনশন। রাজনীতিবিদ গান্ধি এখন সমস্ত হিন্দুদেরকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের নামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন।

স্বভাবতই গান্ধির এই ঘোষণা দেশে এক ত্রাসের সৃষ্টি করে। সরকার এবং গান্ধির কাছে জনসাধারণ আবেদন জানান। সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া হয় এবং

প্রার্থনাদিও করা হয়। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো নেতারা বলেন যে, হিন্দুধর্ম পরীক্ষার সম্মুখীন। সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে দুর্বলতা এবং দোদুল্যমান অবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু তা বর্ণহিন্দু ও তাঁদের নেতাদের দলিত শ্রেণির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য লজ্জাবোধের কারণে নয়, তার কারণ তাঁদের রাজনৈতিক নেতা ও মুক্তিদাতার জীবনের জন্য। হিন্দুদের ঐতিহ্যগত চরিত্রের দুঃখজনক ঝোঁক শ্রেষ্ঠত্ব পায় ও তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হন।

পণ্ডিত মালব্য এই অচলাবস্থা দূর করতে ও গান্ধির প্রাণরক্ষার জন্য সিমলা থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর বম্বেতে হিন্দুদের এক সম্মেলন ডাকার কথা জানান এবং তারযোগে আম্বেদকরকে এ সংবাদ দেন। মহাত্মার জীবন রক্ষার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রোয়েদাদ (Award) পরিবর্তন প্রয়োজন এবং আম্বেদকর দলিত শ্রেণির জন্য যে সুযোগ আদায় করে এনেছেন, এই সংশোধনের জন্য তাঁরও সম্মতি প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে সকলের দৃষ্টি আম্বেদকরের দিকে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস যে, যেসব নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্র আম্বেদকরকে দলিত শ্রেণির নেতা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন, তাঁরাই তখন বাধ্য হচ্ছেন তাঁকে দলিত শ্রেণির নেতা বলে মেনে নিতে। তিনিই তখন সমস্ত দেশের দিশা নির্ণায়ক ধ্রুবতারা।

গান্ধির আমরণ অনশনে উদ্ভূত সংকটের গুরুত্ব ও বিশালতা সম্পর্কে আম্বেদকরের জানা ছিল। গান্ধি তাঁর প্রতি এক ভয়ঙ্কর মারাত্মক ও সর্বনাশা অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। সেই অস্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। তিনি পুনায় বম্বের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেন। এই বিপদে সরকারের প্রতিক্রিয়া তিনি জানতে চেষ্টা করেন। হিন্দু নেতাদের বৈঠকের আগে আম্বেদকর সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন Ñ "আমি যতটুকু সংশ্লিষ্ট আছি, সবকিছু আমি বিবেচনা করতে রাজি আছি, যদিও কোনোক্রমেই দলিত শ্রেণির অধিকার খর্ব করতে রাজি নই। কোনো স্বীকৃত সত্য ছাড়া শূন্যতার মাঝে বৈঠক করা নিরর্থক।" তিনি আমেদাবাদের দলিত শ্রেণির এক প্রতিনিধিদলকে এবং কোটিপতি ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তিনি তাঁদের বলেন যে, গান্ধি তাঁর প্রস্তাব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারতেন। যেহেতু তিনি কোনো প্রস্তাব করেননি, এজন্য দোষী তিনিই।

আম্বেদকরের বিরুদ্ধে এক ভয়ানক প্রচার চালানো শুরু হয়। আবার তিনি দৈত্য, বিশ্বাসঘাতক ও ভাড়াটিয়া নামে অভিহিত হন। বি.জি.হর্নিম্যান সম্মেলনের আগে 'বম্বে ক্রনিকল' পত্রিকায় এক ভয়ানক প্রবন্ধে বলেন যে, আম্বেদকর দলিত শ্রেণিকে তাঁর হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছেন, সেইভাবে কথা বলেন। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলেন যে, ডক্টরের উচিত দেশবাসীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা এবং দেশকে নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে উদ্ধত অহংকার নিয়ে তাঁর অনড় হয়ে থাকা উচিত নয়। সেই

তথাকথিত দেশপ্রেমিক (বি.জি.হর্নিম্যান) আম্বেদকরকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, দেশের এই রকম বিপদের সময় যিনি অহংকারে নির্জনে থাকবেন, তাঁর এই নিঃসঙ্গতা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

আম্বেদকর শান্ত ও সংযত ছিলেন। সেই সম্মেলনের আগে তিনি আর একটি বিবৃতিতে স্মরণ করিয়ে দেন যে, গান্ধি গোলটেবিল বৈঠকে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানে দলিত শ্রেণিদের সমস্যা অতি সামান্য। তিনি বলেন, "যে স্বাধীনতার জন্য মিঃ গান্ধি সংগ্রাম করছেন, গোলটেবিল বৈঠকে সেই নিয়ে বিতর্কে জেদও ধরেছিলেন, সেই লক্ষ্যেই যদি তিনি এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, তবে সেটাই ন্যায়সঙ্গত হত। এটা আরও বেদনাদায়ক যে, গান্ধি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে একাই দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব দাবি করে আত্মোৎসর্গ করেছেন। অথচ এই পৃথক নির্বাচন শুধু দলিত শ্রেণির জন্যই হচ্ছে না, ভারতীয় খ্রিস্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপিয়ান, মুসলিম এবং শিখদের জন্যও হচ্ছে।"

আম্বেদকর আরও বলেন যে, যদি মুসলিম ও শিখদের পৃথক নির্বাচনে জাতি টুকরো টুকরো না হয়, তাহলে দলিত শ্রেণির পৃথক নির্বাচনে হিন্দুসমাজ টুকরো টুকরো হবে, একথা তাঁরা বলতে পারেন না। উপসংহারে আম্বেদকর দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "মহাত্মা অমর নন কিংবা কংগ্রেসও অমর নয়। ভারতে অনেক মহাত্মা জন্ম নিয়েছেন, যাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছিল অস্পৃশ্যতা দূর করে তাঁদের উন্নতি সাধনের দ্বারা সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। মহাত্মারা এসেছেন, মহাত্মারা চলে গেছেন। কিন্তু অস্পৃশ্যরা অস্পৃশ্যই থেকে গেছেন।"

মহাত্মা তাঁর বৈষ্ণবীয় বিনয়ে বিশ্বখ্যাত মানুষ। অমুসলিম ও ব্রিটিশদের সাথে তেমন ব্যবহারই তিনি করেন। দক্ষ কুশলী হিসাবে তাঁর কৌশল তিনি ভালোভাবেই জানেন। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য অথবা মুসলিমদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করলে তার কী ফল হতো। তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্যও আমরণ অনশন করেননি। আম্বেদকর গান্ধির এই মনোভাব জানতেন, তাই তাঁকে কঠোর আঘাত হানেন।

গান্ধির এই আমরণ অনশনের ফলে দেশের জনগণ অস্পৃশ্যদের অবস্থা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। অস্পৃশ্যদের হৃদয় যে আবেগ-উত্তেজনায় এতদিন তোলপাড় করছিল কিছুদিনের জন্য সেইদিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। জনসাধারণ, সংবাদপত্র এবং দেশপ্রেমিকেরা বুঝলেন যে তাঁদের সমাজে কলঙ্ক আছে। আম্বেদকর সম্পর্কে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মধ্যে, প্রত্যেক সামাজিক মজলিসে এবং প্রত্যেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তখন অনেক আলোচনা হচ্ছে। বন্যার স্রোতের মতো তাঁর কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম আসতে শুরু করে। কিছু লোক তাঁর জীবননাশের হুমকি দেয়, কেউ

কেউ তাঁর বিবেকের কাছ আবেদন জানান এবং কিছু লোক তাঁর ওই অবস্থানকে সমর্থনও করেন।

ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান মারচেন্টস্ চেম্বার'-এর হলঘরে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে হিন্দু নেতাদের বৈঠক বসে। আম্বেদকর ও ডঃ সোলাঙ্কি সভাপতির কাছেই বসেছিলেন। রাজা ও ডঃ মুঞ্জে হাতধরাধরি করে সভাস্থলে আসেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মনু সুবেদার, স্যার চিমনলাল হরিলাল শেতলবাদ, ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কমলা নেহরু, সপ্রু, চৈতরাম, গিদোয়ানি, ঠক্কর, ডঃ দেশমুখ, ডঃ সাভারকার, অ্যানি, কে. নটরাজন, পি. বালু, ও অন্যান্যরা। শেঠ ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ মালব্যকে বলেন যে, সবার আগে আম্বেদকরকেই বক্তব্য রাখতে বলা উচিত। আম্বেদকর শান্ত এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গান্ধি দলিত শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধেই অনশন করছেন। এটাও ঠিক যে, গান্ধির অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু গান্ধির তরফ থেকে কোনো বিকল্প প্রস্তাবের অভাবে কোনো পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য তিনি তাঁদের বলেন, তাঁরা গান্ধির বিকল্প প্রস্তাবের জন্য চেষ্টা করুন, তাহলেই তিনি একটা আলোচনায় এগিয়ে আসতে পারবেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "তবে একটা সিদ্ধান্ত পাকা Ñ গান্ধির জীবনরক্ষার জন্য আমার জনগণের স্বার্থবিরোধী হয়, এমন কোনো প্রস্তাবে আমি রাজি হবো না।" এ কথায় অনেক নেতার অন্তর কেঁপে উঠে এবং কারও কারও হৃৎকম্পও শুরু হয়ে যায়।

পরদিন ২০ সেপ্টেম্বর দুপুরে আবার সভা বসে। যে ডেপুটেশনটি যারবেদা জেলে গান্ধির কাছে গিয়েছিল, তার নেতা স্যার চুনিলাল সভায় বলেন যে, দলিত শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত আসনে গান্ধির ব্যক্তিগত কোনো আপত্তি নেই। এরপর আম্বেদকরকে ওই বিষয়ে বলবার জন্য বলা হলে উভয় সংকটে পড়ে তিনি বলেন, "আমার দুর্ভাগ্য যে, আমাকে এই ঘটনার খলনায়ক করা হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা আমাকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিন, তবুও আমি আমার পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না। আমার জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আপনারা বরং গান্ধিকে এক সপ্তাহের জন্য অনশন স্থগিত রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে বলুন।" সভার কাছে এটা হল আর একটি আঘাত। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল চোখ যেন বলতে চাইল, "আপনারা তাত্ত্বিক, পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক। আপনারা যদি আমাদের আপন না ভাবেন, তবে আমাদের উপর যৌথ নির্বাচন চাপিয়ে দেবার বা আপনাদের মতবাদে আমাদের বিশ্বাস স্থাপনের দাবি করারও কোনো অধিকার আপনাদের নেই।"

পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর বিকেল দু'টো পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখা হয়। তখনই নেতৃস্থানীয় সদস্যরা বিড়লা ভবনে যান। সেখানে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু সংরক্ষিত আসনগুলির জন্য প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের একটি পদ্ধতি ঠিক করেন। ওই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেকটি আসনের জন্য দলিত শ্রেণির লোকেরা তাঁদের মধ্য থেকে কমপক্ষে তিনজনের নামের একটি প্যানেল তৈরি করবেন। তখন ওই তিনজনের মধ্য থেকে বর্ণহিন্দু এবং দলিত শ্রেণির যৌথনির্বাচনে একজন নির্বাচিত হবেন। তাতে আম্বেদকর বলেন যে, তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাথে এ বিষয় আলোচনা করে দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তাবসহ ফিরে আসবেন। পি.জি. কানেকার নামে একজন পণ্ডিত ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সহকর্মীর কাছ থেকে তিনি সমস্ত সংকটে এবং জরুরি বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। সহকর্মীদের সাথে আলোচনা শেষে আম্বেদকর রাতে ফিরে গিয়ে তাঁদের বলেন যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রোয়েদাদে (Award) দেওয়া আসনের চেয়ে অনেক বেশি আসনের দাবিতে তিনি ওই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছেন। নেতৃবর্গ তাঁর প্রস্তাবে রাজি হন এবং জয়াকর, সপ্রু, বিড়লা, রাজাগোপালাচারি ও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মঙ্গলবার রাত দুপুরের ট্রেনে পুনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

২১ সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল সাতটায় তাঁরা যারবেদা জেলের অফিসঘরে গান্ধির সাথে দেখা করেন। গান্ধি বলেন যে, তিনি ওই প্রস্তাব বিবেচনা করে তাঁদের বলবেন। ২১ সেপ্টেম্বর দুপুরে যারবেদা জেলের প্রবেশদ্বারের কাছে জেলপ্রাঙ্গনে গান্ধিকে সরিয়ে আনা হয় এবং সর্দার প্যাটেল ও গান্ধির প্রাইভেট সেক্রেটারি পিয়ারিলাল তাঁর খাটের কাছে বসবার অনুমতি পান। দুপুরে পুনা থেকে সপ্রু আম্বেদকরকে সত্বর পুনায় আসতে ফোন করেন। আম্বেদকর রাত দুপুরের ট্রেনে রওনা হন। সেই একই দিনে রাজা ও মালব্যও বম্বে থেকে পুনার উদ্দেশে রওনা হন।

বৃহস্পতিবার সকালে গান্ধি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজাগোপালাচারির কাছে কথা বলার সময় বলেন যে, সংরক্ষিত আসনের জন্য কতকগুলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় নির্বাচন পদ্ধতি ও কতকগুলিতে যৌথনির্বাচন হবে, এটা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক ও দ্বিতীয় নির্বাচন পদ্ধতি সমস্ত আসনের জন্য এক রকমই হওয়া উচিত। ন্যাশনাল হোটেলে অবস্থানরত আম্বেদকরকে সে কথা জানানো হলে পরিবেশ আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কয়েকজন নেতা প্রস্তাব দেন যে, দলিত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন বাতিল করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে তারবার্তায় জানানো হোক। কিন্তু আম্বেদকর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেন যে, তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া পৃথক নির্বাচনের দাবি ছাড়তে রাজি আছেন, কিন্তু তার পরিবর্তে কী হবে তার একটা সুস্পষ্ট ছবি তাঁদের দিতে হবে, তিনি মরীচিকার পিছনে দৌড়ানো লোক নন। এই নিরানন্দ পরিবেশ চরম নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে।

দুপুরে জয়াকর, সপ্রু ও মালব্য জেলে গান্ধির সাথে দেখা করেন। পি. বালু ও রাজাও তাঁদের অনুসরণ করেন। তাঁরা গান্ধির কাছে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা এমন একটা নিরাপদ চুক্তি করবেন, যা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।

সন্ধ্যার পরে আম্বেদকর, জয়াকর, বিড়লা, চুণিলাল মেহতা এবং রাজাগোপালাচারি জেলে গিয়ে গান্ধির সাথে দেখা করেন। তখন ভীষণ রাজনৈতিক সংকট। দলটি যখন জেলপ্রাঙ্গনে পৌঁছান, গান্ধি তখন আমগাছের ছায়ায় সাদা রঙের একটি লোহার চৌকিতে জেলের বিছানায় শুয়েছিলেন। সর্দার প্যাটেল ও সরোজিনী নাইডু গান্ধির পাশে বসেছিলেন। চৌকির কাছে জলের বোতল, সোডিবাইকার্ব ও লবণ ছিল।

আম্বেদকর যখন চৌকির দিকে এগিয়ে যান তখন চারদিকে নীরবতা এবং শ্বাসরুদ্ধকর ঔৎসুক্য। জয়াকর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আম্বেদকর গান্ধিকে দেখলে তাঁর অনমনীয়তা দুর্বল হয়ে যাবে। যে গান্ধি অনেক শক্তিমান মানুষকে তাঁর রহস্যময় চুম্বকীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছেন, সেই আগ্রাসী ব্যাক্তিত্বের কাছে এখন আম্বেদকর উপস্থিত। জেলের বাইরে ভয়ানক বিহ্বলকারী ঘুর্ণিঝড় এবং ভিতরে আকুল করা নিস্তব্ধতার মধ্যে আম্বেদকর ছিলেন শান্ত ও সংযত। কম শক্তিসম্পন্ন মানুষ সেই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে হারিয়ে যেতেন। আম্বেদকর নিজের জীবনের চেয়ে তাঁর জনগণকে বেশি ভালোবাসেন এবং নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বেশি যত্নবান থাকেন। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওই দৃশ্য দেখলে হয়তো চোখের জল ফেলতেন। কিন্তু সুদীর্ঘকালের দুঃখ, হীনম্মন্যতা ও যে যন্ত্রণার মধ্যে তাঁর লোকেরা ব্যথাবেদনার জন্য আর্তনাদ করেছেন, তার জন্যই তাঁর চোখ ও হৃদয়কে মস্তিষ্ক সংযত করে রাখে। অন্যান্য আদর্শ মহারাষ্ট্রীয় নেতাদের মতো এই বিপদের মধ্যেও তিনি চিত্ত ও স্নায়ু অবিকৃত রেখেছিলেন।

গান্ধি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর বিছানায় শুয়ে অছেন। আলোচনা শুরু হলো। সপ্রু গান্ধির কাছে সমস্ত বিষয়টি বর্ণনা করেন। মালব্য হিন্দু-দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য রাখেন। তখন আম্বেদকর কোমল ও মৃদুকণ্ঠে বলেন, "মহাত্মাজি, আপনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুদার।" গান্ধি উত্তর করেন, "এটা আমার দুর্ভাগ্য যে, সব সময় আমি অনুদার বলে গণ্য হই। আমার কিছু করার নেই।" তখন আম্বেদকর সমস্ত পরিস্থিতি ও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। শান্ত ভাষার প্রভাব পড়ল গান্ধির মনে। তিনি আম্বেদকরের দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে উত্তর দিলেন, "আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ডক্টর, আপনি যা বলেছেন, তার বেশিরভাগ বিষয়ে আমি আপনার সাথে একমত। কিন্তু আপনি বলছেন যে আমার জীবনের প্রতি আপনার মমত্ব আছে।" আম্বেদকর উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ মহাত্মাজি, এই আশায় যে আপনি যদি আমার জনগণের জন্য আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি আমাদেরও

নায়ক হতে পারেন।" গান্ধি বলেন, "বেশ, যদি তাই হয়, তাহলে আমাকে বাঁচাতে কী করতে হবে আপনি তা জানেন। তাই করে আমার জীবন রক্ষা করুন। আমি জানি যে রোয়েদাদের (Award) মাধ্যমে আপনার লোকেরা যা লাভ করেছেন, আপনি তা ত্যাগ করতে রাজি নন। আপনার এই প্যানেল পদ্ধতি আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তাতে একটি বিশৃঙ্খলা আপনাকে দূর করতে হবে। আপনাকে এই প্যানেল পদ্ধতি প্রত্যেক আসনে প্রয়োগ করতে হবে। আপনি জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য এবং আমি স্বেচ্ছা-অস্পৃশ্য। আমরা এক ও অভিন্ন। হিন্দুসমাজের এই বিভেদ দূর' করতে আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।"

আম্বেদকর গান্ধির প্রস্তাব মেনে নিলেন। সাক্ষাৎকার শেষ হলো এবং নেতৃবৃন্দ প্যানেলের লোকসংখ্যা, প্রাদেশিক আইন-পরিষদে মোট কত আসন থাকবে, প্রাথমিক ব্যবস্থার স্থিতিকাল এবং আসন সংরক্ষণের স্থিতিকাল ও আসন বণ্টন বিষয় ঠিক করতে কাজ শুরু করেন।

২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে প্যানেলের মধ্যে প্রার্থীর সংখ্যা কত হবে তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তপ্ত আলোচনা চলে। তারপর কথা হয় আসন সংখ্যা নিয়ে। আম্বেদকর প্রাদেশিক আইনপরিষদে ১৯৭ টি আসন দাবি করেন এবং নেতারা তার সংখ্যা কমিয়ে ১২৬ করেন। দরকষাকষি চলতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। দশঘণ্টা আলোচনার পর কয়েকটি বিষয় গান্ধির কাছে পাঠানো হয় এবং তিনি আম্বেদকরের দাবিগুলি মেনে নেন। তথাপি প্রাথমিক নির্বাচনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে ও আসন সংরক্ষণের সময় বিষয় আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়। আম্বেদকর বলেন যে, প্রাথমিক নির্বাচন দশ বছর পরে শেষ হবে। কিন্তু তিনি সংরক্ষিত আসনের প্রশ্নে জিদ ধরে বলেন যে, আরও পনেরো বছর পরে দলিত শ্রেণির নির্বাচনের মাধ্যমে এর মীমাংসা হবে। নেতাদের মত হলো যে, আসন সংরক্ষণ ও পৃথকীকরণ বিষয়টি দলিত শ্রেণির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হলে তার অশুভ ফল দীর্ঘস্থায়ী হবে। পঁচিশ বছর পরে গণভোটের জন্য আম্বেদকরের এই জিদের ফলে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। আম্বেদকর খোলাখুলি তাঁদের বলেন, তিনি বিশ্বাস করতেই পারেন না যে, আগামী কুড়ি বছরে বা তার পরে অস্পৃশ্যতা আর থাকবে না। তিনি বলেন, বর্ণহিন্দুরা যদি ডেমোক্লেসের তরবারির সামনে পড়েন তবেই তাঁদের অমানবিক মানসিকতা বদলাতে বাধ্য হবেন।

বিকেল চারটেয় খবর এলো, গান্ধির স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপের দিকে, তিনি দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছেন। গান্ধির ছেলে দেবদাস গান্ধি অশ্রুসজল চোখে তাঁর পিতার অবস্থা আম্বেদকরের কাছে বর্ণনা করেন। তিনি গণভোটের জন্য পীড়াপীড়ি করে চুক্তি নিয়ে আলোচনা না করতে তাঁকে অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গান্ধিকে

জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আম্বেদকর বিশিষ্ট কয়েকজন নেতার সাথে রাত ন'টায় জেলে গান্ধির সাথে দেখা করেন। গান্ধি গণভোট সমর্থন করে বলেন যে, তা পাঁচ বছর পরে হওয়া উচিত। দুর্বলতায় গান্ধির কণ্ঠস্বর ফিসফিসানির মতো শোনাচ্ছিল। জেলের ডাক্তার কথাবার্তা বলতে নিষেধ করলেন। তাঁরা ফিরে গেলেন। কিন্তু আম্বেদকর তাঁর দাবি ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। তাঁর ইচ্ছাশক্তি সর্বোচ্চ চাপের মুখে। তাঁর জীবনের হুমকি দিয়ে অজস্র চিঠি আসছে। রাস্তায় তাঁর দিকে খুনির দৃষ্টি পড়ছে। পিছন থেকে নেতারা অনেকে পাগলের মতো তাঁকে গালাগালিও দিচ্ছেন।

শনিবার সকালে আবার আলোচনা শুরু হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় দলিত শ্রেণির জন্য ১৪৮ টি আসন এবং ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে হিন্দু আসনের শতকরা দশভাগ দলিত শ্রেণির জন্য দেওয়া হয়। গণভোট সম্পর্কে কয়েকঘণ্টার আলোচনা আগের মতোই ব্যর্থ হয়। আম্বেদকরের দাবি কেউ মেনে নিতে রাজি না হওয়ায়, তিনি ওই ব্যাপারে গান্ধির সাথে আবার দেখা করা সমীচীন মনে করেন। সুতরাং ডঃ সোলাঙ্কি ও রাজাগোপালাচারিকে নিয়ে তিনি গান্ধির কাছে যান। গান্ধি আম্বেদকরকে বলেন যে, তাঁর যুক্তি অখণ্ডনীয়। কিন্তু তিনি বলেন, শুধু আইনী রক্ষাব্যবস্থায়ই রোগ দূর হবে না। সুতরাং তিনি আম্বেদকরকে শেষবারের মতো হিন্দুদেরকে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, গণভোট হবে, তবে তা পাঁচ বছরের বেশি সময়ের নয়। শেষ সিদ্ধান্তের সুরে গান্ধি বলেন, "পাঁচ বছর অথবা আমার জীবন।"

আলোচনাস্থলে ফিরে এসে আম্বেদকর বলেন, তিনি গণভোটের প্রশ্নে নতিস্বীকার করতে পারেন না, তা অন্তত দশ বছর হওয়া উচিত। এর একঘণ্টা পরে সকলে গণভোট সম্পর্কে শর্ত না রেখেই চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। রাজাগোপালাচারি বিকেল তিনটেয় জেলে গিয়ে বিষয়টি গান্ধির কাছে ব্যাখ্যা করেন। গান্ধি সেটিকে উত্তম বলে তাঁর সম্মতি জানান। রাজাগোপালাচারি সঙ্গে সঙ্গে ১ নং রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর রোডে, শিবলাল মতিলালের বাংলোতে ফিরে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, গান্ধি চুক্তিতে রাজি হয়েছেন। অবিলম্বে চুক্তির খসড়া তৈরি হলো। অত্যন্ত আনন্দ ও আলাপচারিতার মধ্যে ওই চুক্তি ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় স্বাক্ষরিত হয় এবং তা ইতিহাসে 'পুনাপ্যাক্ট' নামে খ্যাত হয়। দলিত শ্রেণির পক্ষে আম্বেদকর এবং বর্ণহিন্দুদের পক্ষে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য স্বাক্ষর করেন। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন জয়াকর, সপ্রু, জি.ডি. বিড়লা, রাজাগোপালাচারি, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রায়বাহাদুর শ্রীনিবাসন, এম.সি. রাজা, দেবদাস গান্ধি, রসিকলাল বিশ্বাস, রাজভোজ, পি.বালু, গাভাই, ঠক্কর, সোলাঙ্কি, সি.ভি. মেহতা, ভাকেল এবং কামাত। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের নাম পরে বম্বেতে যুক্ত হয়।

রাজাগোপালাচারি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আম্বেদকরের সঙ্গে তাঁর ফাউন্টেনপেন বিনিময় করেন।

তখনই প্রত্যেক দলের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা চুক্তির বিষয়বস্তু তারযোগে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ও ভাইসরয়কে জানানো হয় এবং বম্বের গভর্নরের সেক্রেটারিকেও জানানো হয়। পরদিন সকালে নেতৃবৃন্দ চুক্তি অনুমোদনের জন্য বম্বে ফিরে যান। বেলা দু'টোয় নেতৃবৃন্দ ইণ্ডিয়ান মারচেন্টস্ চেম্বার হলে এক সভা করেন। সভাপতির ভাষণে মালব্য ঘোষণা করেন যে, জন্মের জন্য কেউ অস্পৃশ্য বলে গণ্য হবেন না এবং দেশ থেকে অস্পৃশ্যতার ধারণা দূর করার জন্য হিন্দুদের কাছে তিনি আবেদন জানান। মথুরাদাস ভাসানজি চুক্তি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং সপ্রু তা সমর্থন করেন। আম্বেদকরের বীরত্বপূর্ণ অবদানে আবেগভরে সপ্রু তাঁর প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেন যে, ভবিষ্যতে দেশের একজন সুযোগ্য সংগ্রামী হিসাবে তিনি খ্যাত হবেন।

আম্বেদকর ওই প্রস্তাব সমর্থনের জন্য উঠে দাঁড়ালে হাজারো প্রশংসায় তিনি অভিনন্দিত হন। আম্বেদকর বলেন, গতদিন যা ঘটেছে, তা ছিল তাঁর কাছে স্বপ্নেরও অতীত। একটা ভয়ানক সংগ্রাম ও অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁরা সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন, কোনো মানুষ কখনও তাঁর মতো এমন সংকটে পড়েননি। একদিকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম মানুষটির জীবন রক্ষা, অন্যদিকে নিপীড়িত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি বলেন, অবশেষে গান্ধি, সপ্রু ও রাজাগাপালাচারির সহযোগিতায় তাঁরা সমাধানে পৌঁছেছেন। তিনি বলেন, "আমার কেবলমাত্র দুঃখ এই যেÑ মহাত্মাজি গোলটেবিল বৈঠকে এই মনোভাব কেন নিলেন না? তিনি যদি তখন আমার বক্তব্যের প্রতি এই মনোভাব নিতেন, তাহলে এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে তাঁকে যেতে হতো না।"

বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বর্ণহিন্দুদের কাছে এই চুক্তি মেনে চলার জন্য আবেদন রাখেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই দলিলকে তাঁরা পরম পবিত্র মনে করে সম্মানের সাথে কাজ করবেন।

ব্রিটিশ সরকার ২৬ সেপ্টেম্বর পুনাচুক্তির অনুমোদন পার্লামেন্টে সুপারিশ করে পাঠানো হবে বলে ঘোষণা করে। সন্ধ্যায় জেলপ্রাঙ্গনে প্রার্থনা করা হয়। সাড়ে পাঁচটার সময় কস্তুরবা গান্ধিকে কমলালেবুর রস দিলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। প্রায় দু'শো শিষ্যশিষ্যা ও গুণমুগ্ধদের মধ্যে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু, সর্দার প্যাটেল, স্বরূপরানী নেহরু সে সময় উপস্থিত ছিলেন।

পুনাচুক্তি সারাদেশে একটা আলোড়ন তোলে এবং সারা পৃথিবীতে তার প্রতিক্রিয়া হয়। এই ঘটনায় আর একবার প্রমাণিত হয় যে, পুনাচুক্তির আগে যে আম্বেদকরকে

কংগ্রেস নেতৃবর্গ এবং সংবাদপত্রগুলি দলিত শ্রেণির নেতা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনিই এখন সারা ভারতে দলিত শ্রেণির নেতা বলে স্বীকৃতি পেলেন। এই নতুন ব্যবস্থায় উভয় পক্ষকেই কিছু হারাতে হয়। বর্ণহিন্দুদেরকে ৭১ টি আসনের জায়গায় ১৪৮ টি আসন অনুমোদন করতে হয়েছিল। দলিত শ্রেণির যা ছাড়তে হয়েছে তা হলো Ñ ওই ব্যবস্থায় বর্ণহিন্দু নেতারা দলিত শ্রেণির ইচ্ছানুযায়ী চলতে বাধ্য হতো, কারণ, রোয়েদাদ (Award) অনুসারে আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারতেন পৃথক ভাবে। তার বদলে এখন যৌথনির্বাচনে দলিত প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা বর্ণহিন্দুদের হাতেও এলো। ২৬ সেপ্টেম্বর হিন্দুমহাসভার দিল্লি অধিবেশনেও বিষয়টি অনুমোদন পায়।

রাজনীতিক গান্ধির ঘাড়ে যখন মহাত্মা গান্ধি চেপে বসেন, তখনই তিনি সরল জিনিসটিকে জটিল এবং কুটিল করার খেলা দেখান। গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি প্রভাব বিস্তার করেছেন রাজনীতিক গান্ধির উপর, কিন্তু তাঁর রাজনীতি বিফল হয়। যারবেদায় রাজনীতিক গান্ধির জয় হয় বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধি সেখানে হেরে যান। গান্ধির এই জয় এমন ফলপ্রসূ ও ভয়ঙ্কর যে, তিনি জীবন রক্ষার সমস্ত রকম অস্ত্র থেকে আম্বেদকরকে বঞ্চিত করে শক্তিহীন করেন। আম্বেদকরের এই বক্তব্য ঠিকই যে, গান্ধি দলিত শ্রেণির সমস্যায় যদি গোলটেবিল বৈঠকে একটু নমনীয়তা দেখাতেন, তাহলে তাঁকে এই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো না। এই পরীক্ষাটি গান্ধির নিজস্ব সৃষ্টি।

পুনাচুক্তির ফলে একটি যুগের অবসান ঘটে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রকৃত পথ

পুনচুক্তির ফলে মনে হলো যেন বর্ণহিন্দু নেতারা সত্বর মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন শুরু করবেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গান্ধি অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশের পক্ষে ছিলেন না এবং সকলের একত্রে আহারেরও বিরুদ্ধে ছিলেন। কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতারাও এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

গান্ধির অনশনের সময় কতকগুলি মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল বলে শোনা যায়। আম্বেদকর বলেন, আসলে মহাত্মার প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের জন্য সামান্য কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভূতুড়ে ও অস্তিত্বহীন মন্দিরের তালিকা করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে গান্ধির গুজরাট থেকে কোনো মন্দিরের নামই ছিল না। ওই রাজ্য আগের মতোই কঠোর ও প্রতিক্রিয়াশীলই রয়ে গেছে।

১৯৩০ সালে নাসিকে আম্বেদকর পরিচালিত মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন এবং কেলাপ্পান কর্তৃক ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে গুরুভায়ুর মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন কংগ্রেসকর্মীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল। কেলাপ্পান ১৯৩২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে গুরুভায়ুর মন্দির অস্পৃশ্যদের কাছে খুলে না দেওয়া পর্যন্ত অনশন শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে যদি অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দির খোলা না হয় তবে গান্ধি তাঁর সঙ্গে অনশনে যোগ দেবেন বলে গান্ধির কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি তিনমাসের জন্য অনশন স্থগিত রাখেন। মালাবারে কেলাপ্পান অস্পৃশ্যদের কাছে এক মহান সম্পদ বলে আম্বেদকর তাঁকে একটি বার্তায় জানান যে, অস্পৃশ্যদের ওই মন্দিরে প্রবেশ করার চেয়ে তাঁর জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

আম্বেদকর তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে নাসিকে মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁর সেই আন্দোলনের দিক বদল করেন। তিনি তাঁর জনগণকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার জন্য আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৩২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বম্বের ওর্লির এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আম্বেদকর বলেন, "মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন ভালো। কিন্তু আধ্যাত্মিক তৃপ্তির চেয়ে পার্থিব মঙ্গলের প্রতি আপনাদের বেশি মনোযোগী হতে হবে। অর্থের অভাবে আপনাদের খাবার অন্ন জোটে না, পরণের কাপড় জোটে না, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কিংবা চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারেন না। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আপনাদের সচেতন হতে হবে; আপনাদের শক্তি বাড়াতে হবে ও পার্থিব উন্নতির জন্য সংগ্রাম করতে হবে।" এই সভাতেই তিনি আন্দোলনের প্রধান দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয়

গৃহনির্মাণের জন্য তহবিল গঠনের সনির্বন্ধ আবেদন জানান।

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বম্বের বেলাসিস রোডে বক্তব্য রাখার সময় তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার করে তাঁদের বলেন, পার্থিব বস্তু লাভের জন্য মন না দিয়ে অদৃশ্য পরকালের সুখের অস্তিত্ব কল্পনায় তাঁরা কী কঠোর পরিশ্রমই না করছেন। তিনি বলেন, যে জ্ঞানের দ্বারা পার্থিব বস্তু লাভ হবে তার প্রতি উদাসীন থাকা ও পার্থিব বস্তুর প্রয়োজনকে উপেক্ষা করার জন্যই দেশ আজ পিছনে পড়ে আছে এবং উন্নতিও থমকে আছে। তিনি বলেন, **"গলায় তুলসীর মালা পরলে সুদখোর মহাজনের কবল থেকে আপনারা রক্ষা পাবেন না। রামনাম গাইলে জমিদারর খাজনা রেহাই করবে না, বছর বছর পান্ধারপুরে তীর্থ করতে যান বলে মাসের শেষে বেতন পাবেন না। সমাজের অধিকাংশ লোক এই অর্থহীন কুহেলিকায় ও কুসংস্কারে ডুবে থাকার জন্য চতুর আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলি অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম সফল করতে পারছে।"** উপসংহারে তিনি বলেন, "সুতরাং আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, যেটুকু রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া যায় সেটুকুই কাজে লাগাতে হবে। যদি আপনারা উদাসীন থাকেন, তার যথাযথ ব্যবহার না করেন, তবে আপনাদের দুঃখের শেষ হবে না। আমার ভয় হচ্ছে, যে দাসত্বের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি তা পুনরায় আসতে পারে।"

সবন্তওয়াড়িতে একটি জরুরি খুনের মামলায় আম্বেদকরের সওয়াল করার কথা ছিল। ১৯৩২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ওই মামলার শুনানির দিন ছিল। কিন্তু গান্ধির অনশনের জন্য তিনি সবন্তওয়াড়ি যেতে না পারায় ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত মামলার শুনানি স্থগিত থাকে। সবন্তওয়াড়ি যাবার পথে আম্বেদকর যারবেদা জেলে গান্ধির সাথে দেখা করেন। Anti-Untouchability League সম্পর্কে গান্ধির সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন কমিটিতে অস্পৃশ্যদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা দরকার। তিনি একটা বিশেষ লোকগণনার উপর জোর দেন এবং বলেন যে, দলিত শ্রেণির উন্নয়নে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যায়। মন্দিরে প্রবেশ ও একত্রে খাওয়াদাওয়ার চেয়ে Anti-Untouchability League-এর কর্মকাণ্ডে তাঁদের আর্থিক, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের দিকই বেশি প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

সবন্তওয়াড়ি থেকে বম্বে ফিরে আসার পরে ১৯৩২ সালের ২৮ অক্টোবর স্যার কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর হলে ঋষি সম্প্রদায় (মুচি সম্প্রদায়) তাঁকে অভিনন্দনপত্র দেন। সেখানে তিনি তাঁর জনগণকে সাবধান করে বলেন যে, তাঁরা যেন মন্দির-প্রবেশ ও একত্রে খাওয়াদাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে না যান। এর দ্বারা খাওয়াপরার সমস্যা মিটবে না। "যত তাড়াতাড়ি আপনারা 'দুঃখকষ্ট পূর্বজন্মের ফল' Ñ এই অন্ধবিশ্বাস দূর করতে পারবেন, ততই আপনাদের মঙ্গল হবে। আপনাদের দারিদ্র অবশ্যম্ভাবী,

জন্মগত এবং অপরিহার্যÑ এই বিশ্বাস অত্যন্ত ভুল। আপনাদের নিজেদের দাস মনে করা পরিত্যাগ করতে হবে।” তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডন রওনা হবার প্রাক্কালে ৪ নভেম্বর তাঁকে আর একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। এই সময় গুজরাটি মেঘওয়াল সমাজ তাঁকে সম্মানিত করে। নির্বাচিত নেতাকে তাঁরা অশেষ আশীর্বাদ জানান এবং তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুউন্নত জীবন কামনা করেন।

১৯৩২ সালের ৭ নভেম্বর আম্বেদকর ইংলণ্ডের উদ্দেশে রওনা হন। যাত্রাকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, কেন্দ্রকে দায়িত্বশীল না রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা অবিবেচনা প্রসূত কাজ হবে এবং ব্রিটিশ ভারতের জন্য কেন্দ্রীয় দায়িত্ব All India Federation-এর উপর নির্ভরশীল করে তোলার ধারণা তিনি পছন্দ করেন না। গান্ধির অহিংস সত্যাগ্রহ (আইন অমান্য) আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, তা যখন বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন নয়, তখন তার দ্বারা ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্রকে তাড়ানো যায় না।

অসীম ক্ষমতার অধিকারী, আত্মসংযমী এবং তাঁর জনগণের মহানায়ক আম্বেদকর তখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে অস্ত্র চালনায় লিপ্ত হন।

বাড়িতে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন যে, প্রতিবারেই বিশাল জনতার দেওয়া তুমুল কোলাহলপূর্ণ বিদায় সংবর্ধনায় তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি বলেন, তাঁর মন-মেজাজ গণতন্ত্রের সাথে সম্পূর্ণ মানানসই, কিন্তু জনতার কোলাহলে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। ওইসব সংবর্ধনা অগণতান্ত্রিক বীরপূজারই নামান্তর। তিনি বলেন যে, তাঁর অন্তর নির্জনতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশকেই পছন্দ করে। তিনি মন্তব্য করেন, যদি অশান্তির পর শান্তি আসা নিয়মই হয়, তাহলে অনেকদিন আগেই কঠিন শ্রম ও সংগ্রামের পর তাঁর অবকাশ জীবন যাপন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, ওই নীতি তাঁর জীবনের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত ব্যস্ততা ও কোলাহলপূর্ণ জীবনই নির্ধারিত। এই অপরিহার্যতা তাঁর কাজের প্রতি একান্ত ভালোবাসা থেকে আসা এবং তিনি আশা করেন যে, উদ্দেশ্যের প্রতি সততা, কর্তব্যের প্রতি টান তাঁকে সাহসের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করবে।

জাহাজে অনেক বিশিষ্ট যাত্রীরা পুনাচুক্তি ও গান্ধির যে অনশন ভারতে একটা আলোড়ন তুলেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। ওই অনশন তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করে। একজন ইউরোপিয়ান যাত্রী আম্বেদকরকে দেখিয়ে তাঁর বন্ধুকে বলেন, “এই যুবকটিই ভারতে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন।”

জাহাজে অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করার সময় আম্বেদকর ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও রাজনীতিবিদেরা কীভাবে দলিত শ্রেণির লোকদের কেন্দ্রীয় আইসভায় বঞ্চনার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা জানতে পেরে বিচলিত হন। তাঁরা এই যুক্তিতে পরিকল্পনাটি করেছিলেন যে, দলিত শ্রেণির সমস্যা প্রাদেশিক সরকারের বিষয়ের অন্তর্গত। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁদের কোটা মুসলিম ও ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। পুনাচুক্তির জন্য ব্রিটিশ কর্মচারী ও রাজনীতিবিদদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার জন্য আম্বেদকর আনন্দিত হন। পুনাচুক্তির ফলে এখন তাঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভায় হিন্দু আসনের শতকরা ১৮ টি আসন পাবেন। তিনি আরও জানতে পারেন যে, কয়েকজন প্রতিনিধি ইংরেজের প্রদত্ত যে কোনো সংস্কার মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। আম্বেদকর বলেছিলেন যে, অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটলে, সাইমন কমিশন যা দিয়েছে ভারত তার চেয়ে বেশি কিছু পাবে না।

আম্বেদকর সামান্য পায়ের ব্যথায় ভুগছিলেন। এজন্য আগের মতো জাহাজের ডেকে হাঁটাহাঁটি করে তিনি আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। তিনি অধ্যাপক স্লোনের লেখা তাঁর প্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্র নেপোলিয়নের জীবনী ও যারবেদা জেল থেকে 'হরিজন আন্দোলন' সম্পর্কে দেওয়া গান্ধির বিবৃতিগুলি পড়ে সময় কাটান। গান্ধির বিবৃতি সম্পর্কে আম্বেদকর চিঠিতে তাঁর সহকর্মীদের জানান যে, গান্ধি যেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিবর্তিত হচ্ছেন। কিন্তু একত্রে খাওয়াদাওয়া ও অসবর্ণ বিবাহে গান্ধির মানসিকতা এখনও সেই স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। তিনি মন্তব্য করেন, গান্ধির অনশন করা উচিত নয়, তাতে তিনি বৃথাই মৃত্যুবরণ করবেন।

লণ্ডন যাবার পথে গান্ধির বিবৃতিগুলির মন্তব্য প্রসঙ্গে ১৯৩২ সালের ১৪ নভেম্বর পোর্ট সৈয়দ থেকে তিনি Anti-Untouchability League-এর সাধারণ সম্পাদক ঠক্করকে একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠি হিন্দু-সমাজকর্মীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান দলিলরূপে বিবেচিত হয়। কারণ তাতে অস্পৃশ্যতা দূর করার কতকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল, তাতে রাগ বা উত্তেজনামূলক কিছুই ছিল না, ন্যায়ভিত্তিক ও আপত্তিকরহীন ছিল। তাতে আম্বেদকর মন্তব্য করেন, "স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য শুধু আইনের দ্বারা এক হতে পারে না, কোনো নির্বাচনী আইনও এদের এক করতে পারে না, যৌথনির্বাচনের বদলে পৃথক নির্বাচন দ্বারাও তা সম্ভব নয়। একমাত্র ভালোবাসার দ্বারাই তা সম্ভব। দলিত শ্রেণির মুক্তি তখনই আসবে যখন বর্ণহিন্দুরা ভাবতে ও চিন্তা করতে বাধ্য হবেন যে, তাঁদের আচার-ব্যবহার অবশ্যই পালটানো প্রয়োজন। আমি বর্ণহিন্দুদের মানসিকতা পরিবর্তনের বিপ্লব চাই।"

এজন্য তিনি অস্পৃশ্যতা নিবারণী লিগকে (Anti-Untouchability League) বলেন, সারা ভারত জুড়ে অস্পৃশ্যদের নাগরিক অধিকার হিসাবে গ্রামের কুয়ো থেকে

জল নেওয়া, গ্রামের চৌকি ও স্কুলে ভর্তি করা এবং সর্বসাধারণের রাস্তা ব্যবহার করার অধিকারের জন্য তাদের সংগঠিতভাবে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন, তা হিন্দুসমাজে একটা সামাজিক বিপ্লব আনবে।

তিনি বলেন, "যদি নাগরিক অধিকারের জন্য লিগকে এই অভিযানে সাফল্য লাভ করতে হয়, তাহলে গ্রামাঞ্চলে একদল কর্মীর প্রয়োজন যাঁরা দলিত শ্রেণির লোকদের তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামে উৎসাহিত করবেন এবং আইনানুগ ব্যাপারেও তাঁদের সাহায্য করবেন। এটা সত্য যে, এই কর্মসূচি কার্যকরী করতে সামাজিক অশান্তি ও তীব্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। সেটা এড়ানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটনের জন্য অন্য কোনো তুচ্ছ বাধা নিষ্ফল হবে।"

তিনি নিশ্চয় করে বলেন, "এজন্য প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে বর্ণহিন্দুদের চিরাচরিত আচরণের বিরুদ্ধে একটা সংকট তৈরি করতে হবে। এই সংকট বর্ণহিন্দুদেরকে ভাবতে বাধ্য করাবে এবং একবার ভাবতে শুরু করলে তাঁরা পরিবর্তনের কথা ভাববেন। সামান্য আঘাত ও যুক্তির কথা বলাতে কোনো সংকট সৃষ্টি হয় না। মাহাদের চৌদার পুকুর অভিযান, নাসিকের কালারাম মন্দির ও মালাবারে গুরুভায়ুর মন্দির-প্রবেশের আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে যে অল্প দিনে ফলপ্রসূ হয়েছে, সংস্কারকদের লক্ষ লক্ষ দিনের প্রচারের ফলেও তা সাধিত হয়নি।"

তিনি দেখিয়ে দেন যে, দলিত শ্রেণির বেশির ভাগ দারিদ্র ও দুঃখের কারণ হচ্ছে সকল বিভাগের কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সমান সুযোগের অভাব। অস্পৃশ্যতা নিবারণী লিগকে (Anti-Untouchability League) তিনি অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে সেই বৈষম্য দূর করার জন্য সংগ্রাম করতে বলেন। তিনি লিগকে দলিত শ্রেণির থেকে সর্বক্ষণের কর্মী নিয়োগ করতে বলেন। কারণ তাঁরা নির্যাতনভোগী সমাজ থেকে আসায় সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করা কর্মীদের চেয়ে বেশি সততার সাথে কাজ করবেন। তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠিতে টলস্টয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "যাঁরা ভালোবাসে, কেবল তাঁরাই সেবা করতে পারে।" আরও বলেন যে, অর্থলোভীদের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

এই সমুদ্রযাত্রার সময় তাঁর একখানি চিঠিতে আম্বেদকর বলেন, কোনো বন্ধু তৈরি করার প্রবণতা তাঁর নেই। এর একটা আংশিক কারণ এই যে তাঁর মুখের গঠনই ছিল কঠোর ও গম্ভীর। অন্য যে প্রধান কারণটি ছিল তা হলো Ñ মানুষের সঙ্গ করার চেয়ে তিনি বইয়ের সঙ্গ বেশি পছন্দ করতেন। তা ছাড়া বেশির ভাগ সময়ই তিনি গভীর চিন্তামগ্ন থাকতেন। তথাপি জাহাজে তিনি বন্ধু হিসাবে পেলেন জাঠের যুবরাজকে। ফলতান রাজ্যের ভদ্র দেওয়ান কে.ভি. গডবোলের সম্পর্কেও তাঁর ভালো ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

লণ্ডন পৌঁছে আম্বেদকর দেখেন, গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনের যুগ্মসভা ১৭ নভেম্বর শুরু হয়ে গেছে। এবারে প্রতিনিধিদের সংখ্যা কম এবং কংগ্রেসের লোকেরা পুরোপুরি অনুপস্থিত। প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভাজন দেখে আম্বেদকর অসন্তুষ্ট হন। তিনি দেখে দুঃখিত হন যে, মুসলিম প্রতিনিধিরা তাঁদের দাবির চৌদ্দ দফা পেয়েও ভারতের অন্যান্য দলের সঙ্গে কেন্দ্রে দায়িত্বপূর্ণ সরকার গঠনের দাবিতে সহযোগিতা করছেন না। তিনি এই বিশ্বাসে পৌঁছান যে, মুসলিমরা সুসংগঠিত একটি সম্পূর্ণ আলাদা দল এবং হিন্দু প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে দলাদলির ফলে শক্তিহীন।

মুসলিমদের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট দেখে তিনি বিস্মিত হন যে, মুসলিম নেতারা শুধুমাত্র আত্মকেন্দ্রিকই নয়, অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং সামাজিকভাবে পশ্চাদগামী। আম্বেদকর নিশ্চিত যে, দলিত শ্রেণির দাবিতে তাঁদের সমর্থন নিরাপদ নয়। তিনি বর্ণনা করেন যে, বাংলার গোঁড়া হিন্দুরা মন্দির-প্রবেশের ব্যাপারে বাধা দিতে কীভাবে মুসলিমদের সমর্থন লাভ করা যায় সেই মর্মে মুসলিম প্রতিনিধিদের অনুরোধ করে তাদের আবেদনে সোচ্চার হওয়ার জন্য গজনবির কাছে টেলিগ্রাম করেছেন। আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে, হিন্দুদের ধর্মরক্ষার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের মুসলিমদের কাছে আবেদন করা ভারতীয় সংস্কারকদের কাছে একটা সাবধানবাণী। আম্বেদকরের অভিমত এই যে, গোঁড়া হিন্দুদের মতো ভারতীয় মুসলিমরাও অদ্ভুত। ভারতীয় মুসলিমদের কাছে সমাজের পুনর্গঠন অভিশাপের মতো। আম্বেদকর আরও লেখেন যে, ভারতীয় মুসলিমরা যদি কামালের বইয়ের একটা পৃষ্ঠাও গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, তুর্কি নেতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু কামাল পাশা ও আমানউল্লার দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল ছিল বলে ভারতীয় নেতা শওকত আলির তাঁদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই।

গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনের কার্যক্রম কর্মসূচি অনুযায়ী চলে। এই অধিবেশনের প্রধান কাজ ছিল আগের অধিবেশনগুলির কাজকর্মের ত্রুটি দূর করা, অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করা এবং লোথিয়ান, পার্শি ও ডেভিডশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের বিষয়টি স্থির করা। এ ছাড়া ঘোষণা করা হয়, বর্তমান অবস্থায় বয়স্কদের ভোটাধিকার হচ্ছে অবাস্তব পরিকল্পনা, ভোটাধিকারের প্রসারতা বৃদ্ধি করা এবং মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া কর্তব্য। রাজন্যবর্গ এবারে নিরুৎসাহ হয়ে শুধু সময় গুণছিলেন। দলিত শ্রেণিদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁদের অধিক সংখ্যায় ভোটাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

আম্বেদকর 'কমার্শিয়াল সেফগার্ড কমিটি'তে কাজ করেন। আম্বেদকর, জয়াকর,

স্যার কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর, যোশি, কেলকার, সপ্রু, নানকচাঁদ এবং এন.এন. সরকার Ñ এই আটজন প্রতিনিধি নির্বাচনের বৈষম্য দূর করার জন্য বৈঠকে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে, সংবিধানের মধ্যে কয়েকটি ছোটো দফা সংযুক্ত করে দিতে হবে, যাতে জন্ম, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে কেউ সুবিধা ভোগ করতে না পারেন।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আম্বেদকর ইম্পেরিয়াল হোটেল থেকে বাড়িতে এক চিঠিতে লেখেন যে, কেউই গোলটেবিল বৈঠকের কাজে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ব্রিটিশ জাতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাদের ঋণ মীমাংসায় উদ্বিগ্ন থাকায় বৈঠকের প্রতি অমনোযোগী। এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখতে পাননি আম্বেদকর। কারণ, ভারতে কোনো দায়িত্বশীল ও প্রকৃত সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই। আম্বেদকর আরও বলেন যে, ফেডারেশনের গঠন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ বৈঠকে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু শুরুর কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তিনি দুঃখ করে বলেন, মুসলিম ও রাজপ্রতিনিধিরা ভারতে সত্বর দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদনের প্রতি উদাসীন এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিভাজিত লোকগুলি ভারতের জন্য কিছু আনতে পারবেন না। ১৯৩২ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে ঝিমিয়ে পড়া ভাব এবং মুসলিম প্রতিনিধিদের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের ফলে বৈঠক শেষ হয়। আম্বেদকরও ভারতের উদ্দেশে রওনা হন।

ইতিমধ্যে মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন সংবাদপত্র ও সভা-সমিতিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেলাপ্পনের সাথে মহাত্মার সহানুভূতিপূর্ণ অনশনের হুমকিতে তাঁর নিজের দলেই কতকগুলি কুলাঙ্গার বেরিয়ে পড়ে। বর্ণহিন্দু নেতারা যে গান্ধির প্রতি অন্ধভক্তির জন্য তাড়াহুড়ো করে পুনাচুক্তিতে এসেছিলেন, সেটি পরিষ্কার হয়ে যায়। আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে। জামোরিন গুরুভায়ুর মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দিতে অস্বীকার করেন। এই জামোরিন ছিলেন একজন হিন্দু রাজা, যাঁর উৎসবে মুসলিমরাও কিছু কিছু অধিকার ভোগ করতেন।

গান্ধি তখন এই সিদ্ধান্ত দেন যে, পুন্নানি তালুকের গণভোটে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে হয়, তাহলে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত অনশন করবেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মন্দির-প্রবেশের পক্ষে মত দিলেও জামোরিন তা স্বীকার করলেন না। প্রায় একই সময় রঙ্গ আয়ার কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তির বিল (The Untouchability Abolition Bill) আনেন। একই প্রকার বিল রাজা, গয়াপ্রসাদ সিংহ ও বি.সি. মিত্র কেন্দ্রীয় আইনসভায় আনেন। পরে বম্বে প্রাদেশিক আইনসভায় বোলেও ওই একই ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করেন।

এজন্য গান্ধি অনশনে বসার সময়সীমা পিছিয়ে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, ১৯৩৩ সালের ১ জানুয়ারি তিনি অনশন শুরু করবেন না, গভর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবেন। তাতে আম্বেদকরবাদীরা বলেন, গান্ধি যদি দেশের মুকুটহীন রাজা হন এবং তাঁর কথাই যদি আইন হয় তবে এত বাগাড়ম্বরের দরকার কী?

১৯৩৩ সালের ২৩ জানুয়ারি আম্বেদকর 'গঙ্গে' ট্রেনে বম্বে ফেরেন। তাঁর সাথে ছিলেন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস। ট্রেন থেকে নামার সময় সমতা দল তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। বম্বের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি তাঁর আগের মত উল্লেখ করে বলেন, ব্রিটিশ ভারতে দায়িত্বশীল সরকার মঞ্জুর করার বিষয়টিকে রাজন্যবর্গের একটি All India Federation-এ যোগ দেওয়া না দেওয়ার আগ্রহের উপর নির্ভরশীল নয়।

মন্দির-প্রবেশ বিল সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনরব শোনা যাচ্ছে ভাইসরয় এই বিল কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং মাদ্রাজ আইনসভায় উত্থাপনের জন্য সত্বর অনুমতি দেবেন না। তিনি আরও বলেন, মন্দির-প্রবেশ সম্পর্কে গান্ধির এখন জীবন বিপন্ন করা উচিত নয় এবং ভাইসরয়েরও আইনসভায় আলোচনার জন্য বিলটিকে আটকে রাখা ঠিক নয়। যদি জনগণের মতের বিরুদ্ধে আইনটি পাশ হয়, সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ভেটো দিতে পারেন।

ব্যালার্ড পিয়ারে আম্বেদকর গান্ধির কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পান যারবেদা জেলে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। আম্বেদকর তাঁকে জানান যে, দিল্লি থেকে ফেরার পথে তিনি তাঁর সাথে দেখা করবেন। পরদিন রেঙ্গুনের ডঃ বা মাওর কাছ থেকে একটি তারবার্তা পান, "বার্মার পৃথকীকরণ বিরোধী দলের নেতারা পরবর্তী সপ্তাহে সংসদ অধিবেশনের সময় দিল্লির নেতাদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। তাঁরা বার্মার সাংবিধানিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার এবং অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। এজন্য আমরা আপনাকে ফেব্রুয়ারির ৪ ও ৫ তারিখ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করছি। অনুগ্রহ করে যোগাযোগের জন্য তারযোগে আপনার দিল্লির ঠিকানা আমাদের জানাবেন। ৮০ নং হারমিটেজ রোড রেঙ্গুনে ইউ.চিট হ্লেইঙ্গকে উত্তর পাঠাবেন Ñ ইউ.চিট হ্লেইঙ্গ এবং ডঃ বার্মা।" দেশের সব জায়গা থেকে বহু অভিনন্দনবার্তা আম্বেদকরের অফিসে আসে। তার মধ্যে একটি ছিল এর্নাকুলামের 'থিয়া যুবজান সমাজ'। তাতে গোলটেবিল বৈঠকে দলিত শ্রেণির স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য এবং দেশীয় রাজ্যের জনগণের স্বার্থে যে সংগ্রাম করেছেন তার জন্য তাঁদের মহান নেতার প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানানো হয়।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের ভাইসরয়ের ডাকা ইনফরম্যাল মিটিং-এ

যোগ দিতে আম্বেদকর বম্বে থেকে দিল্লি যান। দিল্লি থেকে ফিরে আম্বেদকর গান্ধিকে তারবার্তা পাঠান যে, ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। গান্ধি ৩ ফেব্রুয়ারি আম্বেদকরকে তারবার্তা পাঠন যে, "তার পেয়েছি, আগামীকাল ১২-৩০ -এ সম্ভব Ñ গান্ধি।" আম্বেদকর বার্মার প্রতিনিধিদের সাথে দিল্লিতে আর দেখা করতে পারেননি, কারণ তাঁকে ১৯৩৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি যারবেদা জেলে গান্ধির সাথে দেখা করতে হয়েছিল।

৪ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে বারোটায় আম্বেদকর এস.এন. শিবতর্কার, ডোলাস, উপাসম, কৌলি, ঘোরপাড়ে ও কেশবরাও জেধেকে সঙ্গে নিয়ে যারবেদা জেলে যান। গান্ধি খুশিমনে উঠে দর্শনার্থীদের স্বাগত জানান। একটু পরেই মন্দির-প্রবেশ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। গান্ধি সুব্বারায়ন ও রঙ্গ আয়ারের বিল সমর্থন করার জন্য আম্বেদকরকে অনুরোধ করেন। সুব্বারায়নের বিলে অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে নিন্দা করা হয়নি বলে আম্বেদকর সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে শুধু বলা হয় যে, যদি গণভোটে মন্দির-প্রবেশ সমর্থিত হয়, তবেই দলিত শ্রেণির জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হবে। কিন্তু তাঁদের ওখানকার দেবতাকে পূজা করার অধিকার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

তিনি গান্ধিকে বলেন, বর্ণ বিভাগ অনুসারে দলিত শ্রেণির লোকেরা শূদ্র হতে চায় না এবং তিনি নিজেও হিন্দু হিসাবে পরিচিত হতে চান না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, যে ধর্ম তাঁদের অস্পৃশ্য করে হীন অবস্থায় পরিণত করেছে, সেই ধর্মে কেন তিনি গৌরব বোধ করবেন। যদি ওই প্রথা চলতে থাকে, তবে মন্দির-প্রবেশে কোনো লাভ নেই।

গান্ধি বলেন, তাঁর মতে জাতব্যবস্থা খারাপ নয়। "স্পৃশ্য হিন্দুদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার এবং হিন্দুধর্মকে পরিশুদ্ধ করার একটা সুযোগ দিন। এই ব্যাপারে উদাসীন হবেন না। তাহলে সনাতনপন্থীরা ও সরকার তার সুযোগ নেবে। যদি এই সংস্কার ঘটে তবে অস্পৃশ্য সমাজ উন্নত হবে।"

আম্বেদকর গান্ধির সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, অস্পৃশ্যেরা যদি আর্থিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে উন্নতি লাভ করতে পারেন তবে মন্দির-প্রবেশের অধিকার স্বাভাবিকভাবেই লাভ করবেন।

১৯৩৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি গান্ধির প্রকাশিত 'হরিজন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে আম্বেদকর একই বিষয় প্রচার করেন। তাতে তিনি বলেন, "জাতব্যবস্থার ফলেই এই জাতিভ্রষ্ট জনগণের উৎপত্তি। যতদিন জাতব্যবস্থা থাকবে ততদিন এই জাতিভ্রষ্ট মানুষেরাও থাকবে। জাতিভেদ প্রথা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এই জাতিভ্রষ্টদের মুক্তি হতে পারে না। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসকে এই বীভৎস ও পাপপূর্ণ

ধারণা থেকে পরিশুদ্ধ করা ছাড়া আসন্ন সংগ্রামে তাদের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত হতে পারে না।" উত্তরে গান্ধি বলেন, অনেক শিক্ষিত হিন্দু এই মত পোষণ করেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁদের সঙ্গে একমত নন।

পুনা থেকে ফিরে আম্বেদকর বম্বে আইনসভার বিতর্কে যোগ দেন। 'ভিলেজ বেঞ্চ'-এ মুসলিম ও দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি যদি না থাকে তবে তাঁদের নিযুক্তির ব্যাপারে কালেক্টরকে ক্ষমতাদানের জন্য যে গ্রামপঞ্চায়েত সংশোধনী বিল আনা হয়েছিল, তার সমর্থনে তিনি জোরালো বক্তব্য রাখেন।

অভিযোগের উত্তরে আম্বেদকর বলেন, "স্যার, ভারত ইউরোপ নয়। ইংলণ্ডও ভারত নয়। ইংলণ্ড জাতব্যবস্থা জানে না। কিন্তু আমরা জানি। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইংলণ্ডের পক্ষে যা মানানসই, আমাদের পক্ষে তা নয়। এই বাস্তব অবস্থা আমাদের বুঝতে হবে। আমি এমন ব্যবস্থা চাই যাতে আমরা কেবলমাত্র ভোট দিতে পারব তা-ই নয়, আমরা এমন অধিকার চাই যাতে আমাদের লোকেরা আইনসভায় জায়গা পাবেন, তাঁরা শুধুমাত্র কোনো বিষয় আলোচনা করবেন না, কোনো বিচার্য বিষয়ের সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন। সেজন্য বলছি যে, এই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব খারাপ নয়, বিষও নয়। এটা এই দেশের বিভিন্ন শ্রেণির শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। এটাকে আমি সংবিধানের একটা খারাপ দিক বলতে পারি না।"

একজন সদস্য বলেন, "এটা অলঙ্কার!"

ডঃ আম্বেদকর বলেন, "সংবিধানের অলঙ্কারই বটে।"

বিপক্ষীয়দের যুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিচার বিভাগেও কেন তাঁরা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করেন, তার কারণ হচ্ছে, বিচারকগণ সর্বত্র না হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ক্ষমতার অপব্যবহারের দ্বারা বিচারকার্য করে তাঁদের মর্যাদাকে কলঙ্কিত করেছেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে মামলার দৃষ্টান্তও তুলে ধরেন।

ওই বক্তৃতায় আইনসভা ও সংবাদপত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরদিন সদস্যগণ বিচার বিভাগের প্রতি সর্বাত্মক নিন্দার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধ ব্যক্ত করেন। আম্বেদকর আইনসভায় তাঁর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি সমস্ত বিচারকদের দোষারোপ করেন না, অথবা কোনো একটি সম্প্রদায়ের উপরেও বিশেষ দোষারোপ করেন না। ব্যাপারটি ওখানেই শেষ হয়ে যায়।

১৯৩৩ সালের **১২** ফেব্রুয়ারি আম্বেদকর মন্দির-প্রবেশ বিল এবং আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং তার এককপি যারবেদা জেলে "প্রিয় মহাত্মা"র কাছে পাঠান। রঙ্গ আয়ারের বিলের উল্লেখ করে আম্বেদকর বলেন যে,

অস্পৃশ্যেরা তা সমর্থন করতে ইচ্ছুক নয়, কারণ তার ভিত্তি সংখ্যাধিক্যের উপর, তাতে অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলা হয়নি। তাঁরা বলেন, অধিকাংশ লোকই মন্দির-প্রবেশের বিরুদ্ধে। আম্বেদকর বলেন, "পাপ ও নীতিহীনতায় বেশির ভাগ মানুষ আসক্ত ও অভ্যস্ত বলে তা সহ্য করা যায় না। দলিত শ্রেণির কাছে অস্পৃশ্যতা পাপপূর্ণ। সুতরাং বেশির ভাগ লোক তা মানলেও বিনাদ্বিধায় তা ধ্বংস করা উচিত। সাধারণের কাছে তা অন্যায় বলে পরিগণিত হলে আইনের আদালতে এমন ভাবেই তার প্রতি ব্যবহার করা উচিত। আদতে বিলটি তা করেনি।"

আম্বেদকর মন্তব্য করেন, "সমস্যার বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাঁদের মুক্তির নিশ্চিত পথ হচ্ছে উচ্চশিক্ষা, উচ্চকাজে নিযুক্তি ও জীবিকা অর্জনের উন্নত ব্যবস্থা। সমাজ জীবনে তাঁরা যদি একবার ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তবে তাঁরা সম্মানিত হবেন এবং তাঁরা যখন সম্মানিত হবেন তখন গোঁড়া ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিরও নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে। আর যদি তা নাও হয়, তাতে তাঁদের পার্থিব স্বার্থের কোনো ক্ষতি হবে না।" আত্মসম্মানবোধের প্রশ্নও আছে। তিনি বলেন, যেমন ইউরোপিয়ানদের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব ও সামাজিক আবাসনে 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নেই' লেখা থাকলে যেমন হিন্দুরা সেখানে প্রবেশের অনুমতি চান না, তেমনি যে মন্দিরের বোর্ডে লেখা থাকে 'সমস্ত হিন্দু ও কুকুরসহ অন্যান্য প্রাণীর প্রবেশ অধিকার আছে, কিন্তু অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষেধ' Ñ সেখানেও অস্পৃশ্যেরা প্রবেশের অনুমতি চান না। তিনি বলেন যে, বর্ণহিন্দুদের তাঁরা যা বলেছেন তা হল Ñ "মন্দির খুলুন বা না খুলুন, তা আপনাদের বিবেচনার বিষয় এবং আমি এ বিষয় কিছু বলতেও চাই না। আপনারা যদি মনে করেন যে, মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বাকে শ্রদ্ধা না করা খারাপ রীতি, তাহলে মন্দির খুলে দিয়ে ভদ্রলোক হোন। আর যদি ভদ্রলোক হওয়ার চেয়ে হিন্দু হওয়াটাই আপনারা শ্রেয়তর মনে করেন, তবে মন্দির বন্ধ রেখে নিজেদের ক্ষতি করুন। কারণ আমি ওর মধ্যে আসতে চাই না।"

আম্বেদকর বলেন, যদি মন্দির-প্রবেশ শেষ লক্ষ্য না হয়ে শেষ লক্ষ্যের একটি ধাপ মাত্র হয়, তা হলে তাঁরা তা সমর্থন করতে পারেন। যেমন, ভারতীয়রা ভারতের জন্য রাজনৈতিক সংস্কার গ্রহণ করতে চেয়েছিল, যদি ব্রিটেন ভারতীয়দের শেষ লক্ষ্য স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে মেনে নিত।

বৈষম্যমূলক ধর্ম অস্পৃশ্যেরা মেনে না নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। "যদি হিন্দুধর্ম তাঁদেরও ধর্ম হয়, তবে সেই ধর্মে সামাজিক সাম্য থাকতে হবে। তাঁদেরও বিদেশি মনে না করে স্বদেশি হিসাবে ভাবতে হবে। হিন্দুধর্মকে যদি সামাজিক সাম্যের ধর্ম হতে হয়, তাহলে মন্দিরে প্রবেশরীতি সংশোধনই যথেষ্ট নয়, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে চতুর্বর্ণ প্রথা বিলোপ করা। এটাই হচ্ছে বৈষম্যের মূল কারণ এবং জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশতার

জনক, যা অস্পৃশ্যতারই নামান্তর। যদি তা করা না হয়, তাহলে দলিত শ্রেণির লোকেরা শুধু মন্দির-প্রবেশই ত্যাগ করবে তা নয়, হিন্দুধর্মও ত্যাগ করবে। মন্দির-প্রবেশের অধিকার পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মানে হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা এবং তাঁদের পবিত্র মানবিক ব্যক্তিসত্ত্বাকে বিসর্জন দেওয়া।" উপসংহারে তিনি গান্ধিকে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, "আমি যদি মন্দির-প্রবেশ স্বীকার করে নিই এবং চতুর্বর্ণ প্রথা ও জাতব্যবস্থা বিলোপ করার জন্য আন্দোলন করি, তাহলে গান্ধি কোন পক্ষে থাকবেন? তিনি যদি বিরোধী শিবিরে থাকেন, তাহলে আমি কিন্তু তাঁর শিবিরে থাকব না।"

অধিকাংশ আম্বেদকরপন্থী দলিত শ্রেণির নেতারা তাঁদের নেতার মতেরই সমর্থক। শ্রীনিবাসন, প্রেমরাই এবং মালিক তাঁদের নেতার মতকেই তুলে ধরেন।

উত্তরে গান্ধি তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "হিন্দু সমাজে জন্মেছি বলেই আমি হিন্দু নই, বিশ্বাস ও রুচিতেই আমি হিন্দু। আমার মতে হিন্দুধর্মে উঁচু বা নিচু বলে কিছু নেই। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর যখন বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান, তখন আমি তাঁর সঙ্গে এক শিবিরে থাকতে পারি না, কারণ আমি বিশ্বাস করি বর্ণাশ্রম হচ্ছে হিন্দুধর্মের একটা অপরিহার্য অংশ।"

ঠিক সেই সময় মহান নেতা বীর সাভারকার, যিনি রত্নগিরিতে ব্রিটিশ সরকারের নজরবন্দি ছিলেন, তিনি আম্বেদকরের কাছে এক প্রস্তাবে শেঠ ভাগোজি প্রতিষ্ঠিত রত্নগিরির এক নতুন মন্দির উদ্বোধন করার জন্য আহ্বান জানান। আম্বেদকর তাঁকে দুঃখের সঙ্গে জানান যে, আগে থেকেই ওই সময় তাঁর কর্মসূচি থাকার জন্য তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারছেন না। বীর সাভারকারকে তিনি উত্তরে আরও জানান, "আপনি সমাজসংস্কার বিষয়ে যা করেছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যদি অস্পৃশ্যরা হিন্দু সমাজের অংশ হয়, তবে কেবল অস্পৃশ্যতা দূর করাই যথেষ্ট নয়, আপনাদের চতুর্বর্ণ প্রথাও ধ্বংস করা দরকার। আমি আনন্দিত যে, যে অল্পসংখ্যক লোকে তা উপলব্ধি করেন, আপনি তাঁদের মধ্যে একজন।"

আম্বেদকর যখন বিরোধিতার চরম পর্যায়ে চলে যান এবং অনেক নেতা ও শক্তিশালী গোষ্ঠী তাঁর দিকে চলে আসেন, তখন অনেকেই বিস্মিত হয়ে যান। এটা সত্য যে, বর্ণহিন্দু সংস্কারকদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের সাথে তাঁর লোকজনদের সহযোগিতা করার পরিবর্তে তিনি তাঁদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেন রাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতালাভের দিকে। কিন্তু তিনি তা করেছেন যুক্তির মাধ্যমেই। যদিও 'অ্যান্টি আন্টাচিবিলিটি লিগ'-এর কেন্দ্রীয় বোর্ডে তাঁর নাম ছিল, (পরবর্তীকালে গান্ধি এটির নাম দেন 'হরিজন সেবক সংঘ') তিনি তার কোনো সভায় যোগ দেননি। ওই লিগ যখন মূল লক্ষ্য থেকে সরে যায়, তখন তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। ওই

লিগ থেকে দলিত শ্রেণির নেতা-কর্মীদের বাদ দেওয়ার ফলে লিগের সততা সম্পর্কে দলিত শ্রেণির নেতাদের মনে সন্দেহ জাগে। তাঁদের অনেকেই ভাবেন যে, ওই লিগের উদ্দেশ্য তাঁদের কল্যাণকর আন্দোলনের জন্য নয়, তা কেবল আম্বেদকরের নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্যই। শুধু তাই নয়, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই অভিমত যে, গান্ধির অস্পৃশ্যতা দূর করার আন্দোলন আসলে একটা প্লাটফর্ম মাত্র, কোনো প্রোগ্রাম নয়। তা ছাড়া তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও ছিল। আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, গরিব অস্পৃশ্যরা মন্দির-প্রবেশের আনন্দে আত্মহারা হবে ও ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে। সেই জন্যই এ বিভেদের সৃষ্টি হয়।

আম্বেদকরের এই তিক্ত ঘটনাবলি সম্পর্কে দেওয়া বিবৃতিতে জাতীয় সংবাদপত্রগুলি উত্তেজিত হয়ে পুনরায় আম্বেদকরের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রচার শুরু করে। কেউ কেউ তাঁকে ভীমাসুর, দৈত্য আখ্যা দেয়। বম্বের একটি মারাঠি দৈনিক তাঁকে 'ব্রহ্মাদভেস্তা' রূপে বর্ণনা করে। আম্বেদকর মতাবলম্বীদের মতে যে অর্থে লোকমান্য তিলককে 'চিরল' পত্রিকার দেওয়া 'ভারতের বিক্ষোভের জনক' আখ্যা তাঁর জীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন করে, ঠিক তেমনি 'ব্রহ্মাদভেস্তা' আখ্যাটিও আম্বেদকরের জীবনের প্রকৃত মূল্যায়নের কথা ব্যক্ত করেছে। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ্যবাদ হচ্ছে এমন এক আদর্শবাদ, যা উঁচুনিচু ভেদাভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত। ব্রহ্মাদভেস্তা বলেই আম্বেদকর এই অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি হচ্ছেন অধিকতর বিপ্লবী এবং অধিকতর দেশপ্রেমিক। ব্রহ্মাদভেস্তা যেমন জাতিভেদ প্রথা, উঁচুনিচু ভেদাভেদ, নিম্ন শ্রেণির শোষণ বিলোপ করেন, তিনিও তাই করেন।

কেবল কঠোর সনাতনপন্থীরাই নয়, আধা-সনাতনপন্থী ও সনাতনপন্থী সমাজ সংস্কারকগণও রঙ্গ আয়ারের মন্দির-প্রবেশ বিলের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন যে, তা কোনো গণভোটের দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে না এবং আইনেরও এই ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। পণ্ডিত মালব্য ভয়ানক চাপ সৃষ্টিকারী এক টেলিগ্রামে গান্ধিকে জানালেন রঙ্গ আয়ারের বিল প্রত্যাহার করে নিতে। কারণ নীতিগতভাবে মন্দির পরিচালনার ব্যাপারে আইনসভার পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপেরও বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি বলেন যে, বিলটি বম্বে-অঙ্গীকার অনুযায়ী হয়নি এবং বম্বে-অঙ্গীকারটি পুনাচুক্তির অনুমোদন ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষ থেকে গান্ধি ও রাজার আন্দোলনের মধ্যে ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করা হয়। তাঁরা মনে করেন যে, দলিত শ্রেণির লোকদেরকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তা একটা পরিকল্পনা মাত্র। ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

না করা ছিল তাঁদের ঘোষিত নীতি। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, আগে থেকেই তাঁরা ব্রিটিশের প্রতি বিরক্ত, এতে আরও তিক্ততা বাড়বে। তাঁরা ভাবলেন যে, যে হিন্দু নেতারা যুগ যুগ ধরে নীরব ছিলেন, আজ তাঁরা আইনের দ্বারা সেই অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা করছেন, তাতে অস্পৃশ্যরা আরও বিপন্ন হবে মাত্র। কিন্তু অবশেষে ভারতীয় অফিস গভর্নর জেনারেলকে আইনসভায় বিলটি আনার জন্য পরামর্শ দেন। ভাইসরয় ওই বিলটি সর্বভারতীয় চরিত্রের হওয়ায় ডঃ সুব্বারায়ন ও নারায়ণ নাম্বিয়ারকে ওই বিল আনার জন্য অনুমতি দেননি। কারণ তা কেবল প্রাদেশিক ভিত্তিতে আলোচনা করা ঠিক নয়। তিনি অন্যদের ওই বিল আনার অনুমতি দেন। রঙ্গ আয়ারের বিল ছাড়া অন্য বিল বাতিল হয়ে যায়।

১৯৩৩ সালের ২৪ মার্চ রঙ্গ আয়ার ওই বিল আনেন। কিন্তু কংগ্রেস সদস্যদের অজ্ঞতার ভান ও বিলের প্রতি সরকারের সহানুভূতির অভাবে গোঁড়াপন্থীরা দীর্ঘসূত্রিতা প্রথায় তা চেপে রাখেন। ফলে কয়েক মাস পরে ওই বিলটির মৃত্যু ঘটে।

যে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কুসংস্কারের ফলে যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্যরা পুরুষত্বহীন ও নিষ্প্রাণ হয়ে আছে, এরপর আম্বেদকর সেই সম্পর্কে প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি তাঁদের মনে এই ধারণার জন্ম দেন যে, ঈশ্বর উপাসনার চেয়ে রুজি-রুটিই তাঁদের বেশি প্রয়োজন। থানে জেলার কাসারার এক সম্মেলনে তিনি অস্পৃশ্যদের বলেন, "হিন্দুধর্মে আমরা সাম্য চাই। চতুর্বর্ণ প্রথাকে নির্মূল করতে হবে। যে নীতি উচ্চশ্রেণিকে সুবিধা দেয় এবং নিম্নশ্রেণিকে দারিদ্র দেয়, সে নীতির অবসান করতেই হবে। ব্রিটিশ সরকার বিদেশি হওয়ায় আমাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে না। অনৈক্য যেন আপনাদের গ্রাস না করে, তা ধ্বংস ডেকে আনে। নিজের চোখেই পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করবেন। মাহাদ ও নাসিকের সংগ্রামে আপনাদের কী রাজনৈতিক লাভ হয়েছে তা ভুলবেন না। লণ্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় নাসিক সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রতিদিন ব্রিটিশদের ঔৎসুক্য বাড়াত ও তাঁরা শিক্ষালাভ করতেন।"

তিনি বলেন, "আপনারা যা হারাচ্ছেন, অন্যেরা তা লাভ করছে। আপনাদের হীনম্মন্যতা অন্যদের গৌরবের বিষয়। আপনাদের এই দৈন্য, দুর্ভোগ ও হীনম্মন্যতার কারণ আপনাদের পূর্বজন্মের পাপের জন্য নয়, এর কারণ হচ্ছে আপনাদের মাথার উপর যারা বসে আছে তাদের অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা। আপনাদের জমি নেই, কারণ অন্যেরা তা অধিকার করে নিয়েছে, আপনাদের চাকরি নেই, কারণ অন্যেরা তার উপর একাধিপত্য করছে। ভাগ্যের উপরে বিশ্বাস করবেন না, নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস রাখুন।"

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে বম্বের মাঝগাঁওয়ের এক সভায়

তিনি ঘোষণা করেন, “এক সময় তিলক যে অবস্থায় ছিলেন, আমিও সেই অবস্থায় আছি। যতদিন পর্যন্ত আমার বিরোধীরা আমাকে অভিশাপ দেবে, ততদিন ধরে নেব যে, আপনাদের জন্য যা করছি, তা সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত। গত দু'হাজার বছরের অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য এমন চেষ্টা কখনও হয়নি। অস্পৃশ্যেরা এখন বিশ্বাস করে যে, হিন্দুর স্বরাজ দাবিটি দলিত শ্রেণির সমর্থন না পেলে ভুগবে। হিন্দুরা আপনাদের জন্য যা করেন, তা দয়া বা বদান্যতার জন্য করেন না, তাঁরা তাঁদের কল্যাণের জন্যই করেন। আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে অত্যাচার, অন্যায়, মিথ্যা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা, সমস্ত সুবিধাবাদ নষ্ট করা ও নির্যাতিত মানুষদের দাসত্ব মোচন করা। অবিরত সংগ্রামের ফলেই আমাদের কাজের স্বীকৃতি লাভ ঘটেছে।

“পচা মাংস খাওয়া বন্ধ করুন। সম্মানের সাথে বাস করতে শিখুন। এই জগতে কিছু করবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখবেন। যাঁরা সংগ্রাম করেন, তাঁরাই উপরে ওঠেন। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁরা কোনোদিন এ জগতে উন্নতি লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু মনে রাখবেন, অসহায় অবস্থার দিন শেষ হয়েছে। একটা নতুন যুগের আরম্ভ হয়েছে। এখন সবই সম্ভব হয়েছে, কারণ, আপনারা এখন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে ও দেশের আইনসভায় যেতে পারছেন।”

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বম্বেতে এক সভায় তাঁর উদ্দেশে দেওয়া স্বাগতভাষণের উত্তরে তিনি বলেন, “**এই ভাষণে আমার কাজ ও গুণাবলির প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। এর অর্থ আপনাদের মতো একজন সাধারণ লোককে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই জাতীয় বীরপূজা যদি আপনারা অঙ্কুরেই বিনাশ না করেন, তবে আপনাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। এইভাবে একজনকে দেবতা করার মধ্যে আপনারা নিজেদের নিরাপত্তা ও মুক্তি খুঁজছেন, তার ফলে নিজের কর্তব্যে উদাসীন হয়ে আপনারা পরনির্ভর হচ্ছেন। আপনারা যদি এই ধারণার বলি হন, তবে জাতীয় জীবন স্রোতে আপনারা ভেসে যাওয়া কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হবেন। আপনাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে।**” তিনি বলেন, “এই নতুন যুগ আপনাদের যে রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে, তাকে অশ্রদ্ধা করবেন না। আপনারা নিজেদের অসহায় ভাবতেন বলেই আপনারা এ পর্যন্ত পদদলিত হয়েছেন। আমি বলতে চাই যে, এই প্রকার বীরপূজা, দেবত্ব আরোপ ও কর্তব্যে ত্রুটি হিন্দুসমাজকে ধ্বংস করেছে, এবং আমাদের দেশের পতনের কারণও তাই। **অন্যান্য দেশে জাতীয় দুর্যোগ ও সংকটে লোকে জাতীয় দুর্যোগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে, বিপদকে হটিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনে। কিন্তু আমাদের ধর্ম আমাদের কানে বজ্রধ্বনি করে বলছে যে, মানুষ কিছুই করতে পারে না, সে একখানি কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। জাতীয় বিপদের সময় ভগবান**

নিম্নে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন। ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ না করে আমরা ভগবানের অবতারকে দিয়ে ওই কাজ সম্পাদনের আশায় বসে থাকি।

"আপনাদের দাসত্ব অবশ্যই নিজেদের ঘোচাতে হবে। দাসত্ব ঘোচাতে কোনো ঈশ্বর বা অতিমানবের উপর নির্ভর করবেন না। রাজনৈতিক ক্ষমতার উপরই আপনাদের মুক্তি নির্ভর করছে, তীর্থভ্রমণ বা উপবাস করলে তা পাওয়া যাবে না। শাস্ত্রবিশ্বাসে আপনাদের দাসত্ব, অভাব ও দারিদ্র মোচন হবে না। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা পুরুষানুক্রমে তা করেও তাঁদের জীবন বদলাতে পারেননি। আপনাদের পূর্বপুরুষদের মতো আপনারাও ছেঁড়া কাপড় পরেন। তাঁদের মতোই আপনারা উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে বেঁচে থাকেন। তাঁদের মতোই আপনারা গ্রামের পরিত্যক্ত নোংরা জায়গায় ছোট্ট কুঁড়েঘরে বাস করে ধ্বংস হচ্ছেন। তাঁদের মতোই আপনারা হাঁস-মুরগির মতো ব্যাধি ও মৃত্যুর কবলে পড়ছেন। আপনাদের ধর্ম, উপবাস, ব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধনা অনাহার থেকে আপনাদের রক্ষা করতে পারছে না।" সবশেষে তিনি বলেন, "আইনসভার কাজ হচ্ছে আপনাদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, ঔষধ ও জীবিকা অর্জনের সব রকমের সুবিধার ব্যবস্থা করা। আইন রচনা ও তা চালু করা আপনাদের সম্মতি, সাহায্য ও ইচ্ছানুসারে হবে। সংক্ষেপে আইন হচ্ছে সকল প্রকার পার্থিব সুখের উৎস। আপনারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দখল করুন। এজন্য কর্তব্য হচ্ছে উপবাস, পূজা, শুদ্ধি ইত্যাদি বর্জন করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দখল করা। এই পথেই আপনাদের মুক্তি। মনে রাখবেন, কোনো সমাজে অধিক সংখ্যক লোক থাকাই যথেষ্ট নয়, তাঁদের সব সময় সচেতন, শক্তিশালী, সুশিক্ষিত ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন হয়ে সাফল্য লাভ করতে হবে।"

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি শ্বেতপত্রের আকারে ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব ঘোষিত হয়। এই শ্বেতপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় সভার যৌথ অধিবেশনে বিবেচিত হওয়ার কথা ছিল। জিন্না তাকে 'হোয়াইট হল রুল' বলে বর্ণনা করেন, সুভাষ বসু তাকে মারাত্মক শান্তিভঙ্গকারী বলেন, ডঃ মুঞ্জে তাকে 'ব্লাক পেপার' বলেন, জয়াকর বলেন যে, ফেডারেশন পিছিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় বাংলার আইনসভা পুনাচুক্তি বাতিলের প্রস্তাব পাশ করে। আম্বেদকর 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাঙালি হিন্দুদের এই আচরণে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দেখিয়ে দেন যে, বাঙালি বর্ণহিন্দু নেতারা প্যারেলে এবং 'ইণ্ডিয়ান মারচেন্টস্ চেম্বার'-এর অফিসে পুনাচুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে কথাবার্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং 'চুক্তিতে তাঁরা অংশগ্রহণ করেননি',

এই বক্তব্য মিথ্যা। তিনি তখন স্যার এন.এন. সরকার ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে বাঙালি হিন্দুদের পুনাচুক্তিতে প্রতিনিধিত্ব না থাকার যে টেলিগ্রাম করেছেন, তা প্রকাশ করেন। আম্বেদকর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এই কথায় উত্তর দেন, "বাঙালি হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব না থাকার কথা ধরে নিলেও তা বাংলায় প্রযোজ্য হবে না, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (Communal Award) সিদ্ধান্তের চতুর্থ অনুচ্ছেদে তা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতেই প্রযোজ্য।" আম্বেদকর আরও বলেন যে, যদিও বাংলার দলিত শ্রেণিরা পুনাচুক্তিতে খুশি নয়, তাঁরা ৩০ টির বদলে ৫০ টি আসন দাবি করেছিলেন। তিনি ওই চুক্তি তাঁদের মেনে নিতে জোর করে বাধ্য করেছিলেন। তিনি উপসংহারে বলেন, বম্বে, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও ওড়িশার দলিত শ্রেণিরাও পুনাচুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়।

শ্বেতপত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জয়েণ্ট কমিটির প্রতিনিধিদের নামও ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সতেরোজন, ভারতীয় দেশীয় রাজ্য থেকে সাতজন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দুই কক্ষ থেকে বত্রিশজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সপ্রু, জয়াকর, মির্জা ইসমাইল, আগা খাঁ, স্যার আকবর হায়দরী সহ আম্বেদকর জয়েণ্ট কমিটিতে আমন্ত্রিত হন।

আম্বেদকর নাম ও যশের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু বর্ণহিন্দু সমাজ তাঁদের সংস্কার ত্যাগ করেননি। নিপীড়িত মানুষদের প্রতি মহান অবদানের জন্য বরোদার মহারাজাকে বম্বেতে সম্মানিত করার সময় প্রথমে অভ্যর্থনা কমিটির তালিকায় আম্বেদকরের নাম রাখা হলেও অস্পৃশ্যতা দোষের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়। আম্বেদকর এখন একজন সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব। সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর আসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং সম্রাটের সঙ্গে এক আসনে বসতে ও কথা বলতে পারেন, কিন্তু ভারতের আধা-সংস্কারকগণ জাতিভেদ সংস্কারের জন্য সেই আসন দিতে রাজি নন। যারবেদা জেলের ঘটনার পর হাইকোর্টের আইনজীবীরা আম্বেদকরকে সম্মানিত করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের জন্য কোনো জায়গা না পাওয়ায় তা বাতিল করতে হয়। একজন গুজরাটি আইনজীবী ছেলের বিয়েতে আম্বেদকরকে নিমন্ত্রণ করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর অস্পৃশ্যতা দোষের জন্য তিনিও তা করতে পারেননি।

১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল আম্বেদকর দলিত শ্রেণির ছাত্রদের হোস্টেল পরিদর্শনে যান। সেটি তখন আগা খাঁর থানের বাংলোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আম্বেদকর এই বাংলো পাওয়ার জন্য আগা খাঁকে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তিনি অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। আম্বেদকর ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন যে, কীভাবে প্যানভেলে একজন ইহুদির বাড়িতে ওই আশ্রম খোলা হয়েছিলো। তিনি দলিত

শ্রেণির অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন। তিনি ছাত্রদের কাছে তাঁর পড়াশুনোর সময়ের অপমান ও অসুবিধার সাথে এখন তারা হোস্টেলে যে সুবিধা ও পরিবেশ পাচ্ছে তার তুলনা করতে বলেন। তিনি তাদের স্কুলজীবনে রাজনীতিতে যোগ দিতে নিষেধ করেন। তিনি আত্মনির্ভরতা ও আত্মোন্নতির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি তাদের জীবনে একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করতে উপদেশ দেন।

পরের সপ্তাহে আম্বেদকর সোপারে দলিত শ্রেণির এক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ১২ এপ্রিল আম্বেদকর ও বম্বে মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন স্কুল কমিটির সভাপতি ভি.জি. রাওকে সম্মানিত করা হয়। দলিত শ্রেণির শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সেবাকার্যের জন্য তিনি সম্মানিত হন। বক্তৃতায় আম্বেদকর বলেন যে, তাঁর জীবনের আসল উদ্দেশ্য ছিল অধ্যাপক হওয়া এবং একজন ছাত্রের মতো জীবন কাটানো। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে হাজার হাজার বই কিনেছিলেন। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত তিনি রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যান। সেই রাত্রেই বম্বের কাছে কুরলাতে এস.কে. বোলের সভাপতিত্বে আম্বেদকরকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ভারতের আগামী সাংবিধানিক নিয়মে দলিত শ্রেণির প্রার্থীদের প্যানেল এবং প্রাথমিক নির্বাচনের ব্যাপারে আম্বেদকর আর একবার গান্ধির সাথে আলোচনা করতে চাইলেন। তিনি লণ্ডন যাবার প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি তাঁকে সভায় যোগ দিতে হত, কোর্ট যেতে হত, পারিবারিক বিষয়ে ব্যবস্থা করতে হত এবং বই-পুস্তক নির্বাচন করতেও হত। ২৩ এপ্রিল মোরে, সিন্ধে, গাইকোয়াড় ও চ্যবনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যারবেদা জেলে গান্ধির সাথে দেখা করেন। গান্ধি ও আম্বেদকর আমগাছের নিচে চেয়ার পেতে বসেন এবং মহাদেব দেশাই নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে কাছে বসেন।

প্রথমেই আম্বেদকর বলেন যে, ওই নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে এবং সাধারণ নির্বাচনে দলিত শ্রেণির যে সব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তাঁদের প্রাথমিক নির্বাচনে দলিত শ্রেণির ভোটের কমপক্ষে শতকরা পঁচিশ ভাগ ভোট পেতে হবে। গান্ধি বলেন যে, ওই ব্যাপারে তিনি বিবেচনা করে তাঁর মতামত তাঁর লণ্ডনের ঠিকানায় জানিয়ে দেবেন। গান্ধি তাঁকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দেন এবং অস্পৃশ্যতা দূর করার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সনাতনপন্থীরা তাঁকে (গান্ধিকে) শয়তান, দৈত্য বলছে। আম্বেদকর গান্ধিকে বলেন, সনাতনপন্থীদের কাছ থেকে আর বেশি কী তিনি আশা করতে পারেন। গান্ধি বলেন, দলিত শ্রেণির নেতাও তো তাঁর কাজে সন্তুষ্ট নন। শেষে গান্ধি আম্বেদকরের লণ্ডন থেকে ফিরে আসার তারিখ জানতে চান। আম্বেদকর বলেন, ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি ফিরবেন।

২৩ এপ্রিল আম্বেদকরের লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে বম্বের দামোদর হলে পুনার দলিত শ্রেণির লোকেরা আম্বেদকরকে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দন জানান। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি অসহায় ছিলেন। যে গান্ধি দলিত শ্রেণিকে কিছুই দিতে রাজি ছিলেন না, তাঁর প্রভাব থেকে ব্রিটিশ সরকারকে তিনি কিছুতেই মুক্ত করতে পারছিলেন না। তিনি ঘোষণা করেন, যেহেতু দলিত শ্রেণির অধিকার সম্পর্কে তাঁর সংগ্রাম সাফল্যের কাছাকাছি, তিনি তাঁর শক্তি সাধ্যানুসারে দেশের কাজে লাগাবেন। সবশেষে তিনি বলেন, তাঁদের একদিনের বেতনের ক্ষতি করে অভ্যাস মতো তাঁরা যেন ব্যালার্ড পিয়েরে তাঁকে বিদায় জানাতে না আসেন।

জয়েণ্ট কমিটিতে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে আম্বেদকর ১৯৩৩ সালের ২৪ এপ্রিল লণ্ডন রওনা হন এবং ৬ মে লণ্ডনে পৌঁছান। লণ্ডন থেকে তিনি গান্ধির নতুন অনশনের সংবাদ জানতে চান। আত্মশুদ্ধির জন্য গান্ধি যে অনশন ৮ মে শুরু করেছিলেন লণ্ডনের কাগজগুলিতে সে সম্পর্কে প্রায়ই কোনো সংবাদ থাকত না। লণ্ডন থেকে আম্বেদকর প্রায়ই রাজভোজ ও অন্যান্যদের আন্দোলনের বিস্তৃত খবর জানতে চাইতেন।

এই সময় নেতা ও সংগঠক আম্বেদকর, তাঁর সহকর্মীদের সুখদুঃখের সাথি, প্রয়োজনে তাঁদের উপদেষ্টা ও পরিচালক হিসাবে সব সময়ে তাঁদের নিকটসান্নিধ্যে থাকতেন। তাঁর সেক্রেটারি শিবতর্কার বম্বে মিউনিসিপ্যাল স্কুলকমিটির শিক্ষাবিভাগের সুপারভাইজার পদে উন্নীত হন। আম্বেদকর তাঁর এই পদে নিয়োগের জন্য অভিনন্দন জানান। লণ্ডনে থাকাকালে তাঁর উপকারী বন্ধু কেলুস্কারকে তিনি সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তিনি তখন বয়োবৃদ্ধ। তিনি বরোদার মহারাজার কাছে দেওয়ানের মাধ্যমে একটি আবেদন পাঠিয়ে কেলুস্করকে একটি মাসিক পেনশন দেবার জন্য আবেদন করেন। যে ভাস্কররাও কাদ্রেকর তাঁর সাপ্তাহিক জনতার সম্পাদনা ও প্রেসের দেখাশুনা করতেন, আম্বেদকর অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে তাঁকে চিঠিতে লেখেন, "আপনি যে দুরবস্থা ভোগ করছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি এবং সব সময়েই তা অনুভব করে আসছি। তোষামোদ প্রিয়তা নয়, আপনি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করছেন সেজন্য আমরা সবাই এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে অশেষ ঋণী।"

সেই একই চিঠিতে তিনি কাদ্রেকরকে উৎসাহিত করে লেখেন, এটা চিরসত্য যে, গরিব ও নিপীড়িত মানুষের সকল আন্দোলন শুরুতে খুবই ছোটো আকারের ও ধীরগতির হয়ে থাকে এবং নানান উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়, কিন্তু তিনি এই বিশ্বাস রাখেন যে, এতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার কোনো প্রশ্ন নেই, সাফল্য আসবেই। তিনি কিছু কিছু ঘটনা আড়াল করে রেখেছেন, তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর

এই অভিযোগের উত্তরে আম্বেদকর বলেন, "আমার সমস্ত জীবন আপনাদের কাছে উন্মুক্ত, অন্য এমন কোনো নেতাকে আমি জানি না, যার জীবন বইয়ের পৃষ্ঠার মতো সকলের কাছে খোলা।" কাদ্রেকর কর্তৃক প্রকাশিত 'জনতা'র বিশেষ সংখ্যা দেখে তিনি খুশি হন। কিন্তু তিনি মন্তব্য করেন যে, কোনো বিশেষ সংখ্যা সম্পূর্ণভাবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে হওয়া উচিত নয়। যে উদ্দেশ্যে ওই পত্রিকা তেমনি বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোচনা থাকা দরকার।

এই সময়ে গাভাই-এর মাধ্যমে কোনো কোনো মহলে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, আম্বেদকর ইসলামধর্ম গ্রহণ করবেন। সুবেদার সাভাডকর আম্বেদকরকে লিখলেন, তাঁর লোকজনদের সাধারণ মত এই যে, তাঁদের "রাজা" আম্বেদকর তাঁদের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তেমন কোনো পদক্ষেপ যেন না নেন। উত্তরে লণ্ডন থেকে সাভাডকরকে আম্বেদকর লিখলেন, ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কে গাভাইয়ের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে এবং তাঁকে তিনি বলেছেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে তিনি অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে দৃঢ়সংকল্প। তবে তিনি কখনও ইসলামধর্ম গ্রহণ করবেন না, তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট। তিনি বলেন, তিনি তাঁর জনগণের ভাগ্যের সাথে এমনই জড়িয়ে আছেন যে, তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছেন। যতদিন তাঁদের সমস্যার সমাধান না হয়, ততদিন তিনি মুক্ত হতে পারবেন না।

কঠোর পরিশ্রমে আম্বেদকরের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি চশমা পালটান। আম্বেদকর যে কোনো রোগের সম্মুখীন হতে ও কঠোর দুঃখ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু দৃষ্টিহীনতা তাঁর কাছে অসহ্য। মিল্টনের মতো অন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় একবার তিনি শিশুর মতো অঝোরে কেঁদেছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে, যদি চোখ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পড়াশুনাও শেষ হবে এবং বেঁচে থাকার আর কোনো মূল্যই থাকবে না।

লণ্ডনে পৌঁছে জয়েন্ট কমিটির ভারতীয় প্রতিনিধিগণ একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয়ে শ্বেতপত্রের দোষত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। ডঃ মুঞ্জে, ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, পণ্ডিত নানকচাঁদ (তাঁরা জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন), হরি সিং গৌর ও অন্যান্যরা বৈঠকে যোগ দেন। আম্বেদকর বলেন, তিনি পৃথক নির্বাচন চান, কারণ বর্ণহিন্দুদের অমানবিক আচরণই তাঁকে নৈরাশ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। হিন্দুরা যদি সামাজিক ব্যবস্থাকে পূর্ণ সংহতির লক্ষ্যে আন্তরিক চেষ্টা করতেন, তাহলে দলিত শ্রেণি সর্বান্তকরণে তাঁদের সমর্থন করতেন। ডঃ মুঞ্জে এই বক্তব্য যথার্থ উপলব্ধি করে ডঃ আম্বেদকরকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদ দিতে চাইলেন।

এই সময় ভারতে পুনাচুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে ওঠে। বেশির ভাগ হিন্দু

নেতা, যাঁরা তা সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাই এখন তার বিরোধিতা করেন। গান্ধির হরিজন আন্দোলনের প্রতি তাঁদের উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা পুনাচুক্তি গ্রহণ করার শুভসংবাদে উৎফুল্ল হয়ে পরদিনই পুনায় এসে গান্ধির বুকের কাপড়ে মুখ লুকিয়েছিলেন, তিনিও এখন ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। যে হিন্দু মহাসভার নেতারা দিল্লির অধিবেশনে একটি বিশেষ প্রস্তাবে পুনাচুক্তি সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা এখন পুনাচুক্তি সংশোধনের পক্ষে সওয়াল করছেন এই যুক্তিতে যে, পাঞ্জাবে দলিত শ্রেণির কোনো সমস্যা নেই।

ভারতের কর্মসচিব হিন্দু প্রতিনিধিদের বলেন, ওই চুক্তিতে সমস্ত হিন্দু নেতাদের সমর্থন আছে, সুতরাং এ চুক্তি অপরিবর্তনীয়। যখন এন.এন. সরকার বাংলার হিন্দুদের স্বার্থ সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠানো একটি তারবার্তা পেশ করেন, সে সময় সহ-কর্মসচিবও একই কথা বলেন।

১৯৩৩ সালের ৩ অক্টোবর জয়েন্ট কমিটির অধিবেশন আবার শুরু হলে ডঃ জয়াকর এবং স্যার মনুভাই ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের জেরা করতে রাজি হননি। ২৩ ও ২৪ অক্টোবর উইনস্টন চার্চিলকে জেরা করা হয়। চার্চিল পার্লামেন্টে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার উল্লেখ করে আম্বেদকর তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি নাস্তানাবুদ হন। আম্বেদকরের আত্মপ্রত্যয়, নির্ভীকতা ও সংগ্রামী চেতনা তখনকার শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমকক্ষ ছিল।

জয়েন্ট কমিটি ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে কাজ শেষ করে। কমিটি শ্বেতপত্র সমর্থন করে এবং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া সংবিধান রচনার জন্য একটি ছোটো কমিটি নিযুক্ত করে। বেশির ভাগ সদস্যই ভারতে ফিরে আসেন। আম্বেদকর ভারতীয় সেনাদের সম্পর্কে একটি বইয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য লণ্ডনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় অফিস থেকে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কয়েকজন কেরানি নিযুক্ত করেন।

মনে হয় আম্বেদকর যখন তখন হোটেল পরিবর্তন করতেন। প্রথমে রাসেল স্কোয়ারের ইম্পেরিয়াল হোটেল থেকে বাড়িতে চিঠি লেখেন, যেখানে তিনি আগস্ট মাস পর্যন্ত ছিলেন। পরে সেপ্টেম্বর মাসে রাসেল স্কোয়ারের মণ্টেগু হোটেল থেকে লেখেন এবং অক্টোবর মাসে সেই একই এলাকার ব্লুমসবেরি স্ট্রিটের প্যালেস হোটেল থেকে লেখেন। শেষের জায়গা থেকে তিনি মাহার ও চামারদের বিরোধ সম্পর্কে চিঠি লেখেন। মহারাষ্ট্রে মাহারদের সংখ্যা বেশি। চামারেরা সংখ্যায় খুবই অল্প। তাঁরা মাহারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য আম্বেদকরকে দোষারোপ করেন। এটা কদাচিৎ সত্য। মুসলিমরা যেমন হিন্দুদের দোষারোপ করেন হিন্দুস্থানে সর্বত্র হিন্দুর সংখ্যা বেশি, তেমনি চামারেরা বলেন যে, আম্বেদকরের সংগঠন মাহারদের দ্বারাই পরিচালিত। তিনি বলেন যে, এরূপ হীন মনোবৃত্তির জন্য তিনি পীড়া বোধ করেন, যতদিন

জাতিভেদ থাকবে ততদিন এই বিরোধও থাকবে। একজনকে রেখে অন্যজনকে তুচ্ছ করায় রোগ নিরাময় হয় না। জাতিভেদ বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তিক্ততার অবসান হবে।

লণ্ডন ত্যাগ করে আম্বেদকর ভিক্টোরিয়া জাহাজে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে বম্বে পৌঁছান। তাঁর অন্তর তখন আত্মশক্তিতে ভরপুর এবং সানন্দে বন্ধু এবং গুণমুগ্ধদের সাথে আলাপচারিতা করেন। পিয়েরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলি জয়েণ্ট কমিটি সংশোধন করতে পারে। তবে তার বেশির ভাগই গৃহীত হবে। তিনি বলেন, "আমাদের তা গ্রহণ করে আরও পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে হবে। কিছু না করে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব না"। তিনি বলেন, হিন্দু নেতাদের পুনাচুক্তি সংশোধনের আন্দোলন জয়েণ্ট কমিটি মঞ্জুর করবে না। তিনি আরও বলেন, এটা অত্যন্ত লজ্জা ও অসম্মানের বিষয় যে, হিন্দুরা তাঁদের কথার সম্মান দেন না।

পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বর্তমানে রাজনীতিতে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। 'ভারতের সৈন্য' (Army in India) নামে একখানা বই তিনি লিখছেন, অন্য সবকিছুর চেয়ে সেটাই তাঁর কাছে বেশি আগ্রহের। কবে বইটি প্রকাশিত হবে তা তিনি বলতে পারেন না, তবে আশা করেন খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বইটি সাংবিধানিক দৃষ্টিতে সৈন্যদের বিষয়েই লিখিত। যা হোক মনে হয় বইটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
অশনিগর্জন

চার বছর ধরে ভারতে ও লণ্ডনে একনাগাড়ে কাজ করে যাওয়ার ফলে আম্বেদকর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সব সময় পড়াশুনো, ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা, অনবরত সামাজিক কাজকর্ম, আত্মসম্মান আন্দোলনের অবিরাম প্রচেষ্টা, দাসত্ব মুক্তির জন্য দশ বছর ধরে সীমাহীন সংগ্রাম Ñ এতসব কাজকর্মে যে কোনো নেতার পক্ষে অসুস্থ হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর শরীরের এবার বিশ্রাম দরকার। কয়েকদিনের জন্য তাই তিনি বর্দি যান, পরে মহাবালেশ্বরে গিয়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করান। বর্দিতে কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী না থাকায় তিনি বিশ্রাম লাভ করতে পেরেছিলেন।

মহামানবদের কাজকর্ম, চিন্তা ও সংগ্রাম কখনও থেমে থাকে না। বন্ধুরা যখন আম্বেদকরের সাথে দেখা করতে আসতেন তখন চিকিৎসকদের নির্দেশ ভুলে কথাবার্তায় ডুবে যেতেন। শরীরের দুরবস্থার কথা না ভেবে যন্ত্রের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতেন।

কিছুদিন বিশ্রামের পর আম্বেদকর বম্বে ফিরে আসেন। তখন হাতে কোনো জরুরি কাজ ছিল না। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে, সুদীর্ঘ দিনের দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষেরা সম্মানের আসনে উন্নীত হবেন, ভোটের অধিকার পাবেন, তাঁদের রুদ্ধকণ্ঠ আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা পাবে এবং ব্যক্তি ও জাতির স্বাধীনতার পথ দেখাবে। তাঁরা আইনসভায় মাথা উঁচু করে বসবেন তাঁদেরই সঙ্গে যাঁরা তাঁদের ওই স্থান ছুঁতেও দেননি। তাঁদের সঙ্গে ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন। দলিত শ্রেণি ভোটের অধিকার পেয়েছেন এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত খুশির বিষয়। দু'হাজার বছরের মধ্যে তাঁদের দুঃখময় জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম তাঁরা রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি পেলেন। খসড়া সংবিধান রচনা বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে। এ সময় তিনি আইন ব্যবসায় ফিরে গিয়ে ১৯৩৪ সালের জুনমাস থেকে বম্বের সরকারি ল' কলেজের আংশিক সময়ের অধ্যাপক হলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁর মতো প্রখ্যাত বিদ্বান আইনবিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আম্বেদকরের মতো একজন সাংগঠনিক বিদ্বান, সমাজে সম্মানের আসনে উন্নীত একটি সাধারণ অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করতে কর্তৃপক্ষের বিবেকে বাধেনি। কিন্তু এটা সময়ের ওঠানামার যুগ হওয়ায় তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন।

এসময় আম্বেদকর তাঁর যৌবনের একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। তিনি বম্বের

দাদারে হিন্দু কলোনিতে বইয়ের লাইব্রেরির জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেন। এশিয়াতে এমন কেউ নেই যিনি লাইব্রেরির জন্য একটি বাংলোবাড়ি তৈরি করেছেন। অন্য সব বাড়ির মতো সাধারণভাবে এ বাড়ি তৈরি হয়নি। তিনি স্থাপত্যবিদ্যার বই কিনে বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করেন। তাঁর পছন্দসই উপযুক্ত বাড়ি তৈরি সম্পর্কে তিনি এমন বিভোর ছিলেন যে, বাড়ির কোনো কোনো অংশ তৈরি হবার পর ভেঙে ফেলে আবার তা তৈরি করান। অবশেষে বাড়িটি শেষ হয় এবং যথারীতি নানাভাবে বারবার সাজানো গোছানোর পরে লাইব্রেরিটিও সেখানে জায়গা পায়। বাড়িটির নাম রাখা হয় "রাজগৃহ"।

বাড়ির নিচের তলাটি ব্যবহার করা হয় থাকার ঘর হিসাবে। সরল সাধ্বী ধর্মপরায়ণা আম্বেদকরের স্ত্রী রমাবাঈ অদ্ভুত ভাবাবেগে ও বিহ্বলভাবে 'রাজগৃহে' চলাফেরা করতেন। তাঁর পরিবারের সবাই এবং অন্যান্য সকলে আম্বেদকরকে 'সাহেব' বলেই সম্বোধন করতেন। তিনি সেই লাইব্রেরিতেই অতীত দিনের চিন্তাবিদ ও আইনবিদদের সাথে একত্রে (অর্থাৎ তাঁদের লেখা বইপত্রের মধ্যে ডুবে থেকে) খাবার খেতেন।

দেশ সাংবিধানিক ও সাংগঠনিক কাজে তখন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। গান্ধির অহিংস-বিপ্লবে কারও কোনো উৎসাহ ছিল না। অল্প কিছুদিন আগে গান্ধি 'স্বরাজ পার্টি'র পুনরুজ্জীবনে সমর্থন জানান ও তাঁর সংগ্রাম স্থগিত রাখেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ১৯৩৪ সালের মে মাসে ওই আদর্শ ও রদবদলকে গ্রহণ করে। পরবর্তী মাসে সরকার কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং কংগ্রেস নেতারা তাদের প্রাদেশিক সংগঠনগুলি পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু করেন।

কংগ্রেস নেতারা প্রথমেই শ্বেতপত্রের নিন্দা করেন। যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) তাঁদের কাছে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এবং ভারতের স্বার্থ ও ঐক্যের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছে, তার প্রতি তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এখানেই তাঁরা থামেননি। মুসলিম লিগ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সমর্থক জেনেও লিগের প্রতি সমর্থনের এবং সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাতিল করার দাবিতে অ্যানি ও মালব্য নানাবিধ দাবি উত্থাপন করেছিলেন। তাঁদের নিরুৎসাহিত করতে জুলাই মাসে বম্বে কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভায় দল ঘোষণা করে যে, তারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ গ্রহণও করে না, বর্জনও করে না। এই দ্ব্যর্থবোধক ও ধর্মবোধহীন স্লোগানই প্রমাণ করে গান্ধির নেতৃত্বে ভারতে প্রধান রাজনৈতিক দলে দুষ্টক্ষতের বৃদ্ধি হচ্ছে।

ঠিক সেই সময় সরকার কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনের প্রস্তাব দেয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে নাগপুরের দলিত শ্রেণির নেতা গাভাই পুনাচুক্তি সম্পর্কে গান্ধিকে তাঁর মত ঘোষণা করতে এবং নিঃশর্তে পাঁচজন দলিত শ্রেণির প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কংগ্রেস দলকে বলার জন্য অনুরোধ করেন। দলিত শ্রেণির অনেক নেতা এই

মত পোষণ করতেন যে, পুনাচুক্তির সহযোগিতার জন্য কংগ্রেসের লোকেরা দলিত শ্রেণির নির্বাচনে মাথা গলাবেন না। কিন্তু দলিত শ্রেণির যে নেতারা কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করছেন তাঁরা স্বাধীনভাবে জয়লাভ করতে পারবেন বলে আশাবাদী ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব ওইভাবে জানতে চাইলেন। কিন্তু পুনাচুক্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে আস্থা জানিয়ে গান্ধি গাভাই-এর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, দলিত শ্রেণি মৌলিক অধিকার লাভের জন্য বর্ণহিন্দুদের সাথে যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, এতে সরকারের সাথে দলিত শ্রেণির অকারণ সংঘাত বাধবে।

আম্বেদকর গান্ধির মত জানতে পেরে খুশি হয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন যে আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে পুনাচুক্তির বিরোধিতা না করে একটি প্রস্তাব যেন কংগ্রেস পাশ করে। তিনি পুনাচুক্তিতে দৃঢ় অবস্থানের জন্য গান্ধিকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য বলেন, যাঁরা তাঁকে এমন অনুরোধ করেন তাঁরা জানেন না যে, এর ফল কী হতে পারে। পুনাচুক্তির স্রষ্টা ও কর্তা আম্বেদকর স্বপ্নেও ভাবেননি যে, একদিন তিনিই হবেন পুনাচুক্তির বড়ো শত্রু।

ইতিমধ্যে বম্বে আইনসভা আর.আর. রাখেলের আনা 'Harijan Disabilities Bill'টি নাকচ করে দেয়। সরকার ও বিরোধীরা তার অন্তর্নিহিত আদর্শের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও আশঙ্কা করছিলেন যে, তার দ্বারা ক্ষতি হবে।

ইতিমধ্যে যৌথকমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ইণ্ডিয়া বিল' পেশ করা হয়। যৌথকমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন, দলিত শ্রেণি দ্বিতীয় কক্ষ প্রতিষ্ঠায় শুধু বাধাই দিচ্ছেন না, তার গঠন প্রক্রিয়াতেও তাঁরা বাধা দিচ্ছেন, কারণ তাদের মতে তাতে পুনাচুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং দলিত শ্রেণির প্রার্থীরা প্রভাবশালী বর্ণহিন্দু প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কক্ষের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করতে পারবেন না।

আম্বেদকর ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সুরে সুর মিলিয়ে যৌথকমিটির রিপোর্টকে পশ্চাৎগামী ও ক্ষতিকর বলে নিন্দা করায় জাতীয় সংবাদসংস্থা খুশি হয়। তাঁর জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবে আম্বেদকর ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ঘটনা ও সাংবিধানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ রাখছিলেন। দলিত শ্রেণির দাবির প্রতি সামান্যতম অবিচারেও তিনি প্রতিবাদ করতেন। প্রদেশগুলিতে দ্বিতীয় কক্ষ সৃষ্টির ব্যাপারে আম্বেদকর সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকেও আপত্তি তুলেছিলেন।

যৌথকমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ইণ্ডিয়ান বিল নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিতর্ক চলে। বিতর্কের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, একজন রক্ষণশীল এমপি Ñ এ.ডব্লিউ. গুডম্যান প্রবল আবেগে অস্পৃশ্যদের পক্ষে এক আবেদন রাখেন এবং

তাঁদের জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ভারতে এই প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পর্কে বিতর্ক খারাপের দিকে মোড় নেয়। কংগ্রেস নেতারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (Communal Award) ব্যাপারে না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি নিলে তা মুসলিমদের অনুকূলে যায় এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য জিন্নাহ্‌কে অনুমতি দেন।

আইন কলেজে অধ্যাপনার সময়ে আম্বেদকর এই অবস্থা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেন। পুনাচুক্তির বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুদের ক্রমাগত চিৎকারে বিরক্ত হলেও আম্বেদকর চুপচাপ রইলেন। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। গত দশ বছর তিনি পরিবারবর্গের দেখাশুনা করতে সময় দিতে পারেননি। যখনই সময় পেতেন, তখনই তিনি পারিবারিক কাজে দৃষ্টি দিতেন। একবার হাওয়া বদলের জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে ধারওয়ারে নিয়ে যান; কিন্তু সেখানে তেমন উন্নতি হয়নি। ফলে, যদিও আশীর্বাদ স্বরূপ সাধ্বী, কর্তব্যপরায়ণা, ধর্মশীলা স্ত্রী পেয়েছিলেন, কিন্তু আম্বেদকর তেমন সুখী হতে পারেননি। তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যাকে হারান। তিনি কঠোরভাষী রাজনীতিবিদ, লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি, অসীম সাহসী হলেও এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে সেই থেকে সকল পারিবারিক বন্ধন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

আম্বেদকর স্ত্রীর কষ্ট দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওষুধ তাঁর ক্ষয়রোগের উপসম করতে পারেনি। ১৯৩৫ সালের ২৭ মে তাঁর স্ত্রী রমাবাঈ মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। তিনি ছিলেন শান্ত, উদার হৃদয়া, বিশুদ্ধ চরিত্রের। ছ'মাস ধরে অসুখের সঙ্গে লড়াই করে তিনি দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বন্ধুহীন অবস্থায় প্রথম জীবনে তাঁর ভাগ্যে যে অভাব ও দুঃখ নেমে এসেছিল, তা যেমন তিনি সহ্য করেছিলেন, তাঁর মনের সেই ঐশ্বর্যই তাঁকে ধৈর্যের সাথে সব কষ্ট সহ্য করার শক্তি যুগিয়েছিল। রাজগৃহের গৌরব ও জাঁকজমক তাঁকে জীবনের বাস্তববোধ থেকে কখনও আলাদা করতে পারেনি। তাঁর জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে দারুণ দারিদ্রের মধ্যে, দিনরাত কাটিয়েছেন স্বামীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উদ্বেগে, শনিবার কঠোর উপবাসে শুধু জল ও কালো ছোলাই খেতেন, স্বামীর কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করতেন। তাঁর হাত, চোখ ও চিন্তা তাঁর সাহেবের সেবায় ছিল উৎসর্গীকৃত। তিনি ছিলেন কৃশাঙ্গী, শান্ত মেজাজ বিশিষ্টা, মিতাচারী, বাক্যে বিনয়ী, ব্যবহারে উদার, ও সকলের কাছে বাস্তবমুখী।

তাঁর উদ্বেগের মুহূর্তে সভা-সম্মেলনের আহ্বায়কদের তিনি নিন্দা করতেন, কারণ সে সময় তাঁর স্বামীর কোনো বিশ্রাম থাকত না এবং খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তিনি বলতেন যে, তিনি বুঝতেই পারছেন না, পৃথিবীতে লোকদের শিক্ষা দেওয়া ও

প্রচারের জন্য এতগুলি সভার কী দরকার। একদিন তিনি তাঁর জিনিসপত্র বেঁধে তাঁর সাহেব যে সভায় সভাপতিত্ব করবেন সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ ধরেন। কারণ তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। তাতে একটু বচসাও হয়ে যায়। এজন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর ভয়ের আশঙ্কা অমূলক বলে তা দূর করেন।

যে পান্ধারপুরে লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী হিন্দু প্রতি বছর ভক্তিতে মাথা নত করে, সেখানে ধর্মপরায়ণা স্ত্রীর তীর্থ করতে যাওয়ার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু অস্পৃশ্যা মহিলা হওয়ায় তাঁকে মন্দির থেকে দূরে বসে প্রার্থনা করতে হবে, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন আম্বেদকর তা সহ্য করতে পারবেন না বলে স্ত্রীকে এই বলে সান্ত্বনা দিতেন Ñ "যে পান্ধারপুর ভক্তদের দেবতার মূর্তি দেখতে বাধা দেয়, তার কী দরকার? আমাদের ধর্মজীবন, নিঃস্বার্থ সেবা ও নিপীড়িত মানুষের জন্য নিষ্পাপ ত্যাগের দ্বারা আর একটি পান্ধারপুর সৃষ্টি করব।"

সপ্তাহ শেষে আম্বেদকর সদানন্দ গালভানকরের সাথে বাসেইন-এ দেখা করতে গিয়েছিলেন। আগের রাতেই তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। সৌভাগ্যবশত তিনি স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় পাশে ছিলেন। ধনী-দরিদ্র, খ্যাত-অখ্যাত প্রায় দশ হাজার মানুষ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রায় যোগ দেন। আম্বেদকর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অবনত চোখে ধ্যানমগ্নভাবে ব্যাথাকাতর হৃদয়ে অগ্রসর হন। শ্মশান থেকে ফিরে একাকী তাঁর ঘরে শোকমগ্ন অবস্থায় থাকেন। সপ্তাহ ধরে তিনি শিশুর মতো কাঁদলেন, বন্ধুরাও তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না। তাঁর ঐশ্বর্যের দেবী, মানবতার অংশীদার, সংসার জীবনযাত্রার অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। পৌরোহিত্যবাদে অবিশ্বাসী ও তার মিথ্যা ভাবনা ধ্বংসকারী আম্বেদকর তবু স্ত্রীর স্বর্গীয় ভালোবাসার দরুণ তাঁর ছাত্রজীবন থেকে সহকর্মী মাহার পুরোহিত শম্ভু মোরের নির্দেশে হিন্দু প্রথা অনুযায়ী তাঁর পুত্রকে দিয়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করান। এই শোকের সময় তিনি পার্থিব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ন্যাসীর পোশাক পরেন। তিনি মস্তক মুণ্ডন করেন। ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল, গভীর প্রসারিত চোখ, বেদনাক্লিষ্ট পরিবেশে গৈরিক পোশাকে তাঁকে সন্তের মতো দেখাচ্ছিল।

সেই সান্ত্বনার অবকাশ ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৯৩৫ সালের ১ জুন থেকে বম্বে সরকার তাঁকে সরকারি আইন কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করে। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকেই তাঁকে কলেজের প্রশাসন বিভাগও দেখাশুনা করতে হয়। এটি ছিল যোগ্যতার খ্যাতি, কারণ এরূপ পদকে বিচার জগতে উপরে উঠবার সিঁড়ি বলে গণ্য করা হয়। স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় তিনি বিচার বিভাগে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বলতেন। এখন সেই লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে। এই সময় কলেজের উন্নতির জন্য অধ্যক্ষ আম্বেদকর কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন।

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে খবর প্রচারিত হয় যে, আম্বেদকর রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। বম্বে ক্রনিকল পত্রিকায় একজন সাংবাদিক লেখেন যে, আম্বেদকর হাইকোর্টের জজ অথবা নতুন ব্যবস্থাপনায় একজন মন্ত্রী হচ্ছেন। অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি জানতেন যে, সরকারি চাকরিজীবীকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, তিনি কোনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন না। এটাই ছিল চাকরিতে যোগদানের প্রথম শর্ত। সাংবাদিক লেখেন যে, গভর্নমেণ্ট আইন কলেজের অধ্যক্ষপদ রীতি অনুসারে সরকারি চাকরি। আম্বেদকর স্বভাবত কোনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে না পারায় রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর নিতে বাধ্য। সাংবাদিক আরও লেখেন, স্যার ফ্রেডারিক স্কাই গভর্নর থাকার সময়ে আম্বেদকরকে জজ পদে উন্নীত করার প্রস্তাব উঠেছিল এবং এখন লর্ড ব্রাবোর্ন তাঁকে ওই পদে উন্নীত করবেন। আম্বেদকরকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তখনকার দেওয়া জেলাজজের পদ গ্রহণ করলে পরে তাঁকে হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত করা হবে, তিনি তা সমর্থন করেছিলেন।

আম্বেদকরের মানসিক অবস্থা কল্পনা করা কঠিন হলেও তাঁর অতীত কাজকর্ম বিচার করে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হাইকোর্টের বিচারকের পদ লাভ করে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। সিংহের পক্ষে এ খাঁচা অত্যন্ত ছোটো। যদি তিনি সেই পদ গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি প্রমাণ করতে পারতেন যে, একজন অস্পৃশ্যকে যদি সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে রাজ্যের যে কোনো উচ্চপদে তাঁর কর্তব্য করতে পারেন এবং প্রতিযোগিতায় তাঁর লোকের কাছে আদর্শ ও প্রেরণার স্থল হতে পারেন। তিনি এক সময়ে শ্রোতাদের বলেছিলেন যে, জজের পদ তো তুচ্ছ, ভাইসরয়ের পদও তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার যোগ্য নয়।

রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের খবরটি তাঁর সহযোগীদের পদমর্যাদা বন্ধ করতে তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করার হুমকি হতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তখন ইণ্ডিয়া বিল দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জনগণের কল্যাণের জন্য সংবিধানের কাজ করতে তিনি সংকল্পবদ্ধ, সেজন্য সংবিধান রচনার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন কিছুই তিনি করতে পারেন না। ইতিমধ্যেই তিনি সরকারি আইন কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁকে জজের পদে নিযুক্ত করলেও হয়তো তিনি সেই পদ গ্রহণ করতেন।

এ সময় হঠাৎ ভারতের ইতিহাসে এক অপ্রত্যাশিত ও অদ্বিতীয় ঝড় ওঠে। সংবাদপত্রে খবর বেরোয় যে, ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে ইয়োলা সম্মেলনে আম্বেদকর ধর্মান্তর গ্রহণের কথা ঘোষণা করবেন। খবরটি এত আকস্মিক ও মর্মান্তিক

যে, অনেক অনুভূতিপ্রবণ হিন্দুর তাতে হৃদকম্প শুরু হয়ে যায়। আম্বেদকরের বন্ধু ও গুণমুগ্ধরা খবরটির সত্যতা নিয়ে তাঁর কাছে খোঁজখবর করেন। বর্ণহিন্দুর হৃদয় পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেলকর, ভোপতকর, চিত্রাভ এবং মাতে যৌথভাবে আম্বেদকরকে একখানি চিঠি লেখেন। তাতে তাঁরা তাঁর শুভ বুদ্ধির কাছে আবেদন জানান, তিনি যেন তাঁর প্রস্তাবিত তারিখের ঘোষণা থেকে বিরত থাকেন। অধ্যাপক এস.এম. মাতে একজন সনাতনপন্থী সমাজসংস্কারক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অস্পৃশ্যদের মধ্যে সেবার কাজে ও শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে মহান অবদান রেখেছেন।

এর আগে আম্বেদকর তাঁর লোকদেরকে হিন্দু সমাজের মধ্যে গ্রহণ করার জন্য দীর্ঘ দশ বছর ধরে বৃথা চেষ্টা করেছেন। তাঁর লোকদের সাধারণ জলাশয় থেকে পানীয় জল গ্রহণের অধিকারের জন্য, ভালো পোশাক পরার স্বাধীনতা, ধাতুপাত্র ব্যবহার করা ও শিক্ষার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। মাহাদের সংগ্রাম তাঁকে গুরুতর আঘাত দিয়েছে। মাহাদ সম্মেলনের পরেই হিন্দুধর্ম ত্যাগের চিন্তা তাঁকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। চৌদার পুকুর মামলার মাহাদ কোর্টে যখন শুনানি চলছিল, তখন তিনি বিবাদিপক্ষ সমর্থনে প্রায়ই মাহাদে যেতেন। তখন বর্ষাকাল, নদীতে বন্যার জন্য তাঁকে দু'দিন আটকে থাকতে হয়। যেখানে মোটরগাড়ি থেমেছিল সেখানে কাছাকাছি কোনো অস্পৃশ্য জনবসতি না থাকায় তাঁকে আশ্রয় ও খাবারের অভাবে ভুগতে হয়েছিল। কারণ, অস্পৃশ্য বলে কেউ তাঁদের আশ্রয় ও খাবার দেয়নি।

মাহাদ থেকে ফিরে এসে আম্বেদকর মনের দুঃখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন; বাইরেই আসেননি। বোলের সঙ্গে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীরা তাঁর বেদনায় সহানুভূতি দেখিয়ে শান্ত করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জলগাঁও-এ তিনি যে ধর্ম তাঁদের মানুষ বলে স্বীকার করবে, জগতে উন্নত হতে সুযোগ দেবে, কাজ করতে, খেতে, চলাফেরা করতে ও মানুষের মতো বাঁচতে দেবে অস্পৃশ্যদেরকে সেই ধর্ম গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। এর ফলে বারোজন অস্পৃশ্য ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। প্রবল চেষ্টা ও শক্তি নিয়ে, অন্তরে অনেক আশা পোষণ করে তিনি মন্দিরে প্রবেশ-অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু বর্ণহিন্দুরা কোনো সাধারণজ্ঞান ও যুক্তিবোধের পরিচয় দেননি। তাঁরা আগের মতোই অনুতাপহীন ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁরা ভাবাবেগ দেখানো ছাড়া আর কিছুই করেননি। নাসিকের কাছে কোনো গ্রামের একদল অস্পৃশ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্যোগী হলে আম্বেদকর তাঁদের কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখতে উপদেশ দেন যে, হিন্দুধর্ম মহৎ হয় কিনা দেখা যাক।

ইয়োলা সম্মেলনের প্রাক্কালে দলিত শ্রেণির নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে, গত দশ বছরের সংগ্রামের আলোকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ও সেইসঙ্গে আগামী সংস্কার সম্বন্ধেও পর্যালোচনা করা হবে। ইয়োলা যাবার পথে নাসিক রোডে

মেঘওয়াল (ঝাড়ুদার) সম্প্রদায়ের লোকেরা আম্বেদকরকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন এবং নাসিকে সর্বসাধারণের সঙ্গে নৈশভাজেও তিনি আপ্যায়িত হন।

১৯৩৫ সালের ১৩ অক্টোবর ইয়োলা সম্মেলনে অস্পৃশ্যদের সকল সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিলেন। তার মধ্যে হায়দারাবাদ রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রণখাম্বে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উৎসাহের সঙ্গে দলিত শ্রেণির বিপুল সাড়া পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে বলেনÑ এই অধঃপতিত হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদ আখ্যা দেওয়াই ঠিক, কারণ শুধু ব্রাহ্মণদের স্বার্থেই এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে।

অত্যন্ত আবেগজড়িত দেড়ঘণ্টার বক্তৃতায় আম্বেদকর দলিত শ্রেণির অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা বর্ণনা করে দেখান যে, একই হিন্দুধর্মের লোক হওয়া সত্ত্বেও সামান্যতম লাভের জন্য কী অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁরা। বিশেষ করে তিনি কালারাম মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের উল্লেখ করে বলেন, গত পাঁচ বছর ধরে সামান্য প্রাথমিক অধিকার লাভের জন্য কী অমানুষিক দুর্ব্যবহার তাঁরা হিন্দুসমাজের কাছ থেকে পেয়েছেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তিনি বলেন, তাতে তাঁর এই মর্মান্তিক সত্য উপলব্ধি হয়েছে যে, ওই উদ্দেশ্যে যত সময়, অর্থ ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয়েছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন, এ বিষয়ে একটি শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় এসেছে। হিন্দুসমাজে থাকার জন্যই তাঁদের এই দুর্ভোগ ও অপমান। তিনি প্রশ্ন করেন, এই ধর্ম ত্যাগ করে যে ধর্ম তাঁদের সমান মর্যাদা, নিরাপত্তা ও ন্যায্য ব্যবহার দেবে সেই ধর্ম গ্রহণ করা কি উচিত নয়?

তিনি উচ্চকণ্ঠে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য কোনো ধর্মে সান্ত্বনা, আত্মসম্মানের খোঁজ করতে উপদেশ দেন। কিন্তু ব্যবহার, মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সমতা সেই ধর্মে পাওয়া যাবে কিনা তার দিকে কঠোর দৃষ্টি দিতে বলেন।

এ ব্যাপারে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে বলেন, তাঁর দুর্ভাগ্য যে তিনি অস্পৃশ্য হিন্দুর ঘরে জন্মেছেন। এটা রদ করা তাঁর শক্তির বাইরে, কিন্তু ওই নীচ অপমানকর অবস্থা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তাঁর নিজের হাতে। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আপনাদের আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি হিন্দু হিসাবে মৃত্যুবরণ করব না।" সবশেষে তিনি তাঁর লোকদের কালারাম সত্যাগ্রহ বন্ধ করতে বলেন, ওই পাঁচ বছরের আন্দোলনে যে ব্যর্থতা দেখা গেছে, ওই অত্যাচারী বর্ণহিন্দুদের কাছে যে নির্দয় ব্যবহার পাওয়া গেছে তারই উল্লেখ করেন। তিনি তাঁদের এই উপদেশ দেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা এমন ব্যবহার করুন, বহির্বিশ্বে যেন তাঁদের সিদ্ধান্তে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এবং তাঁরা যেন হিন্দু সমাজের বাইরে নিজেদের

স্বাধীন ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর ওই সম্মেলন বর্ণহিন্দুদের অনমনীয় এবং অপরাধমূলক ঔদাসীন্যের ফলে তাঁদের সামাজিক সাম্যের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় গত দশ বছর ধরে বর্ণহিন্দুদের সাথে সমান মর্যাদা নিয়ে উভয় গোষ্ঠীকে সংহত করে এক শক্তিশালী সমাজ গঠনের যে সংগ্রাম দলিত শ্রেণি করছেন, তা বন্ধ করতে পরামর্শ দেন। এই সম্মেলনে আরও উপদেশ দেওয়া হয় যে, এই নিষ্ফল চেষ্টা বন্ধ করে তাঁরা নিজেরা একটা সম্মানজনক ও স্বাধীন অবস্থায় উন্নীত হওয়ার জন্য এই হিন্দুস্তানেই অন্য কোনো সমাজে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করুন।

আম্বেদকরের বক্তব্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংস্থা ইত্যাদির ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। ধর্মান্তরের কথায় হিন্দুধর্ম স্বীয় জন্মভূমিতে তার মৃত্যুঘন্টা শুনতে পায়। ইসলামধর্মের নেতারা আম্বেদকরের উপর লোভনীয় দৃষ্টি দেন এবং খ্রিস্টানধর্মের উন্নতিকামী ব্যক্তিরা এই ভেবে খুশি হন যে, ভবিষ্যতে তাতে তাঁদের শক্তি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা সকলেই ভাবলেন যে, আম্বেদকরের হুমকি যদি কাজে পরিণত হয়, তবে হিন্দুর ভারসাম্য চিরস্থায়ীভাবে নিচু হয়ে যাবে। শিখেরাও আম্বেদকরকে তাঁদের দলে টেনে শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইলেন।

ভারতসহ পৃথিবীর অন্যান দেশ থেকেও আম্বেদকরের কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম আসতে শুরু করে। খ্রিস্টান ও মুসলিম নেতারাও নড়াচড়া শুরু করেন। মুসলিম নেতা কে.এল. গৌবা, এম.এল.এ. আম্বেদকরকে টেলিগ্রাম করেন, সমস্ত মুসলিম-ভারত আম্বেদকর ও অস্পৃশ্যদের সম্মান করতে ও সাদরে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় Ñ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্যের সুযোগের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, আম্বেদকর যদি মুসলিমদের সাথে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক হন, তবে ১৯৩৫ সালের ২০ অক্টোবর বদাউনে মুসলিম সম্মেলনে আসুন।

বম্বের মেথোডিস্ট এপিসকোপাল চার্চের বিশপ ব্রেণ্টন থোবার্ন ব্যাডলিকে আম্বেদকরের ঘোষণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, খ্রিস্টধর্মের মর্মকথা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল জনসংখ্যা সমন্বিত সমাজের লোকের পক্ষে যতক্ষণ না তাঁরা হৃদয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন মনে না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মান্তর গ্রহণ সম্ভব নয়। তিনি আরও মন্তব্য করেন, আম্বেদকরের ওই বিবৃতি খ্রিস্টান-চার্চ সাদরে গ্রহণ করবে, কারণ এর মধ্যে দলিত শ্রেণির একটা উচ্চতর জীবনযাত্রা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁদের সামনে এক নতুন যুগের আলো প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

বেনারসের মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদকের পক্ষ থেকেও আম্বেদকরের কাছে

টেলিগ্রাম আসে যে, যে ধর্ম এশিয়ার বেশির ভাগ লোক গ্রহণ করেছেন, আম্বেদকর ও তাঁর সম্প্রদায়কে সেই বৌদ্ধধর্মে গ্রহণ করার জন্য তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। "বৌদ্ধধর্মে ধর্মীয় বা সামাজিকভাবে কোনো অযোগ্যতা নেই। সকল ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে আমরা সম-মর্যাদার গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ নেই। আমরা কর্মী পাঠাতে ইচ্ছুক।"

শিখদের 'ব্রাদার কমিউনিটি' থেকেও একটি আবেদন আসে। স্বর্ণমন্দির কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট সর্দার দিলীপ সিংহ দোয়াবিয়া আম্বেদকরকে টেলিগ্রাম করে জানান যে, দলিত শ্রেণির ধর্মান্তর গ্রহণের কাঙ্ক্ষিত সমস্ত প্রয়োজনীয়তাই শিখধর্ম পূরণ করতে পারে। তিনি বলেন, "শিখধর্ম একেশ্বরবাদী ও বিশ্বপ্রেমের, এই ধর্মে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয়ে থাকে।"

আম্বেদকরের ওই ঘোষণায় গান্ধি মন্তব্য করেন যে, অস্পৃশ্যতা দূর করা যখন শেষ পর্যায়ে, সেই সময় ওই সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন যে, আম্বেদকরের মতো একজন উচ্চশিক্ষিত ও মহাপ্রাণের পক্ষে কবিতা ও অন্যান্য জায়গায় যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছে, তাতে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, "কিন্তু ধর্ম কোনো ঘর বা আলখাল্লা নয় যে, ইচ্ছা করলেই তা পালটানো যায়। এটা শরীরের চেয়ে বিশ্বাস ও নিজস্ব সত্ত্বার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। আমার বিশ্বাস, তিনি এবং যাঁরা এই বিশ্বাস পরিবর্তনের প্রস্তাব পাশ করেছেন, এতে তাঁদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। কারণ, লক্ষ লক্ষ সরল ও অশিক্ষিত হরিজনেরা তাঁদের কথা শুনবেন না এবং যেসব মানুষ তাঁদের পিতৃপুরুষের বিশ্বাস ত্যাগ করবেন, তাঁরা মনে রাখবেন যে, তাঁদের জীবনের ভালোমন্দ বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।"

মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে নবযুগ-সৃষ্টিকারী সাভারকর, তাঁর অন্তরীণস্থল রত্নগিরি থেকে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, তাঁদের এই ধর্মান্তরে ভারতে খ্রিস্টান বা ইসলামের কাছে সম-ব্যবহার পাওয়ার কোনো আশা নেই। তিনি ত্রিবাঙ্কুরের স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য খ্রিস্টানদের মধ্যে দাঙ্গার উদাহরণ দেন।

'অস্পৃশ্যতা বিলোপের পথে' উল্লেখ করে সাভারকর সমস্যার যুক্তিগ্রাহ্য দিক লক্ষ করে বলিষ্ঠ ও বিনীত আবেদনে বলেন, "সত্য কথা বলতে গেলে ধর্ম হিসাবে কোনো মতবাদ কিছু কিছু জিনিস রক্ষা করে চলে, যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, শুধু বিশ্বাস মাত্র। যাঁরা বর্তমান ধর্মের মতবাদ ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত নয় বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের অযৌক্তিক সংস্কার মেনে চলা উচিত নয়। আম্বেদকরের সেই ধর্ম গ্রহণ করা উচিত যা নীতিভিত্তিক, যুক্তিতর্কের বিরোধী নয়।" তিনি সবশেষে বলেন যে, সাম্যের জন্য প্রগতিশীল হিন্দুদের সঙ্গে থেকে সাহসের সাথে লড়াই করে সাম্য আদায় করে জীবনে উন্নতি করা উচিত।

কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপসাদ ইয়োলা প্রস্তাবে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ইয়োলা প্রস্তাবে ক্রোধের মূল উপলব্ধি করেও তিনি বলেন যে, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সংস্কারকদের কাজকে আরও কঠিন করে তোলার জন্য কিছু একটা করতে হবে।

দেওরুখকর নামে বম্বের একজন দলিত শ্রেণির নেতা বলেন যে, অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করার দরকার নেই, হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যদের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষয়ের দিকে, পরিবর্তে তাঁরা অন্য ধর্মে গিয়ে অস্পৃশ্য হয়ে থাকবেন, কারণ প্রায় সকল ধর্মেই বিভিন্ন প্রকার অসাম্য আছে। বম্বের অন্য একজন অস্পৃশ্য নেতা কাজরোলকার ওই সিদ্ধান্তে আঘাত পান। তিনি বলেন যে, আম্বেদকরের মতো একজন নেতা, যিনি নৈরাশ্যের মধ্যেও তাঁদের পরিচালিত করছেন, তিনি তাঁদের আত্মহত্যা করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন যে, ধর্ম কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন নয়। নাগপুরের একজন দলিত শ্রেণির নেতা বলেন যে, তাঁদের বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে সমমর্যাদা লাভের সংগ্রাম করা উচিত। আম্বেদকরের সহকর্মী ডঃ সোলাঙ্কিও একই মত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, তরুণ প্রজন্ম বিষয়টির উন্নতি সাধন করবে এবং বলেন যে, দলিত শ্রেণির সাম্য ও উন্নতির জন্য তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত।

গোলটেবিল বৈঠকে আম্বেদকরের সহকর্মী শ্রীনিবাসনের কাছে ঘোষণাটি ছিল বজ্রপাতের মতো। তিনি বলেন যে, ধর্মান্তর গ্রহণে দলিতরা সংখ্যার দিক থেকে দুর্বল হবে এবং নিপীড়নকারীদের উৎসাহিত করবে। সমাজের প্রতি তাঁর সব থেকে ভালো উপদেশ Ñ তাঁদের শক্তিকে অটুট রেখে অধিকার ও নীতির জন্য লড়াই করাই হবে মর্যাদাসম্পন্ন কাজ।

এই ঘোষণার মতো আম্বেদকরের অন্য কোনো ঘোষণা এমন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েনি। নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত শ্বাসরুদ্ধ ও নিপীড়িত মানুষদের ভয়ানক আর্তনাদ। এটা ছিল মর্মাহত অন্তরের তীক্ষ্ণ চিৎকার, তাঁদের অব্যক্ত বেদনা, দমিত অবমাননা, অমানবোচিত পরিবেশ, যুগ যুগ ব্যাপী দলিত-মর্দিত হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ। হৃদয়হীন হিন্দুসমাজের প্রতি এটা ছিল আম্বেদকরের ক্রোধোন্মত্ত ঘূর্ণিঝড়ের মতো শক্তিশালী এক অস্ত্রপ্রয়োগ।

ইয়োলা সম্মেলনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে যখন 'অ্যাসোসিয়েট প্রেস' তাঁকে গান্ধির মন্তব্য দেখায় তখন তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত। অসাম্যই হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি ও নীতি, তাই তার অধীন থেকে দলিত শ্রেণি কখনও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারবেন না। গান্ধির সঙ্গে তিনি একমত যে, ধর্ম অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু এ বিষয় একমত নন যে, পূর্বপুরুষের ধর্ম যদি তাঁর উন্নতি ও কল্যাণ বিরোধী হয় এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণের অনুকূল না হয়,

তবুও তা আঁকড়ে থাকতে হবে। শেষে তিনি বলেন, ধর্ম পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি স্থিরসংকল্প এবং জনগণ যদি মনে করেন যে, তা ভালো হবে, তবে তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন। অন্যথায় তাঁদের তাঁকে অনুসরণ করা উচিত নয়। জনগণ তাঁকে অনুসরণ করুন বা করুন তিনি তা গ্রাহ্য করেন না।

নির্মম, মানবতা বিরোধী গোঁড়া হিন্দুরা দলিত শ্রেণির ওই ঘোষণায় অনড় থাকেন। নিরক্ষর অব্রাহ্মণদের ধারণা যে ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণদের ব্যাপার। ইয়োলা সম্মেলনের সিদ্ধান্তে উল্লসিত হয়ে গোঁড়া হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং নাসিকের গোঁড়া হিন্দুরা, যাঁরা মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের জন্য গত পাঁচ বছর ধরে কিছুটা ভুগছিলেন, দলিত শ্রেণি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করছে জেনে তাঁরা খুব খুশি হন। অস্পৃশ্যদের নতুন ঘোষণায় তাঁরা কালেক্টরের কাছে রথের শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আবেদন জানান। অস্পৃশ্যদের ওই সিদ্ধান্তে জ্ঞানী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোকেরা দুঃখ প্রকাশ করেন। যে রাজন্যবর্গ তাঁদের কাজে সহায়তা করেছেন, দলিত শ্রেণির নেতাদের ওই সিদ্ধান্তে তাঁরা হতাশ হন। সিন্ধু প্রদেশের একজন হিন্দু হুমকি দিয়ে আম্বেদকরকে রক্ত দিয়ে চিঠি লেখেন, যদি তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন তবে তাঁকে হত্যা করা হবে।

ইয়োলা থেকে ফিরে আসার পর আম্বেদকর প্রায় দু'দিন বাসেইন-এ ডঃ সদানন্দ গ্যালভ্যাঙ্কারের সাথে ছিলেন। সেখানে বিখ্যাত হিন্দু মিশনারি নেতা মাসুরকর মহারাজ, যিনি গোয়ার দশ হাজার খ্রিস্টানকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন বলে দাবি করেন, তাঁর সাথে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আম্বেদকরের আলোচনা হয়। আম্বেদকর হিন্দু মিশনারি নেতাকে বলেন, অস্পৃশ্যেরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলে তাঁদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। মিশনারি নেতা বলেন, হিন্দুধর্ম থেকে এই বেরিয়ে যাওয়া থামবে না এবং ভবিষ্যতে এতে হিন্দুদের মৃত্যু ঘটবে। উত্তরে আম্বেদকর বলেন, এটা সামান্য ব্যাপার, হিন্দুস্তানের ইতিহাস চলতেই থাকবে। মিশনারি নেতা বলেন, সে ক্ষেত্রে ইতিহাসটি হিন্দুস্তানের হবে না, হবে অন্য 'স্তান'-এর, যেমন 'পাকিস্তান'। আম্বেদকর দুঃখের সাথে মাথা নেড়ে বলেন, তাই হবে। ওই চিন্তাধারায় তিনি খুশি হননি এবং বলেন যে, সেই দুঃখজনক ঘটনা প্রতিরোধ করার উপায় বর্ণহিন্দুদের হাতে।

মাসুরকর এর উপায়ের কথা জিজ্ঞেস করলে আম্বেদকর বলেন, বর্ণহিন্দু নেতাদেরকে কথা দিতে হবে যে, তাঁরা অস্পৃশ্যতার মতো পাপকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলে দেবেন। মাসুরকর উত্তর দেন, সমস্যার বিশালতা দেখে মনে হয়, তা করতে কিছু সময় লাগবে। বর্ণহিন্দু নেতাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। আম্বেদকরকে অবশ্যই ওই ঘোষণা প্রত্যাহার করতে বা স্থগিত রাখতে হবে। আম্বেদকর বলেন, হৃদয় পরিবর্তনের জন্য তিনি পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে রাজি আছেন; কিন্তু বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলেন, এর মধ্যে **কেশরীপন্থীদের মতে একজন আদর্শ হিন্দু, দলিত শ্রেণির নেতা কে.কে. সাকাতকে এক বছরের জন্য শঙ্করাচার্যের গদিতে বসিয়ে, চিৎপাবন বংশীয় একশো ব্রাহ্মণ পরিবার হৃদয় পরিবর্তন এবং সামাজিক সাম্যের চিহ্ন স্বরূপ তাঁর পায়ের উপর পড়বেন।** আম্বেদকর হিন্দু মিশনারি নেতাকে **'হিন্দু'** শব্দের সঠিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতেও বলেন।

অল্প কিছুদিন পরেই নাসিকের একটি সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আম্বেদকরের কাছে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠানো হয়। তাঁরা অস্পৃশ্যতা দূর করার উদ্দেশ্যে যৌথ ও একক আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি দেন। ওই প্রতিনিধিদের নেতা আর.জি. প্রধান আম্বেদকরকে সুস্পষ্ট ফলের আশ্বাস দিয়ে তাঁর সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।

আম্বেদকর তার উত্তরে বলেন, **"কিছু লোক মনে করেন যে, ধর্ম সমাজের পক্ষে জরুরি নয়। আমি ওই মত পোষণ করি না। আমি মনে করি ধর্মীয় ভিত্তি সামাজিক আচরণে ও জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয়। হিন্দুর সামাজিক রীতির মূলে রয়েছে মনুস্মৃতির ব্যবস্থা অনুযায়ী ধর্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত মনুস্মৃতি-শাসিত ধর্ম বাদ দিয়ে তার জায়গায় অন্য এক মহত্তর ব্যবস্থা স্থাপন করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের বৈষম্য দূর করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। যদিও কোনো মহত্তর ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজ স্থাপিত হওয়া সম্পর্কে আমি আশাবাদী নই।"**

ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এ কাজটি না হয় পাঁচ বছর পরেই করা হবে। এর মধ্যে বর্ণহিন্দুরা যদি সুস্পষ্ট কোনো ফলের প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিতে পারেন, তবে তিনি অবস্থার পুনর্বিবেচনা করবেন। কোনো শক্তিশালী সমাজের মধ্যে তাঁর জনগণকে মিলিয়ে দেবার বাসনায় তিনি শিখধর্ম গ্রহণের কথা ভাবছেন। মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন, "যদি কোনো ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী ধর্মীয় আবেগ ও অভ্যাসকে অতি বিপদগ্রস্ত মাত্রায় নিয়ে যায়, তাহলে তারা হচ্ছে মুসলিম।"

তাঁর মতে এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ হচ্ছে ধর্ম এবং সামাজিক ব্যাপারে একজন হিতৈষী একনায়কের আবির্ভাব। তিনি বলেন, "সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে মুসোলিনী বা কামাল পাশার মতো ভারতে একজন একনায়কের দরকার। ভারতের জন্য গণতন্ত্র উপযোগী নয়। আমার আশা ছিল যে, গান্ধি সামাজিক ব্যাপারে একনায়ক হবেন, সে আশা ভেঙে গেছে।" তিনি বলেন যে, এই অবস্থার মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে তেমন একনায়ক পাওয়া কঠিন এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতি তাঁর আশা নেই, তারা ব্যক্তিগত সুখের কামনাই করে। তারা রানাডে, গোখেল ও তিলকের মতো আদর্শবাদী না হওয়ায় তিনি ভবিষ্যৎ ভারত সম্পর্কে হতাশ হচ্ছেন। বর্ণহিন্দু প্রতিনিধিদের সাথে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর গভীর ধর্মীয় আবেগ রয়েছে, কিন্তু

হিন্দুধর্মে তাঁর কোনো বিশ্বাস নেই, যেহেতু তিনি ভণ্ডামিকে ঘৃণা করেন।

ইয়োলা সম্মেলনের প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য অল্প ক'দিন পরে নাসিক রোডে একটি সম্মেলন ডাকা হয় এবং সমগ্র দেশের দলিত শ্রেণির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আম্বেদকরের বার্তা দিয়ে হাজার হাজার প্রচারপত্র বিলি করা হয়। সেই সময় লাহোরের এক আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে খবর বেরোয় যে, পির জামাত আলির মতে আম্বেদকর তাঁর অনুগামীসহ শীঘ্রই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আম্বেদকর বলেন, পির জামাত আলি তাঁর সাথে বোম্বেতে দেখা করেন এটা সত্য এবং ইসলামধর্ম গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনাও করেন, কিন্তু এর বাইরে আর কিছু কথা হয়নি।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বম্বের ফোরাস রোডের এক সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, মাহাদে যে সম্মেলনের কথা তিনি ভাবছেন, সবার আগে সেখানেই ধর্মান্তর ব্যাপারটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংবাদপত্রে তখন চিঠিপত্রের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল, তার বেশির ভাগই আম্বেদকরকে প্রচণ্ডভাবে সমালোচনা করে লেখা এবং অল্পসংখ্যক চিঠিতে তাঁকে সমর্থন জানানো হয়। একজন আধা সমাজসংস্কারকের চিঠিতে হুংকার ছিল যে, আম্বেদকর যদি হিন্দু সমাজের বাইরে চলে যান তাহলে তাঁর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, কারণ অস্পৃশ্যতার জন্যই আম্বেদকরের খ্যাতি। উত্তরে আম্বেদকর বলেন, তাঁর দক্ষতা ও খ্যাতি তাঁর ধৈর্যশীল শ্রম ও বুদ্ধিমত্তার জন্য। সুতরাং তিনি যে কোনো শিক্ষিত সমাজে বা রাজনৈতিক পদস্থ ব্যক্তি বা ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে যেখানেই যাবেন তাঁর ব্যক্তিত্ব সেখানে ফুটে উঠবেই। তিনি আরও বলেন, অবনমিত মানুষেরা যে ধর্মে উন্নতি লাভ করতে পারবেন, এমন ধর্মের মধ্যে তিনি স্বাতন্ত্র্যহীন জীবন যাপনও পছন্দ করবেন।

ধর্মান্তর গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় জড়িত থেকেও আম্বেদকর অন্যান্য কাজ বন্ধ রাখেননি। তিনি কোলাবা জেলার চারি-তে কৃষক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেন যে, জমিদারদের আরাম-আয়েশের মধ্যেই কৃষকদের দুঃখের মূল। ওই আত্মসুখসর্বস্ব লোকগুলি তাঁদের উপর যে দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেন।

আম্বেদকর আইন কলেজের কাজকর্ম ও উন্নতিতে মনোযোগী হন। ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলী তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসের কলেজ পত্রিকায় নতুন অধ্যক্ষের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল তা থেকে প্রমাণিত হয়। সম্পাদকীয়তে পাণ্ডিত্য ও আইনি জ্ঞানের সমন্বয়ের কথা প্রসঙ্গে বলা হয় Ñ "তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত আইনবিদ, অর্থশাস্ত্রের একনিষ্ঠ ছাত্র, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য ভারতে এবং অন্যত্র সুপরিচিত। তাঁর সম্পর্কে বেশি

লেখা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের অধ্যক্ষের কাছে আরও বেশি আশা করি এজন্য এখন তাঁকে বিপন্ন করব না। আমরা আরও দেখার জন্য অপেক্ষা করব।"

আম্বেদকর আইন শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ "Thoughts on the Reform of Legal Education in the Bombay Presidency" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি প্রেসিডেন্সিতে ছ'টি শ্রেণির আইন ব্যবসায়ীর উল্লেখ করেন এবং দুঃখ করে বলেন যে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরীক্ষা ও মর্যাদার প্রশ্নে একই পেশায় এ বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

আইন শিক্ষার পূর্ণ পাঠ্যতালিকা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, একজন আইনবিদের পক্ষে মৌলিক নীতির বিশুদ্ধ জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ভাল জানাশুনা, কোনো বিষয় সম্পর্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে উপস্থাপন, কোনো ঘটনার সংক্ষিপ্ত করণ, নিজেকে প্রকাশের যোগ্যতাসম্পন্ন ভাষাবোধ এবং কোনো বিষয় প্রশ্ন করলেই সেই বিষয় উত্তর দেবার প্রাসঙ্গিকতা বোধ থাকা উচিত। শিক্ষাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইন অধ্যয়ন সম্পর্কে আম্বেদকর বলেনÑ অন্যান্য কতকগুলি সাহায্যকারী বিষয়ও পড়া উচিত। তা না হলে শুধুমাত্র আইন শিক্ষা আইন ব্যবসায় অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা হবে। আইন ব্যবসায়ীর আইন মননশীল হওয়া প্রসঙ্গে তিনি অগাস্টিন বিরেলের উক্তি উদ্ধৃত করেনÑ "একটা আইন মননশীলতা প্রধানত নিজেই পরিষ্কার দৃষ্টান্ত প্রদান করেÑ স্পষ্টব্যাখ্যা করে এবং সর্বত্র বিস্তারিত বলতে সক্ষম হয়।"

আম্বেদকর ধর্মান্তরের বিষয়টি মাঝখানে ছেড়ে দেননি। তবুও এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তের জন্য ১৯৩৬ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি পুনায় অধ্যাপক এন. শিবরাজের সভাপতিত্বে অন্য একটি সম্মেলন হয়। সভাপতির ভাষণে শিবরাজ বলেনÑ "অস্পৃশ্যতা বিলোপ করার একমাত্র পথ হলো দলিত শ্রেণির হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য একটি বর্তমান ধর্ম গ্রহণ করাই নয়, সম্ভব হলে নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা কিংবা আর্যদের দ্বারা ভারতে বিভিন্ন নীতি-নিয়ম সংবলিত হিন্দুধর্ম আনার আগে যে প্রাচীন আদি-দ্রাবিড়দের ধর্ম ছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত করা।"

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আম্বেদকর এই সম্মেলনে তাঁর হিন্দুধর্ম ত্যাগের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। 'মহারাষ্ট্র অস্পৃশ্য যুব-সম্মেলন' (Maharashtra Untouchable Touths Conference)-এর তিনটি জিনিস তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে, ডঃ সোলাঙ্কি ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিরোধী না হলেও তিনি ছিলেন প্রসারণশীল, তিনি এবারে উল্টো গাইলেন। ধর্মান্তর গ্রহণ সমর্থন করে তিনি বলেন, আম্বেদকরকে তাঁর একটি মাত্র অনুরোধ যে, অসংগঠিত হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যদের এক মিনিটও ফেলে না রেখে তাঁদের জন্য স্বাধীন নতুন ধর্ম

প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দলিত শ্রেণির আম্বেদকরকে ছাড়া অন্য কোনো সাধুসন্ত বা বেদ বা গীতা বা কোনো শঙ্করাচার্য কিংবা ধর্মপ্রচারকের দরকার নেই। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ধর্মান্তর গ্রহণ ব্যাপারে চামার সম্প্রদায় আম্বেদকর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে, গান্ধি গুরুভায়ুর মন্দির-প্রবেশ ব্যাপারে অনশন গ্রহণের সময় বৃদ্ধি করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। আম্বেদকর এই কাজের জন্য অনির্দিষ্ট সময় বৃদ্ধি করে বলেছিলেন, তিনি ও তাঁর সমাজ যে ধর্ম সম্পূর্ণভাবে সমতা দান করবে সেই ধর্মই গ্রহণ করবেন। ইয়োলা সিদ্ধান্তের পরেই আম্বেদকর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করবে সেই অপেক্ষায় তিনি আর থাকতে তৈরি নন।

আম্বেদকর তাঁর লোকদের ভুল ভাবনা সম্পর্কে সাবধান করে দেন যে, ধর্মান্তর গ্রহণ তাঁদের নরক থেকে মুক্তি দেবে বা সাম্যের স্বর্গে নিয়ে যাবে। যে নতুন ধর্মেই তাঁরা যান না কেন স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য তাঁদের লড়াই করতেই হবে। তিনি মন্তব্য করেন, "ঘটনা সম্পর্কে আমরা পূর্ণ সচেতন যে, যেখানেই আমরা যেতে ইচ্ছা করিÑ খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম বা শিখÑ আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের লড়াই করতেই হবে। এটা ভাবা বোকামি হবে যে, ইসলামধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রত্যেকে নবাব হবো বা খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করলে পোপ হবো। যেখানেই আমরা যাই না কেন, লড়াই আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী।" তিনি বলেন, বর্ণহিন্দুদের মধ্যে থেকে মিলনের পথগুলি কখনও পূর্ণ হবে না। কারণ এটা রুটি-মাখনের প্রশ্ন নয়। তাঁদের লড়াইয়ের পিছনে যে একটা পবিত্র ইচ্ছা আছে এটা সন্দেহাতীত, তা না হলে নিজামের পক্ষ থেকে সাতকোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব আসত না। গান্ধির চালু করা 'হরিজন ফাণ্ড' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যদেরকে বর্ণহিন্দুদের ক্রীতদাস করে রাখা। তিনি ঘোষণা করেন, বর্ণহিন্দুরা সাহায্য করুন বা বাধা দিন তিনি ধর্মান্তর গ্রহণে বদ্ধপরিকর। এমনকি তাঁর মত বদলাবার জন্য যদি ঈশ্বরকেও হাজির করা হয়, তবু তিনি তাঁর সংকল্প থেকে কিছুতেই পিছপা হবেন না।

ঘন ঘন উচ্চকণ্ঠের প্রশংসাধ্বনিতে তাঁর বক্তৃতা যেভাবে বাধা পাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন অভিযানের উপর আঘাত হানতেই তাঁর অনুগামী ও সমর্থকেরা তাঁর বক্তৃতাকে অভিনন্দিত করছেন। তাঁর নিজের মহলে আম্বেদকরের জয়ধ্বনিতে যুব-সম্মেলন শেষ হয়। কিন্তু বাইরে তাঁর কিছু পক্ষ সমর্থনকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে এই আন্দোলন সহানুভূতি হারায় এবং এতে সংবাদপত্রগুলি ও রাজনৈতিক মানসিকতা সম্পন্ন হাজার হাজার হিন্দু সতর্ক হয়ে যায়। মাহার সম্প্রদায়ের নেতারা ছাড়া অন্যান্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতারা আম্বেদকরের প্রতি তাঁদের অসহমত প্রকাশ করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, ধর্মান্তর তাঁদের আর্থিক বা বস্তুগত

কোনো পরিবর্তন আনবে না, বরং অসুবিধার সৃষ্টি করবে।

বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যে সমস্ত সাহসী, অকপট এবং একনিষ্ঠ কর্মী অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা পুনরায় এই ঘোষণায় অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁরা অনেকে বলেন যে, দলিত শ্রেণির ইতিহাসে এমন বিপদ কখনও আসেনি। তাঁরা আম্বেদকরের ওই কাজকে পলায়নপর মনোবৃত্তি আখ্যা দেন। খ্রিস্টান ও মুসলিমরা অস্পৃশ্যদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মান্তরের যে আন্দোলন করেন, তা তাঁদের নারকীয় পরিস্থিতি থেকে স্বর্গীয় পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করতে যে ব্যর্থ হয়েছে, সে দিকেও আম্বেদকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, ধর্মান্তর আন্দোলনের ইতিহাস আম্বেদকরের লক্ষ্য সমর্থন করে না। ঐতিহ্যের বন্ধন এবং ধর্মীয় আচরণের মূল এত গভীরে যে, ধর্মান্তরিত হিন্দুরাও অবচেতনভাবে সেগুলি পালন করে আসছেন দশকের পর দশক ধরে। এজন্য তাঁরা দলিত শ্রেণিকে তাঁদের পাশে থেকে সাহসের সঙ্গে কাজ করে কিছু গড়ে তুলতে এবং অস্পৃশ্যতা দূর করার লক্ষ্যে, যে কাজ আম্বেদকর ও অন্যেরা এতদিন করে আসছেন, সেইভাবে লড়াই করতে বলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা আম্বেদকর ও অন্যান্যদের কাছে কাপুরুষের মতো রণস্থল ছেড়ে না যেতে অনুরোধ করেন। তবুও অল্পসংখ্যক দূরদর্শী সমাজসংস্কারক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আম্বেদকরের এই ভূমিকার সহানুভূতির সঙ্গে মূল্যায়ন করেন। তাঁরা আম্বেদকরকে উদ্ধারকর্তা হিসাবে অভিনন্দিত করে বলেন, তিনি হিন্দুধর্মের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের জন্যই জন্মেছেন।

যাঁরা এ বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে অক্ষম তাঁরা আম্বেদকরের ধর্মান্তরের ঘোষণাকে হুমকি, ধাপ্পা ও চমক বলে বর্ণনা করেন। যাঁরা ভাবেন যে, আম্বেদকর ধর্মান্তরের অসুবিধার দিকগুলির কথা ভাবেননি কিংবা ধর্মান্তরিত হলেই তাঁদের জন্য স্বর্গের দরজা খুলে যাবে এমন ভাবেন, তাঁরা আম্বেদকরকে ঠিক বুঝতে পারেননি। বেশির ভাগ বর্ণহিন্দু নেতা ওই সমস্যার একটা দিক থেকে দেখেন এবং ধর্মান্তরের সমর্থকেরা দেখেন অন্য দিক থেকে। আম্বেদকর তাঁর নিজস্ব ধারায় একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্য সমস্ত মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী অস্পৃশ্যতা সমস্যার উপর জোর দিয়ে তাঁর জনগণের মানবিক অধিকার লাভের সংগ্রামের গতি বাড়িয়ে দেন। কঠিন রোগে দরকার কড়া ওষুধের। যে রোগের মূল অত্যন্ত গভীরে তার জন্য দরকার একটা ধাক্কা দেওয়া চিকিৎসা পদ্ধতি, আম্বেদকর তারই শেষ চেষ্টা করেন।

গভীর ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং সংস্কারের তীব্র সমালোচক ও সমাজ সংশোধকÑ সংগ্রাম ছিল এই দুই আম্বেদকরের মধ্যে। তিনি তাঁর সংগ্রামের প্রথমদিকে বলেছিলেন যে, হিন্দুত্ব কেবল বর্ণহিন্দুদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। চামার সম্প্রদায়ের কয়েকজন মহিলার ইসলামধর্ম গ্রহণের খবর তাঁর কাছে পৌঁছালে

তিনি মানসিকভাবে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, যতক্ষণ বর্ণহিন্দুরা তাঁদের হিন্দু বলবে, ততক্ষণ তাঁদের বর্ণহিন্দুদের সাথেই মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে। তিনি এটাও ঘোষণা করেন যে, অস্পৃশ্যেরা তাঁদের সংগ্রামের মাধ্যমেই হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করবেন এবং তাঁদের রক্ত দিয়েই তার কলঙ্ক ধুয়ে দেবেন। সেই সময় তিনি গোয়াতে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্যোক্তা হিন্দু মিশনারিদের গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে গোয়া সরকারের কাছে পাঠানো টেলিগ্রাফিক মেমোরেণ্ডামে সইও করেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠকের মাইনরিটি কমিটিতে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাতে দলিত শ্রেণিকে প্রতিবাদী হিন্দু কিংবা ভিন্নমতাবলম্বী হিন্দু নামে অভিহিত করার কথা বলেন। সর্বোপরি তিনি পুনাচুক্তিতেও সই করেছেন, যাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি হিন্দুধর্মেই থাকতে চেয়েছিলেন।

যুব-সম্মেলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। ওই সম্মেলনের দিনগুলিতে আম্বেদকর ডঃ সোলাঙ্কির সাথে **১৯৩৬** সালের **১৩** জানুয়ারি রাতে শিখদের ভজনসভায় যোগ দেন। শিখ নেতারা তাঁকে শিখধর্মে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। সেই সপ্তাহেই মুসলিমদের দু'টি প্রতিনিধিদল পুনায় অপেক্ষা করে দলিত শ্রেণির নেতাকে ইসলামধর্ম গ্রহণের আবেদন জানায়।

যুব-সম্মেলন ইয়োলা সম্মেলনে প্রস্তাবিত আম্বেদকরের আন্দোলনকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করে এবং ব্যাপকভাবে তা কাজে পরিণত করার উপর জোর দেয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্ম বিষয়ে রায়

'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল'-এর লাহোরের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আম্বেদকর ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি থেকে একটি ভাষণ তৈরি করছিলেন। জাতপাত বিরোধী ওই সংগঠনের নেতারা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য আম্বেদকরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রসিংহ বম্বেতে আম্বেদকরের সাথে দেখা করে আমন্ত্রণ গ্রহণে রাজি করান। ডঃ গোকুলচাঁদ নারাঙ ইস্টারের সময়ের ওই সম্মেলনের ক'দিন তাঁর সাথে থাকার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান।

পুনার যুব-সম্মেলনে আম্বেদকরের দেওয়া বক্তৃতা সম্পর্কে বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং সহানুভূতি সম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে তিনি বহু চিঠি পান। কেউ কেউ বলেন, বর্ণাশ্রমই সমস্যা দূর করবে। অন্যেরা বলেন যে, বর্ণাশ্রমের উপর সমাজ গঠন অর্থহীন। সঠিক পথ হচ্ছে জাতপাত ধ্বংস করা। আম্বেদকরের আগুনঝরা বক্তৃতায় হিন্দু নেতাদের মনে যে ভীতির উদ্রেক হয়েছে, তাতে মালব্যের মতো নেতারা মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্যদের মনোভাব জানতে নাসিক ও অন্যান্য জায়গা ঘুরে দেখেন।

১৫ মার্চ বম্বের 'বম্বে থিয়েটার' হলে 'চিত্তরঞ্জন থিয়েট্রিকাল কোম্পানি' আম্বেদকরকে সংবর্ধনা জানায়। সেদিন তারা 'দক্ষঞ্চ দিব' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। বিশিষ্ট নাট্যকার আপ্পাসাহেব টিপনিস ওই নাটকটির লেখক। তাতে পেশোয়া রাজত্বের সময়ের ইতিহাস থেকে তাঁর রাজ্যের অস্পৃশ্য সমাজের পূর্ণ দৃশ্যাবলি দেখানো হয়। সেই সময় দিনের কয়েক ঘণ্টা গলায় মাটির পাত্র বেঁধে এবং তাঁদের পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য কোমরে কাঁটার ঝাঁটা ঝুলিয়ে অস্পৃশ্যদের রাস্তায় চলতে বাধ্য করা হত। ওই নাটক দেখার জন্য আম্বেদকরের আমন্ত্রণ গ্রহণের খবরে এত বিপুল জনসমাগম হয়েছিল যে থিয়েটারটি কানায় কানায় ভরে যায়।

সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠনের কাজে অকপট ও জ্বলন্ত আন্তরিকতার জন্য সুপরিচিত অনন্তরাও গাদ্রে ছিলেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা। গাদ্রে বলেন যে, অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্যবহার এমন ঘৃণ্য ও অমানবিক ছিল যে, সেই অভিনেতা গলায় পাত্র বেঁধে মঞ্চে উঠতে অস্বীকার করেন।

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসের শেষে 'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল' আম্বেদকরকে জানায় যে, মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওই সম্মেলন তারা স্থগিত রেখেছে। পাঞ্জাবের সংবাদপত্রগুলিতে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং গোঁড়া জনসাধারণ আম্বেদকরের

মতো 'হিন্দুধর্মের ঘোষিত নিন্দাকারী'কে সভাপতি নির্বাচন করায় মণ্ডলের তীব্র সমালোচনা করে। এর ফলে ভাই পরমানন্দ, ডঃ নারাঙ, মহাত্মা হংসরাজ ও রাজা নরেন্দ্রনাথের মতো অবিচলিত চিত্ত নেতারা মণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আম্বেদকরকে প্রকৃত অবস্থা জানাবার জন্য তার প্রধান নেতা সন্তরাম, হরভগবানকে বম্বে পাঠান। তিনি ৯ এপ্রিল বম্বেতে আম্বেদকরের সাথে দেখা করে ছাপা হয়ে যাওয়া সভাপতির ভাষণের একটি কপি নিয়ে যান।

১৩ ও ১৪ এপ্রিলে হতে যাওয়া শিখ-মিশন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আম্বেদকর পরদিন অমৃতসর রওনা হয়ে যান। পাঞ্জাব, কেরালা, উত্তর প্রদেশ, এবং মধ্যপ্রদেশের বিপুল সংখ্যক শিখ ও দলিত শ্রেণির লোকেরা ওই সম্মেলনে যোগ দেন। অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ সরদার বাহাদুর হুকুম সিং সভাপতি এবং ওয়াসাখাস সিং অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। সভাপতি ও চেয়ারম্যান উভয়েই তাঁদের ভাষণে দলিত শ্রেণির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মিশনারি কাজের উপর জোর দেন। সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে আম্বেদকর শিখদের সাম্যনীতির প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, যদিও তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করার কথা বলেছেন, তথাপি তখনও তিনি মনস্থির করেননি। স্যার যোগেন্দ্র সিং নামে এক বক্তা মিশনারি কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং একটি ট্রাস্ট গঠন ও তহবিল গঠনের জন্য আবেদন করেন। সম্মেলনের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ডঃ কুট্টির-এর নেতৃত্বে কেরালার থিয্য সম্প্রদায়ের পাঁচজন দলিত শ্রেণির বিশিষ্ট নেতা এবং উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের আরও পঞ্চাশজনের শিখধর্ম গ্রহণ।

আম্বেদকর তাঁর প্রস্তাবিত শিখ-সম্মেলন উপলক্ষ্যে অমৃতসর যাওয়ার কথা সম্ভবত হরভগবানকে বলেননি। কারণ, হরভগবান ১৪ এপ্রিল লাহোর থেকে আম্বেদকরকে লেখেন, "এখানে পৌঁছে জানলাম যে আপনি অমৃতসর এসেছেন। যাবার মতো সুস্থ থাকলে ওখানেই আপনার সাথে দেখা করতাম।" শিখ-সম্মেলনে যোগদানের জন্য জাতপাত তোড়ক মণ্ডলের সন্দেহ বেড়ে যায়। এজন্য তারা ছাপানো বক্তৃতার কিছু অংশ বাদ দেওয়ার জন্য আম্বেদকরকে জানায়, যা তিনি জাতপাত তোড়ক মণ্ডলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তৈরি করেছিলেন এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য সম্মেলন স্থগিত রাখে। আম্বেদকরের ছাপানো অংশ থেকে যে অংশ তারা বাদ দিতে বলে তা হচ্ছে বেদ ও হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কীয়। উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, একটা কমাও তিনি বাদ দেবেন না এবং ওই প্রোগ্রাম তিনি বাতিল করে দেন। শিখ সম্মেলনে যোগদান সম্পর্কে আম্বেদকরের নিজের মত এই যে, কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক কিছু করবার আছে। যেহেতু তিনি শিখ নেতাদের সাথে গোপনে অলোচনা চালাচ্ছেন এবং তাঁর প্রস্তাবিত ভাষণেও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, হিন্দু হিসাবে এই তাঁর শেষ

বক্তৃতা, এজন্যই 'মণ্ডল' তাঁকে সভাপতি করার প্রস্তাবও ফিরিয়ে নেয়।

এ সময় আম্বেদকরের কার্যকলাপে গান্ধি-শিবিরও বিরক্ত হয়। শেঠ ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ আম্বেদকরকে বুঝিয়ে গান্ধির সাথে দেখা করতে রাজি করান। ওয়ালচাঁদের সঙ্গে আম্বেদকর ওয়ার্ধা এবং সেগাঁও-এ গিয়ে গান্ধির সাথে দেখা করেন। কিন্তু তাতে কোনো সমাধান হয়নি। গান্ধি অন্যায়ভাবে ভাবতেন যে, ভারত ও লণ্ডনের বিশেষ প্রভাব আম্বেদকরের উপর কাজ করায় হুমকি দিয়ে সমস্যাটিকে অনেক বড়ো করা হয়েছে। সেগাঁও থেকে ফেরার পথে দলিত শ্রেণির লোকেরা আম্বেদকরকে ওয়ার্ধা স্টেশনে বিপুল সংবর্ধনা জানান। গান্ধির কোটিপতি সমর্থক ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ ও যমনালাল বাজাজ আম্বেদকরকে গান্ধির সাথে যোগ দিতে বলেন। তাহলে তিনি দলিত শ্রেণির উন্নতির জন্য বিপুল সাহায্য পাবেন। আম্বেদকর তাঁদের খেলাখুলি বলেন যে, অনেক ব্যাপারেই গান্ধির সাথে তাঁর মতভেদ আছে। তাঁরা তখন নেহরুর পথে চলার কথা বলেন। আম্বেদকর তাঁদের বলেন, সফলতা পাওয়ার লোভে তিনি তাঁর বিবেক বিসর্জন দেবেন না। আম্বেদকরকে অভ্যর্থনা করার জন্য দলিত শ্রেণির ভিড় দেখে এই কোটিপতিরা আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করেন যে, হরিজনদের জন্য তাঁরা অর্থ খরচ করলেও হরিজনরা তাতে তেমন সাড়া দেন না। আম্বেদকর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেনÑ এটাই হচ্ছে মা আর ধাইয়ের মধ্যে ফারাক।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর না দেওয়া বক্তৃতাটি 'জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি' (Annihilation of Caste) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন এবং প্রস্তাবিত ওই সম্মেলনের পরে প্রকাশিত বইটি জাতপাত বিলুপ্তির এক মহান গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে আজও সমানভাবে আদৃত। প্রবন্ধটিতে কঠোর অধ্যবসায়, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং তাঁর মনের পূর্ব-লক্ষণ প্রতিফলিত। এটি অগ্নিগর্ভ ন্যায়শাস্ত্রÑ যা ঝাঁঝালো ও বিদ্রূপাত্মক, ভয়ঙ্কর উত্তেজক ও বিস্ফোরক। এটি বর্ণহিন্দু নেতাদের কাছে পচা ঘা-এ সিলভার-নাইট্রেট-এর মতো।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ অনুসারে হিন্দু সমাজ প্রথমে চার বর্ণ অর্থাৎ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এই বর্ণ ছিল গুণ অনুসারে। কিন্তু সময়ের গতিতে এই বর্ণব্যবস্থা জন্ম অনুসারে হয়ে যায় এবং চার বর্ণ চার জাতিতে পরিবর্তিত হয়। আম্বেদকরের মতে এই জাতব্যবস্থা হচ্ছে একই গোত্রের মধ্যে মানুষের সামাজিক বিভাগ এবং শুধু শ্রমের বিভাগই নয়, শ্রমিকদের মধ্যেও বিভাগ। এই জাতব্যবস্থা একজন মানুষ যে কাজের উপযুক্ত নয় তাকে সেই কাজে বাধ্য করে। চতুর্বর্ণের উপর হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন অসম্ভব ও ক্ষতিকারক। কারণ এই বর্ণবিভাগ থেকেই জাত বিভাগের সৃষ্টি। চতুর্বর্ণ আইনে শূদ্রদের জ্ঞান লাভ করা, অর্থ উপার্জন করা ও অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ। ফলে তারা কখনও বিদ্রোহ করতে পারবে না এবং অপরিবর্তনীয় ভাগ্যের অধীন

থেকে তাদের চিরদাসত্ব মেনে নিতে হবে। তিনি বলেন, সংক্ষেপে এই জাতিভেদ প্রথা মানুষকে সাহায্যকারী কাজে উৎসাহ না দিয়ে নির্জীব, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া করে রেখেছে।

তিনি মন্তব্য করেন, জাতিভেদ প্রথা মূলত উন্নত মানব সমাজ সৃষ্টির প্রধান বাধা। এই প্রথাই উপরতলার শক্তিশালী বিকৃত হিন্দুদের উদ্ধত ও স্বার্থপর করেছে এবং তারাই এই প্রথা নিচের তলার মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এতে অর্থনৈতিক দক্ষতা তৈরি হয় না। কারণ, জাতিভেদ প্রথায় যোগ্যতা অনুসারে কারও পেশা নির্ধারিত হয় না। জাতব্যবস্থা হিন্দুর নৈতিকতার উপর খারাপ প্রভাব ফেলেছে। এটা সাধারণ মানুষের চেতনা ধ্বংস করেছে, সাধারণের প্রতি বদান্যতা নষ্ট করেছে এবং সাধারণের মতামতও সংকীর্ণ করেছে। এটা কেবল তার নিজের জাতির লোকের প্রতি আনুগত্য সীমাবদ্ধ করেছে। সততা এবং নৈতিকতাও তার জাতির মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছে। জাতব্যবস্থা অন্য জাতের মেধা বা গুণের মর্যাদা দেয় না।

জাতব্যবস্থা ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করেছে। জাতব্যবস্থা ধর্মান্তরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সমাজে ঠাঁই নেই। তিনি বলেন, অতীতে হিন্দুধর্ম ছিল প্রচারমুখী, জাতব্যবস্থা হিন্দুদের সেই প্রচার মানসিকতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। জাতিভেদ আছে বলেই কোনো 'শুদ্ধি'র ব্যবস্থা নেই। যতদিন পর্যন্ত কোনো সংগঠন না হবে ততদিন হিন্দুরা দুর্বল ও হীন থাকবে এবং বশংবদ হয়ে তাদের অপমান ও অন্যায় সহ্য করে থাকতে হবে। তিনি হিন্দুদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, যদি হিন্দুদের অনুতাপহীন হৃদয়হীন ব্যবহারের মধ্যেই আদিবাসীদের থাকতে হয় এবং অহিন্দুরা যদি তাদের দাবি করে ও তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করে নেয়, তাহলে তারা হিন্দুদের শত্রুদের সংখ্যাই বৃদ্ধি করবে।

তিনি বলেন যে, কোথাও মনুষ্যসমাজে একমাত্র একটা দল নেই এবং সমস্ত সমাজেই দল আছে। কিন্তু সেই সমস্ত দল থেকে হিন্দুসমাজের দল আসলে পরস্পরের সাথে কাজে, মেলামেশায় এবং একাত্মকরণে একেবারেই আলাদা। হিন্দু সমাজে প্রত্যেকটি জাতি তার জাতির জন্য বেঁচে থাকে এবং যদিও হিন্দুদের চিন্তায়, বিশ্বাসে, মত ও পথে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে একটা সমাজ বা একটা জাতি নয়, তারা কতকগুলি জাতের সমষ্টি মাত্র। জাতই হিন্দুর বাধা। জাতপাত প্রথাই হিন্দুর পতনের কারণ। জাতপাতের জন্যই হিন্দুর চিরপরাজয়ের জীবন। জাতপাত প্রথাই ভারতে হিন্দুদের দুর্বল করেছে। জাতপ্রথাই হিন্দুসমাজকে অধঃপতনে, ধ্বংসের পথে, চরিত্রহীনতার পথে ও নির্জীবতার পথে নিয়ে গেছে।

এর আসল প্রতিকার হচ্ছে অসবর্ণ বিবাহ। তিনি বলেন, সকলের একত্রে

খাওয়াদাওয়ায় জাতপাতের প্রবণতা ও মানসিকতাকে ধ্বংস করতে পারেনি। রক্তের মিশ্রণই আত্মীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে, যদি এই আত্মীয়তার মনোভাব প্রাধান্য লাভ না করে, তাহলে জাতপাতের পৃথক সত্ত্বাবোধ কোনোদিন মুছে যাবে না। জাত হচ্ছে একটা ধারণাÑ মনের ভাব। এর ধ্বংসের মানে মনোভাবের বদল ঘটানো। হিন্দুর মানবিকতা বোধ নেই বা বিকৃত মস্তিষ্ক বলে জাত মানেন, তা নয়, তাঁরা জাত মানেন, কারণ তাঁরা একান্ত ধর্মপরায়ণ। জাতপাত মেনে তাঁরা অন্যায় করেন না। অন্যায় হচ্ছে তাঁদের ধর্ম, যা জাতপাত তৈরি করে। আসল শত্রু হচ্ছে শাস্ত্র। ওটাই তাঁদের ধর্মে জাতপাতের শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রের এই অনুশাসনকে ধ্বংস করুন, সেইসঙ্গে শাস্ত্রাদি, শাস্ত্রের একাধিপত্য, স্বর্গীয় বিশ্বাস এবং বেদও ধ্বংস করুন। শাস্ত্রের একাধিপত্য থেকে প্রত্যেক নরনারীকে মুক্তি দিন, তাহলে কেউ বারণ করলেও তারা পরস্পরকে বিয়ে করবে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, ব্রাহ্মণরা হিন্দুদের নেতা এবং তাঁরাই বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানুষ হওয়ায় তাঁরা কখনও পুরোহিতের ক্ষমতা ও সম্মান ধ্বংসের জন্য আন্দোলন করবেন না। এক হাত অন্য হাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। সেইজন্য আম্বেদকর বংশগত পৌরোহিত্য ধ্বংস করার প্রস্তাব দেন এবং পুরোহিতের সংখ্যা কমিয়ে, পৌরোহিত্য ব্যাবসাকে গণতান্ত্রিক করতে চান, যাতে যে কোনো হিন্দু পৌরোহিত্য বিষয়ে নির্দিষ্ট পরীক্ষা পাশ করে স্বীকৃতি পেলেই পৌরোহিত্য করতে পারেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ ধ্বংস করে হিন্দুধর্মকে বাঁচান। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, হিন্দুর একখানি মাত্র ধর্মগ্রন্থ থাকবে। আম্বেদকরের গবেষণার বার্তা হচ্ছে হিন্দু সমাজ একটি নৈতিক পুনর্জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক, তা না হলে তা হবে বিপজ্জনক।

তার মানে হিন্দুসমাজকে এক নতুন মতের উপর দাঁড় করাতে হবেÑ যার ভিত্তি হবে সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব, এক কথায় গণতন্ত্র। অর্থাৎ একটা সম্পূর্ণ মৌলিক পরিবর্তনের মনোভাবÑ জীবনবোধ, মানুষ ও বস্তুর প্রতি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

আম্বেদকর বলেন, ভারতের হিন্দুরা হচ্ছে দুর্বল মানুষ। তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন, "যখন হিন্দুসমাজ জাতহীন সমাজ হবে, তখনই তারা আত্মরক্ষা করার উপযুক্ত শক্তির অধিকারী হবে। সেই অন্তর্নিহিত শক্তির অভাবে, হিন্দুদের কাছে স্বরাজ হবে দাসত্বের দিকে একপা এগিয়ে যাবার সামিল।"

মণ্ডলের এই কাজকে আম্বেদকর জাতীয়তাবাদী কাজ মন্তব্য করে 'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল'-এর সাফল্য কামনা করেন।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির চাহিদা এত বেশি ছিল যে, তার ইংরেজি সংস্করণ দু'মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। পাঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল, গুজরাটি, মালয়ালম ইত্যাদি ভাষাগুলিতেও এর অনুবাদ হয়।

হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠনের জন্য জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্তির প্রচার শুধু আম্বেদকর একাই করেননি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লাজপত রায়, রামমোহন রায়, ভাই পরমানন্দ, আচার্য পি.সি.রায়, আর.সি.দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, স্যার যদুনাথ সরকার, অরবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ চ্যাটার্জি, লালা হরদয়াল এবং বীর সাভারকারের মতো আধুনিক নেতারাও জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করেছেন। সকলেই বলেছেন যে, জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুদের প্রখর জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সংহতি থেকে বঞ্চিত করেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, “মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় জাতপাত আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা জাতীয় ঐক্যের বিরোধী।” তাঁর মতে এর সমাধান হচ্ছে বিয়ের স্বাধীনতা। লালা হরদয়াল বলেন, “জাতিভেদ প্রথা ভারতের অভিশাপ। এই রকমারি জাতপাতই আমাদের দাস জাতিতে পরিণত করেছে। ইসলাম বা ইংলণ্ড ভারতকে ধ্বংস করেনি। শত্রু আমাদের মধ্যেই রয়েছে। পুরোহিততন্ত্র এবং জাতিভেদ প্রথাই আমাদের ধ্বংস করেছে। যতদিন জাতিভেদ প্রথা আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে ততদিন ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে না, পেলেও তা রক্ষা করতে পারবে না। আপনারা বক্তৃতা দিতে বা প্রস্তাব পাশ করতে বা কমন ওয়েলথ বিলে সই করতে পারেন। কিন্তু বর্ণহিন্দুরা কখনও একত্রে কাজ করতে, স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে বা বিজয়ী সেনাদলও গড়তে পারবে না।”

জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুর সর্বনাশা বিষ Ñ এই রায়ই দিয়েছেন ভারতের মহান এবং সত্যিকারের ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ ও সমাজসংস্কারকগণ। কোনো কোনো সমালোচকের মন্তব্য এই যে, ইউরোপীয়রা তাঁদের জাতিবোধের গর্ব করেন, মুসলিমরা ধর্মের এবং হিন্দুরা তাঁদের জাতের গর্ব করেন, তা মিথ্যা নয়।

আম্বেদকর পুনার ‘অস্পৃশ্য যুব-সম্মেলন’-এ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ধর্মান্তর আন্দোলনে তাঁর লোকদের প্রকৃত সমর্থন যাচাই করার জন্য তিনি যে সম্প্রদায়ে জন্মেছেন, সেই মাহার সম্প্রদায়ের একটি সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুসারে ১৯৩৬ সালের ৩০ ও ৩১ মে দাদারে বিশেষভাবে নির্মিত প্যাণ্ডেলে সম্মেলনটি হয়। তাতে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ইউরোপিয়ান মিশনারি স্ট্যানলি জোন্স ও বি.জে. যাধব। মঞ্চের উপর অনেক শিখ এবং মুসলিম নেতা ও পুরোহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মান্তরের ইঙ্গিত পাওয়ার আশায় বসে ছিলেন। ইয়োলা সম্মেলনের প্রস্তাব কাজে পরিণত করার উপায় নির্ধারণ করাই ছিল সম্মেলনের উদ্দেশ্য। রেভজি ডি.ডোলাস প্রতিনিধিদেরকে স্বাগত জানান। হায়দারাবাদের দলিত শ্রেণির নেতা বি.এস. ভেঙ্কট রাও ওই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

সম্মেলনের সমস্ত শ্রোতা সম্পূর্ণ নীরবতায় আম্বেদকরের বক্তৃতা শোনেন। তিনি মারাঠি ভাষায় যে বক্তৃতা দেন, সেটি ছিল পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি। প্রথমেই আম্বেদকর বলেন যে, তিনি কেবলমাত্র মাহারদের এই সম্মেলনে ডেকেছেন, কারণ তিনি মাহারদের মতামত জানতে চান। অন্যেরা যাঁরা ধর্মান্তরণে বিশ্বাসী, যদিও তাঁরা সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হননি, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সম্মেলনে তা সমর্থন করতে পারেন। যাঁরা এই ধর্মান্তরের বিরোধী তাঁরাও এই সম্মেলন থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র মনে করবেন না।

দলিত শ্রেণি যে অসংখ্য প্রকার নির্যাতন ভোগ করছেন, সেগুলি বর্ণনা করে আম্বেদকর বলেন, যতদিন তাঁরা হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকবেন ততদিন তা থেকে তাঁদের মুক্তির উপায় নেই। পোশাক, খাদ্য, চাকরি, শিক্ষা ও সভ্য সমাজে বসবাস করার জন্য তাঁদের কর্মতৎপরতায় সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে হলে হিন্দুধর্মের বাইরে গিয়ে তাঁদের তা পেতে হবে। তিনি বলেন, "ধর্মপরিবর্তনে আপনাদের দাসত্বের শিকল ছাড়া আর কিছু হারাতে হবে না, বিনিময়ে আপনারা সবকিছু পাবেন।" সমস্যার সামাজিক বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমস্যাটি দেখতে সামাজিক মর্যাদা লাভের লড়াইয়ের মতো, তথাপি এটি একটি শ্রেণিসংগ্রামই। সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত জনতার মধ্যে অবিরাম যে লড়াই চলছে, অত্যাচার-নিপীড়ন সেই লড়াইয়েরই অংশ। তিনি দলিত শ্রেণিকে বলেন যে, সেই সংগ্রামের জন্য তাঁদের তিনটি জিনিসের অভাব Ñ জনবল, অর্থবল ও বুদ্ধিমত্তা এবং যতদিন তাঁরা হিন্দুসমাজে থাকবেন, ততদিন ওই শক্তিগুলি অর্জন করতে পারবেন না।

বিষযটির আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রকৃত ধর্মের কাজ হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের উন্নয়ন। সেজন্য ধর্মের উচিত সহমর্মিতা, সাম্য এবং স্বাধীনতার শিক্ষা দেওয়া। হিন্দুধর্ম এই সমস্ত গুণের শিক্ষা দেয় না বলে দলিত শ্রেণির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। হিন্দুধর্ম শিক্ষা, সম্পদ ও অস্ত্রধারণের অধিকার না দিয়ে উন্নতির জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করেছে। এজন্য হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য যে ধর্ম উন্নততর জীবন দেবে, তিনি তাঁদের সেই ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন।

তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন, "অস্পৃশ্যতার জন্য আপনাদের গুণের কোনো পুরস্কার নেই। আপনাদের মানসিক ও শারীরিক গুণের কোনো মর্যাদা নেই। এজন্যই আপনারা সেনাবাহিনী, পুলিশ-বিভাগ ও নৌবাহিনীতে চাকরি পান না। অস্পৃশ্যতা নামক অভিশাপ আপনাদের অস্তিত্ব, সম্মান ও সুনাম ধ্বংস করে দিয়েছে।"

এরপর আম্বেদকর স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তিনি হিন্দু সমাজ-সংস্কারকদের সততায় বিশ্বাস করেন না। তাঁরা তাঁদের নিজেদের জাতের মধ্যে জীবিত থেকে নিজেদের জাতের মধ্যে বিয়ে করে, সেই জাতের মধ্যে থেকেই মরেছেন। দলিত

শ্রেণির পক্ষ হয়ে গান্ধির বর্ণহিন্দুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস নেই। কিছু লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ধর্ম বদল করে তাঁরা কী পাবেন। তাঁর উত্তর হলÑ "স্বরাজের দ্বারা ভারত কী পাবে? স্বরাজ যেমন ভারতের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি অস্পৃশ্যদেরও ধর্ম বদলের প্রয়োজন। এই দু'রকমের আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।"

এর রাজনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ধর্ম বদলের ফলে তাঁরা কোনো অসুবিধা ভোগ করবেন না। তাঁরা যে সমাজের সঙ্গে মিশে যাবেন, তাঁদের সমর্থন পাবেন। তাঁর নিজের সম্পর্কে আম্বেদকর জোরের সঙ্গে বলেনÑ "আমি এ ধর্ম ত্যাগ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এই ধর্ম বদলের প্রেরণা কোনো বস্তুগত লাভের মানসিকতা থেকে আসেনি। অস্পৃশ্য থেকেও আমি পেতে পারি না এমন বোধ হয় কিছু নেই। আমার ধর্মান্তর গ্রহণের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু নেই। হিন্দুত্ব আমার অন্তরে সাড়া দেয় না। আমার আত্মসম্মানবোধ হিন্দুত্বের সাথে একাত্ম হতে পারে না। আপনাদের পক্ষে ধর্ম বদল করা পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় উদ্দেশ্যেই জরুরি। বস্তুগত লাভের জন্য আপনারা ধর্ম বদল করছেন, এমন বোকার মতো বিদ্রূপ করা মন্তব্যে কান দেবেন না। যে ধর্ম মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে ভাবে. সেই ধর্মে কী দরকার? ধনী তাঁর অবসর সময়ে ওই বিষয় নিয়ে সুড়সুড়ি দিতে পারেন। যাঁরা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও উন্নত তাঁরা মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে ভাবনায় সময় নষ্ট করতে পারেন। কিন্তু যে ধর্ম আপনাদের সম্মান, অর্থ, খাদ্য ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করেছে, সেই ধর্মের অধীন কেন থাকবেন?"

"আমি আপনাদের বলি, ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। যদি আপনারা সংগঠিত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সফল হতে চান, তাহলে ধর্ম বদল করুন। **যে ধর্ম আপনাদের মানুষ বলে স্বীকার করে না, পানীয় জল নিতে দেয় না, মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় না, তাকে ধর্ম বলা যায় না। যে ধর্ম আপনাদের বিদ্যাশিক্ষায় নিষেধ করে ও পার্থিব উন্নতির পথে বাধা দেয়, তা 'ধর্ম' নামের অযোগ্য। যে ধর্ম তার অনুগামীদের স্বধর্মীয় লোকদের সঙ্গে মানবিক ব্যবহারের শিক্ষা দেয় না, তা বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। যে ধর্ম তার অনুগামীদের ইতর প্রাণীকে ছুঁতে বলে, কিন্তু মানুষকে ছুঁতে নিষেধ করে, তা ধর্ম নয়। যে ধর্ম কোনো কোনো শ্রেণিকে বিদ্যাশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, ধর্ম সঞ্চয় করতে ও অস্ত্রধারণে নিষেধ করে, তা ধর্ম নয়। যে ধর্ম নিরক্ষরকে নিরক্ষর থাকতে এবং গরিবকে গরিব থাকতে বাধ্য করে তা ধর্ম নয়, ঈশ্বরের নামে অত্যাচার মাত্র।"**

বুদ্ধের মৃত্যুকালীন মুখনিঃসৃত বাণী উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর মানুষদের যুক্তির আশ্রয় নিতে বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। বুদ্ধের উদ্ধৃতিতে কারও কারও মনে এই

বিশ্বাস জাগে যে, তিনি বৌদ্ধধর্মের দিকে ঝুঁকছেন। তিনি কৌশলে তাঁর পছন্দ করা ধর্মের নাম প্রকাশ করা এড়িয়ে যান।

সমস্ত ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকেরা, যেমন ম্যাক্সমুলার, এমার্সন, কার্লাইল, শ্লেগেল, থোরু, ভল্টেয়ার, এলিয়ট, বার্নাডশ, শোপেন হাওয়ার ও অন্যান্য, যাঁরা হিন্দুধর্মের প্রশংসা করে জয়গান করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই সমালোচনায় তাঁদের কবরে নড়েচড়ে বসবেন। জন নকস, যিনি রোমের গির্জাকে কলঙ্কিনী বেশ্যা বলে প্রচণ্ড ঘৃণ্য সমালোচনা করেছেন, তিনিও হিন্দুধর্মের প্রতি আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গিরণের মতো আম্বেদকরের এই আক্রমণের কাছে ম্লান হয়ে যাবেন।

সম্মেলন এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, তাঁরা ব্যাপক আকারে একসঙ্গে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এবং তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে মাহার সম্প্রদায়কে সেই থেকে হিন্দুদের দেবদেবীপূজা, হিন্দু-উৎসব এবং হিন্দু-তীর্থদর্শন বন্ধ করতে অনুরোধ করা হয়।

সম্মেলনের পরে পরেই সেই প্যাঙেলে আম্বেদকর মাহার সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের কাছে বক্তৃতা দেন এবং সন্ন্যাসীরাও হিন্দুধর্ম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এটা আম্বেদকরের এমন একটা শক্তিশালী আবেদন যে, সন্ন্যাসীরাও পূর্বপুরুষের ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে তৈরি, এ কথা বোঝাতে হিন্দুধর্মের চিহ্ন স্বরূপ তাঁদের সমস্ত জিনিস আগুনে পুড়িয়ে দেন।

এর কিছুদিন আগে আম্বেদকর তাঁর ছেলে ও ভাইপোকে অমৃতসরে গুরুদ্বার মন্দিরে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা সেখানে দেড়মাস ধরে শিখদের উষ্ণ আদরযত্নে কাটান। শিখরা আশান্বিত হয়ে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন।

দলিত শ্রেণির নেতারা ওই ঘোষণার পুনরায় উল্লেখ করায় বিভিন্ন ধর্মের নেতারা আম্বেদকরকে তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করে সাম্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। সম্ভবত নিজামকে পিছনে রেখে কয়েকজন মুসলিম নেতা আম্বেদকরকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁরা বম্বেতে আম্বেদকরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে আম্বেদকর সারাদিন মোটরগাড়িতে শহরে ঘুরে কাটিয়ে তাঁদের প্রলোভন থেকে দূরে থাকার জন্য সাভ নামে মাহাদের কাছে উষ্ণ ঝরনাওয়ালা এক গ্রামে গিয়ে তাঁদের এড়িয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও তিনি বম্বের একটি মুসলিম হাইস্কুলে ওই দলের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু গলাব্যথার অজুহাতে কোনো বক্তৃতা করেননি, শুধু মুসলিম বক্তাদের বক্তৃতা শুনেছিলেন।

বৌদ্ধরাও তাঁদের নিজেদের মতো তাঁকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মিশনারির 'লোকনাথ বৌদ্ধ মিশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ইটালিয়ান সন্ন্যাসী রেভারেণ্ড লোকনাথ, ১৯৩৬ সালের ১০ জুন দাদারে আম্বেদকরের বাসভবনে আসেন। তিনি

লম্বা ঢিলা পোশাক পরিহিত পুরোহিতের বেশে ভিক্ষাপাত্র ও ছাতা হাতে আম্বেদকরের সাথে দেখা করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে সম্মত করার চেষ্টা করেন। আম্বেদকরের সাথে কথাবার্তার পর ওই সন্ন্যাসী সংবাদ মাধ্যমের কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, দলিত শ্রেণির নেতা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট বলেই তাঁর মনে হয়েছে এবং প্রশ্নটি তিনি সযত্নে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, তবে সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর দেননি। ওই ইটালিয়ান সন্ন্যাসীর আসল নাম স্যালভ্যাটোর। তিনি বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস, আম্বেদকর তাঁর মতাদর্শ গ্রহণ করবেন এবং তাঁর লক্ষ্য সমস্ত হরিজনদের তিনি বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করবেন। তারপর সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে সিংহলে চলে যান।

ইতিমধ্যে আম্বেদকর তাঁর বিভিন্ন প্রদেশের সহকর্মীদের সাথে ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য সঠিক ধর্ম বাছাই করা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সে সময় শিখধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। তাঁর বন্ধু ও কর্মীবৃন্দ অনুভব করেন যে, শিখধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে হিন্দু সভার নেতাদের সমর্থন পাওয়া জরুরি। কেননা, হিন্দু সভার নেতারা শিখধর্মকে বিদেশি ধর্ম বলে ভাবেন না। হিন্দুধর্ম থেকে উৎপত্তি হওয়ায় শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ হয়ে থাকে এবং শিখেরা হিন্দুমহাসভার সদস্যও হতে পারেন।

সেই অনুসারে হিন্দুমহাসভার প্রবক্তা ডঃ মুঞ্জেকে বম্বেতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৩৫ সালের ১৮ জুন সন্ধে সাড়ে সাতটায় রাজগৃহে আম্বেদকর তাঁর দুই বন্ধুর সাক্ষাতে ডঃ মুঞ্জের সাথে কথাবার্তা বলেন। আম্বেদকর সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করে ডঃ মুঞ্জের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেন। পরদিন আম্বেদকরের মতামত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি আকারে দেওয়া হলে ডঃ মুঞ্জে ব্যক্তিগতভাবে তা সমর্থন করেন। এই বিষয়টি ডঃ এম.আর. জয়াকর ও ডঃ এন.ডি. সাভারকারের সঙ্গে আলোচনা শেষে ডঃ মুঞ্জে ২২ জুন অস্পৃশ্য হিন্দুদের শিখধর্ম গ্রহণ ব্যাপারে হিন্দু নেতাদের অনুমোদন লাভের জন্য বম্বে ত্যাগ করেন। তিনি আম্বেদকরের বিবৃতির একটি কপি হিন্দুসভার বিভিন্ন নেতাদের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান। তাঁদের মধ্যে লিখিতভাবে যাঁরা সমর্থন জানান তাঁরা হলেনÑ ডঃ এম.আর. জয়াকর, শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা, স্যার সি. বিজয়ারাঘবাচারিয়া এবং রাজা নরেন্দ্রনাথ। যে হরিজন-নেতা এম.সি. রাজার সঙ্গে তাঁর ১৯৩২ সালে চুক্তি হয়েছিল, ডঃ মুঞ্জে তাঁকে চিঠি লিখলেন। রাজা ভাবলেন যে, ডঃ আম্বেদকরকে হারাবার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। তিনি গান্ধি, রাজাজি এবং মালব্যের কাছে এ বিষয়ে নির্দেশ চেয়ে চিঠি লিখলেন।

এই সময় পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বলেন যে, হরিজনেরা দু'ভাবেই সুবিধা পেতে পারেন না। হয় তাঁরা হিন্দু থেকে পুণাচুক্তির সুবিধা ভোগ করবেন, আর না হয় হিন্দুত্ব বর্জন করে ওইসব সুবিধা ত্যাগ করবেন। উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, এটা

তাঁকে এবং তাঁর দলকে দমনের ভয় দেখিয়ে আগামী নির্বাচন থেকে বাইরে রাখা এবং দমননীতি দ্বারা তাঁকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে জোর করে হিন্দুর খোঁয়াড়ে আটকে রাখার কংগ্রেসিদের কৌশল। তিনি যুক্তি দেখান যে, দলিত শ্রেণি যে আসন লাভ করেছেন, তা হিন্দুর কোটা থেকে নয়, পেয়েছেন সাধারণ কোটা থেকে এবং অস্পৃশ্যরা দলিত শ্রেণিভুক্ত হয়েছেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা কার্যত অন্যধর্ম গ্রহণ করছেন বা ঘোষণা করছেন যে, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা হারিয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা ধর্ম ত্যাগ করেছেন এমন ধরে নেওয়াও ঠিক নয়। তিনি বলেন, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের আচরণ নেতিবাচক হলেও অন্য কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি তাঁর ঝোঁক সুস্পষ্ট নয়। এখনও তাঁকে একজন বিধিবদ্ধ হিন্দু হিসাবে ধরা উচিত।

গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং আম্বেদকরের বিতর্ক প্রসঙ্গে 'সানডে স্টেটসম্যান' মন্তব্য করে যে, ডঃ আম্বেদকর সাংবিধানিক আইনজ্ঞ হিসাবে ছেলেমানুষ নন, এ বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞই। সাপ্তাহিকটি মন্তব্য করে, কোনো একটি বিষয়ে হয়তো তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে উন্নত মেধা আছে এবং ওই বিষয়ে যুক্তি দেখাতেও তিনি তৈরি আছেন। সংবাদপত্রটি এই বলে মত প্রকাশ করে, "যদি তপশিলি জাতি 'সাধারণ' বলে গণ্য কোনো ধর্মে (বৌদ্ধ, জৈন বা অন্য) ধর্মান্তরিত হন, তাহলে সংরক্ষিত আসন বা দ্বৈত নির্বাচন চলে যাবে বটে, কিন্তু তাঁরা ওই শ্রেণির অন্য প্রার্থীদের মতো সমান সুবিধা পাবেন। পক্ষান্তরে তাঁরা যদি মুসলিম, খ্রিস্টান বা পাঞ্জাবের শিখ হন, যাঁদের সম্প্রদায় ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত আছে, তাঁরা আর 'সাধারণ' আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণে, সম্প্রদায় ভিত্তিক অনুপাতে অসঙ্গতি দেখা দেবে, সেক্ষেত্রে পুনরায় আলোচনা সাপেক্ষে তা সংশোধন করতে হবে। অবশ্য শুধু হিন্দুধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণাতে (যা প্রকৃত ধর্মান্তর থেকে আলাদা) কোনো অযোগ্যতার প্রমাণ হবে না। ডঃ এখানে ঠিকই আছেন।"

ইতিমধ্যে গান্ধি, মালব্য ও গোপালাচারি আম্বেদকর ও ডঃ মুঞ্জের আন্দোলনের বিরোধিতা করে রাজাকে চিঠির উত্তর দিয়েছেন। ডঃ মুঞ্জে রাজাকে সরল বিশ্বাসে লিখেছিলেন। কিন্তু তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য গান্ধি রাজাকে চাপ দেন। গান্ধি ডঃ মুঞ্জের কাছে তাঁর ও রাজার মধ্যে যে যোগাযোগ হয়েছিল তা প্রকাশের জন্য সম্মতি চেয়ে চিঠি লেখেন। কিন্তু ডঃ মুঞ্জে হিন্দুসভার নেতাদের সম্মতির জন্য নানা জায়গায় ঘুরছিলেন, এজন্য চিঠি যথাসময়ে তাঁর কাছে পৌঁছোয়নি। রাজাকে দিয়ে গোপন যোগাযোগ প্রকাশ্যে আনার চেষ্টায় বোঝা যায়, গান্ধির উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। রাজার অসন্তুষ্টির সুযোগ নিয়ে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং সরকারকে আম্বেদকরের বিরুদ্ধে

ক্ষেপিয়ে তোলা এবং তাঁর লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেন গান্ধি। সে জন্যই ডঃ মুঞ্জের বিনা অনুমতিতে রাজা সমস্ত যোগাযোগের কাগজপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দেন।

ডঃ মুঞ্জে তাঁর প্রস্তাবে বলেন, ডঃ আম্বেদকর যদি কথা দেন যে, তিনি ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের চেয়ে শিখধর্ম গ্রহণ বেশি পছন্দ করেন, দলিত শ্রেণির ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার যে প্রচেষ্টা মুসলিমরা শুরু করেছে, তাতে বাধা দেবার লক্ষ্যে শিখ ও হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং হিন্দু-সংস্কৃতি প্রচার করবেন ও তার মধ্যে থাকবেন, তাহলে দলিত শ্রেণির শিখধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় হিন্দুসভার কোনো আপত্তি থাকবে না এবং নবদীক্ষিত শিখরা পুনাচুক্তির ভিত্তিতে তপশিলি জাতির সুযোগ পাবেন।

ডঃ মুঞ্জে রাজার কাছে লেখা চিঠিতে আম্বেদকরের যে বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছে যে, যদিও ইসলাম দলিত শ্রেণির প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সাহায্য দেবে, যদিও খ্রিস্টানদের বিপুল অর্থের সংস্থান আছেÑ যা আসবে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং এর পিছনে থাকা এক খ্রিস্টীয় সরকারের কাছ থেকে এবং যদিও শিখদের তেমন আকর্ষণীয় শক্তি সামান্যই, যা দলিত শ্রেণির আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে ইসলাম এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় কোনো সাহায্যে আসবে না, তবুও তিনি হিন্দুদের স্বার্থে শিখধর্মই বেশি পছন্দ করেন এবং বলেন, হিন্দুদের কর্তব্য হচ্ছে এই নবদীক্ষিত শিখদের রাজনৈতিক ও আর্থিক অসুবিধা দূর করা।

শিখধর্ম কেন পছন্দ করেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়ে আম্বেদকর বলেনÑ "হিন্দুদের দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছিÑ ইসলাম, খ্রিস্ট ও শিখধর্মÑ এর কোনটি শ্রেষ্ঠ? পরিষ্কারভাবে বলছি, শিখধর্ম শ্রেষ্ঠ। যদি দলিত শ্রেণি ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তবে তাঁরা শুধু হিন্দুধর্মের বাইরেই যাবেন না, তাঁরা যাবেন হিন্দুকৃষ্টিরও বাইরে। আর যদি তাঁরা শিখধর্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা হিন্দুকৃষ্টির মধ্যেই থাকবেন। এটা হিন্দুদের পক্ষে কম সুবিধা নয়।"

তিনি বলে চলেন, "এই ধর্মান্তরে দেশের উপর যে প্রভাব পড়তে পারে তা মনে রাখা দরকার। ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে দলিত শ্রেণি জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাবেন। যদি তাঁরা ইসলামধর্মে যান, তাহলে মুসলিমদের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে এবং মুসলিম প্রাধান্যের বিপদ বাড়বে। যদি তাঁরা খ্রিস্টান হন, তাহলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা হবে পাঁচ থেকে ছ'কোটি। তাতে ব্রিটিশ রাজত্বকে শক্তিশালী করা হবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁরা শিখধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁরা দেশের ক্ষতি তো করবেনই না, দেশের উন্নতিই করবেন। তাঁরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাবেন না। তাঁরা দেশের রাজনৈতিক উন্নতির সহায়ক হবেন। সুতরাং দলিত শ্রেণি যদি ধর্ম পরিবর্তন করেন, দেশের স্বার্থে তাঁদের

শিখধর্ম গ্রহণ করাই উচিত।” এই কথাগুলি কি ভারতমাতার এক মহান, জ্ঞানী ও খাঁটি সন্তানের কথা নয়?

ডঃ মুঞ্জের চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে রাজা মন্তব্য করেন, “আমরা একটি সুস্থ সবল জাতি হিসাবে, আমাদের মতো করে প্রগতির পথে চলে বেঁচে থাকতে চাই। হিন্দু হিসাবে আমাদের জন্মগত অধিকার ছেড়ে দিয়ে নয়, হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই আমরা, শুধু আমাদের জন্য নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও গ্রহণযোগ্য অবস্থায় হিন্দুধর্মকে পরিবর্তন করে এ কাজ ভালোভাবে করতে পারি। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায় আমরা কারও দাবাখেলার ঘুঁটি হতে চাই না।”

আম্বেদকর ও মুঞ্জের এই আন্দোলনকে রাজা গোপালাচারী নির্মম বলে বর্ণনা করেন। তিনিই আবার সাত বছর পরে তার বহুগুণ নির্মম ভারত ভাগের প্রস্তাব দেন। গান্ধি রাজার মতামত অনুমোদন করে বলেন যে, অস্পৃশ্যতা বিলোপের প্রশ্নটি তার নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে। এরকম একটা ধর্মীয় ব্যাপারে কখনও ব্যবসায়িক লেনদেন হতে পারে না।

এইসব অভিযোগের উত্তরে আম্বেদকর বলেন, ডঃ মুঞ্জের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করতে গেলে তাঁর বিনা অনুমতিতে রাজার কখনও উচিত হয়নি সেটি সংবাদসংস্থার হাতে দেওয়া। রাজা যদি আধ্যাত্মিক তৃপ্তি ছাড়া অন্য কিছু না চান, তাহলে কেন তিনি এমন একটি বস্তুগত ও পার্থিব ব্যাপারে আইনসভায় আসন সংরক্ষণের জন্য চাপ দিয়ে হিন্দু থাকতে ও হিন্দু হয়ে মরতে চান?

গান্ধি ও মালব্যের মতামত সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন, যেহেতু তাঁরা দলিত শ্রেণির উন্নতির ব্যাপারে পুনাচুক্তিতে যে কথা দিয়েছিলেন তা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেজন্য তাঁদের অভিযোগ করারও কোনো অধিকার নেই। গান্ধির বক্তব্যকে রহস্যপূর্ণ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, গান্ধির মুখে সমস্যাটিকে এখন ব্যবসায়িক লেনদেন হতে পারে না বলাটা মোটেই শোভা পায় না। কারণ, গান্ধি পুনাচুক্তির সময় সমস্ত ব্যাপারটিকে ব্যবসায়িক লেনদেনেই পরিণত করেছিলেন। গোপালাচারীর বিবৃতি প্রসঙ্গে আম্বেদকর বলেন, যে সমস্ত হিন্দুরা তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য গভীরভাবে চিন্তিত, তাঁরা গোপালাচারীর বিবৃতির সততায়ও সন্দেহ করতে শুরু করবেন।

আম্বেদকর তাঁর বিবৃতির শেষ অংশে বলেনÑ “শিখধর্মে ধর্মান্তর আন্দোলন, শঙ্করাচার্য ডঃ কুর্তকোটি সহ আরও বহু বিখ্যাত হিন্দু সমর্থন করেছেন। আসলে, যাঁরা এই ব্যাপারে আগ্রহী তাঁরা আমাকে চাপ দিচ্ছেন। আমি দুইয়ের মধ্যে একটিকে এই জন্য বেছে নিতে চাই যে, আমি হিন্দুধর্মের ভাগ্য সম্পর্কে দায়িত্ব অনুভব করছি।”

ডঃ মুঞ্জে এবং ডঃ কুর্তকোটি আম্বেদকরের দলিত শ্রেণির শিখধর্ম গ্রহণ করার

প্রস্তাবে সবচেয়ে কম ক্ষতি বলে মনে করেন। কারণ সমস্ত অতীত ও বর্তমান মহান হিন্দু নেতাদের মতো তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, শিখধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখা এবং হিন্দুধর্মের নীতি ও কৃষ্টি তাতে বর্তমান।

আম্বেদকর জানতেন যে, হিন্দুদের এই ধর্মান্তর গ্রহণে হিন্দুস্তানে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হবে। ধর্মান্তরিত হিন্দুরাই এদেশে অতীতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। এই আন্দোলনের ছ'বছর পরে জিন্নাহ্ লুই ফিসারকে বলেছিলেন যে, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ভারতীয় মুসলিমই পূর্ববর্তী হিন্দু, মুসলিমদের দ্বারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। জহরলাল নেহরু ধর্মনিরপেক্ষতার অহংকারে ওই সংখ্যা শতকরা পঁচানব্বইজন প্রমাণ করেন। সেজন্যই আম্বেদকরের ওই ঘোষণা চেতনাসম্পন্ন হিন্দু নেতাদের কাছে একটি বজ্রপাতের মতো। তাঁরা এটা উপলব্ধি করেন যে, হিন্দুরা যে আত্মঘাতী ও অমানবিক ব্যবহার অস্পৃশ্যদের সাথে করছেন, তার ফলেই তাঁদের জাতীয় শক্তি নষ্ট হচ্ছে।

যে হিন্দুদের শক্তি ও সমর্থনে কংগ্রেসিরা উন্নতি লাভ করেছে, সেই হিন্দুদের ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতাদের উপেক্ষার ফলে পাঞ্জাব, আসাম ও ত্রিবাঙ্কুরে কী ঘটছে তা জানা যাবে নিচের বর্ণনায়। তখন এটা পরিষ্কার হবে যে, শিবাজী, দয়ানন্দ, পরমানন্দ ও সাভারকরের মতো হিন্দু বীরেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বীয় সমাজে ফিরিয়ে এনে ভারতে জাতীয়তা বিহীনদের সংখ্যা বেড়ে চলাটা বন্ধ করা যায়। এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, কেন ডঃ মুঞ্জে ও ডঃ কুর্তকোটি শঙ্কারাচার্য হিন্দুভারতের বিপদাশঙ্কায় বাধা দেওয়ার জন্য আম্বেদকরের পিছু পিছু ছুটেছিলেন।

১৯০১ সালে আসামে জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে হিন্দু ছিল ৫,৫৭৮ জন, মুসলিম ২,৬৮৯ জন এবং খ্রিস্টান ২৩ জন। ১৯৪১ সালে হিন্দুর সংখ্যা কমে হলো ৪,১২৯, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩,৩৭৩ জন এবং খ্রিস্টান বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৫ জন। পাঞ্জাবে অমুসলিমদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৩ জন এবং মুসলিম ছিল শতকরা ৪৭ জন। ১৯৪১ সালে অমুসলিম সংখ্যা কমে হয় শতকরা ৪৭ জন এবং মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে হয় শতকরা ৫৩ জন। ১৯২০ সালে ত্রিবাঙ্কুরে হিন্দু ছিল শতকরা ৮৩ জন, খ্রিস্টান ছিল শতকরা ১২.৪ জন। ১৯৪১ সালে হিন্দুর সংখ্যা কমে হয় শতকরা ৬০.৫ জন আর খ্রিস্টান বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২.৩ জন।

আরও বেশি সংখ্যক দলিত শ্রেণির লোকদেরকে কী করে খ্রিস্টধর্মে আনা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা শেষে গডফ্রে এডওয়ার্ড ফিলিপস তাঁর 'Untouchables'

Quest' বই-এ বলেছেন যে, ভারতীয় গির্জার কমপক্ষে শতকরা ৭০ টি দলিত শ্রেণির দ্বারা তৈরি। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ১৯৩১ সালে শেষ হওয়া দশকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটা স্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখিয়েছিলেন প্রতি মাসে ৫,০০০ জন। সেখানে গ্রামাঞ্চলে ধর্মান্তরের মাধ্যমে প্রতি মাসে বৃদ্ধি পেয়ে ৭,০০০ জন হয়েছিল।

হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার দায়িত্ব ছিল পুরুষানুক্রমে মুসলিম নেতাদের হাতে। এজন্য আদমশুমারিতে অস্পৃশ্যদের হিন্দু তালিকার মধ্যে রাখতে মুসলিমরা আপত্তি তুলেছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি কংগ্রেস সভাপতির পদে থেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, অস্পৃশ্যদের হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোক।

আম্বেদকরের গবেষণাগ্রন্থ 'জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি' (Annihilation of Caste) সারাদেশে তখন সমালোচিত, প্রশংসিত এবং আক্রান্তও হচ্ছে। প্রায় সমস্ত চিন্তাশীল ও সক্রিয় নেতারাই তাঁদের নিজস্ব মতে আম্বেদকরের প্রশ্নের জবাব দেন। জাতি বিলোপ সম্পর্কে ওই একই মতবাদী সাভারকারের কাছ থেকেও একটি উত্তর এসেছিল। কিন্তু 'হিন্দুদের জীবন চিরদিন পরাজয়ের জীবন', আম্বেদকরের এই কথায় আপত্তি তুলে তিনি ইতিহাস থেকে হিন্দুদের গৌরবজনক অধ্যায় দেখান। গান্ধি রাজার কাছে চিঠির মাধ্যমে ধর্মান্তরে আপত্তি করে আম্বেদকরের প্রবন্ধের উত্তর দেন। 'ডঃ আম্বেদকরের অভিযোগ' (Dr. Ambedkar's Indictment) নাম দিয়ে গান্ধি তাঁর দু'টি রচনায় সামান্য প্রশংসাসূচক কথায় শুরু করে শত্রুকে ধিক্কার জানানোর অসাধারণ কায়দায় বলেন যে, ভবিষ্যতে আম্বেদকর ধর্মের যে মোড়কই লাগান না কেন, তিনি কখনও নিজেকে বিস্মৃত হতে দেবেন না। আম্বেদকর হচ্ছেন হিন্দুধর্মের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বর্ণব্যবস্থা হিন্দুদের তাঁর পূর্বপুরুষের পেশায় লেগে থাকতে শিক্ষা দেয়। যদি আম্বেদকরের মত মেনে নেওয়া হয়, তবে প্রত্যেক পরিচিত ধর্মই ব্যর্থ হবে। গান্ধি শেষে বলেন যে, চৈতন্য, দয়ানন্দ, তুকারাম, তিরুভাল্লুভার, রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য যে সমস্ত সাধককে হিন্দুধর্ম জন্ম দিয়েছে, সেই ধর্ম আম্বেদকরের লেখা অনুযায়ী মেধাহীন বলা যায় না।

উত্তরে আম্বেদকর গান্ধির প্রতি করুণা প্রকাশ করে বলেন যে, নিজেকে প্রচার করতে ভালবাসেন বলেই তাঁর এই দোষারোপ। ওই সমস্ত মহাত্মার মতো যাঁরা কাঁচের ঘরে বাস করেন, তাঁদের তাঁর প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারা উচিত নয়। তিনি বলেন, চতুবর্ণ ও স্বাভাবিক নিপুণতার পরিবর্তে পিতৃপেশার অনুসরণ Ñ এই গান্ধি-আদর্শের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। কড়া জবাবে তিনি বলেন, শাস্ত্রীয় আইন অনুসারে গান্ধির উচিত ছিল দাড়িপাল্লাকে পছন্দ করা, আধা-সন্ন্যাসী আধা-রাজনীতিক হওয়া তাঁর উচিত হয়নি। গান্ধি যে সাধুদের তালিকা দিয়েছেন, তাঁরা কখনও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেননি। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁদের পবিত্র জীবন ও

উপদেশ সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেনি। তিনি গান্ধিকে জিজ্ঞাসা করেন, ভালো লোকের সংখ্যা এত কম এবং মন্দ লোকের সংখ্যা এত বেশি কেন? হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁর বিবাদের কারণ তাঁদের সামাজিক অসম্পূর্ণতার জন্য নয়, তাঁদের আদর্শ সম্পর্কে, যা তাঁর মতে ভুল।

গান্ধি ও অন্যান্যদের আপত্তি সত্ত্বেও আম্বেদকর ধর্মান্তর আন্দোলনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৩৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর অনুগামীদের তেরোজনের একটি দলকে শিখধর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য অমৃতসরে শিখমিশনের কাছে পাঠান। তাঁদের কেউই তেমন বিদ্বান বা প্রথম শ্রেণির আম্বেদকরপন্থী ছিলেন না। অমৃতসরে পৌঁছাবার পরেই তাঁদের একজনের কাছে আম্বেদকর চিঠি লিখে তাঁদের উৎসাহিত করে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, তাঁরাই হচ্ছেন ধর্মান্তর আন্দোলনের অগ্রবর্তী সৈনিক এবং তিনি তাঁদের সাফল্য কামনা করেন, কিন্তু তাঁদের শিখধর্ম গ্রহণ করতে বলেননি। এই সময় আম্বেদকর শিখমিশন ও তার নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তখন দলিত শ্রেণি শিখধর্ম গ্রহণ করবেন আশা করে তাঁদের স্বার্থে বম্বেতে মিশন কর্তৃক একটি কলেজ স্থাপনের বিষয় উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া হয়। তখন গুজব রটে যে, আম্বেদকর হবেন ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও পরিচালক। অত্যধিক উৎসাহে সেই অগ্রবর্তী সৈনিকেরা শিখধর্ম গ্রহণ করেন, যেটা তাঁদের নেতা করতে বলেননি। বম্বেতে তাঁদের নিরুত্তাপ স্বাগত জানানো হয়, পরে তাঁরা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটি নতুন দল

১৯৩৬ সাল শেষ হতে চলেছে, ১৯৩৫ সালের ভারতীয় আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন শুরু হবে। আসন্ন নির্বাচনে মানুষের মধ্যে অত্যধিক উৎসাহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব তৈরি হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রত্যেকটি দলই তৈরি হতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওই উদ্দেশ্যে আম্বেদকরও তাঁর পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করেন। সহকর্মীদের সাথে আলোচনা শেষে তিনি ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে 'ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভূমিহীন, গরিব প্রজা, কৃষক ও শ্রমিকদের আশু প্রয়োজনীয় চাহিদা ও ক্ষোভের যথাযোগ্য প্রতিকারের জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচি তৈরি করেন।

ওই কর্মসূচিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হয় ঃÑ

যদিও এই দল মনে করে যে, নতুন সংবিধান দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সক্ষম হবে না, তবুও সে সংবিধান অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই দল মনে করে যে, জমিকে বহু ভাগে টুকরো করা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিই হচ্ছে কৃষকদের গরিবির কারণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে পুরোনো শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও নতুন শিল্প গড়ে তোলা। জনগণের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ওই দল কারিগরি শিক্ষার এক ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং যেখানে প্রয়োজন হবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্প গড়া হবে। ইস্তেহারের মাধ্যমে দল প্রতিশ্রুতি দেয় যে, জমিদারদের দ্বারা খাজনা আদায় ও জমি থেকে উচ্ছেদ করার হাত থেকে কৃষক প্রজাদের রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে এবং কারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের সুযোগসুবিধার মতো আইন পরিবর্তন করে কৃষকদেরও তা পাইয়ে দেবে।

শিল্প-শ্রমিকদের উপকারের জন্য নিয়োগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, কারখানার কর্মীদের বরখাস্ত ও পদোন্নতি, কাজের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ, যথাযোগ্য বেতন নির্ধারণ, সবেতন ছুটি এবং শ্রমিকদের সস্তায় স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে দল আইন প্রণয়ন করবে। ভূমি-ব্যবস্থাপনার দ্বারা বেকারত্বের অবসান করা হবে। শিল্পাঞ্চল ও বড়ো শহরগুলিতে বাড়িভাড়ার ব্যাপারে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দেয় এই দল।

এই দল সমাজসংস্কারের জন্য সমাজসংস্কারকদের সাহায্য করার এবং গোঁড়ামি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে শাস্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই দল চ্যারিটি ফাণ্ডের

উদ্বৃত্ত অর্থ শিক্ষার মতো ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে খরচ করার প্রস্তাব দেয়। এই দল গ্রামীন প্রকল্পে স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও আধুনিক সৌন্দর্যযুক্ত গৃহনির্মাণের প্রস্তাব দেয়। এই দল হলঘর, লাইব্রেরি এবং ভ্রাম্যমান সিনেমায় গ্রাম সাজানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে।

এই কর্মসূচি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা বলে যে, যদিও বহু রাজনৈতিক দলের তারা বিরোধী, তথাপি আম্বেদকর প্রদেশে যে নতুন দল গঠন করেছেন, মানুষের জীবন উন্নয়নে ও ভবিষ্যৎ দেশগঠনে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলে যে, সমাজবাদীদের সহযোগিতায় কম্যুনিজমের প্রবল ধারাকে বাধা দেওয়ার জন্য এই দলের প্রয়োজন ও সুযোগ আছে। "এটা যদি বিশেষ ও আংশিক নির্বাচন না হতো, তাহলে এই নতুন দল অল্পদিনের মধ্যে দেশে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হত।"

নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হলে ১৯৩৬ সালের ১১ নভেম্বর, বুধবার আম্বেদকর ইটালিয়ান জাহাজে বায়ুপরিবর্তনের জন্য জেনেভা যাত্রা করেন। আসলে তাঁর অন্তর্নিহিত ইচ্ছা লণ্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের সাথে আলোচনা করা, যদি দলিত শ্রেণি শিখধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁদের নতুন সংবিধানে দেওয়া রক্ষাকবচ তাঁরা পাবেন কিনা।

বিদায়ের প্রাক্কালে 'টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া'-র প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, কংগ্রেস হচ্ছে শোষক ও শোষিতের সমন্বয়ে গঠিত দল, যা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজন হলেও সমাজ সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

তাঁর দল সম্পর্কে তিনি বলেন, এই দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করবে, তাঁদের মধ্যে সঠিক আদর্শ তুলে ধরবে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁদের রাজনৈতিক চেতনায় সংগঠিত করবে। অধিকাংশ নেতারাই তাঁকে বিদায় জানাবার সময় উপস্থিত ছিলেন।

আম্বেদকরের ধর্মান্তর গ্রহণের হুমকিতে, বহু শতাব্দী ধরে বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্য হিন্দুদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করে আসছেন, তাতে তাঁদের সামাজিক বিবেক জাগ্রত করে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভারত তখন অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। কিছুদিন আগে মহীশূরের রাজ্যসরকার ইতিহাসে এই প্রথম ঘোষণা করে যে, হরিজনেরা 'দশরা দরবার' উৎসবে যোগ দেবেন। এর পর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে মন্দির-প্রবেশের একটি ঘোষণায় রাজ্যপরিচালিত ১,৬০০ মন্দির দলিত শ্রেণির কাছে খুলে দেওয়া হয়। এর ফলে হিন্দুস্তান ও হিন্দুধর্মে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ভারতীয় সংবাদসংস্থা টেলিফোনে মহারাজার সাহস ও জ্ঞানের গুণগান করে এবং এই মহান ঘটনার পিছনে থাকা স্যার সি.পি.রামস্বামী আয়ারের

রাজনীতিজ্ঞানেরও প্রশংসা করে। ‘ম্যাঞ্চেস্টার গার্জিয়ান’ আয়ারের এই অবদানের উচ্চ মূল্যায়ণ করে এবং তাকে গণতান্ত্রিক সংস্কার বলে অভিহিত করে। এম.সি. রাজা বলেন, ওই ঘোষণা দ্বারা পুণাচুক্তির বাস্তবায়ন প্রকাশ পাচ্ছে। মাদ্রাজের ‘দি হিন্দু’ পত্রিকা তাকে একটা সাহসী পদক্ষেপ ও জ্ঞানী রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় বলে আখ্যা দেয়।

তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহরু, হিন্দুরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হোক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে থাকুক এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না; শুধূমাত্র মঠ-মন্দিরগুলি দুই বা তিন প্রজন্ম ধরে ঘিরে রাখলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভাবতেন। তিনিও এই ঘটনায় বিচলিত হন। এই ঘোষণা সম্পর্কে তিনি বলেন, যদিও তিনি বিশ্বাস করেন যে, সমস্ত প্রশ্নটির মূলে রয়েছে ভূমিহীনদের অর্থনৈতিক সমস্যা, তবুও এই ঘোষণায় সৃষ্ট দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল ওই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে। হিন্দু মহাসভা ত্রিবাঙ্কুরের রাজা যে মহৎ উদাহরণ দেখিয়েছেন তা অনুসরণ করার জন্য গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের শাসকদের কাছেও আবেদন রাখে।

‘বম্বে ক্রনিকল’ পত্রিকাও স্বীকার করে যে, ওই ঘোষণা ধর্মান্তর ঘোষণার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়। ‘হিন্দু হেরাল্ড’-এর মতো সংবাদপত্রও বলে যে, যদি ওই ঘোষণা স্বতঃপ্রণোদিতই হতো, তবে তা আরও আগেই ঘোষিত হতো। এই পত্রিকা দলিত শ্রেণির লাগাতার সংগ্রাম ও ওই চরম ঘোষণাকেই সফলতার কারণ হিসাবে বর্ণনা করে। **বাস্তবিকই হিন্দু রাজার ওই মহত্ত্ব ফলপ্রসূ হয়েছিল আম্বেদকরের চাপের কারণে; এটা তাঁর হুমকিরই ফল। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি তাঁর যশ ও নামটি এড়িয়ে যায়।**

আম্বেদকরের নিজের কথায়, তিনি ইউরোপে যান শুধু স্বাস্থ্যের জন্য এবং ভিয়েনা ও বার্লিনেই বেশি সময় কাটান। তিনি লণ্ডনে মাত্র এক সপ্তাহ ছিলেন। যখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন সেই সময় “বিবিধ বৃত্ত” নামে একটি শ্রেষ্ঠ মারাঠি সাপ্তাহিকের প্রতিনিধি খবর পাঠান যে, আম্বেদকর একজন ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁকে নিয়ে ১৯৩৭ সালের ১৪ জানুয়ারি ভারতে আসছেন। আম্বেদকরের সাথে সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকায় বোঝা যায়নি যে, ওটা সাংবাদিকতা জগতের একটি চমক মাত্র। একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদের বিয়ের খবর বিশ্বসংবাদপত্রে উল্লাসের সৃষ্টি করে। একটি গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, একজন ইংরেজ মহিলা আম্বেদকরের বিশাল ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন।

১৯৩৭ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি বম্বে ফেরেন। নামার সময়ই এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিয়ে করেছেন কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ওই গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন যে, তাঁর গোপনে বিয়ে করার কোনো কারণ নেই। তিনি

বলেন, লণ্ডনেকারও সাথে তাঁর কোনো রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার হয়নি। ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল আছেন, কিন্তু কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন তা ঠিক করেননি। তাঁর সেই মুহূর্তের চিন্তাভাবনা ছিল বম্বে আইনসভার নির্বাচনকে নিয়ে।

পিয়ারে যথারীতি তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁর ইউরোপীয় স্ত্রীকে দেখার জন্য এক বিশাল জনতা সমগ্র পথ জুড়ে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বাবাসাহেবকে একা দেখে বিস্মিত হন।

তখন ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড-এর বিয়ের ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যার জন্য বিশেষ বিব্রত ছিলেন। তাঁদের পক্ষে দলিত শ্রেণির শিখধর্ম গ্রহণের মতো পুরোনো খবর নিয়ে চিন্তা করার সময় ছিল না। তাঁরা আম্বেদকরকে বলেছেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের সময় তাঁদের মতো করে তাঁরা দলিত শেণির নেতার উপস্থাপিত সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট শুনেছেন ও ন্যায় বিচার করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁদের আর কিছু করার নেই। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সাথে দেখা করার আগে আম্বেদকর জার্মান ও ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত জুরিদের সাথে আলোচনা করেন যে, দলিত শ্রেণির শিখধর্ম গ্রহণের পরে প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁদের আসন সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকবে কিনা, কারণ শিখদের জন্য আসন সংরক্ষণ কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই মঞ্জুর করা হয়েছে। পরবর্তীকালে শিখমিশনের কর্তৃপক্ষ ও আম্বেদকর এই সমস্যার সমাধান করতে না পেরে পরস্পর দূরে সরে যান।

আম্বেদকর সত্বর তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। আর মাত্র একমাস পরে নির্বাচন। তাঁর নতুন দলকে দেশের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। সেই দল জনবল, অর্থবল ও দেশপ্রেমে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল।

আম্বেদকর নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। তাঁর নতুন ভূমিকা সম্পর্কে জনগণকে বোঝাতে হবে। কেন তিনি একটি নতুন দল গঠন করেছেন? তাঁর নিজের উত্তর হচ্ছে Ñ প্রাদেশিক আইনসভায় ১৭৫ টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৫ টি আসন সংরক্ষিত। এটা পরিষ্কার যে ১৫ জন সদস্যের শক্তি বিরোধিতা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং যে বর্ণহিন্দু সহকর্মীরা বিপদে-আপদে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সাথে আলোচনা করে সাধারণ আসনে কিছু প্রার্থী দেবেন বলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন। তাতে দু'টি উদ্দেশ্য পূরণ হবে, তাঁর কর্মীদের শুভেচ্ছা রক্ষা করা হবে ও সাধারণ নির্বাচনে যেখানে বর্ণহিন্দুর শক্তি দলিত শ্রেণির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেখানে তাঁর প্রার্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং শেষ পর্যন্ত তাতে তাঁর বেশি আসন লাভ হবে। এ ছাড়া তিনি

কয়েকজন নির্দল প্রার্থীকেও সমর্থন করেন। এইভাবে দলের একটা বিশাল ভিত্তি ও অধিকতর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আম্বেদকর বম্বে প্রদেশের সমস্ত জেলায়ই ঘোরেন। তিনি নাসিক, আহ্‌মেদনগর, খান্দেশ এবং শোলাপুর, সাতারা ও বেলগাঁও -এর কয়েকটি জায়গায়, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সাতারায় ঝটিকা সফরের সময় তিনি কান্নাভেজা চোখে তাঁর মায়ের সমাধিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নাগরে তিনি 'নাগর জেলা দলিত শ্রেণি সম্মেলন'-এ যোগ দিয়ে তাঁর দলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রোহমকে ভোট দেবার জন্য তাঁর লোকদের উপদেশ দেন। তিনি দলিত শ্রেণিকে রোহমের মেধা ও যোগ্যতা নিয়ে চিন্তিত হতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, শত শত গ্রাজুয়েটের শক্তি তাঁর নিজের মধ্যে আছে এবং আইনসভার ভিতরে বাইরে তিনি নিজেই দল পরিচালনা করবেন। তিনি প্যানভেল এবং মাহাদের সভায়ও বক্তৃতা করেন।

এই নির্বাচনী লড়াইয়ে আর একটি বিশেষত্ব ছিল 'ডেমোক্রেটিক স্বরাজ পার্টি'র নেতা এল.বি. ভোপতকরকে আম্বেদকর সমর্থন করেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আসন্ন নির্বাচনে আম্বেদকরের পুনার লোকদের তাঁকে ভোট দেবার জন্য ভোপতকর একটি আবেদনপত্র প্রকাশের জন্য আম্বেদকরকে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। যদিও ভোপতকর গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থিত দলের সদস্য এবং তা আম্বেদকরের অজানা নয়, তবুও তাঁর গুণাবলি ও উদ্দেশ্যের সততার প্রতি আম্বেদকরের বিশ্বাস ছিল। দলিত শ্রেণির ব্যাপারে ভোপতকরের অটুট সমর্থন ছিল। আর একটা গুণ যা আম্বেদকরের মনে ভোপতকরের পক্ষে কাজ করেছিল, সেটা হচ্ছে আম্বেদকরের মতো ভোপতকরের দলও নতুন সংবিধানের মধ্যে কাজে বিশ্বাসী এবং তা প্রচার করার জন্য ভোপতকরের সহকর্মী এন.সি. কেলকর বহু বছর ধরে কংগ্রেসি সহকর্মী ও কংগ্রেসি সাংবাদিকদের কাছে প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করেছেন।

আম্বেদকর সেইজন্য সর্বান্তকরণে ভোপতকরকে সমর্থন করে তাঁর সাফল্য কামনা করেন। কেলকরও তাঁর মতো করে একটা বিশেষ আবেদনে বম্বেতে তাঁর মতাবলম্বী ভোটারদের আম্বেদকরকে ভোট দেবার জন্য অনুরোধ করেন। কেলকর তাঁর আবেদনে আম্বেদকরের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, আম্বেদকর দলিত শ্রেণির মুকুটহীন রাজা এবং তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিভা ও একাগ্রতা বলে উচ্চশিখরে উঠেছেন।

অস্পৃশ্যরা পুনার এক ব্রাহ্মণকে নির্বাচনে সমর্থন করেন। যে পুনার ব্রাহ্মণেরা সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রবল বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে কুখ্যাত, তাঁকে সমর্থন করার জন্য বম্বের শ্রমিকনেতা এন.এম. যোশী আম্বেদকরকে বিদ্রূপ করেন। আম্বেদকরও শ্রমিকনেতার অশিষ্টতার জবাব দেন। শেখ মসজিদ সিন্ধি নামে একজন

হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিম নির্বাচনের প্রাক্কালে রটনা করেন যে, হরিজনেরা লক্ষ রাখছেন যে, মুসলিমরা তাঁকে ভোট দিচ্ছেন কিনা অথবা ইসলামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে তাঁরা সম্মান করেন কিনা এবং সিন্ধুপ্রদেশের নির্বাচনের পর আম্বেদকর ইসলামধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবেন। শেখ আবদুল মসজিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার শাহনওয়াজ খান ভুট্টো ঘটনার সত্যতা জানার জন্য আম্বেদকরকে তারবার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ জানালে আম্বেদকর উত্তরে জানান যে, শেখ মসজিদকে বা অন্য কাউকে তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি এবং ওই বিবৃতিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কংগ্রেস দল সব প্রদেশগুলিতেই নির্বাচনে প্রার্থী দেয়। কিন্তু সারা ভারতের মধ্যে দু'টি আসনে কংগ্রেস সমস্ত শক্তি, প্রতিভা ও কৌশলসহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথমটি বম্বে, যেখানে আম্বেদকর প্রার্থী এবং দ্বিতীয়টি পুনা, যেখানে ভোপতকর প্রার্থী। আম্বেদকর হচ্ছেন তাঁদের চরম শত্রু, তাঁদের দেবদেবী ও আদর্শের বিরোধী। ভোপতকর ছিলেন এক সময় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং তাঁদের সাথে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে সংগ্রামও করেছেন। ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট-বোলার পালভঙ্কর ছিলেন আম্বেদকরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যিনি পরবর্তীকালে আম্বেদকরের 'সিডিউল্ডকাস্ট ফেডারেশন'-এর সেক্রেটারি হয়েছিলেন, সেই রাজভোজ এবং দেওরুখরকেও আম্বেদকরের জয়লাভের সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্য দাঁড় করানো হয়। ১৯৩৭ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয় এবং ফল ঘোষণা হলে দেখা যায় যে, কংগ্রেসপ্রার্থী পালভঙ্কর কিছু ভোট পেলেও অন্য দু'জন প্রার্থী গোহারা হেরে যান। আম্বেদকর বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। কিন্তু ভোপতকর অনেক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

নতুন সংবিধানের আওতায় প্রথম নির্বাচনে আম্বেদকরের 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি' বিস্ময়জনক সফলতা অর্জন করে।

১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন জয়লাভ করেন। চিন্তাশীল মানুষেরা তখন কংগ্রেস ও আম্বেদকরের মধ্যে আইনসভায় একটা উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম হবে বুঝতে পারেন। আম্বেদকর হচ্ছেন কংগ্রেসের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ভয় ও আঘাত স্বরূপ।

বম্বে প্রদেশের দলিত শ্রেণি ভোটে তাঁদের নেতার জয়লাভে উল্লসিত হন। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পরই স্যাংলির মাহারওয়াড়ায় আম্বেদকরের উল্লেখযোগ্য জয়লাভের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। আশপাশের গ্রাম ও শহরের অস্পৃশ্য হিন্দুরা গর্বে ও আনন্দে ওই অভিনন্দন উৎসবে যোগ দেন।

আরও একটি জয়লাভের খবর আম্বেদকরের বিজয়োৎসবকে পূর্ণ করার জন্য এসে পৌঁছায়। চৌদার পুকুরের জল ব্যবহার বিষয়ের মামলায় চার বছর আগে

থানের সহকারী বিচারপতির দেওয়া রায়ের সমর্থনে ১৯৩৭ সালে ১৭ মার্চ বম্বে হাইকোর্ট দলিত শ্রেণির পক্ষে রায় দেয়।

কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করলেও অফিসের দায়িত্ব নিতে গিয়ে বাধা পায়।

স্যার ধনজিশাহ বি. কুপার ও যমনাদাস মেহতার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করার জন্য যখন কংগ্রেস দলের নেতা বি.জি. খের আম্বেদকরের কাছে অনুরোধ করেন, আম্বেদকর তখন জানজিরা রাজ্যে পরিদর্শনে ছিলেন, সেখান থেকে তিনি উত্তর দেন যে, সম্মান বাঁচানো ছাড়া কংগ্রেসের দাবির মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। তাঁর অভিমতÑ ছ'মাসের মধ্যে গভর্নরের উচিত আইনসভার অধিবেশন ডাকা, সেখানেই কংগ্রেস তার বক্তব্য রাখতে পারে।

এর ক'দিন পরেই 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি'র ডাকা বম্বের কামগড় ময়দানে এক বিরাট জনসভায় আম্বেদকর তাঁর মতামত পুনরায় উল্লেখ করেন এবং নতুন সংবিধানের অধীনে দলিত শ্রেণির স্বার্থে যতখানি সম্ভব কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস দলের কাছে আবেদন জানিয়ে অচল অবস্থার অবসান ঘটিয়ে যথারীতি কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। তিনি কংগ্রেস দলকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত কংগ্রেসি লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের ক্ষোভকে চলতে দিতে পারি না।" তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দলিত শ্রেণির নির্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নেহরুর মতো কংগ্রেসি নেতাদের আজ্ঞাবহ যেসব লোকদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছিল, সেইসব লোকদের রুচি ও মানসিকতার তিনি নিন্দা করেন। উদারহরণ হিসাবে তিনি নেহরুর চাকর হরির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি কেন অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভায় যোগ দেননি, তার উত্তরে তিনি বলেন, যে মন্ত্রীসভায় সংখ্যাধিক্য নেই, যা বেশিদিন টিকবে না, তাতে যোগ দেবার কোনো মানে নেই।

অবশেষে কংগ্রেস নেতারা নিজেরা শক্তিশালী হয়ে ১৯৩৭ সালের ১৯ জুলাই মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা একদিন আগে পদত্যাগ করে। বিকেলে সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসিরা ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে শপথ নেন এবং যথাস্থানে গিয়ে বসেন। আম্বেদকর গীতার নামে শপথ গ্রহণে অস্বীকার করে মর্যাদাপূর্ণভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

বম্বে আইনসভার দু'জন বিরোধী দলের নেতা আম্বেদকর ও যমনাদাস মেহতা, দেশের মধ্যে সেরা মানুষ এবং বিশ্বের যে কোনো দেশের আইনসভায় দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। যখন কংগেসি মন্ত্রীদের মধ্যে বেশির ভাগই অনভিজ্ঞ, তখন তাঁরা সুনিপুণ এবং প্রখ্যাত তার্কিক।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রমিক নেতা

কংগ্রেস নেতারা বম্বে প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মুসলিম এলাকা থেকে পরাজিত হয়ে তাঁরা মুসলিম সদস্যদের দলে টানতে শুরু করেন। কোয়ালিশনের কোনো দরকার ছিল না। আম্বেদকর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলেন, খুব বিরল পরিস্থিতিতেই তা গঠন করা যেতে পারে।

১৯৩৭ সালে ৩১ জুলাই আম্বেদকর যখন তাঁর পেশাগত কাজে ধুলিয়া যাবার পথে তখন দলিত শ্রেণির লোকেরা চালিশগাঁও স্টেশনে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানান। সকাল আটটায় ধুলিয়া পৌঁছালে বজ্রস্বরে, 'আম্বেদকর কে, তিনি আমাদের রাজা' ধ্বনিতে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়। আম্বেদকরকে তখন শোভাযাত্রা সহকারে টুরিস্ট বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালতের পেশাগত কাজ শেষ হওয়ার পর বিকেলে 'হরিজন সেবক সংঘ'-এর বার্ভে একটি চা-চক্রের অনুষ্ঠানে তাঁকে আপ্যায়িত করেন। সন্ধ্যায় আম্বেদকর বিজয়ানন্দ থিয়েটারে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, এই প্রধান জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ শাসকেরা অস্পৃশ্যদের প্রতি উদাসীন, এখন তাঁদের জায়গায় অন্য একদল নেতারা বসেছেন, যাঁরা দলিত শ্রেণির উপর নিপীড়ন চালান। এমন একটা সময় ছিল, যখন অস্পৃশ্যদের দিক থেকে ঐক্য, সংগঠন ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো। তিনি তখন দেখান যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীসভা কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভাই ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচালিত, সেখানে কোনো দলিত শ্রেণির মন্ত্রী নেই।

তখন ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টির প্রথম সাধারণ সভা হয়। ১৯৩৭ সালের ৭ আগস্ট বম্বের নাগপাড়ায় 'নেইবারহুড হাউজ'-এ এই সভা হয়েছিল। আম্বেদকর সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ব্যারিস্টার এম.বি.সামর্থ সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক হন কে.ভি. চিত্রে এবং এস.এ. উপাসম। কে.ভি. চিত্রে সাময়িক সংগঠক এবং তাঁকে বলা হত আম্বেদকরের ব্যক্তিগত মন্ত্রণাসভার প্রধান। সাধারণ সভায় বক্তৃতাকালে আম্বেদকর বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে এই ব্যাপারটা আমার মনে জাগেনি যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি রাখতে হবে। ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আইনসভায় মন্ত্রীদের মাসিক বেতন পাঁচশো টাকা, সেইসঙ্গে বাড়িভাড়া ও পরিবহন ভাতা সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য একটি বিল উত্থাপিত হয়। আম্বেদকর অনেক যুক্তি দেখিয়ে বিলটির বিরোধিতা করেন। বিলটির সমালোচনা করে তিনি বলেন, "মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে

চারটি বিষয় দ্বারা ওই নীতি নির্ধারিত হবে। প্রথম হচ্ছে সামাজিক মানদণ্ড, দ্বিতীয় হচ্ছে যোগ্যতা, তৃতীয় গণতন্ত্র, চতুর্থ প্রশাসনিক পবিত্রতা ও অখণ্ডতা।"

তিনি বলেন, দেশের জীবন ধারণের মান অনুযায়ী যদি বেতন নির্ধারিত হয়, তবে প্রত্যেক মন্ত্রীর পঁচাত্তর টাকা বেতন নেওয়া উচিত। তিনি মন্তব্য করেন, ডঃ জনসনের মতে, দেশপ্রেম হচ্ছে দুরাত্মাদের শেষ আশ্রয়স্থল; রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনিও তাই মনে করেন। উত্তর দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী খের বলেন যে, বিলের অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে মাতৃভূমির সেবা করা। দেশপ্রেম দুরাত্মাদের আশ্রয়স্থল হলেও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও প্রথম আশ্রয়স্থল। তখন তিনি আম্বেদকরকে তাঁর সমাজের নিঃস্বার্থ সেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশের জন্যও তেমনি নিঃস্বার্থ সেবা করার জন্য আবেদন করেন।

আম্বেদকরের প্রচারের কাজ চলছিল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে মাসুরে দলিত শ্রেণির জেলা সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, তাঁর নিশ্চিত অভিমত এই যে, শ্রমিক এবং গরিবদের স্বার্থে দৃষ্টি দেওয়ার মতো মানুষ গান্ধি নন। কংগ্রেস যদি বিপ্লবী সংগঠন হতো তবে তিনি তাতে যোগ দিতেন। কিন্তু কংগ্রেস বিপ্লবী সংগঠন নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য ঘোষণা করে সাধারণ মানুষের বিশ্রাম, স্বাধীনতা এবং তাঁদের ইচ্ছানুসারে উন্নতি লাভের জন্য আদর্শ প্রচারের সাহস কংগ্রেসের নেই। তিনি মন্তব্য করেন যে, যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনের উপায়গুলি অল্পসংখ্যক মানুষের দ্বারা তাঁদেরই স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হবে, ততদিন পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, গান্ধিবাদ অনুসারে কৃষক হলো তার জোড়া বলদের পেছনে তৃতীয় বলদ।

কম্যুনিস্টদের পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ওই দলে তাঁর যোগ দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি হচ্ছেন কম্যুনিস্টদের প্রকৃত শত্রু, তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শ্রমিকদের শোষণ করে থাকে।

যে কৃষকেরা অসহনীয় অসুবিধার মধ্যে পরিশ্রম করেন আম্বেদকর সেই অগণিত কৃষকদের স্বার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ১৯৩৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বম্বে আইনসভার পুনা অধিবেশনে কোংকনের জমি ভোগদখল সম্পর্কে খোটি প্রথা বিলুপ্তির জন্য তিনি একটি বিল উত্থাপন করেন।

লক্ষ করার বিষয় যে, প্রথম জনপ্রিয় প্রাদেশিক আইনসভায় আম্বেদকরই হচ্ছেন ভারতের প্রথম (আইনসভার) সদস্য, যিনি কৃষক প্রজাদের দাসত্ব মোচনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। প্রচলিত জমিদখল নীতি বিলোপ করে জমিতে প্রজাদের দখলিস্বত্ব প্রবর্তনের জন্য তাঁর ওই বিল। তিনি চেয়েছিলেন খোটি প্রথার বিলোপ

করে রায়তি প্রথার বিকল্প একটি ব্যবস্থা এবং খোটদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দিয়ে অল্প জমিওয়ালাদের ওই জমি দেবার ব্যবস্থা করতে। কারা প্রকৃতপক্ষে ওই জমিতে দখলকারী আছে, তা স্থির হবে ১৮৭৯ সালের 'ল্যাণ্ড রেভেনিউ' আইন অনুসারে। কিন্তু সরকার বিষয়টি স্থগিত রাখে বলে আম্বেদকর বিলটি নিয়ে আর এগোতে পারেননি। ১৯২৭ সাল থেকে আম্বেদকর যে মাহার ভাতান বিলুপ্ত করতে আন্দোলন করছিলেন সে সম্পর্কেও একটি বিল উত্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত তা ১৯৫৯ সালের 'বম্বে ইনফিরিয়ার ভিলেজ ভাতান অ্যাবোলিশন অ্যাক্ট-১ অনুসারে বিলুপ্ত হয়।

১৯৩৭ সালের মার্চ মাস থেকে একটি অতি গুরুতর মানহানির মামলা চলছিল বম্বের মাঝাগাঁও কোর্টে। 'হিলাল' নামক উর্দু পত্রিকার সম্পাদক আলি বাহাদুর খাঁ মারাঠি সাপ্তাহিক 'বিবিধ বৃত্ত' পত্রিকার সম্পাদক আর.কে. তাতনিসের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিলেন। আম্বেদকর তাঁর বন্ধু তাতনিসের পক্ষে মামলাটি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। তিনি ইংলিশ ও ভারতীয় আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে সাত ঘন্টা ধরে প্রতিবাদীর কাজ পরিচালনা করে বলেন যে, প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ পড়া দরকার। কোর্ট মন্তব্য করে, আসামি তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন বটে, কিন্তু বাদীর তিরস্কারের প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে পাঁচটাকা জরিমানা করা হলো।

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে 'আদি দ্রাবিড় যুবসংঘ' (Adi-Dravida Youth Sangh)-এর পক্ষ থেকে একদল দলিত শ্রেণির যুবক আম্বেদকরের নির্বাচনে কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানান। উত্তরে আম্বেদকর তাঁদের কংগ্রেসে যোগ না দেবার জন্য সাবধান করে দেন। যদি তাঁরা তা করেন, তাহলে তাঁদের ক্ষোভ-দুঃখ জানাবার জন্য বাইরে আর কেউ থাকবেন না। ওই মাসের শেষ সপ্তাহে নাসিকের নেতা ভাউরাও গাইকোয়াড়ের দলিত শ্রেণির জন্য অবিরাম সংগ্রাম, একনিষ্ঠ কাজ ও নাগরিক অধিকার লাভের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য বম্বের দলিত শ্রেণি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। আম্বেদকরও তাঁর সহযোদ্ধাকে তাঁর সেবা, বন্ধুত্ব ও ত্যাগের জন্য শ্রদ্ধা জানান।

১৯৩৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর আম্বেদকর শোলাপুর জেলা দলিত শ্রেণির সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য পান্ধারপুরের উদ্দেশে রওনা হন। যাওয়ার পথে ভোরবেলা কুর্দওয়াড়ি স্টেশনে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তারপর তাঁকে তাঁর দলবলসহ একটি বিশেষ বাসে পান্ধারপুর নিয়ে যাওয়া হয়। পথে আম্বেদকর অল্পসময়ের জন্য করকম গ্রামে নেমে মাতঙ্গ সমাজের লোকদের কাছে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাঁদের শোষক, নিপীড়ক ও রক্তচোষকদের নিয়ে গঠিত কংগ্রেস, যাঁরা সাদা পোশাক ও টুপি পরে গরিবদের মঙ্গলের কথা বলে, সেই কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি তাঁদের সাবধান থাকতে উপদেশ দেন। দুপুরে তিনি পান্ধারপুর পৌঁছান। সেখান থেকে

শোভাযাত্রা সহকারে টুরিস্ট বাংলোতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। পান্ধারপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি সেখানে তাঁর সাথে দেখা করেন। তারপর তাঁরা দু'জনেই মিউনিসিপ্যাল ধর্মশালার সম্মেলনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ তাঁদের মহান নেতার কথা শুনতে সমবেত হয়েছিলেন। এক হাজারের বেশি মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন।

ওই সম্মেলনে আম্বেদকর বলেন যে, তাঁদের সামনে তিনটি সমস্যা আছে। প্রথমটি হচ্ছে, হিন্দু সমাজ কখনও তাঁদের সমান মর্যাদা দেবে কিনা; দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁরা জাতীয় সম্পদের ন্যায্য অংশ পাবেন কিনা; তৃতীয় হচ্ছে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মনির্ভরতা আন্দোলনের কী হবে। প্রথমটি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যতদিন জাতিভেদ প্রথা থাকবে, ততদিন তা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলেন যে, যতদিন কংগ্রেস পুঁজিপতিদের হাতে থাকবে, ততদিন বিশ্বাস করা যায় না যে, এই সরকার তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কিছু করবে। এখন দরকার তাঁদের শোষণকারী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করা। এখন সময় এসেছে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার। তৃতীয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, সেই প্রচেষ্টায় তাঁদের হারাবার কিছু নেই, বরং অনেক কিছু লাভই হবে; তাঁদের শুধু মৃত্যুভয় ত্যাগ করতে হবে।

এই সম্মেলন তাঁদের নেতার আইনসভায় পেশ করা মাহার ভাতান বিলকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে।

আম্বেদকরকে তখন মিউনিসিপ্যাল হলে নিয়ে যাওয়া হয়। সমস্ত সদস্যেরা আনন্দের সাথে তাঁকে স্বাগত জানান। ওই উপলক্ষ্যে সভাপতি এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে অতিথিকে মাল্যভূষিত করেন। আম্বেদকর তাঁদের সাথে ভাববিনিময় করে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পান্ধারপুর থেকে আম্বেদকর শোলাপুরে যান মাতঙ্গ সম্মেলনে বক্তৃতা করতে। সেখানে পৌঁছুলে ১৯৩৮ সালের ৪ জানুয়ারি সকালবেলা ভগবৎ চিত্রমন্দিরে শোলাপুর মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে তাঁর উদ্দেশে একটি স্বাগত ভাষণ দেওয়া হয়। ভাষণটি পড়ে শোনান রায়বাহাদুর ডঃ ভি.ভি. মুলে, যিনি মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির ক্ষমতায় শোলাপুরে অস্পৃশ্যদের আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন। উত্তরে আম্বেদকর সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যাবলি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, "রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে শুধুমাত্র এক কংগ্রেস দলকেই শ্রদ্ধা জানানোর মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "সকল অবস্থায় এবং সকল দাবিতে গণতন্ত্রে আমি বিশ্বাসী নই এবং ভারতের বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার অত্যন্ত অনুপযুক্ত। যেভাবেই

হোক কিছুদিনের জন্য একজন প্রজ্ঞাবান একনায়ক শাসকের প্রয়োজন।”

তিনি মন্তব্য করেন, “এই দেশে আমরা যে গণতন্ত্র পেয়েছি তাতে বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন বন্ধ হয়েছে। তা আপাদমস্তক মাত্র একটি সংগঠনের কাছে বাঁধা পড়েছে। এই সংগঠন তার কর্ম ও চিন্তার বিচার করতে তৈরি নয়। একে আমি প্রচণ্ড অস্বাচ্ছন্দ্য, রুগ্ন ও দুর্বলতা মনে করি। এতে আমরা সবাই আক্রান্ত। তারা মাতাল হয়ে আছে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের লোক ঐতিহ্যগতভাবে বেশি বিশ্বাসী বটে, কিন্তু বুদ্ধি কম। **যে কেউ একটু অসাধারণ কাজ করলে এতই কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে যে, অন্যদেশে তাকে পাগলের কাজ বলা হয়, কিন্তু এদেশে তাঁকে মহাত্মা বা যোগী বলা হয়। মেষপালকের পিছনে যেমন মেষ চলে জনগণও তেমনি তাঁকে অনুসরণ করে।** যাঁদের কথা শ্রবণযোগ্য, তাঁদের কথা শোনার জন্য গণতন্ত্র শিক্ষা দেয়।” শেষে তিনি বলেন, “আমি খুশি যে, দেশের অনেকেই যে সংগঠনকে একমাত্র সংগঠন বলে স্বীকার করেন, আমি সেই সংগঠনের কেউ না হওয়া সত্ত্বেও শোলাপুর মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে অভিনন্দনপত্র দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।”

পরদিন আম্বেদকর শোলাপুরে রেভারেণ্ড গঙ্গাধর যাদবের সভাপতিত্বে খ্রিস্টানদের এক সভায় বক্তৃতা দেন। স্থানীয় খ্রিস্টানরা ধর্মের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, যেদিন তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগের ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন, সেদিন থেকে তিনি কেনাবেচার বস্তু বা মজার বিষয় হয়ে উঠেছেন। মহারাষ্ট্রের সুপরিচিত নাট্যকার আচার্য পি.কে. আত্রে লিখিত ‘বন্দে ভারতম্’ নামক একটি মিলনান্তক নাটকের উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর নাটকে ধর্মান্তর গ্রহণকে ঠাট্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর সংকল্পে অটল। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনায় তিনি বলতে পারেন যে, দু’টি ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে, তাঁরা হচ্ছেন বুদ্ধ ও খ্রিস্ট।

তিনি বলেন, যে ধর্ম জনগণকে পরস্পরের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হবে সেই শিক্ষা দেয়, সেই ধর্মই তিনি চান। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার আলোকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক হবে। তিনি খ্রিস্টানদের বলেন যে, তাঁদের একই ধর্মের লোক দক্ষিণ ভারতে গির্জায় জাতিভেদ প্রথা মেনে চলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক ভাবে তাঁরা পিছনেও পড়ে আছেন। মাহার ছেলেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তারা বৃত্তি পায় না। সুতরাং খ্রিস্টান হওয়ায় তাদের কোনো অর্থনৈতিক লাভ হয়নি। ভারতীয় খ্রিস্টানরা কখনও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি। লণ্ডন থেকে ফিরে আসার পরে শিখধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাষ্পের মতো উবে যায়। তাঁর বক্তৃতায় ভারতীয় খ্রিস্টানদের প্রতি তিরস্কার ও সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

শোলাপুর থেকে বম্বে ফিরে আসার পরেই তিনি বম্বে আইনসভার কাউন্সিল হলে কৃষকদের একটি অভিযান পরিচালনা করেন। থানে, কোলাবা, রত্নগিরি, সাতারা

এবং নাসিকÑ এই সব বাইরের জেলা থেকে দলিত শ্রেণির লোকেরা ট্রেনে ও স্টিমারে করে বম্বে আসেন। ছেঁড়া কাপড় পরা, কাঁধে কম্বল-বোঁচকা এবং লাঠিহাতে তাঁরা বম্বে আসেন তাঁদের অভিযোগ জানাতে। তাঁদের রোদেপোড়া মুখে ভরপুর উদ্দীপনা। তিনদিক থেকে শোভাযাত্রা করে তাঁরা এসে কাউন্সিল হলে ঢোকেন। একদল প্যারেল থেকে, একদল আলেকজান্দ্রা ডক থেকে, অন্যদল চৌপট্টি থেকে। পুলিশের পাহারায় তাঁরা ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যান। শোভাযাত্রীরা "খোটি প্রথা বন্ধ কর, আম্বেদকরের বিল সমর্থন কর" লেখা পোস্টার নিয়ে যান। শোভাযাত্রীরা দুপুর দেড়টায় ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের কাছে এসপ্লানেড ময়দানে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে পুলিশ অফিসারেরা শোভাযাত্রীদের বাধা দিয়ে কুড়িজন নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রিমিয়ার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বলা হত) সাথে দেখা করার অনুমতি দেন। আম্বেদকরের নেতৃত্বে পারুলেকর, এস.সি. যোশী, ডি.ডব্লিউ. রাউত, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এবং এ.ভি. চিত্রে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন।

প্রতিনিধিদের উপস্থাপিত প্রথম দাবি কৃষি-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করা। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যেহেতু বকেয়া রাজস্ব মকুব হয়েছে, সেজন্য বকেয়া সমস্ত রকমের করও মকুব করতে হবে। তাঁরা দাবি করেন যে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে হোক বা বিনা ক্ষতিপূরণে হোক, খোটি প্রথা ও ইনামদার প্রথা তুলে দিতে হবে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অপচয় ও নিপীড়নমূলক জমিদারি প্রথা রদ করতে হবে। শেষ দাবি হল অল্প জমিওয়ালাদের পঞ্চাশ শতাংশ জলকর কমাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদের বলেন, প্রত্যেকটি সমস্যাই মন্ত্রীগণ তাঁদের নিজেদের মতো করে দেখছেন।

নেতৃবৃন্দ এসপ্লানেড ময়দানে ফিরে এসে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। আম্বেদকর তাঁর জোরালো বক্তব্যে বলেন যে, সমস্ত কম্যুনিস্ট নেতারা সবাই মিলে যত বই পড়েছেন তার থেকে তিনি কম্যুনিজম সম্পর্কে অনেক বেশি বই পড়েছেন। তাঁর অভিমত কম্যুনিস্টরা বাস্তব বিষয়ে দৃষ্টি দেন না। তিনি মন্তব্য করেন, পৃথিবীতে দু'টি শ্রেণি আছেÑ ধনী ও গরিব, শোষক ও শোষিত। তৃতীয় শ্রেণি মধ্যবিত্ত, তাঁদের সংখ্যা অল্প। সেজন্য তিনি বলেন যে, তাঁদের গরিবি সম্পর্কে তাঁদেরই ভাবতে হবে। তাঁরা বেঁচে আছেন শোষকদের ধনবৃদ্ধির জন্যই। এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় হচ্ছে জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি শ্রমিকদল গঠন করা এবং তাঁদের প্রকৃত প্রতিনিধিদেরকেই আইনসভায় পাঠানো। যদি তাঁরা তা করতে পারেন, তবে তাঁরা আশ্রয়, বস্ত্র পাবেন এবং যাঁরা দেশের খাদ্য ও ধন উৎপাদন করেন, তাঁরা অনাহারে মরবেন না। তাঁর বক্তব্যের তেজস্বীতা, যুক্তি ও তীক্ষ্নতা যে কোনো কম্যুনিস্ট নেতাকেই হার মানাবে। আম্বেদকর কৃষক, শ্রমিক ও ভূমিহীনদের দুর্ধর্ষ নেতা হয়ে উঠবেন, এই ভয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভীত হয়ে পড়েন।

ভূমিসংস্কার নিয়ে যখন আন্দোলন চলে তখন শাসকদলের সাথে আম্বেদকরের প্রবল বিরোধ ঘটে। দলিত শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকাল বোর্ড অ্যাক্ট সংশোধনের জন্য আনা নতুন বিলের একটি ধারায় তপশিলি জাতিকে 'হরিজন' অর্থাৎ ঈশ্বরের লোক বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আম্বেদকরের সহযোদ্ধা ভাউরাও গাইকোয়াড় ওই নাম মুছে দেবার জন্য আইনসভায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। তিনি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে বক্তৃতায় বলেন যে, বহু সম্মেলনে দলিত শ্রেণি ওই নামের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। সেজন্য তিনি আইনসভায় 'হরিজন' শব্দটিকে আইনসিদ্ধ ভাবে গ্রহণ না করতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, যদি তাঁরা তা করেন, তাহলে বিনা বাধায় তা করতে পারবেন না। তিনি আরও বলেন, **"যদি অস্পৃশ্য শেণিরা ঈশ্বরের লোক হয়, তবে স্পৃশ্যদের কি শয়তানের লোক ভাবতে হবে?** সব মানুষকেই যদি হরিজন বলা হয়, তবে আমাদের আপত্তি নেই। কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের এই মিষ্টি নামের দরকার নেই। তাঁদের দুঃখ দূর করার জন্য বাস্তবে কিছু করা দরকার।" ডি.ডব্লিউ. রাউত সংশোধনীটি সমর্থন করেন। মাননীয় মিঃ এল.এম. পাতিল উত্তরে বলেন, তিনি জানেন যে, শুধু নামের পরিবর্তন করে তপশিলি জাতির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার বাস্তবিক কোনো উন্নতি হবে না। কিন্তু 'অস্পৃশ্য' শব্দটির মধ্যে ঘৃণাসূচক কিছু মেশানো আছে, তাঁরা তা দূর করে ওই সম্প্রদায়কে মর্যাদা দিতে চান।

ওই সংশোধনী বিলটি ভোটের মাধ্যমে নাকচ হয়ে যায়। কংগ্রেস দল ওই 'হরিজন' নামটি দলিত শ্রেণির গলায় জোর করে পরিয়ে দেয়, যদিও সংরক্ষিত আসনের পনেরোটির মধ্যে কংগ্রেস পায় মাত্র দু'টি এবং আম্বেদকর পনেরোটির মধ্যে জেতেন তেরোটি আসনে। আম্বেদকর তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, "আমি দুঃখিত এবং না বলে পারছি না যে, এই দলটি সরকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। যদি মাননীয় বন্ধু গাইকোয়াড়ের সংশোধনীটি মেনে নেওয়া হত, তবে কেউই কোনো আঘাত পেতেন না এবং দেশের স্বার্থেরও কোনো ক্ষতি হত না। এই ঘটনায় সরকার সংখ্যাধিক্যের জোরে একটা অত্যাচারমূলক কাজ করছে আশঙ্কায় আমরা অসম্মতি জানিয়ে সদলে বাইরে চলে যাচ্ছি এবং এই দিনের কাজে আর অংশগ্রহণ করব না।"

প্রধানমন্ত্রী মিঃ খের, ওই শব্দটি ভদ্রোচিত ও কাঙ্ক্ষিত অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম বলে দলিত শ্রেণির সদস্যদের শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং তা প্রমাণ করতে গুজরাটের সন্ত-কবি নার্সি মেহতার একটি গান উল্লেখ করে তার অর্থও ব্যাখ্যা করেন।

উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, তাঁর যা বলার ইচ্ছা তা হচ্ছে, তিনি অন্য কোনোভালো

নাম পছন্দ করতে পারেন না। শাসকদল অন্য একটি বিকল্প নামের জন্য তাঁদের সাথে আলোচনা করতে পারতেন। খেরের যুক্তিটি তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি মন্তব্য করে তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ ত্যাগ করেন এবং তাঁর দলের সবাই তাঁকে অনুসরণ করেন।

আম্বেদকর তখন অবনমিত জনগণের উন্নয়নের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। কিছুদিনের জন্য মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর বইয়ের মধ্যে নেই, বইয়ের বদলে সাধারণ মানুষদের নিয়ে লেগে পড়েছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের অভিযোগ শোনা ও বোঝার সুযোগ করে দিয়ে তাঁদের পথপ্রদর্শন করতে ও সরকারের কাছে সেগুলি তুলে ধরতে থাকেন। তিনি ছিলেন তাঁদের দুর্ভাগ্যের কণ্ঠস্বর, তাঁদের লক্ষ্য ও সংকল্প। আহমেদনগরের কৃষক-শ্রমিকেরা তাঁর উপদেশ জানতে চাইলে ১৯৩৮ সালের ২৩ জানুয়ারি সেখানে এক সম্মেলনে তাঁদের কাছে তিনি বক্তব্য রাখেন।

নাগরে ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ডে স্থানীয় উকিল ভাউসাহেব কানওয়াড়ে, সর্দার থোরাট ও অন্য একজন স্থানীয় উকিল ত্রিভুবন কর্তৃক তিনি চা-চক্রে আপ্যায়িত হন। বিকেলে তাঁর দলবল নিয়ে বিশেষ একটি লরিতে করে ওই জেলার আকোলায় চলে যান; পথে অত্যন্ত আন্তরিক অভিনন্দন পান। সেখানে অন্য একটি সভায় নব্বই মিনিটেরও বেশি সময় ধরে তিনি বক্তৃতা করেন। সেই সম্মেলন আইনসভায় তাঁদের নেতার আনা সমস্ত বিলগুলি সমর্থন করেন।

আম্বেদকর তখন কৃষক ও রেলওয়ে কর্মচারীদের সংগঠিত করতে মনোযোগ দেন। প্রথমে তিনি রেল-শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টি দেন। ১৯৩৮ সালের ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি মনমদে বিশ হাজার অস্পৃশ্য রেল-কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন, কীভাবে ছেলেবেলায় আত্মীয়দের জন্য টিফিনক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে মিলে গিয়েছেন এবং মিল-শ্রমিকদের সমস্যাগুলি জানতে পেরেছেন। তিনি বলেন, সেই সময়ের শ্রমিকদের অবস্থা কত অন্য রকম ছিল। শ্রমিক নেতারা কর্মীদের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কায় অস্পৃশ্য কর্মীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার দূর করার চেষ্টাই করতেন না। তিনি বলেন, এরকম সম্মেলন এই প্রথম। তাঁরা এতদিন সামাজিক অন্যায় দুর্ভোগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে অনেকটা সফলতা পেয়েছেন। ফলে তাঁরা রাজনৈতিক প্রতিনিধি পেয়েছেন। এখন তাঁরা অর্থনৈতিক দুর্ভোগ দূর করার কাজে হাত দিয়েছেন। এতদিন তাঁরা অচ্ছুত (পারিয়া) হিসাবে মিলতেন, কিন্তু এখন তাঁরা কর্মী হিসাবে মিলিত হচ্ছেন। এতদিন তাঁকে জাতির শত্রু বলা হত, এখন বলা হচ্ছে শ্রমিকদের শত্রু।

আম্বেদকরের মতে শ্রমিক শ্রেণির দু'টি শত্রু আছেÑ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা আমি ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা, সুযোগ সুবিধার কথা

বুঝি না। সেই অর্থে আমি শব্দটি ব্যবহার করছি না। ব্রাহ্মণ্যবাদ অর্থে আমি বুঝাতে চাইছি স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অস্বীকৃতি। ওই অর্থে এটা সকল শ্রেণির মধ্যেই বর্তমান, কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়, যদিও তাঁরাই এর প্রবর্তক। এই ব্রাহ্মণ্যবাদের কুফল কেবলমাত্র একত্রে খাওয়াদাওয়া ও অসবর্ণ বিবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা তাঁদের নাগরিক অধিকারও অস্বীকার করেছে। এই ব্রাহ্মণ্যবাদ এত সর্বব্যাপী যে, এর দ্বারা অর্থনৈতিক সুবিধাও ব্যাহত হচ্ছে।"

আম্বেদকর অস্পৃশ্য কর্মীদের এবং যাঁরা অস্পৃশ্য নয় তাঁদের সুযোগসুবিধাগুলি তুলনা করে দেখতে বলেন। তিনি বলেন যে, অস্পৃশ্যদের কাজের সুযোগ কম, চাকরির সুযোগ এবং নিজ নিজ কাজে উন্নতির সুযোগও কম। এটা অত্যন্ত অন্যায় যে, এমন অনেক কাজ আছে যেখানে অস্পৃশ্যতা দোষে তাঁদের দরজা বন্ধ। কাপড়ের কলই এর উদাহরণ। রেলে তাঁদের গ্যাংমানের কাজ ছাড়া আর কিছু জোটে না। তাঁদের কুলির কাজও দেওয়া হয় না, কারণ কুলিদের স্টেশনমাস্টারের পরিবারের চাকর হিসাবে কাজ করতে হয় আর অস্পৃশ্য হওয়ার জন্য তাঁদেরকে বাদ দেওয়া হয়। রেলওয়ে ওয়ার্কশপেও তাই। তিনি তাঁর সমালোচকদের প্রশ্ন করেন, যখন তাঁরা সেই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দূর করতে পারছেন না, তখন কী করে শ্রমিকশ্রেণিকে একতাবদ্ধ করবেন, যে অন্যায়গুলি অনৈতিক এবং ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর? অন্য কথায় যদি শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হয়, তবে তাঁদের ব্রাহ্মণ্যবাদ অর্থাৎ অনৈক্যবোধের ভূতকে নিঃশেষ করতে হবে। তিনি ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, তা বদ্ধ জলাশয়ের মতো। কারণ তার নেতৃত্ব হয় ভীরু, নয়তো স্বার্থপর কিংবা বিপথে পরিচালিত। শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিরোধের চেয়েও বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে পরস্পর লড়াই বেশি মারাত্মক। কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে তার অসদ্ব্যবহার করছেন।

তিনি বিস্ময়ের সাথে বলেন যে, এম.এন. রায় কংগ্রেসের ভিতরে বা বাইরে কোনো আলাদা শ্রমিক দল গঠন করার বিরুদ্ধে। রায় অনেকের কাছে যেমন তাঁর কাছেও তেমনি ধাঁধার মতো। কম্যুনিস্ট হয়ে শ্রমিকদের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের বিরোধী। এটা এমন এক ভয়ানক বৈপরীত্য যে, লেনিনও তাঁর কবরে পাশ ফিরে শোবেন। তিনি বলেন, এটা হতে পারে যে, ভারতীয় রাজনীতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের দিকে মিঃ রায় তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিলোপের পরে জনগণের রক্ত ঝরাবার জন্য যাঁরা অবশিষ্ট থাকবেন, সেই জমিদার, মিলমালিক ও মহাজনদের বিরুদ্ধে যদি শ্রমিকদের সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের মতো ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রামের জন্য তাঁর নিজস্ব সংগঠন থাকা দরকার।

সেই একই প্যাণ্ডেলে দলিত শ্রেণির যুবকদের এক জরুরি সম্মেলনে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুরলীধর পাগারের স্বাগত ভাষণের পর আম্বেদকর শিক্ষামূলক ও উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, মানুষের জীবননীতি সম্পর্কে তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা একটি মহৎ আদর্শে জীবন গঠন করবেন। জাতীয় উন্নতি বা আত্মোন্নতির জন্য যে আদর্শ গ্রহণ করা হোক না কেন, একজনকে ধৈর্যের সাথে সেই কাজে লেগে থাকতে হবে। জগতে যে কোনো মহৎ কিছু অর্জন করার পিছনে আছে ধৈর্যশীল শ্রম ও কষ্ট স্বীকার। কারও লক্ষ্যে পৌঁছোতে মন ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা দরকার। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য খেতে হবে এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে তাঁদেরকে বেঁচেও থাকতে হবে।

এরপর শিক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন যে, শিক্ষা হচ্ছে দু'দিকে ধারালো তরবারির মতো, যা ব্যবহারের জন্যই বিপজ্জনক হয়। চরিত্র ও মানবতাহীন শিক্ষিত মানুষ পশুর থেকেও ভয়ানক। তাঁর শিক্ষা যদি গরিবের মঙ্গলের পথে বাধা হয় তবে তা সমাজের অভিশাপ। "ধিক্কার সেই শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি। শিক্ষার চেয়েও চরিত্র বেশি দরকারি। যুবকেরা ধর্মের প্রতি উদাসীন দেখে আমি বেদনা বোধ করছি। কিছু লোকে বলেন, ধর্ম আফিমের মতো, তা সত্য নয়। আমার মধ্যে যা কিছু ভাল অথবা আমার শিক্ষা সমাজের যতটুকু উপকার করেছে তা আমার অন্তর্নিহিত ধর্মীয় অনুভবের কাছে ঋণী। আমি ধর্ম চাই, কিন্তু ধর্মের নামে ভণ্ডামি চাই না।" সম্মেলন অত্যন্ত সাফল্যলাভ করেছিল এবং এটা প্রমাণ করল যে, সুযোগ পেলে দলিত নেতারাও জনগণকে সংগঠিত করতে পারেন।

আম্বেদকর বম্বে পৌঁছালে বম্বের তাদওয়াড়িতে দলিত শ্রেণির পক্ষ থেকে 'বিবিধ বৃত্ত'-এর সম্পাদক আর.কে.তাতনিস তাঁকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেন। উত্তরে আম্বেদকর তাঁর লোকদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি'তে যোগ দিতে অনুরোধ করেন।

আইনসভার নির্বাচনে সাফল্য লাভ করায় উৎসাহিত হয়ে, আম্বেদকর লোকালবোর্ড নির্বাচনের দিকে নজর দেন। তিনি ইসলামপুর পরিদর্শন করে দলের প্রার্থী, যাঁরা সাতারা জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁদের ভোট দেবার জন্য দলিত শ্রেণিকে অনুরোধ করেন। সেখানে তিনি কংগ্রেসের থেকে আলাদা স্বাধীন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য মারাঠাদের উপদেশ দেন। কারণ পুঁজিপতি ও ব্রাহ্মণের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল কখনও কৃষক ও মধ্যবিত্ত লোকদের স্বার্থ দেখবে না। সাতারা ও পুনা পরিদর্শনের পরে তিনি বম্বে ফিরে আসেন।

ওই মাসেই আইনসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপিত হয়। সেটি ছিল প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধন কার্যবিধি সম্পর্কে। তৎকালীন আইন বিশারদ ও বাগ্মী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুন্সীর সঙ্গে আম্বেদকরের আলোচনায় অনেক বাকযুদ্ধ হয়েছিল। মনে হয়, ওই দু'জন মেজাজে ও মৌলিকতায় তীব্র বিরোধী ছিলেন।

বিলটির আলোচনা প্রসঙ্গে আম্বেদকর গান্ধি আদর্শে গান্ধির প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনাকে আক্রমণ করেন। তখন মুন্সী বলেন যে, আম্বেদকর ওই পরিকল্পনাটির বিচারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নন এবং যেহেতু আইনসভার অধিকাংশ সদস্যেরা শিক্ষাবিদ নন, সেহেতু তাঁরা তার যথারীতি বিচার করতেও সক্ষম নন। আইনসভার সদস্যদের প্রতি অসম্মানজনক কথায় আম্বেদকর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আপনারা এই সদস্যদের বরখাস্ত করে দিতে পারেন।"

মুন্সীÑ মাননীয় সদস্য মহাশয়ের নির্বাচনের সাধারণ রীতি ও বিভাগীয় পরিভাষা সম্পর্কে দক্ষতা নেই। সরকার যে কোনো নিয়ম করুক না কেন তা প্রকাশের জন্য অধিকাংশ সদস্যের প্রকাশ্য অনুমতি দরকার।

আম্বেদকরÑ আমার মাননীয় বন্ধু কি বলতে চান যে, বিরোধীদের কিছু বক্তব্য থাকবে না?

মাননীয় মিঃ খের (প্রধানমন্ত্রী)Ñ আপনি যখন একটা সরকারে আছেন, তাকে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনার ইচ্ছানুসারে অপসারিত করতে, প্রভাবিত করতে বা কিছু প্রবর্তন করাতে পারেন না....

আম্বেদকরÑ (উত্তেজিত স্বরে) এটা কি তাহলে অন্য কিছু? (গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়?)

অধ্যক্ষÑ শান্ত হোন, শান্ত হোন।

আম্বেদকর শুধুমাত্র একজন শিক্ষাজগতের অভিভাবকই নন, অধিকন্তু আইন কলেজের অধ্যক্ষও। অপর দিকে মুন্সী একজন আইনজীবী মাত্র। আম্বেদকর শিক্ষাজগতে বিচরণ করেছেন, কাজ করেছেন এবং শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নও করেছেন। মুন্সী কখনও তাঁর চেয়ে ভালো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নন।

বম্বে আইনসভায় ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বম্বে প্রদেশ থেকে কর্নাটককে আলাদা করার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সম্পর্কে আম্বেদকর বলেন, তাঁর ভয় হচ্ছে যে, যদি কর্নাটক আলাদা প্রদেশ হয়, তবে তা হবে যে কোনো লোকের বিরুদ্ধে একটি লিঙ্গায়েত প্রদেশ। ওই রকম ভাগ করার প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসননীতির দু'টি অবদানের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনÑ একটি হচ্ছে সাধারণ আইন প্রণয়ন এবং অন্যটি হচ্ছে সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, সকলের ভাবা উচিত যে তাঁরা প্রত্যেকে ভারতীয়। আইনসভা

ও দেশকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, “আমরা ভারতীয় এই অনুভূতি এখনও ভ্রূণ অবস্থায় এবং তা মাত্র পরিণত হতে শুরু করেছে। আমি গভীর চিন্তাভাবনা করে বলছিÑ অন্যান্য আনুগত্য, সংস্কৃতিগত অনুভূতি, জাতীয়তাবোধের ভাবাবেগকে একসঙ্গে বাড়তে দেওয়াটা হবে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ, যা আমরা করে ফেলতে পারি। আমি আমার নিজের কথা বলছি, আমি এর সঙ্গে একমত নই। আমি তীব্রভাবেÑ অত্যন্ত তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করছি।” (প্রশংসাধ্বনি) দশ বছর আগেও ওই একই যুক্তিতে কর্নাটকের পৃথকীকরণের বিরোধিতা করে তিনি সাইমন কমিশনের কাছে আলাদা রিপোর্ট পেশ করেছিলেন।

বম্বে আইনসভায় অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উপস্থাপিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল বম্বে পুলিশ কার্যবিধির (Bombay City Police Act) সংশোধন। অন্য কোনো বিলেই এমন উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা ও ভীষণ আক্রমণ হয়নি। সমস্ত বিরোধী নেতারা দেখতে চেষ্টা করলেন যে, তার উদ্দেশ্য যেন শুধুমাত্র দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হয়। ওই বিল সম্পর্কে একটি জরুরি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে আম্বেদকর বলেন যে, জনসাধারণ ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছেন, ফলে তাঁদের জীবনের এ বিপদ একটি বাস্তব ঘটনা। তিনি বলেন যে, বম্বের অপরাধ জগতে দীর্ঘ বাইশ বছরের বেশি সময় তিনি বাস করছেন এবং এই সভার সকল সদস্য ও পুলিশ কমিশনারের চেয়েও তিনি বেশি জানেন যে, গুণ্ডা-মস্তান ও দাদাদের দ্বারা কীভাবে জনসাধারণ নিগৃহীত হচ্ছেন। ওই নিগৃহীত লোকদের পক্ষে তার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করাও অসম্ভব, কারণ তাঁরা আরও বেশি নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে আইন-আদালতে তাদের সাজা দেবার জন্য যেতে পারেন না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সকলেই চাইবেন যে, ওই রক্তপাত অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। কিন্তু সেইসঙ্গে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থাও থাকবে যাতে পুলিশ কমিশনার তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে পারেন। কার্যপদ্ধতির ভিতর যেন কোনো রকম ফাঁক না থাকে। যে উদ্দেশ্যে আইন, সেই উদ্দেশ্যেই যেন তা ব্যবহার করা হয়।

যে যমনাদাস বিলের প্রথম পাঠেই আপত্তি করেন, এবার তিনি বলেন যে, এমনকি ডাকাতকেও তার আত্মরক্ষার সুযোগ দিতে হবে। তাতে আম্বেদকর জিজ্ঞেস করেন, এটা কি আদর্শ ব্যবস্থা? যমনাদাস মন্তব্য করেন, এমনকি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরাও এ অধিকার খর্ব করার কথা ভাবেন না। একটু পরে আম্বেদকর বলেনÑ “আমি যমনাদাস মেহতার চেয়ে এ বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন যে, ব্যবস্থাটি যেন শ্রমিক বিরোধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হয়।

যমনাদাস মেহতাÑ আমার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন নন।

আম্বেদকরÑ আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে বলব, আমি বেশি উদ্বিগ্ন।

১৯৩৮ সালের মে মাসের প্রথম দিকে 'সৎনামী'-দের প্রধানের ব্যপারে একটি মামলা পরিচালনা করতে আম্বেদকর নাগপুর যান। নাগপুর স্টেশনে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। কোর্টের কাজের শেষে রাতে জনসাধারণ ঝড়বৃষ্টি ও বিদ্যুৎচমকানির মধ্যেও তাঁর কথা শোনার জন্য ভিড় করেন। পরদিন সকালে তিনি ছাত্রদের এক সভায় ভাষণ দেন, তারপর কামটিতে গিয়ে একটি ভাষণ দিয়ে বম্বে ফিরে আসেন।

কংগ্রেস দল প্রদেশ শাসন করলেও আম্বেদকর তখনও বম্বে গভর্নমেণ্ট আইন কলেজের অধ্যক্ষের কাজ করছেন। **১৯৩৮** সালের মে মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। কলেজ-ম্যাগাজিনে তখন লেখা হয়Ñ কলেজ "এমন একজন অধ্যক্ষকে হারাচ্ছে, যিনি তাঁর শিক্ষা ও যোগ্যতার জন্য ছাত্রদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা সব সময় কঠোর পরিশ্রম ও যত্নের সাথে তৈরি হত, এবং ছাত্ররাও গভীর মনোযোগে তা শুনত।" কলেজ পত্রিকা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে যে, তাঁর কার্যকালে লাইব্রেরির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং আইন সম্পর্কে তাঁর মৌলিক জ্ঞান ছিল।

১৩ মে আম্বেদকর কোংকন জেলা পরিদর্শন করেন। তিনি কোলাপুর হয়ে কংকাভ্লি যান। কংকাভ্লিতে 'আম্বেদকর নগর' নামের একটি প্যাণ্ডেলে দলিত শ্রেণির একটি সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। কোংকনে কৃষি সম্পর্কীয় আন্দোলনের উদ্যোক্তা এ.ভি.চিত্রে উপস্থিত ছিলেন। কাউলি, প্রধান ও টিপনিসও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ছোটো শহরটি জীবনে এই প্রথম এই সম্মেলনে লাউডস্পিকারের ব্যবহার দেখে। আম্বেদকর সম্মেলনের প্রতি তাঁর নির্দেশে বলেন যে, মহারাষ্ট্রে কুড়ি লক্ষ মাহারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের উচিত তাঁদের অধিকার আদায় ও আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম লড়াই করা। ভিক্ষা করা ও পরিত্যক্ত খাদ্য খাওয়ার বদভ্যাস তাঁদের ত্যাগ করা উচিত। আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধিদের কাজকর্মের প্রতিও তাঁদের লক্ষ রাখা উচিত। তিনি ঘোষণা করেন যে, খোটি প্রথা বিলুপ্ত করে তাঁদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর আনা বিলটি যদি পাশ না হয়, তবে তাঁদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালু করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরদিন আম্বেদকর দেবরুখ ও আরাবালি পরিদর্শন করেন। উভয় স্থলে অল্প সময়ের জন্য থেমে দলিত শ্রেণির জনতার সামনে বক্তৃতা করেন এবং **১৬** মে রাতে চিপলুন পৌঁছান। পরদিন সকালে তিনি গুহাগড়ে যান এবং এক সভায় বক্তৃতা দিয়ে চিপলুন ফিরে এসে আর একটি বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতাদের বলেন যে, গান্ধির

তথাকথিত সম্মোহনী বিদ্যা তাঁকে ভোলাতে পারে না। জহরলাল নেহরু এবং সুভাষ বসু তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, কিন্তু তিনি কখনও তা করবেন না। যদি তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন, তবে তাঁর নিজের প্রতিভায়ই তিনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস দল তাঁর উত্থাপিত খোটি বিলটি দশমাস ধরে স্থগিত রেখেছে। যদি ওটা ব্যর্থ হয়, তবে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন করুন এবং তিনি এ ব্যাপারে সবার আগে কারাবরণ করবেন। তিনি কৃষকদের বলেন যে, কৃষকেরা দেশের শতকরা আশিজন, তিনি দেখতে চান যে, তাঁদেরই কেউ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর গদি দখল করছেন।

খেড় ও দাপোলির সভায় বক্তৃতা শেষে তিনি মাহাদে পৌঁছান। যেখানে কোংকনের প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতায় বর্তমান সরকারের নীতিতে তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। ২১ মে প্রায় হাজার মাইল পথ পরিক্রমার পর তিনি বম্বে পৌঁছান। অবিশ্রাম বক্তৃতার ফলে তাঁর গলার স্বর ভেঙে যায়। শেষ সভায় তিনি একটি কথাও বলতে পারেননি।

বম্বে পৌঁছে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর দলের প্রতি জনগণের দিন দিন সমর্থন বাড়তে থাকা ও তাঁদের ভূমিদাস প্রথা দূর করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার প্রতি তাঁদের সকৃতজ্ঞ প্রশংসায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ইণ্ডিয়ান লেবার পার্টি তাঁর নিজস্ব পথে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা করছে। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীসভা যদি সাংবিধানিক উপায়ে সাহায্য করতে না চায় এবং মন্ত্রীসভার প্রতি জনগণ যদি বিশ্বাস হারায়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা হবে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার। যে সমাজতান্ত্রিকরা অনেক বছর ধরে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য চিৎকার করে আসছিলেন, খোটি প্রথা বিলোপের বিলের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ক্রিয় দেখে তিনি অবাক হন।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলির কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার কাজে একটি বিপদ দেখা দেয়। কংগ্রেস দলের কর্তারা প্রধানমন্ত্রী ডঃ খারের বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য তাঁকে পদচ্যুত করেন।

১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বম্বের আর.এম.ভাট হাইস্কুলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি ব্যাপারে ওই সভায় বিপুল জনসমাগম ঘটেছিল। একটি হচ্ছে ডঃ খারের পদত্যাগপত্রের খসড়া সংশোধন করে দিয়েছিলেন গান্ধি, এখন তিনি তা অস্বীকার করছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে গান্ধির অস্বীকৃতি যে তাঁর মিথ্যা আচরণ, ডঃ খারের তা প্রকাশ করে দেওয়া; আর তৃতীয়টি হচ্ছে ডঃ খারে তাঁর মন্ত্রীসভায় একজন হরিজন সদস্য নিয়েছিলেন, গান্ধির তাতে আপত্তি। এই বিষয়গুলিই ছিল সেই মর্মান্তিক নাটকের পটভূমি। সেই সভায় ডঃ মুঞ্জে, যমনাদাস মেহতা, ডঃ আম্বেদকর

তাঁদের বক্তৃতায় খারেকে সেই আইনসভার নেতা হওয়ায় তাঁর পছন্দের মন্ত্রী নির্বাচনকে সমর্থন করেন। ডঃ খারে হরিজন সেবক সংঘের কার্যনির্বাহক কমিটির একজন সদস্য এবং খারের সঙ্গে গান্ধি কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলি ভ্রমণ করে হরিজন উন্নয়নে তৎপর ছিলেন। এখন গান্ধি একজন হরিজনকে মন্ত্রী করার অনুমতি খারেকে দেবেন না!

সেই সময় গান্ধিকে যদি কেউ 'পবিত্র মানব' বলে প্রশংসা করতেন, তবে উত্তরে আম্বেদকর গান্ধিকে পেঁচক স্বভাবের বলতেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলতেন। একটি মারাঠি সাপ্তাহিকের সাথে সাক্ষাৎকারে আম্বেদকর বলেন, **"যদি কোনো লোক বগলে ছুরি ও মুখে ঈশ্বরের নাম নিয়ে মহাত্মা হতে পারেন, তবে মোহনদাস করমচান্দ গান্ধিও একজন মহাত্মা।"** ভারতের রাজনীতিতে অন্য কোনো নেতা এমন রূঢ় কথা বলেননি। আসলে কোনো বিপ্লবী নরম সুরে কথা বলেন না, এবং ধূলি-ধোঁয়া না উড়িয়েও চলেন না।

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আম্বেদকর আমেদাবাদ থেকে তিরিশ মাইল দূরে ছোট্ট শহর বাভলা পরিদর্শন করেন। সেখানে দলিত শ্রেণির এলাকায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁদের মুখের করুণ দৃশ্যে বিচলিত হয়ে তিনি মহারাষ্ট্রের তাঁদের ভাইদের মতো সাহস ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে বলেন। ফেরার পথে আমেদাবাদে প্রেমাভাই হলে তিনি এক বক্তৃতা দেন। তিনি স্বীকার করেন যে, রাজনীতিতে তিনি গান্ধির বিরোধী। তার কারণ গান্ধির প্রতি তাঁর কোনো বিশ্বাস নেই। তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন না যে গান্ধি দলিত শ্রেণির কোনো উপকার করবেন। তিনি বলেন, গান্ধি যদি আন্তরিকই হবেন, তবে কেন বম্বে ও কেন্দ্রীয় প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদেরকে তাঁদের মন্ত্রীসভায় দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি নিতে বলছেন না? তিনি বলেন, বম্বের কংগ্রেস সরকার জমির খাজনা কমাচ্ছে না বা ধনীদের উপর করও ধার্য করছে না। আগের সরকার দলিত শ্রেণির লোকদের পতিত জমি চাষ করতে দিতে, পুলিশ বিভাগে নিয়োগ করতে এবং একটা অংশকে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস সরকার সেসব গ্রাহ্যই করছে না। মাসের শেষদিন বেলগাঁও জেলা ইণ্ডিয়ান লেবার পার্টির সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি নিপানি যান। নিপানি পৌঁছালে এক বিরাট জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে পঞ্চাশটি বলদে বাহিত রথে তাঁকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বম্বে আইনসভায় শ্রমিক বিরোধ বিল বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়। আম্বেদকর ও যমনাদাস মেহতা ওই বিলের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। আম্বেদকর বলেন, বিলটি শ্রমিকবিরোধীÑ অন্যায়, নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু। কারণ তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মঘট বেআইনি বলে শ্রমিকদের

ধর্মঘটের অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। তা ছাড়া তা মালিককে বাজেট প্রকাশ করতে বলেনি এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবহারের কথা বলেছে।

আম্বেদকর বলেন, তাঁর মতে ধর্মঘট সাধারণত নিন্দনীয়, কিন্তু অপরাধ নয় এবং কোনো মানুষকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করানো দাসত্বের সামিল। শ্রমিককে শাস্তি দেওয়া মানে তাকে ক্রীতদাস করে রাখা। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে অনিচ্ছাকৃত কাজ করানো দাসত্বের সমান। তাঁর মন্তব্য, মানুষ যে কোনো শর্তে চাকরি গ্রহণ করুন না কেন, ধর্মঘট করা তাঁর চাকরির স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কংগ্রেসিরা মনে করেন যে, স্বাধীনতা একটি পবিত্র অধিকার তাহলে ধর্মঘটও একটি পবিত্র অধিকার।

তিনি বলেন, বিলটির নাম হওয়া উচিত 'শ্রমিকদের নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত অ্যাক্ট'। বিলটি পশ্চাৎমুখী ও প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ায় তা শ্রমিকদের ধর্মঘট সীমিত করে এবং ধর্মঘটকে বেআইনি ও অসম্ভব করে তুলেছে। সুতরাং তাঁর স্রষ্টা ১৯২৯ সালের ব্যাবসা বিরোধী আইনের চেয়েও বেশি রক্ষণশীল। শেষ আঘাতে মুন্সী ও আম্বেদকরের মধ্যে বাকযুদ্ধ চরমে ওঠে।

আম্বেদকর তখন সরকারকে বিদ্রূপ করে বলেন, এই সরকার দাবি করে যে, তারা শ্রমিকের ভোটে নির্বাচিত। কিন্তু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পালন করে না। তিনি বলেন, এটা এমন গণতন্ত্র, যা শ্রমিকদের দাস করেছে। গণতন্ত্রের প্রহসন মাত্র। দুই তার্কিক এবং প্রতিভাবান শ্রমিক নেতা বিলটিকে এমনভাবে আক্রমণ করেন যে, ট্রেজারি বেঞ্চ যেন গরম জলে পড়ে যায়। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা তা পাশ করাতে কৃতসংকল্প, তাই তাঁরা করেও।

শ্রমিকদের প্রতি এই উদাসীনতার জন্য আইনসভার বাইরে শিল্পাঞ্চলীয় শহর ও নগরগুলিতে বিলের বিরোধিতার এক জোয়ার বয়ে যায়, মনে হচ্ছিল বিলটি বোধ হয় অনুমোদন পাবে না। ১৯৩৮ সালের ৭ নভেম্বর সোমবার, ইণ্ডিয়ান লেবার পার্টি ও বি.পি.টি.ইউ.সি. একদিনের ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রচণ্ড ঝড়ের মতো একদিকে ধর্মঘটের পস্তুতির জন্য প্রচার চলে এবং অন্যদিকে তা ব্যর্থ করার জন্যও আন্দোলন চলে।

ষাটটি বিভিন্ন সংগঠন শ্রমিকদের ডাক দেয়। ৭ নভেম্বরের কর্মসূচির শেষ প্রস্তুতির জন্য যমনাদাস মেহতার সভাপতিত্বে ৬ নভেম্বর সকাল আটটার সময় টি.ইউ.সির 'কর্মোদ্যোগ পরিষদ'-এর (Council of Action) সভা অনুষ্ঠিত হয়। আম্বেদকর, পারুলেকর, মিরাজকর, ডাঙ্গে, নিম্বকর এবং অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিল একটি শোভাযাত্রা বের করার ও সমস্ত কল-কারখানায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং শিল্পাঞ্চলীয় শহরের শ্রমিকদের কাছে ওই

বিলের প্রতি ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ প্রকাশের আবেদন জানায়।

আম্বেদকর তাঁর দলের এম.এল.এ.-দেরকে ‘কর্মোদ্যোগ পরিষদ’-এর (Council of Action) সভায় ডেকে ধর্মঘট সফল করার জন্য এক বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যমনাদাস মেহতাও ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দলের কর্মীদের বিশেষ এলাকায় শ্রমিকদের উৎসাহ দান ও কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়। কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রীরা, যাঁদের এম.এন.রায় ‘গান্ধিনীতির বিপর্যয়কারী’ আখ্যা দিয়েছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, আম্বেদকর তাঁর দলকে ধর্মঘটের দ্বারা শক্তিশালী করছেন, তাই তাঁরা ধর্মঘট সমর্থন করেননি। কংগ্রেসের স্টিম রোলার বলে পরিচিত এস.কে.পাতিল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে অনেকগুলি সভার আয়োজন করেন এবং কটনগ্রীনের সভায় নিজে বক্তৃতাও দেন।

বম্বে প্রদেশের সীমান্ত জেলাগুলি থেকে বম্বে সরকার বারোজন অফিসারসহ তিনশো সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ মিলগেটের কাছে বিশেষ বিশেষ জায়গায় রণকুশলী কায়দায় মোতায়েন করে। যে ইণ্ডিয়ান লেবার পার্টি স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে হ্যাণ্ডবিল প্রচার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণই ছিল মূল লক্ষ্য। এইভাবে দু’পক্ষই যুদ্ধে প্রস্তুত।

৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় কামগড় ময়দানে শ্রমিকসমাবেশ হয়। সেখানে আশি হাজার শ্রমিক যোগ দেন। যমনাদাস মেহতা সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেন এবং অন্যান্য নেতারা বিলের নিন্দা করে জোরালো বক্তৃতা দেন। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক শ্রমিকদের এই কালা বিল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে বলেন। ডাঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের হাস্যোদ্দীপক দর্শনের প্রতি চরম আঘাত হানেন। আম্বেদকর কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার সমালোচনা করে বলেন যে, শ্রমিকদের কর্তব্য ধর্মঘট সফল করা।

সভাশেষে কামগড় ময়দান থেকে তাঁরা এক বিরাট শোভাযাত্রা শুরু করে প্যারেল, লালবাগ ও ডি.লিসলে রোড পরিক্রমা করে ওর্লির জাম্বোরি ময়দানে এসে থামেন।

রাতে যমনাদাসকে সভাপতি এবং আম্বেদকর, ডাঙ্গে, নিমকর, মিরাজকর ও প্রধানকে সদস্য করে একটি পরিদর্শন কমিটি গঠিত হয়। প্রচার কাজে নিয়োজিত আড়াই হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে শতকরা নব্বইজনই ছিলেন আম্বেদকরের দলের লোক।

পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় পুলিশ কর্মচারীরা ধর্মঘটের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে এসে হাজির হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুন্সী অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি না রাখার জন্য আগেই পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন। পরিপূর্ণ শান্তিতে ধর্মঘট আরম্ভ হয়। আম্বেদকর ও যমনাদাস এই দুই শ্রমিক নেতা লাল নিশানে

সজ্জিত লরিতে পাশাপাশি বসে লাউডস্পিকারে যেখানে শ্রমিকেরা রাস্তায় শ্রেণিবদ্ধভাবে ছিলেন তাঁদের ধর্মঘট সফল করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। প্রায় সব টেক্সটাইল মিল ও সমস্ত মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কশপ বন্ধ থাকে।

স্বার্থান্ধ দলের বিরাট বাধার মধ্যে একটা জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক নেতাদের পরিচালিত এটি একটি প্রথম সফল ধর্মঘট। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন ও ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সরকারকে সমর্থন করে এবং যে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসকে ক্ষমতায় দেখতে চায় তারাও এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। তারা সকলেই ধর্মঘটকে ছোটো করে দেখাবার জন্য তার গুরুত্বকে খর্ব করতে এবং শ্রমিকদের মধ্যে আম্বেদকরের প্রভাব কমাবার উদ্দেশ্যে কল্পিত মিথ্যা খবর প্রকাশ করে।

মিলগুলির স্নায়ুকেন্দ্র ডি.লিসলে রোডে পাথর ছোড়ার ফলে কয়েকজন আহত হন। একজন পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন কনস্টেবল আহত হলে জনতাকে বিচ্ছিন্ন করতে পুলিশ গুলি চালায়, তাতে দু'জন আহত হন। প্যারেল রোডে সকাল এগারোটায় মুন্সীর গাড়ি একটি লোকের দ্বারা আক্রান্ত ও গাড়ির জানালা-পর্দা ভাঙা হলে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। মন্ত্রীর গাড়িতে থাকা সর্দার প্যাটেল, মথুরাদাস ট্রিকমজি এবং ভবনজি খিমজি আহত হননি। মোট বাহাত্তরজন আহত, এগারোজন গুরুতর আহত এবং পঁয়তিরিশ জন গ্রেপ্তার হন। সারাদিন পুরোদমে ধর্মঘট চলে।

ওইদিন শ্রমিক নেতাদের ডাকে অন্যান্য জেলায়ও যেখানে শ্রমিক এলাকা সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়। ওই সমস্ত এলাকার শহরগুলিতেও শোভাযাত্রা বের হয়। আহমেদাবাদ, অমলনার, জলগাঁও, চালিশগাঁও, পুনা ও ধুলিয়াতেও ধর্মঘট হয়।

ওই একদিনের ধর্মঘটের শেষে সন্ধ্যায় শ্রমিকদের এক বিরাট পুনর্মিলন ঘটে বম্বের কামগড় ময়দানে যমনাদাসের সভাপতিত্বে। সেখানে রণদিভে, প্রধান, নিমকর, ডাঙ্গে, মিরাজকরÑ কম্যুনিস্ট দলের উচ্চস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই কালা বিলের জন্য সরকারকে তুলো ধোনার মতো আক্রমণ করেন। সভাশেষে বিলটির ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিমূর্তি অগ্নিদগ্ধ করা হয়। আম্বেদকর আগুনঝরা বক্তৃতায় সাফল্যজনক ধর্মঘটের ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মীদের অভিনন্দন জানান এবং সরকার ও মিলমালিকদের ভাড়াটিয়া যে সান্ধ্য পত্রিকাগুলি ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রচার করে তাদের নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, ধর্মঘট বিরাটভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের বলেন যে, শুধু সভায় যোগদান করা বা স্লোগান দিয়ে অথবা বিলের প্রতিবাদ করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হবে না। তাঁদের নিজেদের লোকদের নির্বাচিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে। শেষে বলেন যে, কংগ্রেস যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের সংগ্রাম করে, তবে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

সর্দার প্যাটেল বিবৃতিতে বলেন যে, শ্রমিক নেতাগণ দমনমূলক পন্থা অবলম্বন করেছেন। উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, সর্দার প্যাটেলের বিবৃতির আগাগোড়াই মিথ্যা।

ধর্মঘটে দু'টি জিনিস দেখা যায়। সব রকম ভাবেই এটা প্রমাণিত হয় যে, আম্বেদকর শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও আধিপত্য করতে পারেন। তাঁর সংগঠন দরকারি ভূমিকা নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। শ্রমিক নেতা হিসাবে তাঁর যশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় শ্রমিক সমস্যার ব্যাপারে তার ভিত্তিভূমিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর প্রদেশের কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দ ১৯৩৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর আম্বেদকরের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বম্বের শ্রমিক সমস্যা ও কৃষক আইন সম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য আম্বেদকরকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। আম্বেদকর বলেন, কংগ্রেস যদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তবে তিনি সানন্দে ইণ্ডিয়ান লেবার পার্টি ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজি আছেন। কিন্তু কংগ্রেস সংবিধান কাঠামোকে ব্যবহার করে ধনতান্ত্রিক ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের কায়েমি স্বার্থ বাঁচিয়ে কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে বলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন না।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আম্বেদকর 'ঔরঙ্গাবাদ জেলা দলিত শ্রেণি সম্মেলন'-এ সভাপতিত্ব করেন। হায়দারাবাদ রাজ্যে অস্পৃশ্যদের এটি প্রথম সম্মেলন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি একটি স্পষ্ট বিবরণ দিয়ে দেখান কীভাবে মানুষ নিপীড়িত হচ্ছেন, শক্তি প্রয়োগের ফলে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন এবং ব্রাহ্মণেরা মুসলিমদের সাহায্যে সাধারণ জলাশয় থেকে জল নেয়ার প্রচেষ্টাকে ও মন্দির-প্রবেশের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। হায়দারাবাদের দলিত শ্রেণির কাছে আম্বেদকর এই বাণী দিলেন যে, তাঁরা যেন আত্মসম্মানবোধকে বাঁচিয়ে রাখেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ফেডারেশন ও পাকিস্তান

১৯৩৯ সালের ৬ জানুয়ারি মাহাদে কৃষকদের এক বিশাল সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আম্বেদকর বলেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার উপসম করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী খের নামেই একজন প্রধান মাত্র। প্রাদেশিক সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের তিনি সর্দার প্যাটেলের পোষা কুকুরের মতো বলে বর্ণনা করেন। এই সময় তিনি গুজরাটে খেরের অভ্যর্থনা সভায় সর্দার প্যাটেলের দাম্ভিক উক্তির কথা উল্লেখ করেন। সেখানে প্যাটেল বলেছিলেন যে, তাঁরা খেরকে গান্ধির একজন অনুগত ভক্ত হিসাবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়। নতুবা আনুষ্ঠানিক সম্মান ছাড়াই তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। আম্বেদকর বলেন যে, একজন মহারাষ্ট্রীয়ানকে ভীষণভাবে অপমান করার জন্য তিনি প্যাটেলের উপর প্রতিশোধ নেবেন। প্যাটেল যদি তাঁকে এভাবে অপমান করতেন তবে তিনি চাবুক মারার মতো জবাব দিতেন। এটা কোনো স্বগতোক্তি নয়, এটা ছিল জনতার কাছে ঘোষণা। কংগ্রেসি নেতাদের অমার্জিত মানসিকতার প্রতি এটা ছিল তাঁর দৃঢ় মনের ঘৃণা ও ক্রোধের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা।

বম্বে ফিরে যাওয়ার পর আম্বেদকর ১৯৩৯ সালের ৮ জানুয়ারি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি'র (I.L.P.) প্যারেলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কুচকাওয়াজে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের গুণমান ও দায়িত্বজ্ঞানের উষ্ণপ্রশংসা করেন। তাদের কাজ ও শৃঙ্খলা বোধের জন্য সর্দার প্যাটেল ও প্রধানমন্ত্রী খের যে উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন তিনি তারও উল্লেখ করেন।

ইতিমধ্যে ভারতে প্রস্তাবিত ফেডারেশন চালু করার বিষয়টি প্রধান রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে গুরুত্ব লাভ করে। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সাথে আলোচনা শেষে ভাইসরয় লণ্ডন থেকে ফিরে এলে ভাবা হয়েছিল যে, সত্বর ফেডারেশন চালু করার এটা একটা পদক্ষেপ। ব্রিটিশ রাজনীতিকরা এখন রাজ্যসরকারের গণতন্ত্রীকরণ ছাড়াই রাজ্যগুলির ফেডারেশনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে। সংক্ষেপে বলা যায়, কংগ্রেসের ডানপন্থীরা রাজ্য প্রতিনিধিদের সাহায্যে ফেডারেল অ্যাসেমব্লিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য লড়াই করছিলেন এবং রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে চাইছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ফেডারেশন স্বীকার করার বিরোধী ছিলেন। মুসলিমরাও তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। মুসলিমদের ভাগ করার মানসিকতাকে প্রতিহত করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হিন্দু মহাসভা চাইছিল তা কার্যকর করতে।

প্রস্তাবিত ফেডারেশনের প্রকারগত দিকের ঘোর বিরোধী ছিলেন আম্বেদকর। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে এ ব্যাপারে দু-একবার তিনি প্রকাশ্য সভায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তও করেছিলেন। এবার তিনি ঠিক করেন ফেডারেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ করবেন। যখন তিনি গোখেল এডুকেশন সোসাইটির 'স্কুল অব্ পলিটিকস অ্যাণ্ড ইকনমিকস'-এর তরফ থেকে পুনায় বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন, তখন সেই সুযোগ পান। ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারি দু'ঘণ্টা ধরে দেওয়া বক্তৃতায় কীভাবে এই ফেডারেশন দেশের স্বাধীনতায় সহায়তা না করে বাধার সৃষ্টি করবে, তিনি তা বুঝিয়ে বলেন। কারণ হল, ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা হবেন স্বাধীন অথচ রাজ্যের প্রতিনিধিরা হবেন ব্রিটিশ আমলাদের ক্রীতদাস এবং তাঁরাই রাজন্যবর্গকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্দেশ দেবেন।

তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত ফেডারেশনে সাধারণ নাগরিকত্ব তৈরি হবে না, জনসাধারণ রাজ্যের অধীন হয়েই থাকবেন এবং তাঁদের জন্য ফেডারেল সরকার প্রত্যক্ষভাবে কিছু করতেও পারবে না। তিনি বলেন, যদিও তিনি ফেডারেল পরিকল্পনার বিরোধী নন, তবুও তিনি এক-কেন্দ্রিক সরকারের সমর্থক; কারণ এর সাথে জাতীয়তাবাদ মানানসই, যা ভারতে দরকার। তিনি বলেন যে, এই ফেডারেশন ভারতকে একতাবদ্ধ করতে কোনো সাহায্যই করবে না; কারণ, সব রাজ্যগুলির এতে যোগ দেবার পথ খোলা নেই। আবার এই ফেডারেশন কোনো দায়িত্বশীল সরকারও দিতে পারবে না, যেহেতু প্রতিরক্ষা ও বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তার কোনো ক্ষমতাই নেই। ব্রিটিশ ভারতে তা গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করবে।

আম্বেদকর তাঁর বক্তৃতার মাঝে গান্ধিযুগের সাথে রানাডেযুগের তুলনা করেন। রানাডেযুগ ছিল সৎ ও অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত। রানাডেযুগের নেতারা ভারতকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলার জন্য লড়াই করতেন। তাঁরা ভাল পোশাকপরিচ্ছদের প্রতিও নজর দিতেন। যে রাজনীতিক অধ্যয়নশীল নন তাঁকে অসহ্য উপদ্রব বলে মনে করা হত। সে যুগের মানুষেরা জীবনের ঘটনাবলি নিয়ে অনুশীলন করতেন ও পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন এবং তা থেকে তাঁরা যে ফলাফল পেতেন তার আলোকেই তাঁদের জীবন ও চরিত্র গড়ে তুলতেন। কিন্তু গান্ধিযুগে নেতারা অর্ধেক পোশাক পরতেই গর্ববোধ করেন এবং ভারতকে আদিম যুগের জীবন্ত নমুনা হিসাবে তৈরি করছেন। রাজনীতিকদের বিদ্যাশিক্ষা করা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বলে মনে করা হয় না এবং জনসাধারণও জীবনের ঘটনাবলি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত যে, গান্ধিযুগ হচ্ছে ভারতের অন্ধকার যুগ।

আইনসভায় তখনও ৭ নভেম্বরের ধর্মঘট নিয়ে নানা কথা চলছে। ৭ নভেম্বরের

গুলিচালনার বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্টে বিশৃঙ্খলার জন্য কম্যুনিস্টদের এবং আম্বেদকরকে দায়ী করে পুলিশের গুলিচালনাকে যুক্তিযুক্ত বলা হয়। আলোচনার জন্য যখন কমিটির রিপোর্ট আইনসভায় ওঠে, তখন এক নজির বিহীন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যমনাদাস মেহতা রিপোর্টটিকে একপেশে বর্ণনা করে বলেন যে, সমস্ত তথ্য তদন্ত করে পাওয়া নয়, কমিটির জন্য বানানো তথ্য! আত্মপক্ষ সমর্থন করে আম্বেদকর বজ্রকণ্ঠে বলেন, "আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি 'কর্মোদ্যোগ পরিষদ'-এর (Council of Action) সাথে যুক্ত ছিলাম বলে আমি বিচারের মুখোমুখি হতেও রাজি। যাঁর সাহস আছে, দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং এই তথ্যপ্রমাণে যিনি বিশ্বাসী, এমন যে কেউ এগিয়ে এসে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করুন। কমিটি বলেছে গুলিচালানো সঠিক হয়েছে এবং এর পিছনে কারণ আছে। তাহলে একটাই প্রশ্ন যে, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে কি থাকবে না। 'স্বশাসন' (Home Rule) কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে, আমাদের মন্ত্রী আমাদের নিজেদের লোকদের গুলি করতে পারেন এবং আমাদের আর সবাই পুরো দৃশ্যটি দেখে স্রেফ হাসবেন কিংবা তিনি একটি বিশেষ দলের লোক বলে তাঁকে সমর্থন করতে উঠে দাঁড়াবেন, তাহলে আমি বলব 'স্বশাসন' ভারতের পক্ষে একটা অভিশাপ, তাতে ভারতের কোনো উপকার হবে না।" (তুমুল হর্ষধ্বনি।)

বিতর্কের উত্তরে বম্বের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুন্সী বলেন, আম্বেদকর ঘটনার বর্ণনা করতে কমিটির সামনে আসেননি। তিনি ধর্মঘটের দিন বেলা এগারোটার সময় কোর্টে একটি মামলা পরিচালনা করছিলেন এবং সন্ধ্যায় তিনি সভায় যোগ দেন। এরপর তিনি বিদ্রূপ করে বলেন যে, আম্বেদকর তাঁর দশ মিনিটের ক্ষণিক উপস্থিতিতে বিতর্কসভায় শোভাবর্ধন করে যে আত্মম্ভরি, বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অবিমৃষ্যকারী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁরা আগে থেকেই পরিচিত। মুন্সী গর্জে উঠে বলেন, আম্বেদকর যদি মামলা করার মতো বক্তৃতা দেন এবং শহিদ হওয়ার জন্য আরও কিছু করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে তিনি অবশ্যই মামলা করবেন এবং তাঁকে শহিদ বানাবেন। এরপর স্যার এ.এম.কে দেহলাভির কাছ থেকে 'পয়েন্ট অব্ অর্ডার' এলে মুন্সী 'অবিমৃষ্যকারী' শব্দটি প্রত্যাহার করে নেন। আম্বেদকর হস্তক্ষেপ করে মুন্সীকে প্রশ্ন করেন, তাঁর হাতে যে সব প্রমাণ আছে তার ভিত্তিতে তিনি কেন ধর্মঘটের দিন শ্রমিকদের মাথায় বারংবার আঘাত করার অপরাধে অভিযুক্ত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা করছেন না। এ কথা শুনে যমনাদাস মেহতা বলেন, "ওসব বিশ্বাস করবেন না।"

আম্বেদকর সওয়ালজবাবের সময় অতিরিক্ত শক্তিমত্তার পরিচয় দিলে কিংবা

অনমনীয় মনোভাব নিলে মন্ত্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য আর একটি অস্ত্র প্রয়োগ করতেন, সেটি হচ্ছে আইনসভায় দেরি করে আসা এবং তাঁর ক্ষণস্থায়ী পরিদর্শনের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী খের কয়েক বছর পরে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছিলেন যে, বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আম্বেদকর গঠনমূলক সমালোচনা ও উপদেশের মাধ্যমে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং ত্রুটিবিচ্যুতি ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে অবস্থার ভিতর আম্বেদকরকে আইনসভার কর্তব্য পালন করতে হয়েছে, তার সঠিক ধারণা পেতে আইনসভায় বিরোধীদের প্রতি কংগ্রেসি মন্ত্রীদের মনোভাব সম্পর্কে আইনসভায় যমনাদাস মেহতার একটি ভাষণের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। মেহতা বলেছিলেন, "আমরা যদি সরকারের বিরোধিতা করি, তাহলে অভিযোগ ওঠে আমরা বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করি; যদি আমরা নীতি সমর্থন করি ও তারপর অসুবিধাগুলির কথা বলি, তখন বলা হয় ওটা আদৌ সমর্থনই নয়। আমি চাই এ জাতীয় মনোভাব যথাসম্ভব কমানো হোক।"

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাজকোট রাজ্যে এক সমস্যা পাকিয়ে ওঠে; সেখানে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য এক জোরালো বিক্ষোভ হয়। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ায় পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত গান্ধি সাধারণ দৃষ্টিতে রাজ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য তাড়াহুড়া করে রাজকোটে রওনা হয়ে যান। কিন্তু তাঁর অভিসন্ধি ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ত্রিপুরি-কংগ্রেস সেশনের সময় তিনি এক হুজ্জত সৃষ্টি করেন। ওই রাজ্যের রিফর্মস কমিটিতে দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি না নেওয়ার বিবাদে হস্তক্ষেপ করার জন্য সেখানকার স্থানীয় দলিত শ্রেণি আম্বেদকরকে জরুরি ডাক দেন। সুতরাং তিনি বিমানযোগে রাজকোটে পৌঁছান এবং ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় সেখানকার শাসক থ্যাকার সাহেবের সাথে দেখা করেন। রাতে সেখানকার এক দলিত শ্রেণির জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তিনি তাঁদের উৎসাহিত করেন।

পরদিন সকালে রিফর্মস কমিটিতে হরিজনদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গান্ধির সাথে তাঁর পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা হয়। রাজকোটে এক সাক্ষৎকারে তিনি বলেন, গান্ধির হঠাৎ জ্বর হওয়ায় তাঁর সাথে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি জানিয়ে দেন যে, তাঁর বিকল্প প্রস্তাবটি স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর মতো একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞের কাছে জমা দেওয়ার প্রস্তাব গান্ধি মেনে নেননি। শেষ পর্যন্ত গান্ধি তাঁর অহিংসপন্থায় হৃদয় পরিবর্তন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভাইসরয়ের কাছে আবেদন জানিয়ে দমননীতি অবলম্বন করেন। হৃদয় পরিবর্তন ও অহিংসনীতি আন্দোলনের নেতা গান্ধি নিজেই প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর অহিংসনীতি তখনও পূর্ণশক্তিতে উন্নীত হয়নি। কাজেই, তাঁর ভাষায়,

'পোড়া আশা ও ভগ্ন শরীর' নিয়ে তিনি রাজকোট ত্যাগ করেন।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে আম্বেদকর বম্বের আর.এম. ভাট হাইস্কুল হলে 'রুহিদাস এডুকেশন কমিটি'-র পৃষ্ঠপোষকতায় চামার সম্প্রদায়ের আয়োজিত এক সভায় যোগ দেন। এ সভায় তাঁর উপস্থিতি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; ইতিপূর্বে চামার সম্প্রদায়ের প্রায় সব নেতাই ধর্মান্তরগ্রহণ সমস্যার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। গত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই তাঁর সাথে এঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। তাঁদের মতে, তাঁরা ধর্মান্তরগ্রহণের নীতি সমর্থন করেননি বলে আম্বেদকর তাঁদের সম্প্রদায় থেকে প্রার্থী মনোনয়ন করতে অস্বীকার করেছিলেন। ওই সভায় আম্বেদকর বলেন, তিনি সমস্ত দলিত শ্রেণির জন্যই উন্নতিমূলক কাজ শুরু করেছেন। উন্নয়নের কাজে তিনি গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক নীতিকে সমর্থন করেন না।

তিনি তাঁদের বলেন, দলিত শ্রেণির মধ্যে বিদ্যমান জাতপাতের বিভাজনকে দূর করার পক্ষে তিনি এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সততার সাথে কাজ কর যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন যে, বিয়ের ব্যাপারটা এমন এক সমস্যা, যা গায়ের জোরে সমাধান করা যায় না। এটা এমন ব্যাপার নয় যে যাদুকাঠি নাড়িয়ে আবশ্যিকভাবে চামার কিংবা মাঙ সম্প্রদায়ের ছেলের সাথে মাহার সম্প্রদায়ের একটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়। যাঁরা এমন বিয়ের অনুষ্ঠান করার সাহস দেখাতে পারেন, তাঁদের উচিত তাঁদেরকে উৎসাহিত করা। রাজনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন, কংগ্রেসের নেতারা কিছু দলিত নেতাকে তাঁর দলের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করে সুচতুরভাবে দলিত শ্রেণিগুলির মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছেন। সেইজন্য তিনি কংগ্রেসের মিথ্যা প্রচারের শিকার না হওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আবেদন জানান। কংগ্রেস নেতারা হরিজন নেতাদের মিষ্টি কথায় ভোলাচ্ছেন, কারণ তিনি কংগ্রেস শিবিরে নেই তাই। তিনি বলেন, এটা সত্যি যে, 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি' তার বেশির ভাগ অনুগামী পেয়েছে মাহারদের ভিতর থেকে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, কিন্তু এটা তাঁর দোষ নয় যে, দলিত শ্রেণির মধ্যে মাহাররাই সংখ্যায় বেশি। **পরিশেষে তাঁর মন্তব্যে তিনি তাঁর পুরোনো স্লোগানের কথা ভোলেননি যে, সম্প্রদায়গত ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে অন্য আর একটি ধর্ম গ্রহণ করা।**

কয়েকদিন পর নাসিকের হংসরাজ পি.থ্যাকার্সে কলেজ-কর্তৃপক্ষের আয়োজিত এক চা-পানের আসরে আম্বেদকরকে আপ্যায়িত করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার কর হিসাবে যে অর্থ আদায় করে, তা অবশ্যই কৃষকদের ঋণ মুক্ত করা, দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তিনি বলেন, তা করা যাবে না, যদি মাদক নিষিদ্ধকরণকে এইসব জরুরি সমস্যা থেকেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারত ভাগ সম্পর্কে সিকান্দার

হায়াত খানের অনুমোদিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা স্বীকার করেন কিনা জানতে চাইলে আম্বেদকর বলেন, ওই সাতটা অঞ্চলকে তিনি স্বীকার করেন না, বরং তাঁর আশঙ্কা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিকে ওটি একটি পদক্ষেপ। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি বা দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতীয়দের জন্য এর দু'টি সুফল আছেÑ একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মধ্যে একটি মাত্র সরকারেরই অংশ হিসাবে বাস করার অনুভূতি।

ঠিক এই সময় পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশ ভাইসরয়ের ঘোষণা অনুযায়ী ভারত জার্মানির সাথে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতের বিভিন্ন নেতা বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধকে বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন। ভারতীয় উদারপন্থী নেতারা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারকে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করার পক্ষে ছিলেন; কিন্তু জিন্নাহ্র পরিচালিত প্রধান মুসলিম সংগঠনের বক্তব্য ছিলÑ ব্রিটিশদের উচিত ভারতীয় মুসলিমদের মনে নিরাপত্তা ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার বোধ সৃষ্টি করা। প্রথমে সর্দার প্যাটেল ও জহরলাল নেহরু (তিনি তখন চিয়াং কাইশেকের চিনে উৎসাহবর্ধক ভ্রমণ করে ভারতে ফিরে এসেছেন।) সহ কংগ্রেসি নেতারা নিঃশর্ত সাহায্যদানের পক্ষে ছিলেন; তাঁরা বলেছিলেন, এমন সংকটকালে তাঁরা দরকষাকষি করবেন না।

'ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট হাউস' এবং 'ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে' ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মহা উদ্বেগে গান্ধি তো ব্রিটিশ ভাইসরয়ের সামনেই ভেঙে পড়েছিলেন। ব্রিটেনের দাবি, সে যুদ্ধে নেমেছে মানবিক স্বাধীনতার অপরিহার্য নীতিগুলিকে রক্ষা করার জন্যই। সাভারকার বলেন যে, ভারতকে রাজনৈতিক দাসত্বে আবদ্ধ রেখে ব্রিটেনের এই দাবি রাজনৈতিক চমক ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১ সেপ্টেম্বর ভাইসরয় ঘোষণা করেন যে, সরকারের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ফেডারেশন হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাকে স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। এ ঘোষণায় জিন্নাহ্ আনন্দে আত্মহারা হন।

'ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি'র নেতা আম্বেদকর এক বিবৃতি জারি করে বলেন, পোল্যাণ্ডের তরফে সদগুণের যথেষ্ট অভাব, বিশেষত ইহুদিদের সাথে তার আচার-আচরণে। পোলিশদের বিষয় হল যুদ্ধের একটি ঘটনা মাত্র। যারা জার্মানির সাথে একমত নয়, তাদের উপর জার্মানি তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেওয়ার যে দাবি করছে, তা সকল দেশের পক্ষেই হুমকি স্বরূপ। যাঁরা মনে করেন ইংল্যাণ্ডের অসুবিধা মানে ভারতের সুযোগ, তিনি তাঁদের সাথে একমত নন এবং বলেন যে, ভারতীয়দের নতুন প্রভু খোঁজা অনুচিত।

তিনি বলেন, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপনের মতো ব্যাপারে বিদেশনীতিতে ভারতের কোনো বক্তব্য থাকবে না, এটা অন্যায়। ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকা উচিত এবং সমমর্যাদার অংশীদারীত্ব লাভের জন্য লড়াই করা উচিত। দেশরক্ষার কাজে ভারতীয়দের প্রস্তুত করে তোলার পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন রাখেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভারতের প্রতিরক্ষাকে ভারতেরই একটি দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হবে বলে গোলটেবিল বৈঠকে তাঁরা রাজি হয়েছিলেন। তিনি বলেন, ভারতের প্রতি ব্রিটেনের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারত কীরূপ মর্যাদার আসন লাভ করবে সে সম্পর্কে আবারও ভারতকে আশ্বস্ত করা। ভারত যদি আশ্বস্ত না হয় যে, যুদ্ধ জয়ের পর ওই নীতিগুলির উপকারিতা তার কাছেও এসে পৌঁছাবে, তাহলে ভারত স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে না।

১৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের নেতারা তাঁদের মনোভাব বদল করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন, পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য স্বাধীন দেশগুলির সাথে ভারত সানন্দে সহযোগিতা করবে এবং ব্রিটিশ সরকারকে গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণা করতে বলেনÑ বিশেষত ভারত সম্পর্কে ।

এর কয়েকদিন পর সাভারকর, কেলকর, যমনাদাস, আম্বেদকর, স্যার চিমনলাল শেতলাবাদ, স্যার কাউয়াসজি জাহাঙ্গির ও স্যার ভি.এন. চন্দ্রভারকরÑ এই সাত নেতা একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, কংগ্রেস সকলের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠনÑ এই বলে গান্ধি যে দাবি করছেন তা একটি ফ্যাসিবাদী মনোভাব এবং তা ভারতের গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত বলে প্রমাণ করবে।

ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো অক্টোবরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় ৫২ জন ভারতীয় নেতাÑ যেমন গান্ধি, জিন্নাহ্, নেহরু, সাভারকর, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপসাদ, সুভাষ বসু, আম্বেদকর এবং অন্যান্যদের সাক্ষাৎকার নেন। আম্বেদকরের সাক্ষাৎকার ছিল অক্টোবরের ৯ তারিখ। তাঁর সাক্ষাৎকারে আম্বেদকর গভর্নর জেনারেলের উপর ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতির বিষয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের মতামতের গুরুত্ব প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এবং অভিযোগ করেন যে, পুনাচুক্তির কাজ মোটেই সন্তোষজনক নয়। সুতরাং সংবিধানের পরবর্তী সংশোধনের সময় তিনি এ প্রশ্ন তুলবেন।

ভারতীয় নেতাদের সাথে আলোচনার পর ভাইসরয় ভারতের প্রতি তাঁদের আশা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ছিলÑ যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতের প্রধান দলগুলির সাথে পরামর্শ করে ‘ভারত সরকার অধিনিয়ম’কে (Govt. of India Act) পুনরায়

সংশোধন করা হবে এবং সংখ্যালঘুদের (তখন তপশিলিরা সংখ্যালঘুর মধ্যে গণ্য) সম্মতি ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতির ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যুদ্ধের সময় সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হবে। ভাইসরয়ের এই বিবৃতিকে কংগ্রেসের কার্যকারী সমিতি সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক বলে ঘোষণা করে এবং ব্রিটেনেকে কোনো সাহায্য করা মানেই তার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করা, এই কারণে তাদের সব প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাকেই পদত্যাগ করতে বলে। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসি নেতারা যে নীতিকে ঘৃণা করতেন, ব্রিটিশ সরকার যাতে সেই নীতিই আরও সুবিধাজনক ভাবে চালিয়ে যেতে পারে, তাঁরা তারই সুযোগ করে দেন।

আম্বেদকর এই সময় দিল্লি থেকে এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, গান্ধি এবং কংগ্রেস কংগ্রেসের বাইরের কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি তাঁদের অহংবোধ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব ত্যাগ না করলে সংখ্যালঘুদের সমস্যার কোনোদিন সমাধান হবে না। তিনি বলেন যে, দেশপ্রেম শুধুমাত্র কংগ্রেসিদেরই একচেটিয়া অধিকারে নয়। কাজেই কংগ্রেস থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর লোকদেরও অস্তিত্ব বজায় রাখা ও স্বীকৃতি লাভ করার আইনি অধিকার আছে। মুসলিম সমস্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার বা সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে তাঁদের যে অভিযোগ তা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি নিশ্চিত করে বলেন, অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি তাঁরাও সরকারে অংশগ্রহণ করতে চান। সবশেষে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, মুসলিম লিগের ভারত ভাগ করার দাবি যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে অখণ্ড ভারতের আর কোনো আশা থাকবে না এবং দলিত শ্রেণিকে অন্য আর এক খোঁয়াড়ে তাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব বর্তাবে কংগ্রেসের উপরেই।

উপরোক্ত সাত নেতার যৌথবিবৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের অ-কংগ্রেসি নেতাদের যৌথবিবৃতির ফলে কংগ্রেস নেতারা বিচলিত বোধ করেন; ওই উভয় বিবৃতিতেই দলিত নেতারাও স্বাক্ষর করেছিলেন। দলিত শ্রেণির দাবিদাওয়ার সাথে নিজেকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের 'ওয়ার সাব-কমিটি'র চেয়ারম্যান জহরলাল নেহরু অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে বম্বেতে আম্বেদকরের সাথে দু'দিন ব্যাপী আলোচনা করেন। এটা নেহরুর সাথে আম্বেদকরের প্রথম আলোচনা, যাঁকে আগে এক ঘরোয়া কথাবার্তায় আম্বেদকর চতুর্থ শ্রেণির বালক বলে বর্ণনা করেছিলেন। আম্বেদকরকে নেহরুর কাছে নিয়ে যান খের। এই কথাবার্তার ঠিক পরেই বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ভুলাভাই দেশাইয়ের বাসভবনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং ডঃ আম্বেদকরের মধ্যে তিন-চার দিন ধরে আলোচনা চলে। গান্ধির সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইয়ের উপস্থিতিতেই এই আলোচনা হয়। তিনি এই

উদ্দেশ্যেই ওয়ার্ধা থেকে সেখানে আসেন। তিনি আম্বেদকরের মতামত গান্ধি এবং কংগ্রেসের কাছে পৌঁছে দেন। আলোচনাটি বম্বের কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার পদত্যাগের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে।

পদত্যাগ করার আগে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভায় যুদ্ধসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নিয়ম চালু করে। বম্বে মন্ত্রীসভা গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের লোকদের মতামত না নিয়েই ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধে অংশ নিতে ভারতকে বাধ্য করেছে এবং ভারতীয়দের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা ও কাজকর্ম কাটছাঁট করে আইন পাশ করে তা চালুও করেছে।

বম্বে সরকারের সিদ্ধান্ত থেকে “and have further in ... Provincial Governments”Ñ এই শব্দগুলি বাদ দেওয়ার জন্য আম্বেদকর একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। দেশের নামে দাবিদাওয়া উত্থাপন না করে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে উত্থাপন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তিনি দোষারোপ করেন এবং যুদ্ধনীতি সম্পর্কে তাঁর বিবৃতির পুনরুল্লেখ করে বলেন, অস্পৃশ্যরা কখনই তেমন রাজনৈতিক মর্যাদা স্বীকার করে নেবেন না, যা তাঁদেরকে রাজনৈতিক শূদ্রে পরিণত করবে। সামাজিক কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বÑ যা হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের উপরে এতকাল চালিয়ে আসছে, তার উপর যদি আবার রাজনৈতিক কর্তৃত্বও যুক্ত হয়, তাহলে তিনি তা মোটেই সহ্য করবেন না।

এরপর আম্বেদকর ব্যাখ্যা করে বলেন, কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠরা অস্পৃশ্যদের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার করে চলেছে। তিনি সভাকে জানান, একশো মামলাতদারের মধ্যে দলিত শ্রেণির মাত্র একজন; ৩৪ জন মহলকারীর মধ্যে তাঁদের একজনও নেই; ২৪৬ জন হেডক্লার্কের মধ্যে তাঁদের কেউ নেই ; ২৪৪৪ জন রেভিনিউক্লার্কের মধ্যে তাঁদের আছে মাত্র ৩০ জন; ৮২৯ জন পি.ডব্লিউ.ডি. ক্লার্কের মধ্যে তপশিলি শ্রেণির আছে মাত্র ৭ জন; এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টে ১৮৯ জনের মধ্যে ৩ জন; ৫৩৮ জন পুলিশ ইন্সপেক্টরের মধ্যে ২ জন; ৩৩ জন ডেপুটি কালেক্টরের মধ্যে তপশিলি শ্রেণির মাত্র ১ জন।

আম্বেদকর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় জোরালো কণ্ঠে বলেন– “আমি জানি আমার অবস্থান এ দেশে কেউ সঠিকভাবে বোঝেননি। আমাকে প্রায়ই ভুল বোঝা হয়েছে। সুতরাং আমার অবস্থান বোঝানোর এই সুযোগটি আমাকে নিতে দিন। স্যার, আমি বলছি যখনই আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সার্বিকভাবে দেশের স্বার্থÑ এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিয়েছে, তখনই আমি আমার দেশের স্বার্থকে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। আমি কখনও আমার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথ অবলম্বন

করিনি। আমি যদি নিজের স্বার্থের কথা ভাবতাম, যেমন অন্যান্যরা করে থাকে, তাহলে আমি আজ অন্য জায়গায় থাকতাম। কিন্তু আমি তা কখনও করিনি। গোলটেবিল বৈঠকে আমার সঙ্গে আমার সহকর্মীরা ছিলেন। আমি নিশ্চিত, আমি যা বলছি, তা তাঁরা সমর্থন করবেন, যেখানে দেশের দাবিদাওয়ার কথা ছিল আমি সেখানে কখনও পিছনে পড়ে থাকিনি। বৈঠকে আসা অনেক ইউরোপীয়ান সদস্য বরং বিব্রত বোধ করতেন এই ভেবে যে, বৈঠকে আমি ছিলাম এমন একজন যার বিতর্কিত মন্তব্য অন্যদেরকে চরমভাবে আঘাত করত।”

তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন, “কিন্তু আমি দেশের লোকদের মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখতে চাই না যে, আমার আর একটি আনুগত্য আছে যার প্রতি আমি দায়বদ্ধ। এটাকে আমি কখনও ত্যাগ করতে পারব না। আমার এই আনুগত্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রতি, যে সমাজে আমি জন্মেছি, যে সমাজের আমি একজন, সে সমাজ কখনও আমি ত্যাগ করব না। এই সভাকে আমি বলে দিতে চাইÑ আমার পক্ষে যতটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব, ততটাই জোর দিয়ে বলছি, যখন দেশ এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেবে তখন আমার কাছে কিন্তু দেশের স্বার্থের চেয়েও অস্পৃশ্যদের স্বার্থই বেশি গুরুত্ব পাবে। দেশের স্বার্থের জন্য হচ্ছেÑ শুধু এই কারণে আমি কোনো অত্যাচারী সংখ্যাগরিষ্ঠকে সমর্থন করব না। দেশের নাম করে বলা হচ্ছে বলেই আমি একটি দলকে সমর্থন করব না। না, আমি তা কক্ষনো করব না। এখানে এবং সব জায়গাতে সবাই জানুক এটাই আমার অবস্থান। দেশ এবং আমার মধ্যে যেসব প্রসঙ্গ আছে, তার মধ্যে দেশ অগ্রাধিকার পাবে, কিন্তু দেশ ও দলিত শ্রেণির মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে দলিত শ্রেণির মানুষেরাই, দেশ পাবে না। আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি তার মধ্যে এই কথাগুলিই বলেছি।”

হাইকমাণ্ডের নির্দেশ মেনে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাগুলি ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পদত্যাগ করে। কংগ্রেসের এই বিদায় দেখে জিন্নাহ্ আনন্দোচ্ছল হয়ে ঘোষণা করেন যে, মুসলিম ভারত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। তিনি দিনটিকে “মুক্তি দিবস” হিসাবে পালন করার জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানান। বিপুল সংখ্যক পারসি, যাঁরা কংগ্রেসের ‘নিষিদ্ধ কর্মসূচি’-র (Prohibition Policy) ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এই বিদায়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং কথা দেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই “মুক্তি দিবস” অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। আম্বেদকর ঘোষণা করেন, তিনিও জিন্নাহ্‌র সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চান। তিনি মন্তব্য করেন, “আমি মিঃ জিন্নাহ্‌র বিবৃতি পড়েছি এবং লজ্জাবোধ করছি এই জন্য যে, আমাকে পাশ কাটিয়ে গোপনে তাঁকে এগিয়ে যেতে আমিই সুযোগ করে দিয়েছি।

ব্যাপারটি এমন, তিনি ভাষা আর মানসিক আবেগ যেন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন; যা ব্যবহার করার অধিকার মিঃ জিন্নাহ্‌র চেয়েও আমার বেশি ছিল।" আম্বেদকর বলেন যে, কোনো নিরপেক্ষ বিচারালয়ে জিন্নাহ্ যদি একশোটি অত্যাচারের ঘটনার মধ্যে পাঁচটি প্রমাণ করতে পারেন, সেখানে তিনি প্রমাণ করতে পারবেন একশোটির মধ্যে একশোটিই। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এটা হিন্দু বিরোধী কোনো আন্দোলন নয়, এটা কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। হিন্দুরা যদি এটাকে তাঁদের উপর আক্রমণ বলে ব্যাখ্যা করেন, তার মানে দাঁড়ায় কংগ্রেস একটি হিন্দু সংগঠন এবং এই পরিণতির জন্য তাঁরা নিজেরাই দায়ী।

"মুক্তি দিবস" উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল গান্ধি ও কংগ্রেস বিরোধী এই দুই বিখ্যাত নেতা বম্বের 'ভেণ্ডি বাজারে' "মুক্তি দিবস"-এর সভায় মিলিত হয়ে করমর্দন করেন এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আগুনঝরা বক্তৃতা দেন।

এই সময় আর একটি সমস্যা দেখা দেয়, যেটি আম্বেদকরের মনকে বেশ কিছুদিন ধরে ঘিরে রেখেছিল। বম্বে সরকার 'মাহার বাটানদের' উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে। ১৯২৭ সাল থেকে আম্বেদকর এই সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিলেন। কিন্তু ভূমিদাসত্ব থেকে গরিবদের অব্যাহতি দেওয়ার বদলে সরকার অতিরিক্ত কর ধার্য করে তাঁদের কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দেয়। মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের মাহার, মাঙ ও বেথিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হরেগাঁওয়ে আম্বেদকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হন। বিশ হাজার মাহার, মাঙ ও বেথিয়াদের এই সভায় আম্বেদকর তাঁর ভাষণে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, সরকার যদি এই অত্যাচারমূলক আদেশ ফিরিয়ে না নেয় এবং সভার দিন থেকে ছ'মাসের মধ্যে জোর করে বিনা মজুরিতে কাজ করানোর অত্যাচার থেকে গরিব লোকদের নিষ্কৃতি না দেয়, তাহলে এই অত্যাচারের প্রতিবাদে কাজ করতে অস্বীকার করা ছাড়া তাঁদের আর কোনো বিকল্প থাকবে না। বাটানদারেরা যাতে রাজ্যকর্মীদের মতো বেতন পেতে পারেন তা দেখার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান এবং তাঁদের ভূমিদাসত্ব মোচনের দাবি করেন।

১৯ মার্চ দলিত শ্রেণির লোকেরা তাঁদের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করেন। কারণ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ওই দিনটিতে মাহাদে তাঁদের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছিল। আম্বেদকর মাহাদে দশ হাজার লোকের একটি সমাবেশে বলেন, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ দেওয়া ও প্রধানতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভুলে যাওয়া ভারতীয়দের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায়। দীর্ঘকালের

পরিকাঠামো ভেঙে দিয়ে হিন্দু সমাজকে আধুনিক করে সংগঠিত করার এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। রাতের বেলা মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটি এক স্বাগত ভাষণে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানায়।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৯৪০ সালের এপ্রিলে কংগ্রেস রামগড়ে অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতকে বিভক্ত করা বা তার জনশক্তিকে ভেঙে দেওয়ার সব রকমের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। একই সময়ে মুসলিম লিগও লাহোরে অনুষ্ঠিত তার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অংশ, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার দাবি জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একদা একতা ও শান্তির দূত বলে কথিত জিন্নাহ্ তখন বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবক্তা।

ঠিক সেই সময় হিটলার কয়েকটি ছোটো দেশকে বিধ্বস্ত করেন এবং ব্রিটেন ও তার মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ এক ভয়ঙ্কর দিকে মোড় নেয়। কংগ্রেস নেতারা গান্ধির নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেন এবং প্রস্তাব দেন যে, কেন্দ্রে যদি একটি সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় সরকার গঠিত হয় তবে যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাথে তাঁরা সহযোগিতা করবেন। এই প্রস্তাব পুনা শহরে পুনরায় তাঁদের দ্বারা ঘোষিত হয় এবং এটাই 'পুনা-প্রস্তাব' নামে পরিচিত। জিন্নাহ্ এর বিরোধিতা করে বলেন যে, এর অর্থ হবে কেন্দ্রে হিন্দুদের স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ভাইসরয় একটি নতুন প্রস্তাব ঘোষণা করে বলেন, 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ' (Executive Council) বর্ধিত করা হবে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। কংগ্রেস প্রস্তাবটিকে ভারতের সম্পূর্ণ স্বার্থবিরোধী বলে বাতিল করে।

এই সময় কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে পদচ্যুত সুভাষ বসু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। যে ব্রিটিশ শক্তি তখন ইউরোপে জীবনমরণ যুদ্ধে জড়িত, তার বিরুদ্ধে তিনি ভারতীয় শক্তিগুলিকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ১৯৪০ সালের ২২ জুলাই বম্বে এসে জিন্নাহ্, আম্বেদকর ও সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেন। সুভাষ বসু ছিলেন প্রস্তাবিত ফেডারেশনকে গ্রহণ করার ঘোর বিরোধী; আম্বেদকরও এর বিরোধী। তাই সুভাষ বসু এটাকেই তাঁদের মধ্যে একতাবদ্ধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা হিসাবে ভেবেছিলেন। ফেডারেশন নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনার পর আম্বেদকর সুভাষ বসুকে প্রশ্ন করেন, নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি প্রার্থী দেবেন কিনা। তিনি নেতিবাচক উত্তর দেন। এরপর আম্বেদকর সুভাষ বসুকে প্রশ্ন করেন, অস্পৃশ্যদের সমস্যার প্রতি তাঁর দলের ইতিবাচক মনোভাব কী হবে। বসুর কাছে এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য উত্তর ছিল না এবং সেখানেই তাঁদের সাক্ষাৎকার শেষ হয়। মনে হয়, সাভারকরের অনুপ্রেরণামূলক কথাবার্তা সুভাষ বসুর মনোভাবকে বদলে দেয় এবং

তিনি ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার সম্ভাবনা বিবেচনা করতে শুরু করেন।

সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস পুনরায় গান্ধির একনায়কত্ব মেনে নেয়। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে গান্ধি অহিংসনীতির ভিত্তিতে যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কথা প্রচার করে 'পৃথক সংগঠিত আইন অমান্য আন্দোলন' (individual civil disobbedience movement)-এর সূচনা করেন। ফলে কংগ্রেসের প্রায় সব নেতাকেই কারাগারে যেতে হয়। গান্ধির এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে আম্বেদকর বলেন, যুদ্ধের জন্য জনবল বা অর্থবল জোগান দেওয়ার বিরুদ্ধে গান্ধির এই নতুন প্রচার কার্যের অর্থ হচ্ছে ভারত-প্রতিরক্ষা আইন-এর (Defence of India Act) বিরুদ্ধে আইন অমান্য করা। তিনি মন্তব্য করেন, "গান্ধিকে বাদ দিয়েও, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই বলপ্রয়োগকে ঘৃণা করেন, বলপ্রয়োগ করা এবং সমস্ত অন্যায় শর্তগুলিকে পরাস্ত করতে জয়ের জন্য বলপ্রয়োগ করাÑ এই দুয়ের তফাতটাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে।" তিনি বলতে থাকেন, "আমার মনে হয় শয়তানির মূল কারণ, বল প্রয়োগ করার মধ্যে নয়, জয়লাভকে অপব্যবহার করার মধ্যে। যখন পরাজিতের প্রতি শান্তির জন্য জঘন্য ও অনুচিত শর্ত চাপিয়ে শান্তি ঘোষণা করা হয়, তখন যদি তাঁরা এর বিরুদ্ধে আমরণ অনশনে বসেন, তাহলে মিঃ গান্ধি এবং সকল শান্তিকামী ও অহিংসনীতিতে বিশ্বাসীরা মনুষ্যজাতির জন্য একটি স্থায়ী সেবামূলক কাজ করতে পারেন। আমার মনে হয়, এই শান্তিকামী মানুষটি তাঁর মিশনকে ভুল বুঝেছেন। তাঁর সংগ্রাম অবশ্যই মিথ্যা শান্তির বিরুদ্ধে হওয়া উচিত, বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে নয়। বলপ্রয়োগকে পরিহার করার প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্য লোকদের আহ্বান করে এই শান্তিকামী ব্যক্তি কেবল তাঁদেরই সাহায্য করেছেন, যাঁরা একমাত্র জয়লাভের লক্ষ্যেই বলপ্রয়োগের উপর জোর দিয়েছে।" রাজা গোপালাচারী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, তিনি যদি ভাইসরয় হতেন, তাহলে তিনি পুরোনো নীতিই চালিয়ে যেতেন। তাঁর এ কথার উদ্ধৃতি দিয়ে আম্বেদকর বলেন, "কংগ্রেস দেশের জন্য লড়ছেÑ এটা একটা ধোঁকাবাজি। কংগ্রেস লড়ছে ক্ষমতার চাবি হাতে পাওয়ার জন্য। এক বছর আগে 'ভারত-প্রতিরক্ষা আইন' (Defence of India Act) পাশ হওয়ার ঠিক পরে পরেই গান্ধি কেন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেননি?"

১৯৪০ সালের শেষের দিকে আম্বেদকরের প্রধান রচনা-কর্ম 'থট্‌স অন পাকিস্তান' (Thoughts on Pakistan) প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে লেখা এই বইটি সেদিনের উত্তপ্ত পরিবেশে বোমা ফাটানোর মতো কাজ করে। ভারতের মহাবিদ্বান, সাংবিধানিক পণ্ডিত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছেন। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে হিন্দুদের

উন্নতি, শান্তি ও মুক্তির জন্য ভারতকে হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানÑ এই দু'টি ভাগে ভাগ করা। মূলত হিন্দুদের জন্যই রচিত হয় এই বইখানি।

বইখানিতে যুক্তি দেখানো হয়, অকারণ আপত্তি না তুলে মুসলিমরা যে একটি জাতি সে কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে জাতিগতভাবে নিরাপদ সীমান্ত না থাকলেও হিন্দুদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই; কারণ, আধুনিক জগতে আধুনিক প্রযুক্তিতে কোনো দেশের ভৌগোলিক পরিবেশই চূড়ান্ত নয়। ওই পাকিস্তানের তুলনায় হিন্দুস্তানের সম্পদ অনেক বেশি, তাই পাকিস্তান সৃষ্টিতে হিন্দুস্তানকে দুর্বল অবস্থায় ফেলতে পারবে না। এই বইয়ে হিন্দুদের বোঝানো হয়েছে যে, ভারতের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্য সর্বদাই সন্দেহজনক, তাই মুসলিমদের হিন্দুস্তানে রেখে তাঁদের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে বাইরে রেখে তাঁদের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়াই ভাল। মুসলিম মুক্ত নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমান্ত থেকে অনেক ভাল।

পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে সাম্প্রদায়িক বিষময় পরিস্থিতি যাতে না হয় তার বিধানও এ বইয়ে দেওয়া হয়। **শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমজাতীয়তার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সার্বিক লোকবিনিময় ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হয়। অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের নিয়ে আসতে হবে এবং হিন্দুস্তান থেকে মুসলিমদের নিয়ে যেতে হবে, যেমন করে তুরস্ক, গ্রিস ও বুলগেরিয়া তাদের পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পরে সমাধান করে নিয়েছে।**

পাকিস্তানের পক্ষে দার্শনিক যুক্তি দিয়ে মুসলিমদের কাছে তাঁদের আলকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলা হয় এবং হিন্দুদের কাছে যুক্তি দিয়ে বইখানি প্রশ্ন তোলে যে, অখণ্ড ভারত কি এমন কোনো আদর্শ যার জন্য লড়াই করা উচিত? বলপ্রয়োগ করে শাসন করা কোনো প্রতিকার নয়। দেশভাগে রাজি হলে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই দাসত্ব এবং পারস্পরিক অবৈধভাবে কিছু লাভের ভয় থেকে মুক্ত থাকবেন। তুরস্ক, গ্রিক ও অন্যান্য জাতি সম্পর্কে গভীরভাবে অনুশীলন করলে এর সত্যতা বোঝা যাবে। সকলের উচিত হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানÑ ভারতকে এই দু'ভাগে ভাগ করতে রাজি হয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও দুঃখজনক ঘটনাকে এড়ানো। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার পেতে হলে ভারতকে ভাগ করা মেনে নেওয়া উচিত। তা না হলে ভয়াবহ পরিণতি হবে। বলপ্রয়োগ করে ঐক্য আনতে গেলে তা উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। স্বাধীনতার সমস্ত আশা ব্যর্থ হবে। ভারত অবিভক্ত থাকবেÑ এই জেদ ধরে থাকলে ভারতের ভবিষ্যৎ চরম হতাশায় পরিণত হবে। ঐক্যবদ্ধ ভারত কখনও আঙ্গিকভাবে পূর্ণতা লাভ করবে না। তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশদের সমস্যাও এর দ্বারা সমাধান হবে না। তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হবে দ্বৈত মতের বীজাণু। ভারত

হবে একটি রক্তশূন্য রুগ্ন রাষ্ট্রÑ সৎকার না হওয়া একটি জীবন্ত শব। বইটির উপসংহারে মন্তব্য করা হয় যে, স্বায়ত্বশাসনই হোক বা স্বাধীনতাই হোক, এই বিভাজন সকলের ভবিষ্যতের পথ খুলে দেবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর Thoughts on Pakistan বইখানির লেখক রাজাগোপালাচারীকে এভাবে বর্ণনা করেনÑ "মিস্টার রাজাগোপালাচারীর রাজনৈতিক চমকপ্রদ কাজগুলি এত টাটকা যে, সেগুলি ভোলা যায় না। হঠাৎ তিনি নিজেকে একজন মুসলিম লিগের সৈনিক বলে নাম লিখিয়েছেন এবং আপন আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন; কিন্তু কেন? মুসলিমদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি অনুমোদন করার ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যর্থতার জন্য নয়, মুসলিমদের সব চেয়ে অসংযত দাবি অর্থাৎ পাকিস্তান স্বীকার না করার জন্য।"

আম্বেদকর ধীরস্থির বুদ্ধিমত্তা নিয়ে একজন ডাক্তারের দৃষ্টিতে ভারতের ব্যাধি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। একজন তেজস্বী লোকের লেখা বই আবেগপূর্ণ হয় না। এ বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে সরলতা, দক্ষতা, জ্ঞান, সাহসিকতা ও উৎকর্ষতা সবই আছে। বইখানিতে প্রতিভাধর আম্বেদকর তাঁর দূরদর্শীতার সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে দেশপ্রেম ও মনীষার এক অকৃত্রিম যুগলবন্দি ঘটিয়েছেন। 'থট্স অন্ পাকিস্তান' একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

এই বইখানির প্রভাবে বহু হিন্দু রাজনীতিবিদের মাথা গুলিয়ে যায়। ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সারসংক্ষেপ হিসাবে এটি প্রশংসা পায় এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এ বই ভারতের রাজনীতিকে ওলটপালট করে দেয়। মুসলিমরা তাঁদের আদর্শের প্রতি সমর্থন পেয়ে উল্লসিত হন। যে কংগ্রেসিরা 'না-বর্জন না-গ্রহণ' নীতিতে সারাজীবন অভ্যস্ত, তাঁরা পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। রাজাগোপালাচারীর পাকিস্তান প্রচারকে এ বই অনুপ্রাণিত করে। হিন্দু মহাসভার কিছু নেতা, যাঁরা জাতীয় ও যুক্তিগত ভাবে পাকিস্তানের চরম বিরোধী ছিলেন, তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের নেতা সাভারকর তাঁর জীবন পণ করেন অখণ্ড ভারতের জন্য এবং জোরালোভাবে ভারত-ভাগের তত্ত্বকে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, বিপদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া, রণে ভঙ্গ দেওয়া এবং আক্রমণকারীর কাছে আত্মসমর্পণ করাÑ এগুলিকে সাহসিকতা বা রাজনৈতিক দক্ষতা বলা যায় না। তিনি হিন্দুদের সাবধান করে বলেন, ভারত-ভাগ ভারতের ঘোষিত শত্রুদের হাতকেই শক্ত করবে এবং বিদেশিরা এসে ভারতকে আক্রমণ করবে। ভারত-ভাগ ভারতের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির এক স্থায়ী হুমকি।

কিন্তু এটাও সত্যি যে, প্রথম সারির কোনো হিন্দু নেতা তেমন শক্তি, সাহস, পাণ্ডিত্য এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে আম্বেদকরের যুক্তি খণ্ডন করে কোনো পালটা জবাব

দেননি। পুনা থেকে হিন্দু মহাসভার একজন লেখক এবং কংগ্রেস গোষ্ঠীর বম্বের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক আম্বেদকরের জবাব দিলেও তাঁদের সেই লেখা মারাঠি ভাষায়, আর সেগুলি ছিল 'থট্স অন্ পাকিস্তান'-এর ধারাবিবরণীর মতো। পরে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এর উপরে একখানা বই প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সে বইটিতে আম্বেদকরের যুক্তি খণ্ডন করার মতো কোনো আলোচনা ছিল না। আম্বেদকরের যুক্তিতে বিব্রত ডঃ মুঞ্জে আম্বেদকরের কথার জবাব দেওয়া যে অত্যন্ত জরুরি, সে কথা জানিয়ে এন.সি. কেলকরকে একটি চিঠি লেখেন। কিন্তু কেলকরের বিচক্ষণ অথচ দোদুল্যমান প্রতিভা এই ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অখণ্ড ভারতের জন্য সংগ্রাম করা ছিল হিন্দু মহাসভারই কাজ। কিন্তু মহাসভার পক্ষ থেকে সময়মতো কিছুই করা হয়নি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ধুলা থেকে সর্বোচ্চ চূড়ায়

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম চতুর্থাংশ জুড়ে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের, বিশেষ করে মাহারদের চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মাহাররা যোদ্ধাসুলভ গুণাবলির জন্য বিখ্যাত। আম্বেদকর বম্বের গভর্নরের সাথে দেখা করে তাঁর কাছে সরকারের সামরিক নীতির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভের কথা জানান। এ নীতির ফলে যুদ্ধপ্রিয় ও যুদ্ধবিমুখ শ্রেণির মধ্যে এক অর্থহীন পার্থক্যের ভিত্তিতে মাহারদের বাদ দেওয়া হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে মাহার জাতি অতীতে যে ভূমিকা পালন করে, পরবর্তী সময়ে সামরিক বিভাগে তাঁদের নিয়োগ যেভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মাহার ব্যাটেলিয়ানকে আবার যেভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, কিছুদিন পরেই আবার অর্থনৈতিক অজুহাত দেখিয়ে তা ভেঙেও দেওয়া হয়Ñ ইত্যাদি সব কথাই আম্বেদকর গভর্নরের কাছে ব্যাখ্যা করেন। তাই যুদ্ধপ্রিয় সৈনিক দলের জন্য এবার একটি মাহার ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান।

এর ফলে সরকার একটি মাহার ব্যাটেলিয়ান গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আম্বেদকর মাহারদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, তাঁরা যেন নিজেদের ও দেশের কল্যাণে এই সুযোগটি গ্রহণ করে। শীঘ্রই একটি ব্যাটেলিয়ান গঠিত হয় এবং মাহার সম্প্রদায়ের অনেককেই সেখানে তালিকাভুক্ত করা হয়। তাঁদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজনকে রিক্রুটিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আম্বেদকরের সহযোদ্ধা যাধবÑ ডাকনাম ছিল মাড়াকেবুভা। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল। সাভারকরের ইচ্ছা ছিল হিন্দুদের সামরিক জাতি হিসাবে পুনর্জন্ম হোক। তাই তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আম্বেদকরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মাহার ভাইয়েরা সামরিক গুণাবলির জোরে পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তাঁদের সামরিক উন্নতি হিন্দুদের মধ্যে একতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

১৯৪১ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ভাইসরয় আটজন ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়ে ‘নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ’-কে (Executive Council) সম্প্রসারিত করেন এবং একটি ‘প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা কমিটি’ (Defence Advisory Committee) গড়ে তোলেন। যমনাদাস মেহতা, রামরাও দেশমুখ, এম.সি.রাজা এবং অন্যান্য কয়েকজন সুপরিচিত ভারতীয় নাগরিক ও ভারতের রাজন্যবর্গসহ আম্বেদকরকে এই ‘প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা কমিটি’-তে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ‘নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ’-

এ তাঁদের কাউকে রাখা হয়নি বলে শিখ ও দলিত শ্রেণির লোকেরা ক্ষুব্ধ হন।

দলিত শ্রেণির দাবির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আম্বেদকর প্রতিবাদ করেন। তাঁরা তাঁদের কোনো প্রতিনিধি না নেওয়াকে অপমান ও বিশ্বাসভঙ্গ বলে মনে করেন, সে কথা জানিয়ে তিনি ভারতের সেক্রেটারি অব্ স্টেট আমেরিকে একটি তারবার্তা পাঠান। সাভারকর আম্বেদকরের দাবি সমর্থন করে 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এ আম্বেদকরকে নিয়োগ করার জন্য ভাইসরয়কে তারবার্তা পাঠান।

হরেগাঁওয়ের মাহার সম্মেলনের আবেদনে সরকার সাড়া দিতে ব্যর্থ হলে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সিন্নারে আর একটি সম্মেলন ডাকা হয়। আম্বেদকর সেখানে বলেন, তিনি গভর্নরের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন দেশপাণ্ডে ও দেশমুখের মতো বাটান মালিকেরা ওইদিন পর্যন্তও বাটান সম্পত্তি ভোগ করেছেন, অথচ তাঁরা কর থেকে ছাড় পেয়ে গেছেন। সরকারের এই অনমনীয় আচরণে ধৈর্যচ্যুত হয়ে মাহাররা কর না দেওয়ার চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করার আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই সম্মেলনে সরকার যতদিন অতিরিক্ত করের দাবি প্রত্যাহার না করছে, ততদিন তার সঙ্গে অসহযোগিতা করার জন্য ক্ষুব্ধ মাহারদের কাছে একটি বার্তা দেওয়া হয়।

বম্বে ফিরে আসার পর আম্বেদকর একদিন সকালে গভর্নর স্যার লরেন্স রোজার লুমলির সাথে গভর্নমেণ্ট হাউসে দেখা করেন। প্রথম শ্রেণির সাংবাদিক আই.এ. ইজেকিয়েল সান্ধ্য পত্রিকাগুলিতে আম্বেদকরের সিন্নারে দেওয়া বক্তৃতা প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতার জগতে বহু বছর ধরে তিনি আম্বেদকর ও তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন করে আসছিলেন। গভর্নর জেনারেল লিনলিথগো তখন বম্বেতে। তিনি সংবাদপত্রে ওই বক্তৃতা পড়েন। দলিত শ্রেণিকে বিরূপ করে বিরোধী শিবিরে ঠেলে দেওয়ার জন্য তিনি বম্বের গভর্নরের কাছে তাঁর অসন্তুষ্টির কথা জানান। এর অল্প ক'দিন পরেই বম্বে সরকার তার অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করে নিলে আম্বেদকরেরই জয় হয়!

দু'সপ্তাহ পরে আম্বেদকর সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করেন। বম্বেতে এমন একটি সভায় তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদিও 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ' (Executive Council)-এ দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকে অস্বীকার করেছে, তবুও তিনি এইজন্য দুঃখিত যে, যাঁরা মনে করছেন সরকারকে সাহায্য করা উচিত নয়, তাঁরা বিষয়গুলির সমানুপাতিক ও আপেক্ষিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তাঁদের বলেন, নাৎসিরা যদি দেশের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তাহলে 'এক্সপ্যাণ্ডেড কাউন্সিল'-এর এমন কিছু থাকবে না, যার জন্য লড়াই করা যায়। তিনি আরও বলেন, শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন করতে এবং প্রথম থেকেই স্বদেশি সরকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি আর একবার

সংগ্রাম করতে রাজি নন। পড়াশোনা আপাতত বন্ধ রেখে সামরিক বৃত্তির জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এবং তাঁদের উচ্চ সামরিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলতে মাহার যুবকদের উৎসাহিত করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এবার আম্বেদকর সামরিকীকরণ আন্দোলনে বিশেষ মনোযোগী হন এবং ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেন। 'ডিফেন্স কাউন্সিল'-এর তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সে সভাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

রাজনৈতিক অচলাবস্থা তখনও অমীমাংসিত। কংগ্রেস-নেতারা জেলে। তাঁদের সর্বাধিনায়ক গান্ধি রয়েছেন বাইরে। অনেক রাজনীতিক ভাবলেন, গান্ধি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আমৃত্যু অনশনে বসবেন, কারণ, মুসলিমরা তখন পাকিস্তানি দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে এবং জিন্নাহ্ বলেছেন, একমাত্র হৃদয়ের পরিবর্তনেই এই উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে। যে স্লোগান দিয়ে কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে লোকের কাছে ঢাক পিটিয়ে বলা হয়েছিলÑ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া কখনও স্বাধীনতা আসবে না, তাঁর এই ঐতিহাসিক ভুল ও তাঁর স্লোগানের বিফলতা গান্ধি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। মুসলিমদের সমর্থন না পেয়ে গান্ধি তখন এসে দাঁড়ালেন "করো অথবা মরো" (Do or die) সংগ্রামের মুখে।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বম্বের ওয়াগল হলে 'বসন্তকালীন বক্তৃতামালা'য় (Spring Lectures Series) আলোচনা চলছে। 'থট্স অন্ পাকিস্তান'-এর উপর তিনদিন ধরে আলোচনা হয়। আলোচনার সময় আম্বেদকর উপস্থিত ছিলেন। সভায় আচার্য এম.ভি. দণ্ডে সভাপতিত্ব করেন। দণ্ডের আন্তরিক অনুরোধে তাঁর বন্ধু, সহকর্মী এবং প্রদেশের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আম্বেদকর বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেন, যাঁরা মনে করেন পাকিস্তান কোনো বিতর্কের বিষয়ই নয়, তিনি তাঁদের জন্য কিছু বলবেন না। যদি এ কথা মনে করা হয় যে, এ দাবি অন্যায়, তাহলে পাকিস্তান সৃষ্টি হবে তাঁদের কাছে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তিনি বলেন, মানুষকে ইতিহাস ভুলে যেতে বলা অন্যায়। "যাঁরা ইতিহাস ভুলে যান, তাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন না। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলিমদের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে বিপন্মুক্ত করার জন্য শত্রুভাবাপন্নদের বাইরে রাখাটাই হবে বিজ্ঞের কাজ। আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করব। আপনারা মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হবেন না যে, পাকিস্তান তার মুসলিম সাম্রাজ্য ভারতে বিস্তার করতে পারবে। হিন্দুরা তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। আমি স্বীকার করি বর্ণহিন্দুদের সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আমার বিবাদ আছে, কিন্তু আমি আপনাদের সামনে শপথ করে বলছিÑ

আমাদের দেশের প্রতিরক্ষায় আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।" তুমুল করতালিতে তাঁর বক্তৃতা অভিনন্দিত হয়।

এই সময় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস রাশিয়ায় তাঁর সফল মিশনকার্য শেষে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। তখন ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের অচল অবস্থা দূর করার জন্য তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারতে আসার প্রাক্কালে আম্বেদকর একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। ব্রিটেনের উচিত ভারতকে অবিলম্বে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়াÑ এই মর্মে চিয়াংকাইশেক যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আম্বেদকর সেই প্রসঙ্গে বলেন যে, চিনের নেতা সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে দেননি। তিনি আরও বলেন, শান্তিচুক্তির তিনবছরের মধ্যে ভারতকে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হবে এবং যুদ্ধবিরতিতে সই করার এক বছরের মধ্যে যদি ভারতীয় দলগুলি সম্মতিসূচক কোনো সমাধান দিতে না পারে, তাহলে ভারতের এ সমস্যা সমাধানের জন্য 'আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল'-এ পাঠাতে হবে এবং ব্রিটেনকে ঘোষণা করতে হবে যে, ভারতের জন্য 'ডোমিনিয়ন কনস্টিটিউশন'-এর একটি অংশ হিসাবে সে তা কার্যকরী করার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

জিন্নাহ্ যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রতিনিধিত্ব দাবি করছেন, তাকে তিনি একেবারেই অর্থহীন বলে বর্ণনা করেন এবং তা বাতিল করার জন্য লর্ড লিনলিথগোকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মুসলিমদের জন্য জিন্নাহ্র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রতিনিধিত্বের দাবি যদি স্বীকার করে নেওয়াই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তেমন কোনো অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত নয়।

যাঁরা এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেনÑ তাঁরা বলেন, আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত মুসলিম লিগ মেনে নেবে, তা ইতিহাসবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ আম্বেদকর যে আশা করছেন তার জন্য তাঁরা বিস্মিত।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা জাপানের কাছে সিঙ্গাপুর হারায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য এখন ডুবতে বসেছে; সাম্রাজ্যে ফাটল ধরেছে। পূর্বপ্রান্তের যুদ্ধের নাট্যমঞ্চে বিপরীত অবস্থা এবং আমেরিকা ও চিনের চাপে ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটি পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য সত্বর ভারতে আসেন। তিনি কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, শিখ-সংগঠন ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। আম্বেদকর এম.সি.রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ৩০ মার্চ ক্রিপসের সাথে দেখা করেন। ক্রিপসের প্রস্তাব অনুযায়ী শত্রুতা বন্ধ করার পরেই গণপরিষদের

এক সভা আহ্বান করা হবে। সেটাই ভারতীয় রাজ্যগুলির সহযোগিতায় সংবিধানের খসড়া তৈরি করবে; কিন্তু প্রদেশগুলিকে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেওয়া বা তার বাইরে থাকার অধিকার দেওয়া হবে এবং গণপরিষদকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসতে হবে।

ক্রিপসের প্রস্তাবকে গান্ধি 'পোস্ট ডেটেড চেক' বলে বর্ণনা করেন। সাভারকর এটিকে ভারতকে টুকরো টুকরো করার একটি পরিকল্পনা বলে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। উদারপন্থীরা একে হাস্যকর আত্মনিয়ন্ত্রণ বলে অভিহিত করেন। পাকিস্তানের আদর্শকে নীতি হিসাবে সমর্থন করা হলেও এর পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট কিংবা স্পষ্ট ঘোষণা নেই বলে মুসলিম লিগও এটাকে প্রত্যাখ্যান করে। অনেক কংগ্রেসি নেতা, যাঁরা ভারত টুকরো টুকরো হওয়ার চেয়েও ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিতে বেশি আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা ভারত ভাগের বড়ি গিলে নেন।

দলিত শ্রেণির অন্যান্য প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের সাথে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আম্বেদকরও এই প্রস্তাবটি বাতিল করে দেন। কারণ, দলিত শ্রেণির নেতৃবৃন্দের বিচারে দলিত শ্রেণির সব থেকে বেশি ক্ষতি করার জন্যই এটি পরিকল্পিত হয়েছে। এটি হিন্দুশাসনের কাছে তাঁদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে এবং তাঁরা ভীত যে এর ফলে তাঁদের আবার পুরোনো সেই অন্ধকার দিনগুলিতে নিয়ে যাবে। তাঁরা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে বলেন, তিনি যেন তাঁর মহামান্য সরকারকে জানিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদি দলিত শ্রেণির জনসাধারণের অসম্মতিতে ওই নীতিতে রচিত কোনো সংবিধান তাঁদের উপর চাপিয়ে দেন, তাহলে দলিত শ্রেণি সেটাকে বিশ্বাসভঙ্গ বলেই মনে করবেন।

অন্য একটি বিবৃতিতে আম্বেদকর দলিত শ্রেণির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবকে 'মিউনিক মেন্টালিটি' বলে বর্ণনা করেন, যার অর্থ হচ্ছে অন্যদের বলি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করা। তিনি পুনরায় বলেন, ক্রিপসের প্রস্তাব পরিষ্কারভাবে লিগকে পাকিস্তান সৃষ্টির অধিকার দিয়েছে। তাঁর মতে ক্রিপস প্রস্তাব স্নায়বিক দুর্বলতা এবং আদর্শবোধ হারানোর ফল; একটা বিশ্বাসভঙ্গ ও হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানো।

দলিত শ্রেণির ব্যাপারে ব্রিটেনের এই নতুন নীতি আম্বেদকরকে শ্রমিক নেতা হিসাবে তাঁর নতুন ভূমিকা থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। সাক্ষাৎকারে ক্রিপস আম্বেদকরের কাছে জানতে চান তিনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন না দলিত শ্রেণির, এবং তাঁর পার্টির শক্তির ব্যাপারেও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। সেটাই আম্বেদকরের ভূমিকার মোড় ঘুরিয়ে দেয়; এবং গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি যাঁদের জন্য লড়াই করে এসেছেন, সেই দলিত শ্রেণির স্বার্থেই তিনি তাঁদের নেতৃত্ব দান করাটাকেই

শ্রেয় বলে মনে করেন। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ও ৩১ মার্চ দিল্লিতে উপস্থিত দলিত শ্রেণির একটি সভা ডাকেন এবং তাঁদের সঙ্গে ক্রিপসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। এম.সি. রাজা যিনি তখন পর্যন্ত আম্বেদকরের বিরোধিতা করছিলেন, তিনিও তাঁর সাথে মতবিরোধ মিটিয়ে নেন। রাজভোজ আগেই তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। দশ বছর পর আবার সিদ্ধান্ত হয়Ñ নাগপুরে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে সর্বভারতীয় দলিত শ্রেণির সম্মেলন ডাকা হবে। তার লক্ষ্য হবে আন্তঃপ্রাদেশিক শক্তিগুলির সহযোগিতায় স্পষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন তৈরি করা।

১৯৪২ সালের ১৪ এপ্রিল আম্বেদকরের ৫২তম জন্মদিন। এই দিনটিকে চিহ্নিত করে 'ইণ্ডিয়ান লেবার পার্টি' এবং বম্বে ও শহরতলির অন্যান্য ৪৫ টি গণসংগঠন ন'দিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যার মধ্যে পতাকা-অভিবাদন, শোভাযাত্রা এবং জনসভার ব্যবস্থা থাকে। বম্বে এবং শহরতলির সব ক'টি ওয়ার্ডে ১২ এপ্রিল এই উদ্‌যাপন শুরু হয়।

পুনা শহরে বড়ো বড়ো রাস্তায় এবং ক্যান্টনমেন্টে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শানিওয়ারওয়াড়ায় অধ্যাপক এস.এম.মাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এম.সি. রাজা ও পি.এন. রাজভোজের বক্তৃতায় অস্পৃশ্যদের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানানো হয়। সভায় তাঁদের নেতার দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করা হয়। পুনা মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাসেমব্লি হলে পৌরসভাপতি গণপতরাও নালাভাদের সভাপতিত্বে এক বিশাল সভায়ও অস্পৃশ্যদের এই মহান নেতাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ডঃ মোহিলে, পোপতলাল শাহ, চ্যবন এবং আর.আর. ভোলে মহান নেতার নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের উচ্চ প্রশংসা করেন। আম্বেদকরের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। বিপুল উত্তেজনা ও আনন্দধ্বনির মধ্যে পুনা ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, আম্বেদকরের এক প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন এবং বলেন যে, আম্বেদকরের একটি প্রতিকৃতি পেয়ে বোর্ড গর্বিত। তিনি শুধু দলিত শ্রেণিরই মহান নেতা নন, তিনি ভারতের মহান নেতাদের মধ্যেও একজন। তিনি আরও বলেন, আম্বেদকরের নিঃস্বার্থ আত্মদান জাতির অন্তরে এক স্থায়ী আসন লাভ করেছে। কেশবরাও জেধে এবং বাপুসাহেব গুপ্তেও এই সভায় আম্বেদকরের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন।

১৯ এপ্রিল সকালে আম্বেদকর 'রোহিদাস তরুণ সুধাকর সংঘ'-এর মহিলা শাখার উদ্বোধন করেন। কল্যাণের এক সিনেমা হলে সংঘের সভায় বক্তৃতায় তিনি হিন্দু প্রতিষ্ঠান ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে সাহায্য না নেওয়ার জন্য যুবকদের বিশেষভাবে উপদেশ দেন, যাতে তাঁরা বর্ণহিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিজেদের

স্বাধীন সত্ত্বাকে বিসর্জন না দেন।

ডঃ এম.আর জয়াকরের সভাপতিত্বে 'গোল্ডেন জুবিলি সেলিব্রেশন সিরিজ'-এর প্রধান অনুষ্ঠান হয় ১৯ এপ্রিল, বম্বের চউপট্টিতে। শহরের সব দিক থেকে শোভাযাত্রা এসে এক বিশাল জনসভায় পরিণত হয়। জুবিলি কমিটির চেয়ারম্যান আচার্য দণ্ডে বলেন যে, আম্বেদকর ভারতের মহত্তম ব্যক্তিদের একজন। তিনি ইতিহাসে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেছেন। দলিত শ্রেণির জন্য দীর্ঘদিন ধরে আম্বেদকর যে সেবামূলক কাজ করেছেন, তার জন্য সভায় আম্বেদকরের প্রতি তিনি আবেগোচ্ছল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আম্বেদকরের স্বাধীন চিন্তাধারা ও তাঁর কাজ দলিত শ্রেণির মর্যাদার ব্যাপারে কীভাবে এক অসাধারণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, কীভাবে তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে এবং কীভাবে বর্ণহিন্দুদের চেতনা জাগিয়েছে, বিশাল জনতার কাছে তিনি তা ব্যাখ্যা করে বলেন। গোলটেবিল বৈঠকে এবং পুনা প্যাক্টের সময়েও জয়াকর আম্বেদকরের প্রশংসা করেছিলেন এবং এখানেও তিনি এই মহান নেতার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যসহ সমর্থন করার জন্য দলিত শ্রেণির কাছে আবেদন জানান। বম্বের শেরিফ এম.আর.এ. বেগ আম্বেদকরকে একজন মহান নেতারূপে বর্ণনা করেন। এন.এম. যোশী ওই সভায় বলেন, তাঁর প্রাক্তন ছাত্র যাঁকে তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়িয়েছেন, সেই আম্বেদকর যে উচ্চ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তার জন্য তিনি গর্বিত। তিনি বলেন, ছাত্র হিসাবে আম্বেদকর ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও সকলের অগ্রগণ্য।

২১ এপ্রিল প্রায় সমস্ত প্রধান সংবাদপত্রে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের, আম্বেদকরের সেবার কাজ এবং পাণ্ডিত্যের জন্য প্রশংসা করে অভিনন্দিত করা হয়। বর্তমান অবস্থায় দলিত শ্রেণির যা সামান্য উন্নতি হয়েছে তার অধিকাংশই যে আম্বেদকরের বলিষ্ঠ তদবিরের জন্য সম্ভব হয়েছে, সে কথা বলে বম্বের 'দি টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া' মন্তব্য করেÑ "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া হরিজনদের পক্ষে সামাজিক সাম্য লাভ করা যে বেশ কঠিন, এ সত্য উপলব্ধি করার ব্যাপারে আম্বেদকরের অবদান বিশাল।" সম্পাদকীয়টির শেষে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর এই কঠিন কাজের সময় প্রায়ই তিক্ত ও হুল ফোটানো বাচনভঙ্গীতে যথেষ্ট ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অস্পৃশ্যতা দূর হলে হিন্দুসমাজের পরিকাঠামো নিশ্চিতভাবেই শক্তিশালী হবে এবং ভারতের সাধারণ লোকেরও উন্নতি হবে। হরিজনদের তরফ থেকে আম্বেদকরের এই প্রচেষ্টা ব্যাপক সমর্থন লাভের যোগ্য।"

আম্বেদকর তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য প্রশংসনীয় কর্তব্য করেছেন বলে 'বম্বে ক্রনিকল' পত্রিকা তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলে, তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি সীমাহীন অমানবিকতা সম্পর্কে আম্বেদকর দিনরাত ভাবনাচিন্তা করেন। এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে,

হরিজনদের উৎপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর গভীর তিক্ততার মতোই হরিজনদের প্রতি তাঁর অনুরাগও সমান সমান। নাগপুরের 'দি মহারাষ্ট্র' পত্রিকা মন্তব্য করেÑ আম্বেদকর কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় নেতাদের মধ্যে একজন, যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব, সংগ্রাম, ত্যাগস্বীকার ও পাণ্ডিত্যের জোরে ভারতীয় রাজনীতিতে পুরোভাগে আসন পেয়েছেন। এতে আরও বলা হয়Ñ দলিত শ্রেণি তাঁদের বর্তমান রাজনৈতিক মর্যাদার জন্য তাঁর অবিরাম সংগ্রামের কাছে ঋণী।

পুনার Dnyanaprakash পত্রিকা আম্বেদকরের নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক মন নিয়ে সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করার জন্য তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানায়। পত্রিকাটি বলে, নিপীড়িতদের কাছে আম্বেদকরের জীবন একটি নিদর্শন স্বরূপ; তিনি এমন একজন আদর্শ পুরুষ, যিনি সাফল্যের জন্য কখনও তাঁর নীতিবোধকে বিসর্জন দেননি। পুনার মারাঠি দৈনিক 'কাল' ঘোষণা করে যে, আম্বেদকর মহারাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধিত্বমূলক নেতা। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য মহান নেতৃবৃন্দের মতো তিনি যে কেবল একজন সক্ষম ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতা তা নয়, তিনি একজন পণ্ডিত, একজন নিঃস্বার্থ হৃদয় ও শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ। বম্বের মারাঠি দৈনিক 'প্রভাত' আম্বেদকরকে আধুনিক বিপ্লবী নেতা হিসাবে অভিনন্দিত করে এবং দয়ানন্দ, গান্ধি ও সাভারকরের প্রতি কোনো রকম অসম্মান না করেই বলে, তাঁদের থেকে অস্পৃশ্যদের জন্য আম্বেদকরের সেবামূলক কাজের গুরুত্ব অনেক উঁচুতে।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য আসে সাভারকরের কাছ থেকে। একজন রাজনৈতিক ও সমাজবিপ্লবী আর একজন বিপ্লবীর কাজের মূল্যায়ন করছেন! আম্বেদকরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সুবর্ণজয়ন্তীতে সাভারকর মন্তব্য করেন, আম্বেদকরের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও নিজেদের সংগঠিত করে পরিচালনা করার ক্ষমতা, তাঁকে আমাদের জাতির এক সুবিদিত সম্পদরূপে চিহ্নিত করে। এ ছাড়াও তিনি আমাদের মাতৃভূমিতে অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ করার জন্য অমূল্য কাজ করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ দলিত শ্রেণির মানুষের মনে নৈতিক মর্যাদাপূর্ণ আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করে ফলাফল অর্জন করেছেন, তৈরি করেছেন স্থায়ী দেশপ্রেমমূলক জনহিতকর কৃতিত্ব। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে যে সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছে তাই নয়, আত্মবিষণ্নতা থেকেও তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন এবং তথাকথিত স্পৃশ্যদের অতিরিক্ত কাজ করার দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাঁদের প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সবশেষে সাভারকর বলেন, "মানুষটিকে এবং তাঁর কাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসহ আমি ডঃ আম্বেদকরের নীরোগ, কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।" বম্বে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভাও আম্বেদকরকে তাঁর সুবর্ণজয়ন্তীতে অভিনন্দন জানায়।

'বম্বে সেন্টিনেল' এর সম্পাদক বি.জি. হোর্নিম্যান বলেন, আম্বেদকরের মহান

বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি এবং দেশ ও তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সেবামূলক কাজ তাঁকে ভারতের মহান ব্যক্তিদের সাথে প্রথম সারিতে বসিয়েছে। তিনি আরও বলেন, যাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে ভারতের মানুষের জন্য স্বাধীনতা অর্জনের ভূমিকায় অবতীর্ণ আম্বেদকরের কার্যাবলি তাঁদের সকলের কাছ থেকেই শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার দাবি রাখে।

সেলিব্রেশন কমিটির চেয়ারম্যান আচার্য দণ্ডের সভাপতিত্বে বম্বের প্যারেলের কামগড় ময়দানে জুবিলি কমিটির শেষ সভা হয়। সেখানে আম্বেদকরকে ৮৮০ টাকা উপহার দেওয়া হয়। উত্তরে সেই বিশাল সমাবেশে আম্বেদকর বলেন, তাঁর জন্মদিন পালনের রেওয়াজ বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ, তাঁর মতে যে সমাজ একজন মানুষকে পুজো করে তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসায়, সে সমাজ নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসের পথে যায়। তিনি বলেন, জন্মসূত্রে অতিমানব হয়ে ঐশ্বরিক গুণাবলি নিয়ে কেউ আসেন না। নিজের প্রচেষ্টায়ই মানুষের উত্থান বা পতন হয়।

দলিত শ্রেণির উন্নতি সম্পর্কে সমীক্ষা করে তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, দলিত শ্রেণি সমাজের একটি অঙ্গ। হিন্দুরা যাতে দলিত শ্রেণির লোকদেরকে সাম্যের শর্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, সেজন্যই তিনি মাহাদ ও নাসিকের সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়নি। পরে তিনি ব্রিটিশের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, তাঁদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার স্বীকার করে না, এমন পরিকল্পনাকে দলিত শ্রেণি যে কোনো উপায়ে রুখে দেবে। হিন্দুদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁরা যদি হিন্দু সমাজে দলিত শ্রেণির জন্য জায়গা করে দেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে।

১৯৪২ সালের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে খবর আসে যে, ভাইসরয় তাঁর 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ' (Executive Council) সম্প্রসারিত করবেন। ২ জুলাই 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এ যাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে ছিলেন স্যার সি.পি.রামস্বামী আয়ার, স্যার মহম্মদ ওসমান, ডঃ আম্বেদকর, স্যার জে.পি. শ্রীবাস্তব ও স্যার যোগেন্দ্র সিং। এঁদের নিয়ে ভারতীয়দের সংখ্যা হয় চৌদ্দ এবং ইউরোপীয়দের সংখ্যা হয় পাঁচ।

আম্বেদকরের এই নিয়োগ কোনো বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়নি। কংগ্রেস পত্রিকাগুলি এর মৃদু সমালোচনা করে বলেছে, এটা শ্রমিকদের কল্যাণ করতেও পারে। বম্বের 'সানডে স্টাণ্ডার্ড' মন্তব্য করেছিল যে, যিনি হতভাগ্যদের জন্য সারাজীবন ব্যয় করেছেন এবং শ্রমিকদের জন্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন, তাঁর পক্ষে

এটা অবশ্যই একটি আদর্শ পোর্টফোলিও। পত্রিকাটি আরও বলে যে, স্বাধীনচেতা ডঃ আম্বেদকর সরকারের পক্ষে কাঁটা হয়ে না দাঁড়ালেও তাদের রবারস্ট্যাম্প হবেন না। বম্বের 'দি টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া' মন্তব্য করে, দেশের ইতিহাসে এই প্রথম একজন অস্পৃশ্য হিন্দু ভারত সরকারের 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এর সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন।

আসলে এটা ছিল একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ভারতের ইতিহাসে এর আগে কখনও দলিত শ্রেণির কেউ শাসনকার্যে এতটা উচ্চপদ লাভ করেননি। আম্বেদকরের এই নিয়োগ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল অনন্য। তিনিই প্রথম জননেতা যিনি ভাইসরয়ের 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এ সদস্য নিযুক্ত হন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এ নিয়োগের জন্য দলিত শ্রেণির লোকেরা অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তা ছাড়া অতীতের ওই পর্যায়ের খুব অল্পসংখ্যক ভারতীয়ের মতো আম্বেদকর ছিলেন সর্বতোভাবে প্রস্তুত। নিজের দেশে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক সমস্যা ও তাঁদের ব্যাপারে আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। সর্বোপরি তিনিই প্রথম সমাজবিপ্লবী যিনি ভারতের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ-এর অফিসের একটি উচ্চপদে আসীন হবার সুযোগ পান।

কয়েক বছর আগে আম্বেদকর হাইকোর্টের বিচারক হয়ে রেকর্ড করার সুযোগ পেয়েছিলেন যাতে, হাইকোর্টে যেসব ব্যক্তি অবজ্ঞায় তাঁর প্রতি নাক কুঁচকাতেন, তাঁদেরই দেওয়া জোরালো যুক্তির গুরুত্ব বিচার করতে হত তাঁকে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা আম্বেদকর এইভাবে ধুলা থেকে নিজেকে উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত করেন। মহৎ গুণ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দীর্ঘকাল ধৈর্য সহকারে পরিশ্রম, সেবার প্রতি ভালবাসা, ত্যাগ স্বীকারের প্রবণতা এবং বীরোচিত নৈতিক গুণাবলির জোরে একটি সামান্য অস্পৃশ্য বালক সিঁড়ির উচ্চতম ধাপে আরোহণ করেন। এমন এক প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যা ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার জগতে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে এবং হিন্দুস্তানের এক শ্রেণির মানুষের উপরে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি প্রয়োগ করে।

আম্বেদকর অনেক বিখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছ থেকে শত শত অভিনন্দনপত্র এবং টেলিগ্রাম পান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাভারকর, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, লোকনায়ক অ্যানে, স্যার সুলতান আহমেদ, বিকানিরের মহারাজা, বম্বের প্রধান বিচারপতি, স্যার চিমনলাল শেতলবাদ, রাও বাহাদুর এম.সি. রাজা ও অন্যান্য অনেক গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবৃন্দ।

আম্বেদকর ৫ জুলাই 'জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ'-এর (National Defence

Council) মিটিং-এ যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লি রওনা হয়ে যান এবং সেখান থেকে ১১ জুলাই বম্বে ফিরে আসেন।

ফিরে আসার পর আম্বেদকর বম্বের রেডিও ক্লাবে বন্ধু ও গুণমুগ্ধদের আয়োজিত এক নৈশভোজে যোগ দেন। আচার্য এম.ভি. দণ্ডে সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেই বছরগুলির কথা উল্লেখ করেন, যখন তাঁরা ধৈর্য সহকারে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন তাঁদের নেতা তাঁর লোকদের দাসত্ব ঘোচাবেন এবং ভারতের শ্রমজীবী জনতার উন্নতি সাধনে কৃতকার্য হবেন। আম্বেদকর তার উত্তরে বলেন, তিনি গরিবের ঘরে জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে বড়ো হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বাস করেছেন, তাঁদের মতো স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় চটের বিছানায় ঘুমিয়েছেন ও তাঁর লোকদের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি শপথ করে বলেন যে, বন্ধুদের প্রতি এবং পৃথিবীর অন্য সকলের প্রতি তাঁর মনোভাব থাকবে অপরিবর্তিত এবং দিল্লিতে তাঁর বাড়ির দরজা বন্ধুদের জন্য সব সময়ই খোলা থাকবে।

পরদিন ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি ও বম্বে মিউনিসিপ্যাল লেবার ইউনিয়ন তাদের নেতাকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে একটি সভা করে। সেই সভায় আম্বেদকর শ্রমিকদের বলেন, 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এর সামনে যদিও প্রধান কাজ দেশের প্রতিরক্ষা, তাহলেও তিনি যা করবেন তার অনেকটাই নির্ভর করে পরিষদ-এ (Council) তাঁর সহকর্মীদের উপর। বম্বের আর.এম. ভাট হাইস্কুলে কোংকন জেলা এবং রাজ্যগুলির কৃষকদের আয়োজিত এক সভায় আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে, ভারতের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষা এবং তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সংগ্রাম শুরু করতে হবে সেই সংগ্রামে তিনি কখনও আত্মসমর্পণ করবেন না। এমনকি ছোটোখাটো মতান্তরের জন্য পদত্যাগেরও হুমকি দেবেন না। দলিত শ্রেণির জন্য স্বতন্ত্র সংগঠন সাধারণ শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ ও একতার পক্ষে ক্ষতিকরÑ এই অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন, সমাজের নিম্নতম শ্রেণির লোকের স্বার্থে যে সংগ্রাম চালিত হয় তা শ্রমিকদের অন্যান্য শ্রেণির উন্নয়নের কাজেও সহায়তা করতে বাধ্য। কারণ কোনো কাঠামোর সবচেয়ে নিচের পাথরটি যদি সরে যায়, তাহলে তার উপরের অংশও ধসে পড়বে। তিনি দেখান যে, বর্ণহিন্দু শ্রমিকেরা দলিত শ্রেণির শ্রমিকদের প্রতি যে কুসংস্কার লালন করে আসছেন, তা থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেননি। অনুষ্ঠানের সভাপতি অনন্তরাও চিত্রে আম্বেদকরকে তাঁর শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব ও কাজকর্মের পরিধি বাড়ানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান, যাতে অ-দলিত শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষদেরও তাঁর আন্দোলনের আওতায় নিয়ে আসা যায় এবং ভারতের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের তিনি নেতৃত্ব দিতে পারেন।

মাহার পঞ্চায়েতে অভিনন্দন জানানোর সভায় আম্বেদকর স্পষ্টভাবে বলেন,

কীভাবে তিনি ছেলেবেলায় 'মিলে' কাজ করার জন্য সাতারা থেকে বম্বে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং কীভাবেই বা তাঁর পিসিমার পুঁটলি থেকে টাকা চুরি করে নেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি বলেন, দলিত শ্রেণির পক্ষ থেকে চাপ দেওয়ার ফলেই সরকার তাঁকে পরিষদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁদের একটি কথা মনে রাখতে বলেন, যদি কেউ কোনো পদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন না করেন, তাহলে সরকার তাঁদের দাবি পূরণ করতে পারবে না।

জুলাই মাসের ১৮ এবং ১৯ তারিখ ছিল 'নিখিল ভারত দলিত শ্রেণি'র (All India Depressed Classes) সম্মেলন বসার নির্ধারিত দিন। দলিত শ্রেণির সর্বভারতীয় সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি এন. শিবরাজকে সাথে নিয়ে আম্বেদকর ১৮ জুলাই সকাল ৯ টায় নাগপুরে এসে পৌঁছান। চল্লিশ হাজার লোকের বিশাল জনতা তাদের পছন্দের নেতা ও নির্বাচিত সভাপতিকে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জানায়। পাঞ্জাব, বাংলা ও মাদ্রাজ থেকে নেতৃবৃন্দ এই সভায় যোগ দিতে আসেন। নাগপুর মোহন পার্কে বিরাট প্রশস্ত প্যাণ্ডেলে সম্মেলন শুরু হয়।

সম্মেলনের শুরুতে সভাপতি এন. শিবরাজ মন্ত্রীপরিষদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আম্বেদকরকে দলিত শ্রেণির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, জনগণের সেবার জন্য এই দপ্তর এক নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

আম্বেদকর বলার জন্য উঠে দাঁড়ালে সত্তর হাজার লোকের বিশাল জনতা উচ্চরবে উল্লাস প্রকাশ করে। তিনি দলিত শ্রেণির দাবি প্রসঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের দিন থেকে শুরু করে ক্রিপসের প্রস্তাব পর্যন্ত সমস্ত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন এবং ক্রিপসের প্রস্তাবকে দলিত শ্রেণির প্রতি এক বড়ো রকমের বিশ্বাসঘাতকতা বলে বর্ণনা করেন।

মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জিন্নাহ্ তাঁর সম্প্রদায়কে যখন সংখ্যালঘু বলে অভিহিত করেন, তখন অন্যান্য সংখ্যালঘুরা পরস্পরের কাছ থেকে শক্তি পেতেন। কিন্তু এখন সেই জিন্নাহ্ তাঁর সম্প্রদায়কে একটি জাতি বলছেন। তাঁর এই মত বদলানোর অর্থÑ তাঁরা একারাই লড়াই চালিয়ে যাবেন।

তিনি বলেন, "এটা একটা বিশাল তৃপ্তির বিষয় যে, অস্পৃশ্যরা সব দিকেই বেশ দ্রুত ও সবল পদক্ষেপ নিয়েছেন।" তিনি আনন্দের সাথে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা রাজনৈতিক চেতনায় একটি বড়ো মাত্রা অর্জন করেছেন, যা ভারতের অল্পসংখ্যক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন এবং পাবলিক সার্ভিস সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পা রাখার জায়গা নিশ্চিত করেছেন। সবার উপরে অস্পৃশ্য মহিলারা যে উন্নতি করেছেন, তা উৎসাহব্যঞ্জক এবং বিস্ময়কর।

উন্নতিতে এটা একটা রেকর্ড, তাঁরা এর জন্য রীতিমত গর্ব করতে পারেন। এটা হিন্দুদের বদান্যতার ফল নয়। এটা তাঁর নিজস্ব পরিশ্রমের ফসল। প্রস্তাবনার মধ্যে তাঁর রাজনীতির মূল ভিত ছিল, অস্পৃশ্যরা হিন্দুদের কোনো উপসমাজ নন, তাঁরা ভারতের জাতীয় জীবনে মুসলিমদের মতো একটি আলাদা অঙ্গ। সুতরাং তিনি হিন্দুদের বিপরীতে আলাদা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। তিনি ঘোষণা করেন, গান্ধি তাঁদের সব থেকে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদে (Executive Council) দলিত শ্রেণির জন্য একটি আসন মানে ব্রাহ্মণ্যবাদের উপরে এক মারণ-আঘাত।

যুদ্ধের পক্ষে তিনি নিঃশর্ত সমর্থন জানান। তাঁর মন্তব্যÑ একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে এই যুদ্ধ। একনায়কতন্ত্র নৈতিকতার ভিত্তিতে নয়, জাতিগত ঔদ্ধত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নাৎসিবাদ মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে এক হুমকি। সুতরাং মানবিক সম্পর্কের নিয়ামক নীতি হিসাবে গণতন্ত্র যাতে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় সেটা দেখা তাঁদের কর্তব্য। অতএব, গণতান্ত্রিক সভ্যতার ভিত রক্ষা করার জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে তাঁদেরও লড়াই করা উচিত। তিনি মন্তব্য করেন, "যদি গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁদেরও সর্বনাশ হবে।"

সবশেষে তিনি বলেন, "তোমাদের প্রতি আমার চূড়ান্ত উপদেশÑ শিক্ষিত হও, সংগ্রাম কর এবং সংগঠিত হও। আত্মবিশ্বাস অর্জন কর। ন্যায় যখন আমাদের পক্ষে তখন লড়াইয়ে আমরা কী করে হেরে যেতে পারি সেটা আমি বুঝতে পারি না। আমার কাছে লড়াই একটা আনন্দের ব্যাপার। এ লড়াই সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক। এর মধ্যে বস্তুগত বা সামাজিক কিছু নেই। আমাদের জন্য এ লড়াই সম্পদ বা ক্ষমতার জন্য নয়। এ লড়াই স্বাধীনতার। এটা মানুষের ব্যক্তিত্বকে পুনরুদ্ধার করার লড়াই।"

সম্মেলনে 'অল ইণ্ডিয়া তপশিলি জাতি ফেডারেশন' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় এবং সরকারি খরচে বসতি স্থাপনের জন্য আলাদা গ্রাম পত্তনের দাবি করা হয়। সম্মেলনের শেষ দিকে তাঁর বিরুদ্ধে সমাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া ও বইয়ের মধ্যে মগ্ন থাকার অভিযোগ খণ্ডন করে আম্বেদকর বলেন যে, কারও বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ নেই এবং তিনি কখনও অন্য কাউকে অপমান করেন না। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে তাঁকে সর্বাধিক অগ্রগতি লাভ করতে হবে। "অনেক হিন্দু আমাকে তাঁদের শত্রু হিসাবে দেখেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমার অনেক ব্যক্তিগত বন্ধু আছেন। আমি যে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি, তাতে যাঁরা আমার লোকদের সাথে কুকুর-বিড়ালের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করেন ও তাঁদের উন্নতিতে বাধা দেন, সেইসব ব্রাহ্মণদের অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে চাবুক মারা আমার নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।" মাদ্রাজের 'হিন্দু পত্রিকা' আম্বেদকরের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে

আলাদা বসতি দাবি করার ব্যাপারে তাঁকে চিন্তাভাবনা করতে বলে। উন্নততর বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসম্মত হিসাবে মেনে নিলেও এটা অস্পৃশ্যতাকে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারে।

নাগপুরের এই একই মঞ্চে আম্বেদকর আরও দু'টি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। একটি ছিল অমরাবতীর মিসেস সুলোচনাবাঈ ডোংরির সভাপতিত্বে দলিত শ্রেণির মহিলাদের সম্মেলন। আম্বেদকর সেখানে বলেন যে, তিনি মহিলাদের সংগঠনে বিশ্বাসী। যদি তাঁদের বোঝানো যায়, তাহলে তাঁরা সমাজের কত উন্নতি করতে পারেন, তা তিনি জানেন। সামাজিক পাপকে সমূলে ধ্বংস করতে তাঁরা বিশাল সেবামূলক ভূমিকা পালন করেছেন। একটি সম্প্রদায় কতটা উন্নত, তিনি তা বিচার করতেন সেই সম্প্রদায়ের নারীসমাজ কতটা উন্নত হয়েছে, তা দিয়ে। তিনি খুশি এবং নিঃসন্দেহ যে, নারীসমাজ উন্নতি লাভ করেছে। তিনি বলেন, "পরিচ্ছন্ন হতে শিখুন। অনাচার থেকে দূরে থাকুন। সন্তানদের শিক্ষা দিন। তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলুন। তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন যে, নিশ্চিতভাবে তারা বড়ো হতে পারবে। তাদের মন থেকে হীনম্মন্যতা দূর করে দিন। বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। বিয়ে একটা দায়িত্ব। বিয়ের ফলে উদ্ভূত দায়িত্ব বহন করার মতো আর্থিক ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত আপনারা সন্তানদের উপর তা চাপিয়ে দেবেন না। যারা বিয়ে করবে, তাদের মনে রাখতে হবে যে, অনেক সন্তানের জন্ম দেওয়া একটা অপরাধ। পৈতৃক কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক সন্তানকে তার মা-বাবার চেয়েও উন্নত জীবন শুরু করতে দেওয়া। সর্বোপরি, মেয়েদের বিয়ের পরে প্রত্যেককেই তার স্বামীর পাশে দাঁড়াতে হবে, বন্ধু ও তার সমকক্ষ হওয়ার দাবি করতে হবে এবং তার দাসীত্বকে অস্বীকার করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা যদি এই উপদেশ মেনে চলেন, তাহলেই আপনারা সম্মান ও গৌরব অর্জন করতে পারবেন।" এই বলে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

নিপীড়িত শ্রেণির মহিলাদের মধ্যে আংশিক জাগরণের নিদর্শন ও মিসেস ইন্দিরাবাঈ পাতিল ও মিসেস কীর্তিবাঈ পাতিলের মতো নেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এই মহিলাসম্মেলনে বহুবিবাহ প্রথা বিলোপ করার দাবি জানানো হয় এবং মহিলাশ্রমিকদের জন্য পেনশন ও সবেতন ছুটির ব্যবস্থা চালু করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। সর্দার গোপাল সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'সমতা সৈনিক দল'-এর সম্মেলনে আম্বেদকর মন্তব্য করে বলেন, অহিংসনীতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা আছে, কিন্তু কাপুরুষোচিতভাবে আত্মসমর্পণ করার সাথে অহিংসনীতির তফাত আছে। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের বলেন, একজন মানুষের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা, দাসত্ব ও অসহায়ের মতো জীবনযাপন করা মানানসই নয়। সন্ত তুকারামের মতো তিনি বিশ্বাস করেন, দুষ্টকে ধ্বংস করাও এক ধরনের অহিংসা। যদিও সকল

জীবের প্রতি প্রেম ও করুণা প্রদর্শন অহিংসনীতির একটি অংশ, তাহলেও দুষ্কৃতকারীকে ধ্বংস করাও অহিংস-মতবাদের এক মূল বিষয়। তা না হলে অহিংসা তো এক শূন্য খোলস, স্বর্গসুখ। শক্তি ও শীল অহিংসবাদীদের আদর্শ হওয়া উচিত।

শহরে থাকাকালীন সময়ে তিনি লালা জয়নারায়ণের দেওয়া এক চা-চক্রে আপ্যায়িত হন। সেই সময় দিল্লি থেকে একজন রাজকীয় বার্তাবাহক নাগপুরে আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করেন। সেই বার্তা অনুসারে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই সকালে নাগপুর থেকেই টেলিগ্রামের মাধ্যমে আম্বেদকর ভারত সরকারের শ্রমদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তথাকথিত উচ্চশ্রেণির লোকেরা এতটাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণ্য ব্যবহার করতেন যে, দিল্লি থেকে আসা ওই বার্তাবাহক নাগপুর স্টেশনে ও তার বাইরে লোকদের কাছে দলিত শ্রেণির অধিবেশনের জায়গা সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি তাদের কাছ থেকে নিঃস্পৃহ দৃষ্টি কিংবা কিছু বাজে কথায় উত্তর পেয়েছিলেন।

নাগপুর থেকে ফিরে আসার পর ডঃ আম্বেদকর তাঁর উদ্দেশে দেওয়া শেষ অভ্যর্থনা সভা, মিসেস দণ্ডের সভাপতিত্বে বম্বের দলিত শ্রেণির মহিলাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি সেখানে শিক্ষিত মেয়েদের ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী যুববকদের বিয়ে না করার উপদেশ দেন। সবশেষে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, দলিত শ্রেণির মহিলারা, বিশেষ করে মাহার মহিলারা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মারাঠি, ভাণ্ডারি কিংবা আগারি মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি উন্নতি লাভ করেছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রমমন্ত্রী

দিল্লি রওনা হওয়ার আগে আম্বেদকর ১৯৪২ সালের ২৭ জুলাই বম্বের 'দি টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে গান্ধির খোলাখুলি বিদ্রোহকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে বর্ণনা করে বলেন, এটা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিচয় এবং কংগ্রেসের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার একটি প্রয়াস মাত্র। ভারত দখল করার জন্য বর্বরেরা যখন ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, তখন দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে দুর্বল করার এটা একটা পাগলামি। ব্রিটিশের মুখোমুখি ভারতীয়রা শেষ খাদে পৌঁছেছে। যদি গণতন্ত্রের জয় হয়, তবে ভারতের স্বাধীনতার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। পরে গান্ধিকে তিনি এমন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন যে, যিনি খুব তড়িঘড়ি কাজ করতে চান।

কংগ্রেসি-পত্রপত্রিকা এই বিবৃতির বিরূপ সমালোচনা করে বলে যে, আম্বেদকর শ্রমমন্ত্রী হয়েছেন, তাই প্রতিদানে ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে তিনি সমর্থন করছেন।

আম্বেদকর একাই গান্ধির এই ভূমিকার বিরোধিতা করেননি। মুসলিম লিগের নেতারাও কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সংগ্রাম থেকে দূরে থাকার জন্য মুসলিমদের সাবধান করেছেন। সাভারকর ঘোষণা করেন, কংগ্রেস যদি তার পরিকল্পিত সংগ্রাম শুরু করার আগে ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতায় একনিষ্ঠ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে হিন্দু মহাসভা এই সংগ্রামে যোগ দেবে। সাভারকর ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, গান্ধির যা প্রকৃতি তাতে একটি নয়, বহু পাকিস্তানের জন্যও তিনি রাজি হবেন।

আম্বেদকর নতুন দিল্লিতে আসার সপ্তাহখানেকের মধ্যে কংগ্রেস তার আগস্ট-সংগ্রাম শুরু করে। ভাইসরয়ের 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ' (Executive Council) বৈঠক করে তাদের সিদ্ধান্ত জানায় যে, কংগ্রেসের আন্দোলন একটি চ্যালেঞ্জ, যা ভারতকে বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্যের মধ্যে ঠেলে দেবে এবং মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে অসাড় ও পঙ্গু করে দেবে।

সারাদেশে কংগ্রেসি নেতাদের গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়। এর ফলে জন-অসন্তোষ, গণ-বিশৃঙ্খলা ও সরকার কর্তৃক তাঁদের কঠোর দমন ব্যবস্থা ইত্যাদিতে দেশে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুসলিম ও হিন্দু মহাসভার অনুগামীরা এই সংগ্রাম থেকে দূরে থাকেন। আম্বেদকরপন্থীরাও এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন এবং সামরিকীকরণের উপর তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত করেন।

২৩ আগস্ট দিল্লিতে 'ডিপ্রেস্‌ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' থেকে

আম্বেদকরের সম্মানার্থে ডাকা অভ্যর্থনাসভায় তিনি তাঁর মনের অবদমিত চিন্তাভাবনার কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পদের প্রতি তাঁর মোহ নেই। তিনি যদি সাধারণ জনগণের উন্নতির চেষ্টায় অসফল হন, তাহলে সানন্দে তাঁর নিজের কাজে ফিরে যাবেন। তিনি দেখান যে, সংখ্যার দিক থেকে দলিত শ্রেণি মুসলিমদের প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এ (Executive Council) দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের তিনগুণ প্রতিনিধিত্ব মুসলিমদের দেওয়া হয়েছে। দলিত শ্রেণির লোকেরা এজন্য অসন্তুষ্ট।

আম্বেদকর ক্ষমতায় থাকলেও তিনি তখন ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। বম্বেতে থাকা তাঁর ছেলে ও ভাইপোর কাছ থেকে কোনো খবর পাচ্ছেন না। সেখানে তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক গোলমাল চলছে। তিনি ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে বিফল হলেন। তাই জরুরি চিঠি লিখে তাদের চরম সতর্কতায় থাকতে বলেন। কারণ, তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাঁর জন্যই তাঁর পরিবারের লোকজনেরা বিপদগ্রস্ত হতে পারে।

আগস্ট মাসের গোলমালের পর থেকে ভারতে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, পরবর্তী মাসে সেই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভায় আলোচনা হয়। সেখানে বিতর্কের উত্তরে আম্বেদকর বলেন, গত দু-তিন বছর ধরে তিনি লক্ষ করেছেন যে, অহিংসনীতির মধ্যে একটা ধস নেমেছে। ভারত-সচিবের ভেটো দেবার যে ক্ষমতা রয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা থাকা উচিত ছিল আইনসভার হাতে। কিন্তু যেহেতু অনেকদিন থেকে কোনো নির্বাচন হয়নি সেহেতু বর্তমান আইনসভাকে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় না।

১৯৪২ সালের ১৩ নভেম্বর "ভারতীয় শ্রমিক ও যুদ্ধ" (Indian Labour And War) সম্পর্কে শ্রমমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকর আকাশবাণী বম্বে (All India Radio, Bomby) থেকে ভীষণ ভাবনা উদ্রেককারী এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এ যুদ্ধ পুরোপুরিভাবে কেবল পৃথিবীর অঞ্চলগুলিকে বিভক্ত করার যুদ্ধই নয়, একটি বিপ্লব ঘটানোরও, যা মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে সহযোগী হিসাবে থাকার শর্তগুলির মৌলিক পরিবর্তন চায়। এটা এমন এক বিপ্লব যাকে বলা যায় মিলেমিশে বাস করার জীবন পুনর্বিবেচনা করবে, সমাজকে নতুন করে গঠন করবে। সুতরাং শ্রমিকদের নাতসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধ করতেই হবে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করলে নাতসিবাদ ধ্বংস হবে। আর যদি নাতসিবাদ জয়লাভ করে, তাহলে স্বাধীনতাকে চেপে দেওয়া হবে, সাম্যকে অস্বীকার করা হবে ও ভ্রাতৃত্ববোধকে ক্ষতিকর বলে বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে। জয়ের ফল হিসাবে দেখা দেবে স্বাধীনতা এবং এক নতুন সমাজব্যবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতার গুরুত্ব নির্ভর করে কী ধরনের সরকার ও কী ধরনের সমাজ গঠিত হয়, তার উপর। সুতরাং 'নতুন

ভারত’ গড়ে তোলার আন্দোলনের উপর শ্রমিকদের বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনকে কম গুরুত্ব দিতে হবে। সহিংস শক্তির কাছে নতিস্বীকার করে পাওয়া শান্তি, শান্তি নয়। সেটা হচ্ছে আত্মহত্যার নামান্তর এবং উপযুক্ত মনুষ্য জীবনযাপন করার জন্য যা কিছু মহৎ ও প্রয়োজনীয় তার সবকিছুকেই হিংস্র ও বর্বর শক্তির কাছে বিসর্জন দেওয়া। সবশেষে তিনি বলেন, “আক্রান্ত হলে যুদ্ধকে অস্বীকার করে তাকে বিদায় দেওয়া যায় না। যুদ্ধকে বিদায় করতে হলে অবশ্যই যুদ্ধে জয়ী হতে হবে ও ন্যায়সঙ্গত শান্তিপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।”

‘প্যাসিফিক রিলেশন কমিটি’র (Pacific Relations Committee) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আম্বেদকর ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে অস্পৃশ্যদের সমস্যার উপর একটি গবেষণাপত্র রচনা করেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার কুইবেক (Quebec) শহরে ওই কমিটির অধিবেশনে এন.শিবরাজ এটি পাঠ করেছিলেন। এই গবেষণাপত্রে আম্বেদকর অনুতাপ করে বলেছেন, বিভিন্ন দেশে দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হলেও ভারতে অস্পৃশ্যতা এখনও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। গবেষণাপত্রে আম্বেদকর আমেরিকার লোকজনদের কাছে এই মর্মে আবেদন জানান যে, তাঁরা যেন কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী প্রচারে বিভ্রান্ত না হন এবং হিন্দুদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে দেশে অস্পৃশ্য বলে গণ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাধীনতার শত্রু হয়ে না দাঁড়ায়, তার জন্য তাঁরা যেন আগে থেকেই কংগ্রেসি হিন্দুদের কাছ থেকে তা ভালভাবে বুঝে নেন।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি আম্বেদকর সুরাট যান। সেখানে ‘সিভিল পাইওনিয়ার’ র‍্যালি-র উদ্দেশে তিনি একটি ভাষণ দেন। সামরিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ওই র‍্যালিতে তিনি বলেন, ভারতবাসীরা যখন স্বাধীনতা লাভ করবে তখন এরাই হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক এবং ‘সিভিল পাইওনিয়ার’-রাই আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে।

সুরাট থেকে বম্বে ফিরে এলে আম্বেদকরকে সন্ধ্যায় আর.এম. ভাট হাইস্কুলে মারাঠা ও তার সহ-সম্প্রদায়গুলির তরফ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। যে অব্রাহ্মণ রাজনৈতিক দলগুলি বম্বে ও মাদ্রাজে বিশ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল, তাদের পতনের কারণ অনুসন্ধান করে তিনি বলেন, প্রথম কারণ, অব্রাহ্মণ দলগুলি নিজেদের লোকজনকে চাকরি দেওয়ার জন্য তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, অন্য কিছু নয়। এমন কোনো উদার নীতি বা ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেনি, যা তাদের অনুগামী এবং যেসব কৃষক ও শ্রমিক ওই দলগুলিকে সমর্থন করতেন, তাঁদের উপকার করতে পারে। একই ভাবে খারাপ ছিল আরও একটি ব্যাপার। এই অব্রাহ্মণ রাজনৈতিক দলগুলি যাদের চাকরি দিয়েছিল, ক্ষমতার আসনে বসে তাঁরা যে শ্রেণির লোক, সেই

শ্রেণির লোকদের কথাই ভুলে যান এবং বিদেশিদের মতোই উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্য দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, কারণ গণতন্ত্র সেখানে রক্ষণশীলদের হাতে। যদি সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণরা ক্ষমতায় আসে, তাহলে এদেশেও সেই একই অবস্থা হবে। শ্রোতাদের তিনি বলেন যে, একটি রাজনৈতিক দলকে শক্তিশালী করতে তিনটি বিষয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রথমটি হচ্ছেÑ এর নেতাকে অন্য দলের নেতাদের সমকক্ষতা অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, দলকে অবশ্যই সাংগঠনিকভাবে সুশৃঙ্খল হতে হবে এবং তৃতীয় বিষয়টি হল, দলের একটি নিখুঁত কর্মসূচি থাকবে। ভারতে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে এবং রক্ষণশীলদের কবল থেকে তাকে মুক্ত রাখতে গেলে এই ক'টি চাহিদা পূরণ করা দরকার।

ভারতের দেশপ্রেমিক এবং সমাজসংস্কারক রাণাডের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার জন্য আম্বেদকর আমন্ত্রণ পেয়ে পুনা যান। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি সেখানে তিনি বক্তৃতা দেন। জীবনে তিনি যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন, এটি তার অন্যতম। বক্তব্যের শুরুতে মানুষের মহত্ত্ব মূল্যায়ন করার তিনটি তত্ত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, অগাস্টিনের মতবাদে ইতিহাস হচ্ছে ঐশ্বরিক পরিকল্পনার উন্মোচন মাত্র। এর মধ্য দিয়ে যতদিন শেষ বিচারের দিনে ওই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন মানুষকে সংগ্রাম আর দুর্ভোগের মধ্যেই চলতে হবেÑ এখন এটি ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের একটি বিশ্বাস মাত্র। বাকল-এর মতবাদেÑ ইতিহাসকে সৃষ্টি করে ভূবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান। কার্ল মার্কসের মতবাদে ইতিহাস হচ্ছে অর্থনৈতিক শক্তির পরিণতি। আর আম্বেদকর বলেন, এতে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয় না। নৈর্ব্যক্তিক শক্তিগুলিই সব এবং ইতিহাস সৃষ্টির পিছনে মানুষের কোনো হাত নেইÑ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দু'টি চকমকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বালাতে মানুষেরই প্রয়োজন।

সামরিক বীরেরা তাঁদের দেশকে আগের তুলনায় ছোটো করেছেন কিন্তু সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেননি। মানুষের মহত্ত্বকে বোঝাতে গিয়ে আম্বেদকর বলেন, কার্লাইল গুরুত্ব দিয়েছেন তার সততা ও আন্তরিকতার উপর। রোজবেরির মতে একজন মহামানবকে এ জগতে আসতে হয় এক মহান প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিরূপে, একটি চাবুক হিসাবে এবং বিশুদ্ধ করার জন্য একজন ঝাড়ুদার রূপে। এসব পরীক্ষা আংশিক এবং কেউই সম্পূর্ণ নন। আলোচনার সারাংশ করে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, যিনি মহান তিনি অবশ্যই সামাজিক কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণবন্ত আবেগের দ্বারা পরিচালিত হবেন এবং তাঁকে সমাজের এক চাবুক ও সমাজশোধক হিসাবে কাজ করতে হবে। এই মূল্যমানে রাণাডেকে বিচার করলে, কেবল তাঁর সময়েই নয়, অন্য যে কোনো মানদণ্ডে বিচার করলেও তিনি

একজন মহামানব। রাণাডের জীবন সামাজিক অবিচার ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং সমাজ সংস্কারের জন্য এক কঠোর সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। যে হিন্দুসমাজ তখন ছিল মুমূর্ষু ও ব্যাধিগ্রস্ত তার অধিকারবোধ সৃষ্টি এবং বিবেকবোধ সতেজ করে তুলতে ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে রানাডে সংগ্রাম করেছিলেন।

আম্বেদকর গান্ধি ও জিন্নাহ্‌র সাথে রাণাডের তুলনামূলক বিচার করেন। তিনি বলেন, বিশাল আত্মপ্রচারে গান্ধি ও জিন্নাহ্‌র মতো দু'জন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত প্রাধান্যই সবকিছু এবং দেশের ব্যাপারটা তো টেবিলে বসে নিছক বিরুদ্ধাচরণ করা। চাটুকারদের চাটুকারীতায় তাঁরা অভ্রান্ততা দাবি করেন।

এরপর তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় সাংবাদিকতা এককালে ছিল পেশা, এখন হয়েছে ব্যাবসা। তিনি কংগ্রেসি সংবাদপত্রের লেখাগুলির নিন্দা করে বলেন, সেগুলি যেন ঢাক-বাজিয়েদের মতো তাদের নায়কদের যশগৌরব ঘোষণা করার জন্যই লেখে।

সবশেষে তিনি বলেন, কারও প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে 'বীরপূজা' এক জিনিস, আর অন্ধভাবে ওই বীরের কথা মেনে চলা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

আম্বেদকরের এই বক্তৃতা 'রাণাডে, গান্ধি এবং জিন্নাহ্' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং তার মুখবন্ধে আম্বেদকর বলেন যে, তাঁর সময়ে বলিষ্ঠ দাগ রেখে যাবেন এবং মহান নীতি ও সংগ্রামী উদ্দেশ্যকে সহায়তা করবেনÑ এটা কেউ আশা করতে পারেন না, যদি তিনি ভালোবাসা ও ঘৃণা এই দু'টি ব্যাপারেই শক্তিশালী না হন। আম্বেদকর বলেন, "আমি অন্যায়-অবিচার, নিপীড়ন, আত্মম্ভরিতা ও ধোঁকাবাজিকে ঘৃণা করি এবং যারা এসব অপরাধে অপরাধী, তাদের সবাইকেও ঘৃণা করি। আমার সমালোচকদের আমি বলতে চাই যে, ঘৃণার অনুভূতিকে আমি আসল শক্তি বলে মনে করি। আমি যে উদ্দেশ্যের প্রতি আমার ভালোবাসা পোষণ করি, সেগুলি তারই প্রতিফলন মাত্র এবং এ কথাটি বলতে আমি কোনোভাবে লজ্জিত নই।" তিনি আশা করেন দেশবাসীরা একদিন বুঝতে পারবেন যে ব্যক্তির চেয়ে দেশ বড়ো।

বৌদ্ধমতবাদ থেকে আম্বেদকর ঘৃণা করার নীতি পাননি। বৌদ্ধমতবাদের পরিকল্পনা তাঁর জীবনে তখনও আসতে বাকি। ঘৃণাকে ঘৃণার দ্বারা থামানো যায় না, ভালোবাসার দ্বারা থামাতে হয়Ñ বুদ্ধের এটাই শাশ্বত নীতি। আম্বেদকর সম্পূর্ণ অহিংসনীতিকে ভালবাসতেন উদ্দেশ্য রূপে এবং তার উপায়স্বরূপ বিশ্বাস করতেন আপেক্ষিক হিংসা নীতিতে। **তাঁর অভিমত ছিল, গান্ধি অহিংসনীতি গ্রহণ করেছেন জৈনমতবাদ থেকে, বুদ্ধের কাছ থেকে নয়। বুদ্ধ কখনও তাঁর অহিংসনীতিকে জৈনধর্মের চরম অহিংসা নীতির সাথে মেলাননি।**

দুর্বল প্রস্তুতি ও বিশৃঙ্খলার জন্য জনগণের মধ্যে চরম অনিয়ম, অরাজকতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলার মধ্য দিয়ে কয়েক সপ্তাহ পরে আগস্ট বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে।

চরম ব্যর্থতা বুঝতে পেরে গান্ধি ১৯৪৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ২১ দিনের এক অনশন করেন। সেটা ছিল তাঁর আগাখান প্যালেস থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি কৌশল। এই অনশন সারাদেশে আলোড়ন তোলে এবং "গান্ধিকে মুক্তি দাও" চিৎকারে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এর (Executive Council) সদস্যদের উপর পদত্যাগ করার চাপ দেওয়া হয়। আম্বেদকর এবং শ্রীবাস্তব অবিচল থাকেন। অ্যানি, মোদি ও মিঃ সরকার স্নায়ুচাপে পদত্যাগ করেন। তাঁদের পদত্যাগে অনশনরত মহাত্মার মুখে অস্পষ্ট হাসি ফোটে। কিন্তু তাতে আম্বেদকরের জনপ্রিয়তা বা সম্মানের কোনো হেরফের হয়নি। অনশন শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরেই আম্বেদকরের ৫১ তম জন্মদিনে স্যার চিমনলাল শেতলবাদ তাঁর আবেগোচ্ছল শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আম্বেদকর স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও সাহসিকতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

আম্বেদকর এরপর শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণমূলক কাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের অভাব-অভিযোগ, রোগব্যাধি, গুণাগুণ ও দুঃখকষ্টের কথা সবই তিনি জানতেন। বম্বে সেক্রেটারিয়েটে আম্বেদকরের সভাপতিত্বে 'স্ট্যাণ্ডিং লেবার কমিটি'-র (Standing Labour Committee) তৃতীয় বৈঠক হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে। তাঁর পূর্বসূরি স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের আমলে 'ত্রিদলীয় শ্রমিক সম্মেলন' (Tripartite Labour Conference) ওই কমিটি গঠন করে। এই বৈঠকে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি ছিল, অন্তত যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে Joint Labour Management Committee গঠন করার প্রস্তাব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে এরকম কমিটি গঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি ছিল Employment Exchange গঠন করার প্রস্তাব। শ্রমিকদের স্বার্থে এগুলি করতে হবে, যাতে দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক-কারিগর, যাঁরা নানা পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের যেন পথে বসিয়ে দেওয়া না হয়; তাঁরা যেন চাকরির পথ খুঁজে পান।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের বম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটি শ্রমমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকরের সম্মানে বম্বেতে এক চা-চক্রের আয়োজন করে। শ্রমিক সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য ও তাদের বিক্ষিপ্ত শক্তির এক সমালোচনামূলক সমীক্ষায় শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে যে দুর্ভাগ্যজনক ফাটল ধরেছে তার নিন্দা করে তিনি

বলেন, তাঁর মতে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এখন অন্তঃসারশূন্য ও নিতান্তই অর্থহীন। তিনি তাঁদের কাছে আবেদন করে বলেন যে, তাঁদেরই এর দোষত্রুটি খুঁজে বের করে তার প্রতিকার করতে হবে। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন যে, তাঁর স্পষ্ট অভিমত, ভারতে শ্রমিক-সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রমিকদের কাজ করতে হবে। ভারত স্বরাজ লাভ করবে, এটাই যথেষ্ট নয়Ñ স্বরাজ কাদের হাতে থাকবে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ওই একই দিনে আম্বেদকর বম্বের চেম্বার অব কমার্সের একটি সভায় বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, পৃথিবী এখন যুদ্ধ-পীড়ায় পীড়িত ও তিনটি রোগে আক্রান্ত। প্রথমটি হচ্ছে এক জাতির উপর অন্য জাতির সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে বর্ণবাদের বাধা, যার মোকাবিলা করতে হবে এবং এমনভাবে তার সমাধান করতে হবে যাতে আর কোনোদিন শান্তি বিঘ্নিত না হয়; তৃতীয়টি হচ্ছে দারিদ্র। দেশগুলির মধ্যে সমতা আনার উপায় হচ্ছে দুর্বল দেশগুলিকে শক্তিশালী করা। এরপর তিনি স্মরণ করেন ইংরেজ ও ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রতিনিধিরা পেশোয়াদের সামনে কীভাবে নতজানু হয়। তিনি মন্তব্য করে বলেন, প্রাচ্যদেশীয় জাতিগুলির প্রতি ইউরোপের জাতিগুলি শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব গ্রহণ করার কারণ তাদের উন্নত শিল্প ও অর্থনৈতিক শক্তি। তাঁর মতে ভারতে শিল্পের প্রসার ও অর্থনৈতিক শক্তিই সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ সমস্যার সমাধান করবে।

দারিদ্র সম্পর্কে তিনি আতঙ্ক প্রকাশ করে বলেন যে, মানবসভ্যতা ধ্বংস করার জন্য দেশগুলি প্রতিদিন বিশাল পরিমাণ অর্থব্যয় করে যাচ্ছে। ব্রিটেন প্রতিদিন চৌদ্দকোটি টাকা খরচ করছে, আমেরিকা প্রায় সমপরিমাণ টাকা খরচ করছে এবং ভারতেরও প্রতিদিন প্রচুর টাকা ব্যয় হচ্ছে; তবে তিনি বুঝতে পারছেন না যে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের উন্নতির জন্য শান্তির সময়েও তারা কেন দারিদ্র দূর করতে এর অর্ধেক টাকাও খরচ করে না। তিনি শেষে বলেন, "দারিদ্র যাতে দূর হয়, সেজন্য বিশ্বকে সংশোধিত হতে হবে, নতি স্বীকার করতে হবে ও বিশেষ অধিকারের কিছু কিছু ত্যাগ করতে হবে।"

রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য আম্বেদকরের প্রস্তাবিত একটি পরিকল্পনা নিয়ে সংবাদপত্রে সে সময় আলোচনা চলছিল। পরিকল্পনাটি ছিল এই রকমÑ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি সীমা নির্ধারণ কমিটি গঠন করতে ও দু'টো গণভোটের ব্যবস্থা করতে আইন পাশ করবে। প্রথম গণভোটে মুসলিমরা ঠিক করবেন তাঁরা পাকিস্তান চান কি চান না। আর দ্বিতীয় গণভোটে ঠিক হবে অ-মুসলিমরা প্রস্তাবিত পাকিস্তানে থাকবেন কি থাকবেন না। অ-মুসলিমরা যদি পাকিস্তানে থাকতে চান, তাহলে বর্তমান সীমারেখার কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব এই পরিকল্পনা দেবে না।

যদি তাঁরা পাকিস্তানে থাকতে রাজি না হন, তাহলে যেসব জেলায় মুসলিমদের বাস বেশি, সেগুলির সীমারেখা নির্ধারণ করতে একটি 'বাউণ্ডারি কমিশন' গঠন করতে হবে, তার দু'বছর পরে ঠিক হবে মুসলিমরা পৃথকীকরণ চান কি চান না।

শ্রমমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে নতুন দিল্লিতে 'ত্রিদলীয় শ্রমিক সম্মেলন'-এর (Tripartite Labour Conference) দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর। এই অধিবেশনে আম্বেদকর এক হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থানের জন্য শ্রমিকদের দাবি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ওই অধিবেশনেই শ্রমিকদের মজুরি ও বেতনের বিষয় বিবেচনা করার জন্য এবং যেসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার নীতি তৈরি হবে তা সংগ্রহ করার জন্য একটি মেশিনারি গড়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

ওই মাসেই আম্বেদকর মিস্টার কার্টিনের প্রস্তাবিত Imperial Consultative Council গঠন সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি বলেন যে, ভারতকে স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার করার জন্যই ডোমিনিয়নগুলির স্বার্থ রক্ষা করতে এটা করা হচ্ছে। কিন্তু একই সময়ে তিনি এ কথাও বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি ভারতীয়দের কোনো দরদ নেই; কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতীয়দের প্রজা বলেই মনে করে, তাঁদের সমান মর্যাদার নাগরিক মনে করে না।

পরের মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচিত দলিত শ্রেণির সদস্য প্যারেলাল কুরিল তালিবের আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করানো হয়। প্রস্তাবটি ছিল সামরিক বাহিনীতে অফিসারের পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে দলিত শ্রেণির উপর যেসব বাধানিষেধ ছিল, সেগুলি দূর করা।

কেন্দ্রীয় আইসভা ও কাউন্সিল অব স্টেট্‌স-এ দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে পেরে আম্বেদকর কিছুটা পরিতৃপ্ত। অফিসে বসার পর থেকে তিনি যেসব সুবিধা আদায় করেছেন, তা হিসাব করে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে নতুন দিল্লিতে দলিত শ্রেণির নেতা ও কর্মীদের তিনি বলেন যে, সরকারি পদে এবং লণ্ডনে প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে দলিত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের শতকরা সোয়া আট ভাগ নিয়োগ ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় আরও একটি বেশি আসন তিনি লাভ করেছেন এবং কাউন্সিল অব্ স্টেটসেও একটি আসন সৃষ্টি করেছেন।

দু'টি কারণে দলিত শ্রেণির জন্য সরকারি পদের একটা নির্দিষ্ট শতকরা হার লাভ করার উপর আম্বেদকর জিদ ধরেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল সরকারি চাকরিতে বর্ণহিন্দুদের আধিক্য না থাকলে দলিত শ্রেণির উপর পীড়নমূলক আচরণ চিরস্থায়ী করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত সরকারি চাকরি তাঁদের ন্যায়বিচার লাভের

সম্ভাবনাকেও বৃদ্ধি করবে ও দলিত শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটবে।

একবার দক্ষিণ ভারতের এক অফিসার দিল্লিতে আম্বেদকরকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, তাঁর রাজনীতি শুধু চাকরি হাতিয়ে নেবার জন্য। উত্তরে আম্বেদকর বলেছিলেন, "যদি তাই হয়, আপনারা কেন চাকরির শতকরা ৯০ ভাগ দখল করে আছেন? যেসব চাকরিকে আপনারা অবজ্ঞা করেন, সেগুলি থেকে বেরিয়ে এসে আপনারা কেন আমাদের জন্য জায়গা দিচ্ছেন না?"

১৯৪৪ সালের ২৬ জানুয়ারি আম্বেদকরের সভাপতিত্বে Standing Labour Committee-র লখনউতে আবার একটি সভা হয়। ২৯ জানুয়ারির তপশিলি জাতি ফেডারেশনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে সেখান থেকে তিনি কানপুরে যান।

সভাপতি এন. শিবরাজ বলেন যে, দলিত শ্রেণির লোকেরা ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী নয়, যদি ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নাগপুর অধিবেশনে দলিত শ্রেণির লোকেরা যে দাবিগুলি উত্থাপন করেছিলেন সেগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

বিশাল জনতার সামনে আম্বেদকর তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেন যে, ভারতের জাতীয় সরকার গঠনে হিন্দু, মুসলিম ও অস্পৃশ্যদের অবশ্যই অংশ থাকবে। সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে যদি দলিত শ্রেণির লোকেরা যথাযোগ্য অংশীদার না হতে পারেন, তাহলে ওই লক্ষ্য পূরণে তাঁরা সংগ্রাম করবেন। প্রযুক্তিগত ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়াশোনা করার জন্য সরকার যেসব সুবিধা দিচ্ছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে আম্বেদকর ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দেন এবং যুব-নেতাদের কাছে আবেদন রেখে বলেন, তাঁরা যেন বর্ষীয়ান নেতাদের ভুল না বোঝেন, যাঁরা অপরাজেয় সাহস, অদম্য শক্তি ও অবিচল আস্থা নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন।

১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রমিকদের উন্নতির জন্য আম্বেদকর আর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্থায়ী কারখানাগুলিতে যেসব শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের জন্য তিনি সবেতন ছুটির প্রস্তাব দিয়ে একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন।

এর কয়েকদিন পর পুনার আগাখান প্যালেসে অন্তরীণ অবস্থা থেকে স্বাস্থ্যের কারণে গান্ধি মুক্তি পান। তিনি পাঁচগানি চলে যান, যেখান থেকে রাজাগোপালাচারী এক ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, জিন্নাহ্‌র কাছে তিনি একটি নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন যা গান্ধি তাঁর অন্তরীণকালে অনশনরত অবস্থায় অনুমোদন করেছেন। এই বিশ্বাসঘাতক প্রস্তাবটি সম্পর্কে জাতীয় সংবাদসংস্থা অদ্ভুতভাবে নীরবতা পালন করে। উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটিকে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বিপদ বলে বর্ণনা করেন। সাভারকর বলেন, গোপালাচারী একাই ওই দুঃখজনক ঘটনার খলনায়ক নন।

আম্বেদকর এই ভয়ানক দুঃখজনক ঘটনাকে সংবিধান বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাই রাজাগোপালাচারীর কাজকে তিনি মানসিক সুস্থতায় ফিরে আসা বলে বিবেচনা করলেন, যদিও অল্প ক'দিন আগে Pacific Relations Committee-র কাছে এক চিঠিতে তিনি এই কাজের নিন্দা করেছিলেন। গান্ধির বিভাজন-নীতি গ্রহণ করাকে আম্বেদকর স্বাগত জানান। কিন্তু তিনি বলেন, বেশি ভাল হত যদি গান্ধি নিজে প্রস্তাবটি দিতেন এবং প্রস্তাবটি নিঃশর্ত হত। তিনি আরও বলেন, তিনি বুঝতে পারছেন না জিন্নাহ্ কেন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। গণভোটের ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু যে কোনো মূল্যায়নে চূড়ান্ত বিচারক হবেন জনগণই।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গান্ধি এত দীর্ঘ সময় নিয়েছেন বলে আম্বেদকর দুঃখ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসিদের খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, তিনি দুঃখিত যে, গান্ধি তাঁর বন্ধুদের পরিত্যাগ করেছেন, যাঁদের বিশ্বাস ছিল গান্ধি পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোর বিরোধী এবং সেজন্যই তাঁরা এর বিরোধিতা করে যাচ্ছিলেন এবং তাঁরা এখন হেয় হয়ে গেছেন। আম্বেদকর বলেন, হিন্দু মহাসভার কণ্ঠরোধ করার জন্য হিন্দু-অধিকৃত সংবাদসংস্থার উপর নির্ভর করা যেত না। যথার্থ বলেছিলেন তিনি। ভারতের অখণ্ডতায় যারা বিশ্বাসী, তাদের শেষ আশ্রয় ছিল এই হিন্দুসভা। আম্বেদকর প্রেস সম্বন্ধে যা বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই সত্য হল। সংবাদসংস্থা হিন্দু মহাসভার কণ্ঠ চেপে ধরল। কিন্তু বড়োই অদ্ভুত যে, Thoughts On Pakistan গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে আম্বেদকর এই পরিকল্পনাটিকেই আবার একটি ফাঁদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা কোনো সমাধান দেয়নি।

লিগ-কর্তার প্রতি গান্ধির সদিচ্ছাজ্ঞাপক মানসিকতা লক্ষ করে আম্বেদকরও গান্ধির সামনে বন্ধুসুলভ প্রস্তাব তুলে ধরেন এবং ভাবেন যে মহাত্মা অস্পৃশ্য নেতার সাথেও আপস করার মনোভাব গ্রহণ করবেন। তিনি সে সময় গান্ধির কাছে চিঠিতে লেখেন, যদি ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লাভ করতে হয়, তাহলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে হিন্দু বনাম অস্পৃশ্যদের সমস্যারও সমাধান হওয়া দরকার; তা যদি হয় তাহলে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে মীমাংসা প্রয়োজন সেগুলি তিনি যথাযথভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করতেও রাজি। ১৯৪৪ সালের ৬ আগস্টে লেখা চিঠিতে গান্ধি উত্তর দেনÑ দলিত শ্রেণির এই বিষয়টি তাঁর কাছে ধর্মীয় ও সমাজসংস্কারের বিষয়। যদিও আম্বেদকরের কার্যক্ষমতার কথা তিনি জানেন এবং আম্বেদকরকে তাঁর সহযোগী ও সহকর্মীরূপে পেতে আগ্রহী, তা হলেও গান্ধি জানেন যে আম্বেদকর এবং তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আলাদা আলাদা মত পোষণ করেন। শক্তের ভক্ত, নরমের যম। রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধি এ নীতির ব্যতিক্রম ছিলেন না।

১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের শেষে আম্বেদকর কলকাতায় যান। সেখানে

অনেকগুলি তপশিলি সংগঠন মিলিতভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। এই অভিনন্দনের উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, নতুন সংবিধান ভারতকে একটি স্বায়ত্ব শাসিত রাষ্ট্রে (Dominion) পরিণত করবে। শ্রোতাদের তিনি বলেন, জয় হবেই, শুধু সকলের ঐক্যবদ্ধ থাকা চাই। তিনি ঘোষণা করেন যে, গান্ধিকে ভাইসরয় এ কথা বলে ভাল করেছেন যে, হিন্দু, মুসলমান ও দলিত এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির প্রয়োজন আছে। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, হিন্দু মহাসভা যদি তাঁর দাবি মেনে নেয়, তাহলে তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দেবেন। আর কংগ্রেস যদি মেনে নেয়, তাহলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

কলকাতায় তাঁর এই বক্তৃতার ঠিক পরেই এই প্রসঙ্গে ডঃ মুঞ্জে আম্বেদকরকে একটি চিঠিতে লেখেন, তিনি যেন তাঁর দাবিগুলি তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি তার কোনো জবাব পাননি। মহাসভার অনুগামীরা দলিত শ্রেণির দাবিগুলির কখনও বিরোধিতা করেননি।

এরপর আম্বেদকর দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে যান। সেখানে এক সভায় বলতে গিয়ে জোর দিয়েই তিনি তাঁর নতুন অবস্থান সম্পর্কে পুনরোক্তি করে বলেন, দলিত শ্রেণি একটি আলাদা জনগোষ্ঠী। তিনি ঘোষণা করেন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে দলিত শ্রেণির মানুষেরা পিছিয়ে নেই। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়েরও স্বাধীনতা চান।

এরপর আম্বেদকর মাদ্রাজে যান। মাদ্রাজ পৌঁছে তিনি 'তামিলনাদ ডিপ্রেসড ক্লাস ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফ থেকে একটি স্মারকলিপি পান। এতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু তাঁরা হিন্দু সমাজের দলিত শ্রেণি থেকে এসেছেন, সেহেতু তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তাঁদের হিন্দুসমাজের ভাইদের মতোই। স্মরকলিপিতে এও বলা হয়েছে যে, খ্রিস্টান হওয়ার পরেও বর্ণ-খ্রিস্টানরা তাঁদের জাত বজায় রেখে চলেছেন এবং দলিত শ্রেণির খ্রিস্টানদের প্রতি তাঁরা খারাপ আচরণ করেন। ধর্ম প্রচারকরা বর্ণবাদী খ্রিস্টানদের মানসিকতা পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা করেননি। তাই তাঁরা স্মারকলিপিতে আম্বেদকরের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, বর্ণবাদী খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের দাসত্ব থেকে তিনি যেন তাঁদের উদ্ধার করেন।

১৯৪৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর আম্বেদকরকে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রিপন বিল্ডিং-এ অভিনন্দন জানায়। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল দলের সদস্যরা সেখানে অনুপস্থিত থেকে তাঁদের মনোভাব বুঝিয়ে দেন। অভিনন্দনের উত্তরে আম্বেদকর বলেন, তিনি জাতীয় সরকার বা স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা কোনোটিরই বিরোধী নন। তবে তিনি বলেন, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নেই যে, একবার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের

ভোটে সংসদীয় সরকার গঠিত হলেই মানুষের সব ভোগান্তি দূর হয়ে যাবে। যদি জাতীয় সরকার এমন শাসকশ্রেণির হাতে পড়ে, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, একটি সম্প্রদায় ও একটি শ্রেণিরই কেবল শিক্ষা লাভ ও উন্নতি লাভের অধিকার আছে এবং অন্য সব মানুষদের জন্ম হয়েছে দাসত্ব করার জন্য, তাহলে সেই জাতীয় সরকার বর্তমান শাসকদের চেয়ে ভালো হবে না।

ওইদিন সন্ধ্যায় 'অন্ধ্র চেম্বার্স অব কমার্স' আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানায়। অভিনন্দনপত্রে আনন্দ প্রকাশ করে বলা হয় যে, শ্রমিকদের প্রতি সরকারি মনোভাবে আম্বেদকর একটি নতুন ভাবধারা যোগ করেছেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কর্মচারী, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নতি। এই অনুষ্ঠানের পরে পরেই "চেত্তিনাদ হাউস"-এর লনে কুমাররাজা স্যার মুথিয়া চেত্তিয়ার শ্রমমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকরকে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করেন।

পরদিন সন্ধ্যায় S.& S.M.Railway-এর তপশিলি সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের কর্মচারীরা একত্রে শ্রমমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। এই অভিনন্দনের উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, মাদ্রাজে এই প্রথম একটি সভায় সকল শ্রেণির কর্মীরা একত্রে মিলিত হয়েছেন দেখে তিনি আনন্দিত। তিনি তাঁদের বলেন যে, দারিদ্র দূর করার জন্য তাঁদের সকলকে একত্রে দাঁড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার চেয়েও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২৪ সেপ্টেম্বর সকালে Madras Rational Society-র পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত 'প্রভাত টকিজ' হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতের মতো এমন ভয়াবহ গতিশীল রাজনৈতিক জীবন সুদূর অতীতে কোনো দেশেই ছিল না। ভারত একটি বিপ্লবের দেশ, সেই তুলনায় ফরাসি বিপ্লব নিতান্তই তুচ্ছ। মূল ব্যাপারটা হচ্ছেÑ **প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে চলেছিল এক মহাসংগ্রাম। বৌদ্ধধর্ম শুরু করেছিল এক বিপ্লব, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম শুরু করেছিল এক প্রতিবিপ্লব। বিবাদ ছিল একটি মাত্র বিষয় নিয়ে এবং তা ছিল "কোনটি সত্য?" বুদ্ধ বলেছেনÑ সত্য হচ্ছে এমন কিছু, যা 'দশ ইন্দ্রিয়ের' অন্তত কোনো একটি ইন্দ্রিয় বুঝতে পারে। ব্রাহ্মণরা বলেছেন, বেদ যা ঘোষণা করেছে, তাই সত্য।** বেদের কোনো কোনো দিক বিশ্লেষণ করে আম্বেদকর আরও বলেন, বেদের কতকগুলি অংশ নিশ্চিতভাবে জালিয়াতি, যেগুলিকে পরবর্তী সময়ে বেদের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি বিস্মিত যে, প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণরা এত চতুর ছিলেন যে, তাঁরা সেইসব গ্রন্থের উপরেই পবিত্রতা ও কর্তৃত্ব বেঁধে দিয়েছেন, যেসব গ্রন্থ চরম নোংরা তামাসা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেন, "আজ আমরা প্রতিবিপ্লবীদের হাতে বন্দি, যদি অতি সত্বর আমরা কিছু একটা না করতে পারি,

তাহলে হয়তো আমরা দেশের জন্য আরও বড়ো দুর্বিপাক নিয়ে আসব।”

বিকেলে কনেমারা হোটেলে পি. বালসুব্রাহ্মণ্য মুদালিয়ারের দেওয়া আম্বেদকরের সম্মানার্থে এক বৈকালিক জলযোগের আসরে আম্বেদকর বক্তৃতা করেন। অ-ব্রাহ্মণ দলের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, তাঁদের অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করেছিলেন। এতকাল ক্রীতদাসের মতো তাঁরা যে ব্রাহ্মণ্যবাদকে মেনে আসছিলেন, সেগুলো তাঁরা ছাড়তে পারেননি। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তিনি বলেন, অ-ব্রাহ্মণ দলের জন্য দরকার একজন ভাল নেতা, একটি ভাল সংগঠন এবং স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন একটি আদর্শ।

সন্ধ্যায় পার্কটাউনের মেমোরিয়াল হলে বিভিন্ন ‘তপশিলি জাতি ফেডারেশনস’ ও ‘সাউথ ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’ আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানায়। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি ভারতের জাতীয় জীবনে সম্প্রদায়গুলির অবস্থান সম্পর্কে ভাইসরয়ের ঘোষণাকে জোরের সঙ্গে সমর্থন করেন। আন্তর্জাতিক শান্তিসম্মেলনে আম্বেদকরের উপস্থিতি দেশের সাধারণ স্বার্থবিরোধী হবে বলে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন। সে সম্পর্কে আম্বেদকর খোলাখুলিভাবে বলেন, সমাজজীবনে তাঁর এমন কোনো অসম্মানের ঘটনা নেই যার জন্য তিনি ভারতের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে লজ্জা পাবেন। তিনি বলেন, শাস্ত্রী হচ্ছেন ব্রিটিশ সরকারের পোষা কুকুর। তিনি যদি বিশেষ কোনো খ্যাতি বা আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা পেয়েই থাকেন, তা পেয়েছেন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘শো-বয়’ বানিয়ে রেখেছেন বলেই। গোলটেবিল বৈঠকের কার্যবিবরণী থেকে কিছু ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে যদি ভারতকে ছোটো করা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তিনি বা তপশিলি জাতিগুলি করেনি, করেছেন গান্ধি, শাস্ত্রী ও অন্যান্যরা। স্যার এডওয়ার্ড কারসন “চুলোয় যাক তোমাদের রক্ষাকবচ”Ñ বলে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, দলিত শ্রেণির পক্ষে সেই মানসিকতা গ্রহণ করার যদিও হাজার কারণ আছে, তাহলেও স্বায়ত্বশাসনের দাবি সমর্থন করার মতো যথেষ্ট উদারতাও তাঁদের আছে, শুধু তাঁর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে একটি ছোট্ট শর্তÑ ন্যায়সঙ্গত রক্ষাকবচের দাবি। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অধীনে দু’হাজার বছর ধরে যন্ত্রণা ভোগ করলেও ন্যায়সঙ্গত দাবি জানাবার পক্ষে তাঁরা যথেষ্ট দেশপ্রেমিক। তাই তিনি হিন্দু ভাইদের কাছে তাঁদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর আবেদন জানিয়ে বলেন, “আসুন, আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করি।”

মাদ্রাজে অবস্থান কালে জাস্টিস পার্টির নেতা ই.ভি.রামস্বামীর সাথে মাদ্রাজের রাজনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। আম্বেদকর তারপর ইলোর যান। সেখানে জেলা তপশিলি জাতি ফেডারেশন, খ্রিস্টান ফেডারেশন, পশ্চিম গোদাবরী

জেলাবোর্ড এবং ইলোর মিউলিনিসিপ্যাল কাউন্সিল তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

নাগরিক সম্ভাষণের উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে, গান্ধির মধ্যে তিনি যেসব দোষত্রুটি লক্ষ্য করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে তাঁর পুরোপুরি দূরদৃষ্টির অভাব। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা স্বপ্নেও ভাবেননি যে, ভারত যখন তার উদ্দেশ্য লাভের জায়গায় প্রায় পৌঁছে যাবে, তখনই সে ভেঙে যাবে। সংখ্যালঘু সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে গান্ধির মনোভাব নিগ্রোদের সমস্যার প্রতি লিঙ্কনের মনোভাবের মতোই। উত্তরের রাজ্যগুলির জন্য নিগ্রোদের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভের আশায় মিলনে উৎসর্গীকৃত লিঙ্কন ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ক্রীতদাসদের জন্য স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। একই ভাবে গান্ধি স্বাধীনতা চাইছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে চতুবর্ণ ধর্মও চাইছেন। আম্বেদকর বলেন, সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধান যদি রচনা করা সম্ভব হয়, তাহলে গান্ধি দেখতে পাবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীই ভারতের এক অদ্বিতীয় প্রতিনিধি।

মিঃ ক্রিপস চলে যাওয়ার পর থেকে আম্বেদকর দেশ ও ব্রিটিশ সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করার জন্য পাগলের মতো কাজ করা শুরু করেন, যাতে তাঁরা বোঝেন যে, দলিত শ্রেণি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও তাঁদের দাবি ভারতীয় সমাজে তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি স্বীকৃত স্থান। এগুলি ছিল তাঁর ছোটোবড়ো দ্রুত প্রচারের নানা অনুষ্ঠান এবং তাঁর যুক্তি শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ও মেনে নেন।

দলিত শ্রেণির মানুষের এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের কথা বর্ণনা করে 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "দলিত শ্রেণির সাথে গান্ধির দেশজোড়া বন্ধুভাব বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি দেখানোর ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশত বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, শুভ ইচ্ছার এই ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ছিল আসল কাজের চেয়ে কংগ্রেসি নেতার প্রতি বেশি শ্রদ্ধা দেখানো।" সম্পাদকীয়টিতে আরও বলা হয়, মন্দির-প্রবেশ, পাতকুয়া খুলে দেওয়া, সাধারণ শ্মশানঘাট ব্যবহার ইত্যাদি সংস্কারকর্ম সমস্যার মাথা ছুঁয়েছে মাত্র। সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার যে কোনো চেষ্টা শেষপর্যন্ত দেশের স্বার্থের পক্ষে সর্বনাশা হয়ে দাঁড়াবে।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তাঁর সম্মানার্থে পুনা শহরে রাজভোজের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আম্বেদকর যোগ দেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রাচীন কালে লেখা প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থই রাজনৈতিক গ্রন্থ। গীতাও অবশ্যই একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থ যার লক্ষ্য বেদভিত্তিক শিক্ষাকে ধরে রাখা ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে মহত্তম অবস্থানে তুলে ধরা।

এই সময়ে সপ্রু-কমিটি ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। আম্বেদকর এই কমিটির সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন, কারণ কমিটির কয়েকজন সদস্যের উপর তাঁর আস্থা ছিল না।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আম্বেদকর কলকাতা যান। সেখানে

তপশিলি জাতির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পিওপ্‌ল্‌স হেরাল্ড'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, গান্ধির মৃত্যুর পর কংগ্রেস আঘাতে আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তিনি তপশিলি জাতি ফেডারেশনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক ও নীতিগত দিক থেকে এ দল দেশে একটি স্থায়ী দল হবে এবং যেহেতু তপশিলি জাতির উন্নতি সাধন করা এক মহৎ কাজ, সেহেতু তিনি নিজেকে সেই কাজে উৎসর্গ করেছেন।

কলকাতায় থাকা কালে আম্বেদকর ডি.জি.যাদবের ঘরে খাওয়াদাওয়া করেন। পরদিন সকালে রেলের এই 'কনসিলিয়েশন অফিসার'-এর পাচক এবং অন্যান্য চাকরেরা তাঁর বাড়িতে কাজ করতে অস্বীকার করে; কারণ, আম্বেদকর একজন অস্পৃশ্য! অথচ এই অফিসারও এসেছেন এক অস্পৃশ্য সমাজ থেকে। আম্বেদকর তখন ভারতের 'প্রধান নির্বাহী পরিষদ'-এর (Chief Executive Council) একজন সম্মাননীয় শ্রমদপ্তরের সদস্য (এক কথায় ব্রিটিশ ভারতের শ্রমমন্ত্রী)।

আম্বেদকর এর মধ্যে তাঁর 'থট্‌স অন্ পাকিস্তান' গ্রন্থে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করে 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব্ ইণ্ডিয়া' নাম দিয়ে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন। যদিও তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐক্যের কথা স্বীকার করেছেন এবং ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই বা তার বেশি জাতি একই সংবিধানের অধীনে বসবাস করে সে কথা বর্ণনা করেছেন, তবুও তিনি বলেছেন স্বাধীন ভারতের নিশ্চিত নিরাপত্তার জন্য এবং যে মুসলিমরা একটি আলাদা জাতি হতে চান, তাঁদের আবেগকে স্বীকৃতি দিতে পাকিস্তানকে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত।

রাজনৈতিক অচল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবার জোরদার চেষ্টা চালানো হয়। বিভিন্ন খ্যাতনামা নেতা পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে প্রায় ন'টি পরিকল্পনা তৈরি করেন। এগুলো হচ্ছে– Cripps Proposals, Prof. Reginald Coupland's Regional Scheme, Sir Ardeshir Dalal's Plan, M.N.Roy's Scheme, Dr. Radha Kumud Mukherjee's Plan ও Sir Sultan Ahmed's Scheme এবং আরও কয়েকটি।

১৯৪৫ সালের ৬ মে রবিবার প্যারেলে তপশিলি ফেডারেশনের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে আম্বেদকর তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শাসন তত্ত্বগতভাবে অযৌক্তিক এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা অসমর্থনীয়। তিনি আইনসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং হিন্দুদের আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেন। যদিও তাঁর এই পরিকল্পনা ঐক্যবদ্ধ ভারত সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়, তথাপি তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ

করার জন্য তিনি মুসলিমদের কাছে আবেদন জানান। কারণ এটা তাঁদেরকে অধিকতর নিরাপত্তা ও এক স্থায়ী গুরুত্বের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং এমনকি তাঁদের উপরে হিন্দুশাসন কর্তৃত্বেরও ভয় থেকে মুক্তি দিচ্ছে। এই পরিকল্পনার সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলিত শ্রেণিরা একটি ক্ষমতার ভারকেন্দ্র হতে পারছে।

পরিকল্পনাটি সংবাদ মাধ্যমে তীব্র সমালোচিত হয়। অ-হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য কুখ্যাত 'দি টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া' লেখে যে, যদিও পরিকল্পনাটি একজন বহিরাগতের কাছে কাব্যিক বিচার বলে মনে হতে পারে, তবুও এটা চরম ভাবাপন্ন দোষে দুষ্ট এবং তা দলিত শ্রেণিকে এক নতুন শাসক জনগোষ্ঠীতে উন্নীত করবে বলে বর্ণনা করে। হিন্দুদের উপর নাড়া দেওয়ার প্রশ্নে আম্বেদকরের এই পরিকল্পনা আরও একটা ব্যাপারে সপ্রু-প্রস্তাবকে ছাড়িয়ে যায়। এতে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বর্ণহিন্দু মন্ত্রীদের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। কিন্তু মন্ত্রীসভার সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের সংখ্যালঘুরা (সব ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও তপশিলি জাতি) নিজেরাই নির্বাচিত করবেন। হিন্দু পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে একমত হয় যে, আম্বেদকরের লক্ষ্য ভারতে সংখ্যালঘুদের শাসন! পত্রিকাগুলির মন্তব্য, আম্বেদকর বর্ণহিন্দু নেতা হলে এই প্ল্যান উড়িয়ে দিতেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি অন্য পক্ষে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কখনও এমন অপমানের বিষয় হননি।

২০ মে বম্বের 'কাফে মডেল'-এ মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে একদল বন্ধু আপ্যায়ন করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে, তাঁরা যদি স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে ভারতের পক্ষে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' চাওয়াটাই বেশি কাম্য। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইনানুসারে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর অর্থ পরিপূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আম্বেদকরের "গান্ধি এবং কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছেন" (What Congress And Gandhi Have Done To The Untouchables) নামে একখানি বড়ো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বলিষ্ঠ আবেদন, বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান ও শক্তিশালী যুক্তি সম্পদে পরিপূর্ণ বিতর্কমূলক এই গ্রন্থ কংগ্রেস দলের উপর যেন এক বোমা বিস্ফোরণ। এ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কংগ্রেস দলের ঘোষিত হরিজন উন্নয়ন প্রকল্পটিকে কংগ্রেস ১৯১৭ সালে তার কর্মসূচির মধ্যে একটি দফা হিসাবে গ্রহণ করার পর থেকেই অস্পৃশ্যদের অক্ষমতা দূর করা নয়, যাতে তাঁরা জাতীয় জীবনে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ না করতে পারেন, সেই কাজই বেশি করে করা হয়। আম্বেদকর এই গ্রন্থে গান্ধির কাজের সমালোচনা করেন ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অস্পৃশ্যদের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক বলে প্রশংসা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

গ্রন্থখানির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটিতে আম্বেদকর গান্ধি এবং গান্ধিবাদ সম্পর্কে অস্পৃশ্যদের সাবধান করে দেন। তাঁর মতে গান্ধিবাদ হচ্ছে গ্রামীণ জীবনে ফিরে যাওয়া, প্রকৃতির জগতে ফিরে যাওয়া, পশুর জীবনে ফিরে যাওয়া এবং আধুনিক যন্ত্রযুগের এটা একটা অভিশাপ। অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি নিস্পৃহ এই গান্ধিবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এক প্রগতি বিরোধী দর্শন, যার পতাকায় জ্বলজ্বল করছে প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়ার ডাক (চরকা)। তিনি মন্তব্য করেন, যদি এমন কোনো মতবাদ থাকে, যা মিথ্যা বিশ্বাস ও মিথ্যা নিরাপত্তার মধ্যে মানুষকে শান্ত করে রাখার জন্য আফিম হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে ধর্মকে পূর্ণ ব্যবহার করছে, তাহলে সে হচ্ছে এই গান্ধিবাদ। সুতরাং গান্ধিবাদ যাতে ভিতরে না ঢুকে পড়ে সেজন্য তিনি অস্পৃশ্যদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

গ্রন্থের শেষে ভারতীয় রক্ষণশীলদের সম্পর্কে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সংস্কারতন্ত্রীদের চরম সাবধান করা হয়েছে, কারণ পৃথিবীর মানুষকে বোকা বানাতে এবং ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে স্বাধীনতার স্লোগানের তাঁরা অপব্যবহার করছেন। এতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ গান্ধির কাছে একটি মঞ্চ মাত্র, কোনো কর্মসূচি নয়। সুতরাং গান্ধি অস্পৃশ্যদের মুক্তিদাতা বা উদ্ধারকর্তা নন। গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়েছে একজন ইংরেজ মহিলাকে, যাঁর সাহচর্যে থেকে গ্রন্থকার আম্বেদকর লণ্ডনে থাকাকালে বাইবেল অধ্যয়ন করেছিলেন।

গ্রন্থখানি তিক্ত বাদানুবাদ ডেকে আনে। এ গ্রন্থের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন 'ডেপুটি গান্ধি' রাজাগোপালাচারী, কিন্তু গ্রন্থখানির উত্তর তিনি যা দিয়েছিলেন তা হাতুড়ির কাছে পেন্সিল কাটা ছুরির মতন। এর থেকে ভালো উত্তর একটা আসে সান্থনামের কাছ থেকে, কিন্তু তা ছিল পাণ্ডিত্য, মৌলিকত্ব ও পরিসংখ্যানহীন।

গান্ধিবাদের প্রতি আম্বেদকরের এই যুক্তিযুক্ত আক্রমণ নতুন নয়। বছরদশেক আগে গান্ধিবাদ-প্রেমী একজন আমেরিকান কর্মচারীকে তিনি বলেছিলেন যে, হয় তিনি ভণ্ড, নয়তো উন্মাদ। তাঁকে তিনি প্রশ্ন করেনÑ আমেরিকানরা তাহলে কেন তাদের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী ধ্বংস করছে না, কেন তাদের কলকারখানা ও আকাশছোঁয়া বহুতল বাড়িগুলি ভেঙে ফেলছে না আর আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছে না। তিনি ওই আমেরিকান কর্মচারীকে আরও বলেছিলেন, তাঁর মতো লোকেরা গান্ধিবাদে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা কেবল ভারতীয়দের ও আমেরিকানদের বিপথে চালিত করেন।

লণ্ডনে নয় সপ্তাহ কাটাবার পর লর্ড ওয়াভেল জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তথাকথিত ওয়াভেল-পরিকল্পনা নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। তিনি জেল থেকে কংগ্রেসি নেতাদের মুক্তি দেন ও ১৯৪৫ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সিমলায় একটি অধিবেশন ডাকেন।

কংগ্রেস তার মুসলিম প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের মাধ্যমে বর্ণহিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে, মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করেন জিন্নাহ্, তপশিলিদের প্রতিনিধিত্ব করেন এন.শিবরাজ এবং শিখদের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের মনোনীত শিখ প্রতিনিধি। প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা সকলেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অসুবিধাজনক সংগঠন বলে হিন্দু মহাসভাকে বাইরে রাখা হয়। Executive সদস্য হওয়ার জন্য আম্বেদকর এতে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তপশিলিদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর বক্তব্য ছিল মুসলিমরা যদি Central Executive পাঁচটি আসন পায়, তবে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে তপশিলি জাতির আসন পাওয়া উচিত তিনটি। কংগ্রেস তার নিজের পক্ষে মুসলিম সদস্য রাখার জেদ ধরার ফলে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য পদ বণ্টনের প্রশ্নে অধিবেশন ভেস্তে যায়।

ব্রিটেনে জুলাই মাসে নির্বাচন হলে রক্ষণশীল দল পরাজিত হয় ও শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসে। জাপানও আত্মসমর্পণ করেছে। শাসক শ্রেণিকে পরাজিত করতে ব্রিটিশ নির্বাচকমণ্ডলী যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, আম্বেদকর তার প্রশংসা করেন।

কিছুদিনের জন্য শ্রমমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকর বম্বে ফিরে আসেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে 'টাটা ইনস্টিটিউট অব্ সোসাল সাইন্স'-এর 'স্টুডেন্টস ইউনিয়ন'-এ এক বক্তৃতায় আম্বেদকর বলেন যে, বাধ্যতামূলক শান্তি স্থাপন বা সালিশি শ্রমিক দলের পক্ষে একটি বড়ো সুবিধা। তিনি আশা করেন, এই নীতিটিকে তিনি 'শ্রমিক আইন'-এর (Labour Code) এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাঁড় করাবেন। তিনি আরও বলেন, তাঁর আশা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ভারত সরকার যেসব 'কারিগরি প্রশিক্ষণ স্কুল' চালু করেছে তার সব ক'টিকেই তিনি ধরে রাখবেন।

আগস্টের শেষ সপ্তাহে 'স্ট্যাণ্ডিং লেবার কমিটি' নতুন দিল্লিতে সভা করে এবং সেখানে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং', মালিক পক্ষের দায়দায়িত্ব ও সবেতন ছুটির জন্য নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সুচিন্তিত আলোচনা সভায় আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন।

এর মধ্যে লর্ড ওয়াভেল পরামর্শের জন্য ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে আবার লণ্ডন যান। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝির পরে তিনি ভারতে ফিরে আসেন ও সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।

এই নির্বাচনে সব দলই অংশ গ্রহণ করে। বিপুল অর্থ আর বিশাল নির্বাচনী মেশিনারি নিয়ে কংগ্রেস "ভারত ছাড়ো" স্লোগান তুলে নির্বাচনে অংশ নেয়। ইতিমধ্যে

'পাকিস্তান অর্থভাণ্ডার' নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছিল। 'পাকিস্তান অর্থভাণ্ডার' থেকে সাহায্য পেয়ে "হয় পাকিস্তান, নয় ধ্বংস" স্লোগান দিয়ে নির্বাচনে ঝাঁপান জিন্নাহ্। হিন্দু মহাসভার স্লোগান ছিল "স্বাধীনতা ও অখণ্ড ভারত"। আম্বেদকরের 'তপশিলি জাতি্স ফেডারেশন'-এর কোনো নির্বাচনী মেশিনারি বা ধনভাণ্ডার ছিল না। ৪ অক্টোবর পুনাতে একটি সভার মাধ্যমে আম্বেদকর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। সেখানে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি দলিত শ্রেণির বিশ্বাস রাখা উচিত হবে না, কারণ তাঁদের ইতিহাস সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের। যাঁরা ধনী ও সমাজের প্রতি উদাসীন, কংগ্রেস তাঁদের হাতের পুতুল। তাঁরা কখনও দলিত শ্রেণির অসামর্থ্যতা দূর করার প্রয়াস করেনি এবং তাঁদের অভিযোগের প্রতিকারও করেনি। এর প্রতিকার তাঁদের নিজেদেরই হাতে, তাই তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে। এটাই তাঁদের জীবনীশক্তি। তাঁদের শাসক জাতিতে উন্নীত হয়ে তাঁদের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় তাঁদের অধিকার শুধু কাগজেকলমেই থাকবে। শ্রমমন্ত্রী হিসাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত সময়কালের মধ্যে তাঁদের জন্য তিনি যেসব সুবিধা এবং অধিকার অর্জন করেছেন, সেগুলি তিনি বর্ণনা করেন। সবশেষে তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচন তাঁদের পক্ষে এক জীবনমরণ বিষয় বা তার চেয়েও বেশি কিছু। কারণ, সংবিধান রচনা কমিটি সম্ভবত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি দ্বারাই নির্বাচিত হবে।

আম্বেদকর নতুন দিল্লিতে ফিরে আসেন। সেখানে ১৯৪৫ সালের ২৭ নভেম্বর ভারতীয় শ্রমিকদের সপ্তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "বিত্তবান লোকদেরকে শ্রমিকরা একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারেনÑ 'যুদ্ধের খরচ মেটাতে তোমরা যদি ট্যাক্স দিতে কিছু মনে না কর, তাহলে শ্রমিকদের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করাতে তোমরা আপত্তি কর কেন?' যদি যুদ্ধে ব্যয় করা এই অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হত, তাহলে কত শিক্ষাহীন লোককে শিক্ষাদান করা যেত এবং কত রুগ্ন লোককে সুস্থ করা যেত?"

'তপশিলি জাতি ফেডারেশন' এবার বেশ জোরের সাথে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে। নির্বাচনের কাজে গতি বাড়ানোর জন্য তাঁরা ১৯৪৫ সালের ২৯ ও ৩০ নভেম্বর আমেদাবাদে একটি প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকেন। সভাপতিত্ব করেন গোবিন্দ পরমার। আম্বেদকর সেই সম্মেলনে যোগদান করতে যান। এম.এন.রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা, কম্যুনিস্টরা ও হিন্দু মহাসভার নেতারাও স্টেশনে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন। সমস্ত কলকারাখানা বন্ধ থাকে। সবরমতী নদীর তীরে বুদ্ধনগর নামক বিশাল মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে আম্বেদকর বিশাল জনতার সামনে বলেন যে, তাঁরা যে সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন, তা সবই তিনি আদায় করেছেন,

গান্ধি করেননি। তিনি বরং তাঁদের দাবিগুলির বিরোধিতা করার জন্য মুসলিমদের সাহায্য চেয়েছিলেন।

৩০ নভেম্বর আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি আম্বেদকরকে স্বাগত জানায়। স্বাগত ভাষণের উত্তরে তিনি বলেন, সরকার যদি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে কঠোর ব্যবস্থা না নিত, তাহলে জাপান ও জার্মানি ভারতকে ধ্বংস করে দিত। তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ওই মিউনিসিপ্যালিটিকে তিনি ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, এই অনুষ্ঠানে বম্বে মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছে, তার সঙ্গে তাঁর নিজের বম্বে সিটি করপোরেশনের আচরণের তুলনা করলে দেখা যাবে এই দু'য়ের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। না, ঠিক নৃশংস বৈপরীত্য নয়, তবে অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট বিপরীতধর্মী আচরণ। কারণ, ওই করপোরেশন তাদের আলোচ্যসূচিতে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর কোনো কথা রাখতে অস্বীকার করেছিল।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আম্বেদকর বম্বে সেক্রেটারিয়েটে প্রাদেশিক কমিশনারদের সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, শিল্প সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা কমাতে বা বন্ধ করতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। আপস মীমাংসার জন্য একটি মেশিনারি, দ্বিতীয়, Trade Disputes Act.-এর সংশোধন, তৃতীয় ন্যূনতম মজুরির আইন প্রণয়ন। তিনি বলেন, প্রথমটির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং বাকি দু'টোর জন্যও তিনি যথাসত্বর প্রস্তাব পেশ করবেন বলে আশা করেন।

শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন, ক্ষমতার জোরে শিল্পে শান্তি স্থাপন করার সম্ভাবনা আর নেই। আইনের ভিত্তিতে এটা হতে পারে, তবে তারও নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলেন, সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর ভিত্তি করে হলে তা আশাজনক বলে মনে হয়। কারণ এতে তিনভাবেই কাছাকাছি আসার মানসিকতার বিকাশ ঘটবে, যা অবশ্যই প্রথম শুরু হবে শ্রমিকদের মধ্যে, শ্রমিকদেরও স্বীকার করে নিতে হবে কাজ করা তাঁদের কর্তব্য এবং সেটাই হবে কর্মবিমুখতা দূর করার সমান। মালিক পক্ষকেও তাঁদের উপযুক্ত বেতন দিতে হবে, তাহলেই হবে শোষণমুক্তি। এটা হলে তৈরি হবে কাজের স্বস্তিকর পরিবেশ, যার অন্য নাম শ্রম-কল্যাণ। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র এবং সমাজকে অবশ্য ঝুঝতে হবে যে, সাধারণ মানুষের জন্য উপযুক্ত শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখা তাঁদের সামাজিক কর্তব্য, তা কেবল মালিক ও কর্মচারীর ব্যাপার নয়। চিফ লেবার কমিশনার এস.সি. যোশী তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, Industrial relations machinery ইণ্ডাস্ট্রির মালিক ও কর্মচারীÑ এই দু'পক্ষের কারোর শত্রুও নয়, মিত্রও নয়।

'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর (Scheduled Casts Federation) একটি সম্মেলনে ভাষণ দিতে আম্বেদকর মানমাড়ে যান। সেখানকার ভাষণে তিনি বলেন, তাঁর লোকদের অধিকারের ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে একটি চুক্তি করার যে উদ্যোগ তিনি কয়েক বছর ধরে নিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছে। এখন সংরক্ষিত আসনগুলি দখল করা ছাড়া তাঁদের আর কোনো বিকল্প নেই। এরপর তিনি আকোলাতে এক সভায় বক্তৃতা দেন এবং পরে নাগপুর যান। ১৩ ডিসেম্বর সেখানে এক জনসভায় সম্ভাব্য স্বশাসন (Self-Government) সম্পর্কে কংগ্রেসের কাছ থেকে তিনি একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা (blueprint) দাবি করেন। কংগ্রেসের অস্পৃশ্যতা দূর করার অভিযান কীভাবে চরম ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন। সাম্প্রতিক এক ভ্রমণের সময় কীভাবে তিনি পাশের এক বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির কেবল দূর থেকেই দেখতে পেরেছিলেন সে কথাও তিনি বলেন।

এরপর আম্বেদকর পার্টির নির্বাচনী কাজে প্রেরণা দিতে দক্ষিণ ভারতে যান। মাদ্রাজে তিনি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারকে একটি ধোঁকাবাজি বলে বর্ণনা করেন। কারণ এর মধ্যে ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। পরে তিনি মাদুরা গিয়ে একটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দেন। কোয়েম্বাটুরে গিয়ে এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, আসন্ন নির্বাচনই দেশের সংবিধান সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত করে দেবে। আইনসভা ও নির্বাহী কর্মকর্তার চাকরির ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত প্রতিনিধিত্ব, শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও গ্রামে গ্রামে জমি সংস্থানের দাবির কথা তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন। কয়েকটি সংবাদপত্র ও কয়েকজন নেতা 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এর (Executive Council) সদস্য হিসাবে আম্বেদকর তাঁর পদের অমর্যাদা করছেন ও সরকারি টাকা খরচ করে পার্টির স্বার্থ দেখেছেন বলে তাঁর সমালোচনা করেন।

ফিরে আসার পথে মাদ্রাজের পার্ক টাউনের মেমোরিয়াল হলে আম্বেদকর 'সাউথ ইণ্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন'-এর এক জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের বেড়ে ওঠা ও তার শক্তির কথা বর্ণনা করে বলেন যে, গোখেল পরিচালিত 'লিবারেল পার্টি'-কে লোকেরা একটি অযোগ্য সংগঠন মনে করে। 'রিভল্যুশনারি পার্টি' মানুষের কল্পনাকে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু অতি অল্প লোকই তাঁদের মতো ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরি ছিল। কংগ্রেস পার্টির শক্তি, গান্ধি তার নেতা বলেই। তিনি রাজনীতিভাবাপন্ন লোকদের কাছে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি ধর্মভাবাপন্ন লোকদের কাছেও। 'জাস্টিস পার্টি'-কে তিনি এই বলে উপদেশ দেন যে, তাদের দলের সাফল্যের জন্য দরকার একজন নেতা, একটি কর্মসূচি ও শৃঙ্খলা।

এরপর তিনি ওই হলঘরেই 'নন-ব্রাহ্মিন লইয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর দ্বিতীয়

বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মনুস্মৃতি ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এই বক্তৃতা দক্ষিণ ভারতের বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ক্রোধোন্মত্ততার ঝড় তোলে এবং ক্রুদ্ধ হিন্দুরা তাঁকে অসংখ্য চিঠি পাঠায়, যেগুলি ছিল অত্যন্ত অশ্লীল কটুকাটব্যে ভরা, যা বলা যায় না ও ছাপার অযোগ্য এবং তাঁর জীবনের উপর ভয়ঙ্কর হুমকিতে ভর্তি।

তাঁর মাদ্রাজ-বক্তৃতার পর পরই তিনি দিল্লি ফিরে যান। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে দশ সদস্যের একটি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধিদল দিল্লিতে আসে। দিল্লিতে অবস্থানকালে তাঁরা ১০ জানুয়ারি আম্বেদকর, জিন্নাহ্ ও নেহরুর সাক্ষাৎকার নেন। জিন্নাহ্র সাথে তাঁদের কথাবার্তা চলে দু'ঘণ্টা। তাঁর সাথে কথা বলার দু'ঘণ্টা পরে প্রতিনিধিদলের আট সদস্য নব্বই মিনিট আম্বেদকরের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরে আসে জহরলালের পালা। দেশের অন্যান্য অগ্রগণ্য রাজনীতিকদের সাথেও প্রতিনিধিগণ কথা বলেন। কয়েকটি জায়গা তাঁরা পরিদর্শন করেন। চার সপ্তাহ ধরে তাঁরা তাঁদের মতো করে সার্ভে করেন, তারপর ১৯৪৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে যান।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎকারের পরপরই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি আম্বেদকর বম্বে ফিরে আসেন এবং শোলাপুর রওনা হয়ে যান। সেখানে 'ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ড' এবং মিউনিসিপ্যালিটি তাঁকে অভিনন্দন জানায়। তপশিলিদের উন্নতিতে তাদের ভাল কাজের জন্য দু'টো প্রতিষ্ঠানকেই তিনি ধন্যবাদ জানান এবং হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন সভাপতি ডঃ মুলের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেন যাঁর সহযোগিতায় আম্বেদকর কুড়ি বছর আগে তাঁর জনসেবামূলক জীবিকা শুরু করেছিলেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, দলিত শ্রেণির ছাত্রদের জন্য শোলাপুরে একটি ছাত্রাবাস পরিচালনা করতে ডঃ মুলেই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

জানুয়ারি মাসের শেষে আম্বেদকর তাঁর দিল্লির সদর দফতরে ফিরে যান। ৪ ফেব্রুয়ারি 'দিল্লি তপশিলি জাতি প্রাদেশিক ফেডারেশন'-এর এক সভায় তিনি বলেন, যে সংবিধান তাঁদের অনুমোদন পায়নি, তা তাঁদের মেনে চলা বাধ্যতামূলক হতে পারে না। এরপর তিনি দিল্লি ত্যাগ করেন এবং সাঁতারা, বেলগাঁও ও অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন সভায় তপশিলি ফেডারেশনের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। তিনি কংগ্রেসি নেতাদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের সভা করতে না দেন, তাহলে তাঁরাও তাঁদের শান্তিপূর্ণভাবে সভা করতে দেবেন না।

বম্বে ফিরে আসার পর বম্বের তপশিলিরা তাঁকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেন। এই সভায় প্রবেশের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওই সভায় বক্তৃতা

কালে তাঁরাও যে স্বাধীন ভারতের নাগরিক সে কথাটা তাঁর লোকদের বুঝতে বলেন। তিনি বলেন, **তপশিলি জাতিগুলি মুসলিমদের মতো আলাদা কোনো ভূখণ্ড দাবি করেনি। তারা দাবি করছে সমান অধিকারÑ কোনো পোষকতা নয়।** কংগ্রেস যদি মনে করে যে, তাঁদের এ দাবি সংগত নয়, তাহলে বিষয়টিকে কোনো নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে পাঠানো হোক এবং ওই বিচারালয়ের রায়কে মেনে চলতে তিনি প্রস্তুত।

আম্বেদকরের এই বক্তৃতার ঠিক আগে আগেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঘোষণা করেছিলেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভার প্রথম কাজ হবে আইনের দ্বারা জোর করে অস্পৃশ্যতার মূল শিকড়গুলি ধ্বংস করা। আম্বেদকরের দাবিগুলি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত হলেও তাঁর পথগুলি ভ্রান্ত। তিনি আরও বলেছিলেন, যদিও হরিজনরা পুনাপ্যাক্টের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, তবুও আম্বেদকর কংগ্রেস পার্টি ও গান্ধির নিন্দা করে যাচ্ছেন।

প্যাটেলের এই মন্তব্যের প্রতিবাদে তপশিলি শ্রেণির শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে পুনাচুক্তি কীভাবে তাঁদের জীবনে এক অভিশাপ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, সে কথা বর্ণনা করে অসংখ্য চিঠি পর পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে।

দিল্লি অফিসে এক পক্ষকাল কাজ করার পর ১০ মার্চ আম্বেদকর আগ্রায় 'উত্তর প্রদেশ তপশিলি জাতি ফেডারেশন' আয়োজিত ও এন. শিবরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে তিনি বলেন, স্বরাজের মানে যদি সংখ্যালঘুদের সহযোগিতা ও সম্মতি নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সরকার পরিচালনা বুঝায়, তবে তিনি সেই স্বরাজকে অবশ্যই স্বাগত জানাবেন।

প্রাদেশিক নির্বাচনে তপশিলি জাতি তাঁদের বাবাসাহেবের উপদেশে পায়ে হেঁটে নির্বাচন কেন্দ্রে হাজির হন। খুব ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত তাঁরা ভোট দেন। কিন্তু কংগ্রেস বিপুল সংখ্যক বর্ণহিন্দু ভোটে ফেডারেশনের ভোট-সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়। আম্বেদকরের তপশিলি জাতি ফেডারেশনের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। কংগ্রেস আম্বেদকর ও হিন্দু মহাসভাÑ উভয়কেই পরাজিত করে। কিন্তু মুসলিম ভোটাররা কংগ্রেসের মর্যাদা ও জাতীয়তাবাদের বুদবুদকে ফুটো করে দেয়। তারা কংগ্রেসকে চরমভাবে হারিয়ে দেয়।

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আজাদ হিন্দ ফৌজের) বিদ্রোহ ও তাদের বিচারের ফলে সৃষ্ট বয়ে যাওয়া দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস এবং 'রয়াল ইণ্ডিয়ান ন্যাভাল র‍্যাটিংস' ও 'রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'-এর বিদ্রোহে মনে হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোটাকেই বুঝি ভেঙে ফেলবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী যে স্বাধীনতার জন্য বেদনাবোধ করছিল এটা ছিল তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। রাজনীতি ও জাতীয়তাবোধ পদস্থ কর্মচারীদের কাছে

পৌঁছে তাঁদের হৃদয়ও ছুঁয়ে গেছে। ব্রিটিশরাও জানত ভারতীয়দের আর দাসত্ব শৃঙ্খলে আটকে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ১৫ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি স্বীকার করেন যে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে কিংবা তার বাইরে থেকেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার অধিকার আছে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রগতির পথে সংখ্যালঘুদের 'ভেটো' দেবার অনুমতি তাঁরা দেবেন না।

রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য সে সময়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, এ.ভি. আলেকজাণ্ডার এবং তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড পিথিক লরেন্সÑ এই তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধিদলকে ভারতে পাঠান। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্রতিনিধিদলটি ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ নতুন দিল্লি এসে পৌছাঁয়। ভাইসরয়ের বাসভবনে বহু সাক্ষাৎকার, উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবিবেচনা চলে। নেহরু, প্যাটেল, গান্ধি, জিন্নাহ্ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। কিন্তু এই রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সবচেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলÑ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস দলের, মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলিম লিগের এবং ভোপালের নবাব ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্ব করেন। অর্থাৎ তিনজন মুসলিম নেতাই সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ক্যাবিনেট মিশন ৫ এপ্রিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দু'জন প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেয়। তাঁরা হচ্ছেন আম্বেদকর ও মাস্টার তারা সিং। নির্বাচনে দলের পরাজয়ে আম্বেদকরের অবস্থান তখন দুর্বলÑ প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন' কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত তপশিলি জাতির মুখপাত্র আম্বেদকর তাঁর সাক্ষাৎকারে তপশিলি জাতির মতামত ও দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। রিপোর্টে বলা হয় আম্বেদকর তাঁর বিষয়গুলির পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন এবং তপশিলি জাতির লোকেরা ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছেনÑ এই অভিযোগকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। মিশনের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে তিনি সংবিধানে তপশিলিদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি বাড়তি জোর দিয়েছিলেন একটি নতুন বসতি স্থানের উপর; জোর দিয়েছিলেন Settlement Commission গঠন করার প্রয়োজনীয়তার উপরে; জোর দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক Executive Body-তে, সরকারি চাকরিতে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনগুলিতে, তা ফেডারেল হোক, আর প্রাদেশিকই হোক, যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করার উপর। তিনি তাঁদের শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দের উপরও চাপ দিয়েছিলেন। স্মারকলিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই রক্ষাকবচগুলিকে নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি।

১৯৪৬ সালের ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশন একটি ‘স্টেট পেপার’-এর আকারে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সেই অনুযায়ী তাঁরা প্রদেশগুলিতে তিনটি গ্রুপ, একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) ও একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারÑ এই তিনের সমন্বয়ে এক একটি দুর্বল ও আনুষ্ঠানিক ইউনিয়ন গঠনের কথা চিন্তাভাবনা করেন। ওই ‘স্টেট পেপারে’ তপশিলি জাতিগুলির দাবি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ছিল না।

ব্রিটিশ সরকার যখন প্রায় ঠিক করে ফেলেছে নির্বাচনে জয়ী দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নতুন সরকার গঠন করা হবেÑ তখন ভাইসরয় তাঁর ক্যাবিনেট সহকর্মীদের পরিষ্কার বলে দেনÑ এবার তাঁদের চলে যেতে হবে। ১৯৪৬ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে আম্বেদকর দিল্লি ত্যাগ করে বম্বে চলে আসেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গণপরিষদে কার্যক্রম

বম্বে পৌঁছে আম্বেদকর দেখেন সেখানকার পরিবেশ উত্তেজনাপূর্ণ। শহরে তাঁর অনুগামী ও বর্ণহিন্দু কংগ্রেসিদের মধ্যে গোলমাল চলছে। এই গোলমালের জেরে তাঁর ছেলের পরিচালিত 'ভারত ভূষণ প্রিন্টিং প্রেস' পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেডারেশনের সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যরা এসব ঘটনা তাঁকে জানান। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আম্বেদকর বম্বের 'রাজগৃহে' তপশিলি জাতি ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা ডাকেন। সেই সভা একটি সিদ্ধান্তে ১৬ মে তারিখের ব্রিটিশের দেওয়া প্রস্তাবগুলিকে ক্ষতিকর বলে নিন্দা করে ও তপশিলি জাতির প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার প্রতিকার না হলে তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। কংগ্রেসি গুণ্ডাদের প্ররোচনায় তপশিলি জাতির লোকদের উপর যে জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হয়েছে যার ফলে আম্বেদকরের ছাপাখানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সভা তার নিন্দা করে। তিনি তারপর নতুন দিল্লি ফিরে যান। ভাইসরয়কে একটি তদারকি সরকার গঠন করতে হবে। সুতরাং 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এর (Executive Council) সদস্যগণ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভাইসরয়কে বিদায় জানান। এখানে লক্ষ করার বিষয়, শ্রমমন্ত্রী হিসাবে আম্বেদকর যে সুদক্ষ এবং তাঁর যে একটা উদ্দেশ্য আছে, সেটা তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন।

এই অনিশ্চিত পরিবেশের মধ্যেও ১৯৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে সযত্নে লালন করে আসা আম্বেদকরের একটি স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। তাঁর এই স্বপ্নটি হল, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সাজসরঞ্জাম ও মেধাবী কর্মচারীসহ একটি আদর্শ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাÑ যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে নিম্নমধ্যবিত্ত, বিশেষ করে তপশিলিজাতির মধ্যে উচ্চতর শিক্ষাবিস্তার করা। তিনি 'পিপল্‌স এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করেছিলেন যা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুন একটি কলেজ শুরু করে। কলেজটি প্রমাণ করে ভারতে প্রথম সারির কলেজগুলির মধ্যে সে অন্যতম। বন্ধুদের ভয় ও ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এবং কর্মচারীদের মধ্যে একদল দক্ষ ও আগ্রহী কর্মী আকৃষ্ট করার ব্যাপারে তিনি সফল হন। কলেজটি সিদ্ধার্থের নামে, যা ভগবান বুদ্ধের অনেক নামের মধ্যে একটি।

২৫ জুন আম্বেদকর বম্বে ফিরে আসেন। তপশিলি জাতির লোকেরা বম্বের সেণ্ট্রাল স্টেশনে তাঁদের নেতাকে বিপুল সংবর্ধনা জানান। আম্বেদকর এবার ন্যায় বিচার ও মানবতার জন্য এবং ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করা ও তাঁদের অধিকার ধ্বংস করার দুরভিসন্ধির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাঁর লোকদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর লোকদের অধিকার ও ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করার এটাই হচ্ছে শেষ সুযোগ। কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, স্বাধীন ভারত আবার সেই পুরোনো ঐতিহ্যে ফিরে যাবে। এর ফলে তাঁর লোকেরা গরিব হবে, অবহেলিত হবে এবং সমাজ থেকে ও সরকারি চাকরির সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে।

২৯ জুন একটি তদারকি সরকারের ঘোষণা করা হয় এবং ব্রিটিশ মিশন অন্যান্য বিষয়গুলি সমাধান করার দায়িত্ব ভাইসরয়ের উপর ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করে।

বম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভার দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাওয়া দিয়ে শুরু হয় তপশিলি জাতির আন্দোলন। তপশিলি জাতির নেতা ও কর্মীরা কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলের সামনে কালো পতাকা প্রদর্শন করেন এবং কংগ্রেসি নেতাদের কাছে স্বাধীন ভারতে তাঁদের অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাবি করেন। রাজভোজ পুনাতে গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, কংগ্রেসের হরিজন নেতারা তপশিলি জাতির প্রতিনিধি নন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুলাই পুনা শহরে সংগ্রাম শুরু হয় এবং এই সংগ্রাম বম্বে অ্যাসেমব্লিতে পুনা অধিবেশন শুরু হওয়ার সময়কার ঘটনা।

যে কংগ্রেস তাঁদের কথা বলা, প্রতিবাদ করা ও ক্ষোভ প্রকাশ করার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, অস্পৃশ্যদের সংগ্রাম ছিল সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই। পুনা শহরে হঠাৎ স্বেচ্ছাসেবকেরা স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়েন। জেলাশাসক শোভাযাত্রা ও সভাসমাবেশ বন্ধ করে দিলেও তাঁরা তা অমান্য করেন। কাউন্সিল হলের সামনে স্বেচ্ছাসেবকদের দলের পর দল গ্রেপ্তার করা হয়। পুনা শহরে অহিংস-সংগ্রাম শুরু হওয়ার সময় আম্বেদকর বোম্বেতে ছিলেন। পুনা রওনা হওয়ার আগে, ১৭ জুলাই এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, তাঁরা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন এবং ঘোষণা করেন যে, যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষের থাকার দরকার নেই, তবু পরিস্থিতি যদি এই যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ প্রয়োজন মনে করে, তাহলে তিনিও গ্রেপ্তার হবেন। তাঁর অবস্থানকে সমর্থন করে কিছু নেতার কাছ থেকে আম্বেদকর বার্তা পান। কিন্তু গান্ধির 'হরিজন সেবক সংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক তাঁকে হুমকি দিয়ে বলেন, যদি তাঁরা আন্দোলন থেকে সরে না যান, তাহলে তাঁরা পালটা আর একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করবেন। ফেডারেশন একই সঙ্গে কানপুর ও লখনউতেও সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে।

ঠিক সেই সময়ে মিশন-পরিকল্পনা অনুসারে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদের সদস্যদের নতুন দিল্লিতে বৈঠকে বসার কথা ছিল। কংগ্রেস

যাদের সদস্য হিসাবে নির্বাচন করে, তাঁদের বেশিরভাগই নির্বাচিত হন সংবিধান রচনা সম্পর্কে তাঁরা বেশি বোঝেন বলে নয়, দেশপ্রেমমূলক সংগ্রাম করে তাঁরা জেলের কষ্ট ভোগ করেছেন তাই। বম্বে আইনসভায় আম্বেদকরের প্রার্থীপদ সমর্থন করার জন্য তাঁর কেউ ছিলেন না। কিন্তু এই অসাধ্যসাধন করলেন বাংলার আইনসভার একমাত্র তপশিলি প্রতিনিধি মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনিই তাঁর নাম উত্থাপন করেন। সেক্ষেত্রে মুসলিম লিগের সমর্থন নিয়ে তিনি গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন।

"এই গণপরিষদই ভবিষ্যতে ভারতের সংবিধান রচনা করবে। সুতরাং কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের ঘোষণা ছিল যে, গণপরিষদে যেন ডঃ আম্বেদকর কোনোমতেই প্রবেশ করতে না পারেন, যে কোনো মূল্যে তাঁকে রুখতেই হবে। বম্বে বা অন্য কোনো প্রদেশের আইনসভায় তপশিলি ফেডারেশনের এমন সদস্য ছিলেন না যে, সেখান থেকে ডঃ আম্বেদকরকে নির্বাচিত করা যায়। অবশেষে এগিয়ে এলেন তপশিলি ফেডারেশনের বাংলার প্রধান স্তম্ভ মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি ভাবলেন, যদি আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠানো না যায়, তাহলে তপশিলি জাতি-উপজাতির রক্ষাকবচ সংবিধানে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই যোগেন্দ্রনাথ আম্বেদকরকে আহ্বান জানালেন বাংলা থেকে নির্বাচিত হওয়ার জন্য। প্রস্তাবক হিসাবে তিনিই ডঃ আম্বেদকরের 'নমিনেশন পেপার' দাখিল করলেন। ওই নমিনেশন পেপারে সমর্থক হিসাবে স্বাক্ষর করেন রংপুরের নির্দল প্রার্থী নগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

বাংলা থেকে ডঃ আম্বেদকরকে গণপরিষদে নির্বাচন করে পাঠাতে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়, আর এই যুদ্ধে তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে মনোহর ঢালী, রসিকলাল বিশ্বাস, কামিনীপ্রসন্ন মজুমদার, রাজকুমার মণ্ডল (গোপালগঞ্জ), জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার, ডাঃ মনোহর রায়, রামদয়াল দাস, আচার্য মাধব বিশ্বাস, গঙ্গাধর প্রামাণিক, মনীন্দ্রনাথ দাস, মনোরঞ্জন দাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

শোনা যায় বাংলার অন্যতম তপশিলি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিক নিজে গণপরিষদে প্রার্থীহবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কিছু ফেডারেশন কর্মী তাঁর উপর প্রচণ্ড চাপসৃষ্টি করেন। মুকুন্দবিহারী যখন দেখলেন তাঁর নির্বাচিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন তিনি ডঃ আম্বেদকরকে ভোট দিতে সম্মত হলেন। সংরক্ষিত আসনের নির্দল সদস্য প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে (পি.আর.ঠাকুর) কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তবু ডঃ আম্বেদকর প্রয়োজনের চেয়েও বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

তপশিলি সমাজদরদি যেসব সদস্যরা আম্বেদকরকে ভোট দেন, তাঁরা হলেনÑ

বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ফরিদপুরের দ্বারিকানাথ বারুরী, টাঙ্গাইলের গয়ানাথ বিশ্বাস, রংপুরের নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও ক্ষেত্রনাথ সিংহ ও খুলনার মুকুন্দবিহারী মল্লিক। ডঃ আম্বেদকরকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত করার জন্য মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলসহ প্রত্যেকের নাম তপশিলি আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ডঃ আম্বেদকরের নির্বাচনে তপশিলি ফেডারেশনের যেসব যুবক ও মহিলা কর্মী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অপূর্বলাল মজুমদার, সন্তোষকুমার মল্লিক, খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চুনিলাল বিশ্বাস, নীলকমল সরকার, যোগেন্দ্রনাথ হালদার, তুষ্টলাল রায়, বিষ্ণুপদ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শশিভূষণ হালদার, সন্তোষকুমারী তালুকদার, বীণা সমদ্দার, সুষমা মৈত্র (সরকার), ডাঃ স্বর্ণলতা হাজরা (মজুমদার), প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" ('বঞ্চিত জনতার মুক্তিসূর্য ডঃ আম্বেদকর', রণজিতকুমার সিকদার)

সংগ্রামী জীবনে আম্বেদকরের তেজোদ্দীপ্ততা, গুরুত্ব ও শক্তি প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে সঠিক মুহূর্ত বেছে নেওয়ার এক অমোঘ ক্ষমতা ছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল চিরসজীব এবং কোনো সমস্যা বোঝার ব্যাপারে তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ সঠিক।

গান্ধি চরিত্রের খাঁটি অনুসারী প্রধানমন্ত্রী খের (বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী) ১৯ জুলাই ঘোষণা করেন, 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর সত্যাগ্রহের মূল কারণ তিনি জানেন না। শ্লেষাত্মকভাবে তিনি বলেন, "কেউ জানে না কেন তাঁদের এই ক্ষোভ। ক্ষোভের কারণ কি এই যে, তাঁরা যা চান, ক্যাবিনেট মিশন তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা সাম্প্রতিক নির্বাচনে ডঃ আম্বেদকর ও তাঁর দলের পরাজয়ের জন্য অথবা সাধারণভাবে সকলের হতাশার জন্য?"

এ সমস্ত অভিযোগ ও হুমকির উত্তরে আম্বেদকর ২১ জুলাই পুনাতে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ছেড়ে চলে যাবার। ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিমরা। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে ছ'কোটি অস্পৃশ্যের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কংগ্রেসের কাছ থেকে একটি সুস্পষ্ট ব্লুপ্রিন্ট দাবি করার অধিকার তপশিলি জাতিগুলির আছে। তিনি বলেন যে, পুনাতে যে সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে, তা তপশিলিদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করার উদ্দেশ্যে দেশজুড়ে সংগ্রামের এক সূচনা মাত্র। তিনি দাবি করেন, পুনা-সত্যাগ্রহ পরিচালনায় উন্নতমানের আদর্শ মেনে চলা হয়েছে এবং যে গান্ধি নিজেকে একজন সত্যাগ্রহের গ্রাজুয়েট (সবচেয়ে বড়ো সত্যাগ্রহী) বলে মনে করেন, সকল স্বেচ্ছাসেবকদের অহিংস আচরণ তাঁকেও শিক্ষা দিয়েছে। পুনাচুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, পুনাচুক্তি আইনসভায় তপশিলি জাতির প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে

বাধার সৃষ্টি করে, তাই অবশ্যই এ চুক্তি থাকা উচিত নয়। এটা তপশিলি জাতির ভোটাধিকার হরণ করারই নামান্তর। সবশেষে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, নীতিগত উপায় শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে প্রতিবাদ জানানোর অন্য উপায় তাঁদের খুঁজতে হবে।

পুনার এক বিশাল জনসভায় এই আন্দোলনকে কষ্টকর যা কিছু করা সম্ভব, সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর লোকদের উদ্বুদ্ধ করেন। কংগ্রেসের হরিজন নেতারা সব সময় আম্বেদকরের শ্রম ও সংগ্রামের ফলে উপকৃত হয়েছেন, তাঁরাই তাঁর আন্দোলনের বিরোধিতা করে যাঁরা সব সময় হরিজনদের দাবিদাওয়ার বিরোধী তাঁদের পক্ষে কথা বলছেন। এ হচ্ছে উপকারীর প্রতি ঘেউঘেউ করা।

এই সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধি লেখেন, আম্বেদকর সত্যাগ্রহের একটি ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এর লক্ষণ যদি অহিংস হয়ও, এর উদ্দেশ্য অবশ্যই অস্পষ্ট।

একপক্ষকাল ধরে এই সত্যাগ্রহ চলার ফলে আইনসভার পুনা-অধিবেশন বন্ধ করে দিতে সরকার বাধ্য হয়। কংগ্রেস নেতারা আম্বেদকরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এজন্য বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রধান এস.কে. পাতিল সিদ্ধার্থ কলেজে আম্বেদকরের সাথে দেখা করেন এবং তাঁরা উভয়ে এন.এম. যোশীকে নিয়ে ২৭ জুলাই সর্দার প্যাটেলের কাছে যান। গণপরিষদে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব ও পুনা-সত্যাগ্রহ নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রায় একঘণ্টার মতো আলোচনা হয়। সম্ভবত তাঁরা কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেননি; কারণ গাইকোয়াড়, রাজভোজ প্রমুখ প্রখ্যাত তপশিলি নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় তপশিলি জাতির এক শোভাযাত্রা ৮ আগস্ট ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন স্থলের দিকে রওনা হয়।

কিছুদিন পর আম্বেদকর সর্দার প্যাটেলকে লিখে জানান, ব্যক্তি যত বড়োই হোক না কেন, তিনি দেশকে তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো মনে করেন এবং বলেন, যে কোনো ব্যক্তি কংগ্রেসি না হয়েও একজন বড়ো মাপের জাতীয়তাবাদী হতে পারেন এবং তিনি নিজে যে কোনো কংগ্রেসি নেতার চেয়েও একজন বড়ো জাতীয়তাবাদী।

২৪ আগস্ট অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। নেহরু, প্যাটেল, আজাদ, রাজাগোপালাচারী ও শরৎ বসুর নামের সঙ্গে বিহারের তপশিলি নেতা জগজীবন রামের নামও সেখানে ছিল। মুসলিম লিগ এই মন্ত্রীসভা গঠনের কাজে সহযোগিতা করেনি। সুতরাং মুসলিমদের জন্য প্রস্তাবিত পদগুলি অন্য মুসলিমদের দেওয়া হয়। এবং তাঁদের একজনকে কোনো এক গোঁড়া মুসলিম মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করে।

আম্বেদকর সেদিন পুনাতে ছিলেন। তপশিলি জাতি ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা চলছিল সেখানে। ভাইসরয়ের ঘোষণা ছিল আম্বেদকর ও তাঁর দলের পক্ষে ভীষণ নৈরাশ্যজনক। কেন্দ্রে নতুন গঠিত মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের প্রতিনিধিত্ব অপ্রতুল হওয়ায় আম্বেদকর তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তিনি আরও একটি তপশিলি আসনের দাবি জানান। তালিকায় জগজীবনের নাম দেখেও তিনি বিস্মিত হন। কারণ আম্বেদকর যখন অপ্রতুল প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠান, তখন জগজীবন রামও 'নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদ'-এ (Executive Council) তপশিলি জাতির জন্য বর্ধিত প্রতিনিধিত্বের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। তপশিলি জাতি ফেডারেশন-এর কার্যনির্বাহক সমিতি জগজীবন রামের কাছে মন্ত্রীসভায় দেওয়া পদটি গ্রহণ না করার জন্য আবেদন জানায় এবং ঘোষণা করা হয়, নতুন গঠিত সরকার তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে পারে না। তপশিলি নেতবৃন্দকে ব্রিটিশ সরকার যেসব উপাধি দিয়েছে সেগুলি বর্জন করারও আহ্বান জানানো হয়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তপশিলি জাতি ফেডারেশন নাগপুরে সত্যাগ্রহ শুরু করে ও খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে প্রায় আটশো লোক কারাবরণ করেন।

আম্বেদকর বুঝতে পারেলেন যে, প্রতিবাদ ও ধরনায় সুফল লাভের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজে একবার ব্রিটেনে গিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখবেন কোনো পরিবর্তন ঘটানো যায় কিনা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৫ অক্টোবর করাচি হয়ে তাঁর রাজনৈতিক মিশন শুরু করেন। করাচিতে এক প্রেস সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিনি লণ্ডন যাচ্ছেন, কিন্তু কোনো আলোচনায় যেতে বা তাঁর মিশনের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে তিনি অস্বীকার করেন। লণ্ডনে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করেনÑ 'লেবার পার্টি' অস্পৃশ্যদের নিরাশ করেছে এবং তাঁদের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করার পর থেকে দিল্লির পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞেস করা হলে আম্বেদকর বলেন, এ হচ্ছে এক দেশে দুই সরকার। প্রেসকে তিনি খোলাখুলিভাবে বলেন, ভারত এখন এক গৃহযুদ্ধের মধ্যে অবস্থান করছে। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে উপদেশ দেন ১৯৩৫ সালের অ্যাক্ট চালু করে দশ বছর পরে ভারতীয় দলগুলির হাতে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত হস্তান্তর করতে।

সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে তিনি তাঁর স্মারকলিপি মুদ্রিত করেন এবং ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের দ্বারস্থ হন। দলিত শ্রেণিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেছেন কিনা রয়টারের রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে এই প্রশ্নের উত্তরে আম্বেদকর বলেন যে,

তিনি এ ব্যাপারে দলিত শ্রেণির কোনো উপদেশ দেননি।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষে ভারতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আম্বেদকরের কথা হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী এটলি ও ভারতের রাষ্ট্রসচিবের সাথে তাঁর স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা করেন। চার্চিল, টেম্পলউড (আগে স্যার স্যামুয়েল হোর নামে পরিচিত), যিনি এক সময় ভারতের রাষ্ট্রসচিব ছিলেন এবং অন্যান্য আরও অনেকের সাথে দেখা করেন। ৫ নভেম্বর 'হাউস অব কমন্স'-এ 'কন্সারভেটিভ ইণ্ডিয়ান কমিটি'-র এক সভায় তিনি ভাষণ দেন। সেখানে লেবার পার্টির কয়েকজন এম.পি.-ও উপস্থিত ছিলেন। আম্বেদকর তাঁদের কাছে তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। কিন্তু তাতে লাভের কোনো আশা আছে বলে তাঁর মনে হল না। এখান-ওখান থেকে কিছু মৌখিক সহানুভূতি আর মাথা নাড়ানোর মতো কিছু সম্মতি তিনি পান। লেবার পার্টির সদস্যরা নীরব থাকায় প্রমাণ হল শেষ পর্যায়ে তাঁরা আর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলতে রাজি নন। পরিবর্তিত পরিস্থিতে নিজেকে মানিয়ে চলতে ও গণপরিষদে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে আম্বেদকরকে উপদেশ দেওয়া হয়। সুতরাং চরম বিষাদগ্রস্ত মনে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করেন।

বম্বে পৌঁছাবার অল্পকাল পরেই 'গ্লোভ এজেন্সি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে আম্বেদকর বলেন, যদিও এটা একটি বৃথা আশা, তবুও অস্পৃশ্যরা প্রকৃত এবং বাস্তব অর্থেই হিন্দুসমাজের মধ্যে অসবর্ণ বিয়ে ও অসবর্ণ-খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হওয়া বা মিশে যাওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু এর অন্য দিকটি হলÑ হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁদের এই মিশে যাওয়ার কাজটা সহজ হবে, যদি অস্পৃশ্যরা সামাজিক মর্যাদায় বর্ণহিন্দুদের সমপর্যায়ে উন্নীত হন। তিনি ক্ষীণ আশা ব্যক্ত করে বলেন, কালক্রমে হিন্দুধর্ম নিজেকে এমনভাবে সংশোধিত করবে, যাতে সে গ্রহণযোগ্য হয় এবং অস্পৃশ্যরা যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতে প্রস্তুত, কারণ মানুষকে এক মাটি থেকে তুলে নিয়ে অন্য মাটিতে রোপণ করা যায় না।

অস্পৃশ্যদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার যে প্রস্তাব রেভারেণ্ট লিভিংস্টোন দিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "খ্রিস্টান অ-খ্রিস্টান সকলের মধ্যেই ধর্ম পৈত্রিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন খ্রিস্টান উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতৃসম্পত্তি লাভ করে, সেইসঙ্গে সে লাভ করে তার ধর্মও। সে কখনও খ্রিস্টধর্মকে অন্য ধর্মের সাথে তুলনা করে না বা তার আধ্যাত্মিক মূল্য বিচার করে না।

এই সময়ে আম্বেদকরের বই "কারা শূদ্র ছিলেন" (Who were the Sudras?) প্রকাশিত হয়। বইখানি মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের নামে উৎসর্গ করা হয়। তাঁকে তিনি শ্রেষ্ঠতম সমাজসংস্কারকদের একজন বলে মনে করতেন। দীর্ঘদিন ধৈর্যশীল অধ্যবসায় ও গবেষণাপ্রসূত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইখানি ঘটনাবলির তালিকা তৈরি করার এক

চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি ও দীপ্তিময় উদ্দীপ্তকারী ব্যাখ্যা উপহার দেয়। আম্বেদকরের এটা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত সত্য যে, বর্তমান শূদ্ররা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁরা দাস কিংবা দস্যু ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সূর্যবংশীয় সম্প্রদায়গুলির অন্যতম। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে তাঁরা অধিকারভ্রষ্ট হলে ব্রাহ্মণরা এই ক্ষত্রিয়দের উপনয়ন-অনুষ্ঠানাদি করতে অস্বীকার করেন এবং তাঁদেরকে চতুর্থ বর্ণে নামিয়ে দেন, যার অস্তিত্ব আগে ছিল না।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বম্বে পরিদর্শন করেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, লণ্ডনে আম্বেদকরের মিশনের ফলাফলে তিনি সন্তুষ্ট এবং আরও বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তাঁর যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আম্বেদকরের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

মুসলিম লিগ বয়কট করলেও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর নির্ধারিত তারিখেই গণপরিষদের সভা শুরু হয়। সভা রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি নির্বাচিত করে এবং কর্মপদ্ধতির নীতিনিয়ম তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। পণ্ডিত নেহরু ১৩ ডিসেম্বর আকর্ষণীয় এক বক্তৃতার মাধ্যমে Declaration of Objectives-এর উপর একটি প্রস্তাব পেশ করে ওই কমিটির কর্মপদ্ধতির সূচনা করেন। সাধারণভাবে একজন সুবক্তা ও চিন্তাশীল, আন্তরিক ও স্বপ্নবিলাসী নেহরু জাতি ও তাঁর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণাবলির উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যান এবং বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে সভাকে মোহিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়াই ভারতের উদ্দেশ্য। পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন এই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর আইন-জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, শান্তি প্রতিষ্ঠার কারিগর বলে পরিচিত ডঃ এ.আর. জয়াকর, নেহরুর প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধনী পেশ করে বলেন, গণপরিষদে যতদিন পর্যন্ত মুসলিম লিগ ও ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ যোগদান না করছেন, ততদিন পর্যন্ত প্রস্তাব পাশ করানোর কাজ স্থগিত রাখা হোক। এ প্রস্তাব সরল বিশ্বাসেই তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা এতে উত্তেজিত হন এবং ডঃ জয়াকরকে বাধা সৃষ্টিকারী বলে বিভিন্ন কংগ্রেসি গোষ্ঠী থেকে প্রতিবাদ ওঠে। ঝরঝরে, সাবলীল কন্ঠের অধিকারী বুদ্ধিমান জয়াকর সেদিনের মতো হাউসে আর বক্তব্য না রেখে বসে পড়েন। তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব এক বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক নেতা এম.আর. ম্যাসানি নেহরুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। ডঃ জয়াকরের সংশোধনী প্রস্তাবকে ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি আইনগত ও টেকনিক্যাল কারণে সমর্থন করেন, তবে তিনি মূল প্রস্তাবটির পবিত্র চরিত্রের দিকটিকেও সমর্থন করেন। হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ এস.পি. মুখার্জি সিদ্ধান্ত

পিছিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পান না। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলে তা মুসলিম লিগকে বাইরে থেকে যেতে এবং উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এবার গণপরিষদের সভাপতি অপ্রত্যাশিতভাবেই ডঃ আম্বেদকরকে তাঁর বক্তব্য রাখতে ডাকলেন। আম্বেদকর হলেন কংগ্রেসের স্বীকৃত শত্রু, তাঁদের আদর্শকে চাবুক মেরেছেন এবং তাঁদের নেতাকে ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করেছেন। পরিষদ তখন সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়ে আছে। আম্বেদকর হাউসটাকে একবার দেখে নিলেন। সকলেই ভাবলেন, এমন একটা মারাত্মক ভূমিকা পালন করতে গিয়ে আম্বেদকর সংশোধনী প্রস্তাবকারীকেই অনুসরণ করবেন। যাঁরা জাতির সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী নেতাÑ কগ্রেসের সেই কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ানোর মানে একটা ওয়াটারলু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া! কংগ্রেস-সদস্যরা তাঁদের স্বীকৃত শত্রুকে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলার জন্য হাত উঁচিয়েই আছেন।

আম্বেদকর দেখলেন, তাঁর চারদিকে ঘিরে রয়েছেন ঝানু রাজনৈতিক সব নেতারা। সাদা পোষাক পরিহিত এলিটদের বেশির ভাগই তখন পর্যন্ত তাঁর কোনো বাক্য শোনেননি, যদিও তাঁর সম্পর্কে অনেক বড়ো বড়ো কথা তাঁরা শুনেছেন। ভাষার উপর অসীম আধিপত্যে চরম সাহসের সঙ্গে গম্ভীরভাবে তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন, নেহরুর প্রস্তাবের প্রথম অংশকে তিনি বিতর্কিত মনে করেন এবং পরবর্তী যে অংশে ভবিষ্যৎ সংবিধানের লক্ষ্যবস্তুসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা তর্কাতীত, যদিও তা পণ্ডিতি মনোভাবাপন্ন। কারণ এতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতিকারের বিহিত না করে শুধুমাত্র অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেস-সদস্যদের তখন দমবন্ধ অবস্থা। কিন্তু হাউসের মানসিকতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে চোখের পলকে আম্বেদকর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সংশোধনীর জটিলতায় চলে যান।

তিনি বলেন, "আমি জানি, আজ আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ভাগ হয়ে গেছি। আমরা বিবদমান শিবিরে বাস করছি এবং সম্ভবত আমি একটি বিবদমান শিবিরের একজন নেতা। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যথাসময়ে এবং উপযুক্ত পরিবেশে বিশ্বের কোনো শক্তি এদেশকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যে জাতপাত ও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, আমরা যে কোনোভাবেই হোক, একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হব।"

তিনি আরও বলেন, "আমার বলতে দ্বিধা নেই লিগ ভারত ভাগ করার আন্দোলন করা সত্ত্বেও মুসলিমদের একটা আলোকিত প্রভাত আসবে এবং তাঁরা ভাবতে শুরু করবেন যে, অবিভক্ত ভারত প্রত্যেকের জন্যই অধিকতর শুভ হবে।"

শক্তিশালী কেন্দ্রকে টুকরো টুকরো করার অনুমতি দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করে আম্বেদকর বলেন, হাউসের এ প্রস্তাব পাশ করার অধিকার আছে কিনা, সে প্রশ্ন তিনি তুলছেন না। হয়তো সে অধিকার তার আছে। আরক্ত চোখে তিনি বলেন, "আমি যে প্রশ্ন এখানে তুলছি তা হচ্ছে, এটা করা কি আপনাদের পক্ষে সুবিবেচকের কাজ হবে? এটা কি বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে? ক্ষমতা এক জিনিস, আর প্রাজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন জিনিস।" তিনি কংগ্রেসি সদস্যদের কাছে বিরোধ দূর করার জন্য আর একবার চেষ্টা করে দেখার ঐকান্তিক আবেদন রেখে বলেন, "একটি জাতির ভাগ্য নির্ধারণে নেতা, ব্যক্তি বা দলের মর্যাদাকে কখনও গণ্য করা উচিত নয়।"

পরিশেষে তিনি তিনটি উপায়ের কথা বলেন, যেগুলি দ্বারা বিষয়টির মীমাংসা হতে পারে। একটি দলের কাছে অন্য দলের স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণ, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা অথবা যুদ্ধ। তিনি স্বীকার করেন, যুদ্ধের কথায় তিনি আতঙ্কিত এবং সাবধানবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, এ যুদ্ধ হবে মুসলিমদের সাথে অথবা যেটা সম্ভবত আরও অধিকতর খারাপ, এ যুদ্ধ হবে ব্রিটিশ ও মুসলিমদের মিলিত শক্তির সাথে। আমেরিকার সাথে মীমাংসার পক্ষে বার্কের বিখ্যাত রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আবেদনের সুরে তিনি বলেন, "যদি কেউ মনে করেন যে, এ সমস্যার সমাধান হবে যুদ্ধের মাধ্যমে, অথবা যদি মনে করেন মুসলিমদের বশ্যতাস্বীকার করানো সম্ভব ও তাঁদেরকে সেই সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য করা যাবে, যা তাঁদের না জানিয়ে, তাঁদের সম্মতি না নিয়ে তৈরি হবে, তাহলে এ দেশ তাঁদের জয় করার এক অন্তহীন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে। বার্ক বলেছেন– 'ক্ষমতা প্রদান করা সহজ, কিন্তু প্রাজ্ঞতা প্রদান করা কঠিন।' আসুন, আমরা আমাদের আচরণের দ্বারা প্রমাণ করি, দেশের সব শ্রেণির লোকদের নিয়ে চলার মতো এবং যে পথ ঐক্যের দিকে যেতে আমাদের বাধ্য করে সেই পথে তাঁদের চালনা করার মতো ক্ষমতাই যে শুধু আমাদের আছে তা নয়, বিচক্ষণতাও আমাদের আছে।"

এই আবেগপ্রবণ আবেদন এত বলিষ্ঠ ছিল যে, তা গণপরিষদের উপর এক চমৎকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কংগ্রেস-সদস্যরা বারবার তাঁকে উৎসাহিত করেন। ডঃ জয়াকরের বক্তৃতার মধ্যে এই একই আবেদনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আম্বেদকরের চমৎকার ভাষণ সকলের মনে সহযোগিতার ভাব তৈরি করে। যে হাত তাঁকে আঘাত করার জন্য ছটফট করছিল, সেই হাতেই এবার তাঁর অনুমোদনের তালি বেজে ওঠে। আম্বেদকরের বিস্ময়বিহ্বল জীবনে এটি একটি স্মরণীয় দিন। এখন অধর্মাচারী হলেন পরামর্শদাতা, ঘৃণিত হলেন বন্ধু, যে বন্ধু কংগ্রেসিদের মুগ্ধ করলেন। একজন বক্তার জীবনে কিছু বক্তব্য এমন পরিবর্তন ঘটায়। প্রস্তাবের উপর

আলোচনা আগামী অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, যেটি পরবর্তী জানুয়ারি মাসে বসে এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রস্তাবটি পাশ হয়।

People's Education Society-র দেখাশোনা করার জন্য আম্বেদকর বম্বে ফিরে এলেন। তাঁর লোকদের সাথে কংগ্রেস-মনোভাবাপন্নদের সংঘাত তখনও থামেনি। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ছুরিকাঘাতে বম্বের দলিত শ্রেণির নেতা দেওরুখকরের মৃত্যু হয়। সেই সময় এক ব্যক্তি সিদ্ধার্থ কলেজে আম্বেদকরকে একদিন বলেন যে, তাঁর বাড়ি যাওয়া উচিত হবে না, কারণ গুণ্ডা-মস্তানেরা তাঁর বাড়ির চারদিকে ঘিরে আছে। তিনি তখন রাগে তাকে ভ্রূকুটি করে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে, ভাইপো এবং তাঁর বইপত্র, যা তাঁর নিজের জীবনের মতোই প্রিয়, যেখানে বিপদের মধ্যে রয়েছে, সেখানে তাঁর নিজের জীবন রক্ষা করা উচিত নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তিনি বাড়ি ফিরে যান।

১৯৪৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আম্বেদকর এম.বি. সামার্থ, জি.জে. মেন এবং পি.টি. বোরেলের সহায়তায় দেওলালির এক জেনারেল কোর্ট মার্শালে ৩৮ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সওয়াল করেন। অভিযুক্ত সৈনিকরা বিহারের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, তারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের কোনো এক কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, অথবা ভারতের বর্তমান প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ভারতকে হস্তান্তর করবে। লর্ড ওয়াভেলকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দেশে ফিরিয়ে নেন। তিনি কেবল মুসলিমদের দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু দেখতেন।

আম্বেদকর সঠিক সময় বুঝতে পারতেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, সংবিধান সম্পর্কে তাঁর অভিমত গণপরিষদে ব্যক্ত করার সময় এসে গেছে। সুতরাং ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে তিনি একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন যাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, যেখানে তপশিলিদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে, সেখানেই কেবল পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা উচিত। অন্য জায়গায় তাঁরা যৌথভাবে ভোট দেবেন।

'States and Minorities' ('রাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু') নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে এই স্মারকলিপি প্রকাশ করা হয়। এটা ছিল সংবিধানের একটি খসড়া, যা তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তৈরি করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন অধ্যয়ন করা যেমন আনন্দদায়ক, তেমন শিক্ষামূলকও বটে। তাই সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তা দেওয়া হচ্ছে।

আম্বেদকরের মতে গণতন্ত্র হল অপরিহার্যভাবে একটি সমাজব্যবস্থা। এর মধ্যে

নিশ্চিতভাবে দু'টো জিনিস জড়িত আছে। প্রথমটি হচ্ছে মনের অনুভূতি, প্রতিবেশীদের প্রতি সম্মান ও সাম্যের অনুভূতি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কঠোর সামাজিক প্রতিবন্ধকতাহীন সামাজিক সংগঠন। যেখানে বিচ্ছিন্নতা ও বর্জন করার মনোভাব, সেখানে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ। এর ফল হচ্ছে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত আর সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এই পার্থক্য সৃষ্টি করা অর্থাৎ অল্পজনের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা ও বহুজনের জন্য শুধু বঞ্চনা।

গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের অবসর জীবনের নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকতে হবে। সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক সমাজের স্লোগান অবশ্যই হবেÑ যন্ত্রপাতি, আরও যন্ত্রপাতি ও সভ্যতা। অতএব, তিনি যন্ত্রযুগকে স্বাগত জানান। যন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতা অনেক ক্ষতিকর ব্যবস্থার সৃষ্টি করলেও তা মেনে নিতে হবে। তাই বলে ওইসব ক্ষতিকর ব্যাপারগুলি তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নয়। ওগুলো সৃষ্টি হয় ভ্রান্ত সামাজিক সংগঠনের কারণে, যেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানো এবং ব্যক্তিগত লাভের পিছনে ছুটে বেড়ানোকে পবিত্র দায়িত্ব-কর্তব্য বলে মনে করে। যন্ত্র ও সভ্যতা যদি প্রত্যেকের লাভদায়ক না হয়, তাহলে যন্ত্রপাতি ও সভ্যতার দোষ দেওয়া তার প্রতিকার নয়, প্রতিকার হচ্ছে সামাজিক সংগঠন পদ্ধতিটাকেই বদলে দেওয়া, যাতে তার সুফল মুষ্টিমেয় কয়েকজন অপহরণ করতে না পারে, সকলে মিলে ভোগ করতে পারে।

প্রাণীজগত বিন্যাসে মানুষই সর্বোচ্চ আসন দখল করে আছে। একবার যদি জৈবিক ক্ষুধার তৃপ্তি হয়, তাহলেই পশুজীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ তার মনকে পরিপূর্ণভাবে পরিমার্জিত করতে পারছে না, ততক্ষণ সে তার জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে না। সংক্ষেপে, কৃষ্টিই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে। সুতরাং মানবসমাজের অবশ্যই লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করতে পারে, অর্থাৎ মনের চর্চা, যা নিছক দৈহিক তৃপ্তি থেকে আলাদা। এই সাংস্কৃতিক জীবন তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ নিজেকে সংস্কৃতজীবনে নিয়োজিত করতে যথেষ্ট অবসরের সময় পায়। অবসর সময় একেবারেই সম্ভব হয় না, যদি মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম কমানো না যায়। সেটা হতে পারে একমাত্র মানুষের জায়গায় যন্ত্র স্থাপিত হলে।

গান্ধিবাদ যন্ত্রকে ঘৃণা করে বলে তিনি গান্ধিবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, গান্ধিবাদ সাধারণ মানুষের পক্ষে অনিবার্য ধ্বংস বয়ে আনবে এবং এতে অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য কোনো উৎসাহ নেই।

যে সব গোঁড়া মার্কসবাদী সব ব্যাপারে মার্কস ও এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি দেন,

আম্বেদকর তাঁদের ঘৃণা করেন। তিনি নতুন ভাবাদর্শ ও নতুন ধারণা পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, কলমের আঁচড় দিয়ে কেউ একটা আদর্শ প্রচলন করতে পারে না। সমাজকে সব সময় পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাঁর মতে, মার্কসের দর্শন একটি নিচুমানের তৃপ্তিকর দর্শন। এটা একটা চলার দিক্‌নির্দেশনা মাত্র; কোনো মতবাদ নয়। একবার তিনি রাশিয়ান কম্যুনিজমকে প্রবঞ্চনা বলে বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি রাষ্ট্রীয় সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। "দ্রুত শিল্পায়নের জন্য ভারতে রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি-উদ্যোগ এটা করতে পারে না। যদি তা করেও, বেসরকারি পুঁজিবাদ ইউরোপে সম্পদের যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল, সেও তাই সৃষ্টি করবে। ভারতীয়দের এটাকে সাবধানবাণী বলে মনে করতে হবে। সংহতিকরণকে ধরে রাখা এবং প্রজাস্বত্বের আইন প্রণয়ন অর্থহীন বলার চেয়েও খারাপ। কৃষিক্ষেত্রে এতে শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সংহতিকরণকে ধরে রাখা বা প্রজাস্বত্বের আইন প্রণয়নÑ এর কোনোটাই ছ'কোটি অস্পৃশ্যের কোনো উপকারে আসবে না। কারণ তাঁরা ভূমিহীন শ্রমিক। কেবল মাত্র যৌথখামার পদ্ধতিই তাঁদের সাহায্য করতে পারে।"

বুনিয়াদি শিল্পগুলির মালিক হবে রাষ্ট্র; তিনি বলেন, "বীমা থাকবে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে। কৃষি হবে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প। জমির মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে এবং তা গ্রামবাসীদের মধ্যে জাতপাত ও ধর্মমতের পার্থক্য না করে এমন ভাবে বণ্টন করা হবে যে, সেখানে কোনো জমিদার, প্রজা এবং কোনো ভূমিহীন শ্রমিক থাকবে না।"

তিনি সাংবিধানিক আইন বলে রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং যাতে আইনসভা বা নির্বাহী কর্মকর্তা দ্বারা তা অপরিবর্তনীয় থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে, যা স্বাধীন সমাজের জন্য উপযুক্ত সরকার গঠন করবে, তার দ্বারাই রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের অনুশীলন করতে হবে। একমাত্র এই পদ্ধতিটিতেই তিনটি লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়Ñ যেমন সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা, সংসদীয় গণতন্ত্রকে অব্যাহত রাখা ও একনায়কতন্ত্রকে পরিহার করা।

তিনি বলেন, "কিন্তু গণতন্ত্রকে যদি 'প্রত্যেক মানুষের সমান মূল্য' (One man, one value) এই নীতিতে পৌঁছাতে হয়, তাহলে সাংবিধানিক আইনকে কেবল রাজনৈতিক কাঠামোর আকার ও রূপ নির্দিষ্ট করে দিলেই হবে না, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আকার ও রূপও তাকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।"

কিন্তু আম্বেদকর কি ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকদের সাথে একমত ছিলেন? তাঁর ইচ্ছা ছিল সামাজিক সমস্যার প্রতি তিনি ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিই একমাত্র প্রেরণা নয়, যার দ্বারা মানুষ কাজে প্রণোদিত হয়। অর্থনৈতিক শক্তিই যে একমাত্র শক্তি, মানবসমাজের

কোনো জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তি সে কথায় সম্মত হবেন না। ধর্মও যে শক্তির একটি উৎস ইতিহাস তার ভালোই উদাহরণ দিয়েছে।'' তিনি রোমের সাধারণ লোকদের ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যাতে তাঁরা তাঁদের ধর্ম ত্যাগ না করে যে পার্থিব সুযোগ লাভের জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন, সেটাকেই শেষে ত্যাগ করেন।

'ইউরোপীয় সমাজে বর্তমান অবস্থায় ক্ষমতার উৎস হিসাবে সম্পত্তি প্রাধান্য লাভ করেছে, সেজন্য ভারতেও সেটা সত্য হবে' একথা মনে করার মধ্যে সমাজতান্ত্রিকদের একটি ভুল ধারণা আছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, "ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা ও বিষয়সম্পত্তিÑ এগুলি সবই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস।"

সম্পদের সমবণ্টনই একমাত্র আসল সংস্কার এবং অন্য সবকিছুর আগে এটা হওয়া দরকারÑ এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তিনি একমত নন। তিনি সমাজতান্ত্রিকদের কাছে প্রশ্ন করেন, আগে সমাজবিন্যাসে সংস্কার না এনে তাঁরা অর্থনৈতিক সংস্কার করতে পারবেন কিনা। তিনি সাবধান করে বলেন, "সমাজতান্ত্রিকরা যদি আকর্ষণীয় চটুল বাক্যে তৃপ্তি পেতে না চান, তাঁরা যদি সমাজতন্ত্রকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বাস্তবে পরিণত করতে চান, তাহলে তাঁদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, সমাজ সংস্কারের সমস্যাটি মৌলিক এবং এ সমস্যাটিকে তাঁদের এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এটা না করলে, তাঁরা তাঁদের বিপ্লবও সম্পন্ন করতে পারবেন না। তাই বিপ্লবের আগে না হলেও, বিপ্লবের পরে তাঁরা জাতপাতকে হিসাবের মধ্যে নিতে বাধ্য হবেন।"

ব্রিটিশদের অস্পষ্ট নীতি, মুসলিমদের করা বর্বরোচিত কাজ ও কংগ্রেস নেতাদের সমস্যা মোকাবিলায় অক্ষমতা হিন্দুদের আত্মরক্ষামূলক নীতির দিকে ঠেলে দেয় এবং সেজন্য এবার পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের দাবিকেই তাঁরা শ্রেয় বলে ভাবেন। তাঁদের এই অবস্থান পরিবর্তন সম্পর্কে আম্বেদকর নতুন দিল্লিতে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে, যে সকল অস্পৃশ্যরা স্থানান্তরিত হবেন, বর্ণহিন্দুরা তাঁদের কী করবেন এবং কীভাবে তাঁরা পুনর্বাসিত হবেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে আম্বেদকর যোগদান করেন। 'অ্যাডভাইসরি কমিটি' ও 'ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস কমিটি'র রিপোর্ট গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালের ২৯ এপ্রিল গণপরিষদে ঘোষণা করা হয়, "যে কোনো রূপের অস্পৃশ্যতা বিলোপ করা হল এবং এই ব্যাপারে অক্ষমতা প্রদর্শন করা অপরাধ" (Untouchability in any form is abolished and the imposition of disability on that account shall be an offence)। সর্দার প্যাটেলের সৌভাগ্য যে, এই ধারাটি তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এটি একটি গৌরবময় দিন,

যখন ভারতের শাসকবর্গ অস্পৃশ্যতার কলঙ্কচিহ্ন ধুয়ে ফেলার ইচ্ছা ঘোষণা করেন। বিশ্বের সংবাদসংস্থা এই ঘটনাকে অস্পৃশ্যদের স্বাধীনতা, জাতিচ্যুত মানুষদের মুক্তিদিবস, অস্পৃশ্যতাকে বেআইনি ঘোষণার এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং মানবমুক্তির জয় বলে বর্ণনা করে। নিউইয়র্ক টাইমস বলে, "প্রাচীন কলঙ্ক মুছে ফেলাতে তাদের (ভারতের) এই অগ্রগতি আধুনিক যুগে একমাত্র আমাদের নিজেদের দাসপ্রথা দূরীকরণ ও রাশিয়ার ভূমিদাসদের মুক্তির সঙ্গে তুলনীয়।" লণ্ডনের 'দি নিউজ ক্রনিকল' এটাকে ইতিহাসের মহত্তম কাজগুলির অন্যতম বলে প্রশংসা করে। 'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' এই ঘটনাকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এক নতুন ও স্বচ্ছ আলোকরশ্মি রূপে বর্ণনা করে।

বিদেশি সমস্ত সংবাদপত্র ভারতের এই বিশাল কৃতিত্বে গান্ধির প্রশংসা করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কংগ্রেস পার্টিই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ঘোষণা করে এবং মাহাত্মা গান্ধিই হলেন কংগ্রেসের মুকুটহীন সম্রাট। বিদেশি কোনো পত্রপত্রিকা আম্বেদকরের নামও উল্লেখ করে না, যাঁর সুদৃঢ় চালিকাশক্তিই জাতিকে বাধ্য করেছিল এই কাজটি করতে। তারা সবাই ডেনমার্কের রাজকুমারের উল্লেখ না করে 'হ্যামলেট' নাটকের বর্ণনা করলো। যখন আম্বেদকরেরই এই অবস্থা তখন জ্যোতিরাও ফুলে, দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দ ও সাভারকরের নামের সকৃতজ্ঞ মূল্যায়নের উল্লেখের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

একজন আধুনিক মনু

নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করেন ও লণ্ডন চলে যান। তারপর তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে এসে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন তাঁর (দেশভাগের) পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে দু'টো কেন্দ্রীয় সরকার, দু'টো গণপরিষদ এবং সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য গণভোটের কথা ঘোষণা করা হয়। **গান্ধি ও নেহরু তাঁদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে দেশভাগ মেনে নিতে বাধ্য করেন। সত্যানুসন্ধানী গান্ধি যিনি পাকিস্তানকে একটি পাপ, একটি মূর্তিমান অসত্য বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং দেশবিভাগের অধিবক্তাদের দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, "ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করার আগে আমার অঙ্গচ্ছেদ কর।" এবার সেই গান্ধিই অখণ্ড-ভারতের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। সমাজতান্ত্রিকরা নিন্দনীয়ভাবে নীরব থাকেন। হিন্দু সভার সদস্যরা বৃথাই চেঁচামেচি করে যান।**

এই সঙ্কটমুহূর্তে ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দারাবাদ রাজ্য ঘোষণা করে যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই আগস্ট ভারত যখন স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে, তখন তারাও স্বাধীন হবে। এই পদক্ষেপ সম্পর্কে আম্বেদকর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে রাজ্যগুলিকে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করে নিতে পরামর্শ দেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, তাদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া ও রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা পাওয়ার আশা হবে কল্পনার স্বর্গে বাস করা।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আম্বেদকর নতুন ইণ্ডিয়া বিলের উপর তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, বেরার আবার নিজামের অধিকারে ফিরে যাবে। কারণ, যে চুক্তিতে এটা ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই চুক্তির মেয়াদ এখন শেষ হতে চলেছে।

আম্বেদকর ১৯৪৭ সালের ৩ জুলাই বম্বে ফিরে আসেন। তিনি গণপরিষদের 'ফ্লাগ কমিটি'র সদস্য ছিলেন বলে কয়েকজন মারাঠি নেতা এবং বম্বে প্রাদেশিক হিন্দু সভার নেতারা তাঁর বাড়িতে এসে তাঁর সাথে দেখা করেন। তিনি তাঁদের কথা দেন, যদি বিভিন্ন দায়িত্বশীল সংগঠনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে চাপ আসে এবং আন্দোলন হয়, তবে গেরুয়া পতাকার পক্ষে তিনি মত দিতে চেষ্টা করবেন। ১০ জুলাই মারাঠিদের বিভিন্ন নেতা এবং 'সিটি হিন্দু সভা'র নেতাদের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরে আম্বেদকরকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। যখন তিনি বিমানে আসন

গ্রহণ করতে যাবেন, সেই সময় তাঁর হাতে তাঁরা একটি গেরুয়া পতাকা তুলে দেন। যদি ওই পতাকা গ্রহণ করার জন্য আন্দোলন করা হয়, তাহলে সমর্থন করার কথা দিলেন আম্বেদকর। এরপর আন্তরিক হাসির সাথে এস.কে. বোলে, অনন্তরাও গড়রে ও অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, একজন মাহার-সন্তান গণপরিষদে গেরুয়া পতাকা তুলবেনÑ একথা তারা কি আশা করেছিলেন?

২২ জুলাই গণপরিষদে অশোকচক্র সহ ত্রিবর্ণ পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কথিত আছে আম্বেদকর প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু গেরুয়া পতাকা গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে কোনো আন্দোলন না হওয়ায় তিনি অশোকচক্রের পক্ষে মত দেন। সাভারকরও 'ফ্লাগ কমিটি'র চেয়ারম্যান ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে গান্ধিবাদের প্রতীক চরকার পরিবর্তে চক্রের আবেদন করেছিলেন। চরকার পরিবর্তে চক্র গৃহীত হওয়ায় গান্ধি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, পতাকার মূল চরিত্রে যদি খদ্দর আর চরকাই না থাকে, তবে সে পতাকায় তাঁর কোনো দরকার নেই।

আম্বেদকর নতুন দিল্লি থেকে ভারত সরকারের দৃষ্টি সরিয়ে এনে বাউণ্ডারি কমিশনের কাজের দিকে নিবদ্ধ করে বলেন, "আমার আশঙ্কা যদি সত্যি হয় এবং কমিশনের নির্ণিত সীমানা যদি স্বাভাবিক না হয়, তাহলে একথা বলার জন্য কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার প্রয়োজন হয় না যে, এর রক্ষণাবেক্ষণে ভারত সরকারকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে হবে এবং তা ভারতীয়দের নিরাপত্তাকে মহাবিপদে ফেলবে। সুতরাং আমি আশা করি, আর দেরি না করে প্রতিরক্ষা বিভাগ নিজেই এ ব্যাপারে কর্মতৎপর হবে এবং অনেক দেরি হবার আগেই তার কর্তব্য করবে।" এই উক্তি একজন দেশপ্রেমিকের আন্তরিকতা ও একজন রাজনীতিবিদের সতর্কতাকেই প্রকাশ করে। তবু, Thoughts on Pakistan-এর লেখক প্রচার করেছেন আধুনিক বিশ্বপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশই চূড়ান্ত নয়।

১৫ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act.) পাশ করে। এর ফলে গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। এটি তৈরি হয়েছিল অখণ্ড ভারতের জন্য, কিন্তু এখন তা হল খণ্ডিত ভারতের জন্য। বাংলা ভাগ হবার ফলে অনেক সদস্য গণপরিষদে তাঁদের আসন হারান। বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে আম্বেদকরও তাঁর আসন হারান। এবার তিনি বম্বে লেজিসলেটিভ কংগ্রেস পার্টির দ্বারা ডঃ এম.আর. জয়াকরের ইস্তফা দেওয়ায় শূন্য আসনটিতে নির্বাচিত হয়ে আসেন।

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহেই স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম শোনা যাচ্ছিল। তালিকার মধ্যে মাদ্রাজের মুনিস্বামী পিল্লাইয়ের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, যদিও জুনের প্রথম থেকেই তালিকায় আম্বেদকরের নামের কথাও

শোনা যাচ্ছিল। আম্বেদকর ওই সময় নতুন দিল্লিতে ছিলেন। আম্বেদকরকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্তি করা নিয়ে কংগ্রেস-নেতা প্যাটেল ও পাতিলের মধ্যে টেলিফোনে কথা হয়। প্রাথমিক কথাবার্তা শেষে নেহরু আম্বেদকরকে তাঁর চেম্বারে আমন্ত্রণ জানিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তিনি স্বাধীন ভারতের নতুন মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেবেন কিনা। তখন তাঁকে কথা দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী ধাপে পরিকল্পনা বা উন্নয়ন দপ্তরের কার্যভার তাঁকে দেওয়া হবে। আম্বেদকর রাজি হন। নেহরু মন্ত্রীসভায় মনোনীত চূড়ান্ত তালিকা গান্ধিকে দেখাতে ভাঙ্গি কলোনিতে যান। গান্ধি মাথা নেড়ে সম্মতি দেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যাঁরা ব্রিটিশের কাছ থেকে ক্ষমতার উত্তরাধিকার পেতে যাচ্ছিলেন, তাঁরা এবার আম্বেদকরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে চান এবং তাঁর সঙ্গে আপসমূলক ও তাঁকে যথার্থ মূল্য দেবার মতো মানসিকতায় ছিলেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁরা আম্বেদকরের গুণাবলি কাজে লাগানোতে অবজ্ঞা করেছেন। এবার তাঁরা ঠিক করলেন, স্বাধীনতাকে সুসংহত করতে ওই গুণাবলির সদ্ব্যবহার করবেন। আম্বেদকরও তাঁর আগেকার ঝগড়ার কথা ভুলে গিয়ে শান্তিপ্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে রাজি হন। মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মন্ত্রীসভায় যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

৩ আগস্ট ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে আম্বেদকরের নাম ছিল। সেদিন তিনি বম্বেতে ছিলেন এবং বম্বে মিউনিসিপ্যাল কামগর সংঘ কর্তৃক আয়োজিত বম্বের চেম্বুরে একটি সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানে তাঁকে সেন্ট্রাল বিল্ডিং গঠনের জন্য দু'শো টাকা দেওয়া হয়, যে বিল্ডিং তৈরি করার কথা তিনি ১৯৩২ সাল থেকে ভেবে আসছিলেন।

আম্বেদকর নতুন ভারতের আইনমন্ত্রী হতে চলেছেন, এই সাফল্যের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুরা, অনুরাগীবৃন্দ ও সংবাদ মাধ্যম তাঁকে শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানাতে আরম্ভ করেন। ধুলো থেকে সর্বোচ্চ আসনে উঠে আসার মতো এটা তাঁর একটি কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা। ইতিহাসে এই প্রথম একজন অস্পৃশ্য ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জনপ্রিয় মন্ত্রী হলেন** Ñ যে মানুষটি ব্রিটিশের সাগরেদ বলে নিন্দিত হয়েছেন, এবার তাঁর আগেকার বিরোধীদের দ্বারা তিনি একজন রাজনীতিবিদরূপে উচ্চপ্রশংসিত হলেন। ৬ আগস্ট বম্বেতে 'বার অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাধীন ভারতের মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে সম্মানিত করা হয়। এবার আম্বেদকর চলার পথের বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চললেন।

** এর আগে ব্রিটিশ-ভারতে অস্পৃশ্য জাতির আর একজন সদস্য মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন (১৯৪৬-৪৭)।

বিশ্ব-ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত একটি স্বাধীন জাতিতে পরিণত হওয়ায় একটি মহান দিনের সূচনা হয়। ভারতের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এশিয়া মহাদেশে এক বিশাল শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু একটি কারণে এর শান্তি বিনষ্ট হয়। ভারত খণ্ডিত হওয়ায় রক্ত ঝরে এবং এর পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান।

এই সাফল্যের সাথে যে উন্নয়ন ঘটে, তা আম্বেদকরকে খ্যাতির উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। ১৯ আগস্ট গণপরিষদ এন. মাধবরাও, সৈয়দ এম. সাদুল্লাহ্, স্যার আল্লাদি কৃষ্ণমাচারী, টি.টি. কৃষ্ণমাচারী ও আরও দু'জনকে সদস্য এবং আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান করে একটি 'ড্রাফটিং কমিটি' (সংবিধান রচনার) নিয়োগ করে। যাঁকে গোরুরগাড়ি থেকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাঁকে ছেলেবেলায় স্কুলে (অন্য ছাত্রদের থেকে) আলাদা করে রাখা হয়েছিল, অধ্যাপক হিসাবে যিনি অপমানিত হতেন এবং যাঁকে যুবা বয়সে হোটেল, হোস্টেল, সেলুন ও মন্দির থেকে ঘৃণ্য মাহার বলে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং যিনি ব্রিটিশের চামচা হিসাবে অভিশাপ কুড়িয়েছেন, ঘৃণিত হয়েছেন হৃদয়হীন রাজনীতিক ও শয়তান হিসাবে, ঘৃণিত হয়েছেন মহাত্মার একজন নিন্দুক বলে, নিন্দিত হয়েছেন একজন Executive Councillor হিসাবে, আজ সেই ব্যক্তিই হলেন স্বাধীন জাতির প্রথম আইমন্ত্রী এবং ভারতের ইচ্ছা, লক্ষ্য ও স্বপ্নকে নির্ণয় করার সংবিধানের প্রধান রূপকার। এটি একটি তাঁর মহান কৃতিত্বের স্বীকৃতি এবং ভারতের ইতিহাসে এক বিস্ময়। ভারত তার যুগযুগব্যাপী অস্পৃশ্যতা নামক পাপের শুদ্ধিস্বরূপ তার আইনস্রষ্টা, নতুন মনু ও নতুন স্মৃতিকারকে বেছে নিল এমনই একটি সম্প্রদায় থেকে, যুগযুগ ধরে যাঁদের মনুষ্যত্ব হরণ করা হয়েছে, চরিত্র হনন করা হয়েছে ও নষ্ট করা হয়েছে তাঁদের জীবনীশক্তি। নতুন ভারত তার নতুন আইন প্রণয়নের ভার ন্যস্ত করল এমন এক ব্যক্তির উপর যিনি কয়েক বছর আগে হিন্দু-আইনের সঙ্কলনগ্রন্থ 'মনুসংহিতা'কে আগুনে পুড়িয়ে ছিলেন!

যদিও এখন আইনমন্ত্রী, তবুও আম্বেদকর তাঁর শিশু-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সিদ্ধার্থ কলেজের উন্নয়নের কাজের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চললেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর কলেজের সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের (Parliamentary Institution) উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর একটি ভাবোদ্দীপ্ত ভাষণে বাকশিল্পের বিকাশ সাধন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিকাশোন্মুখ যুবসমাজের মনে গভীর রেখাপাত করেন। তিনি বলেন, কোনো সংসদীয় প্রতিষ্ঠানে যিনি ভদ্রভাবে কিংবা জোরালো যুক্তির দ্বারা শিক্ষাপ্রদ পদ্ধতিতে সভাকে নিজের আয়ত্তে রাখার শক্তি ধরেন, তিনিই সাফল্য লাভ করেন। এই শক্তি বাড়াতে গেলে ছাত্রদেরকে বহু ভাবে প্রস্তুত হতে হবে। তাদের অবশ্যই মনকে উদার করতে হবে, দৃষ্টিকে বৃহৎ করতে হবে; তাদের চিন্তাধারণ

ক্ষমতা ও মানুষকে যেসব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান করার যোগ্যতাকে অবশ্যই বাড়াতে হবে। এরপর তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে বলেন যে, সরকার মানেই সিদ্ধান্ত। আপসমূলক সরকার, সরকারই নয়। কারণ, তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা 'না মাছ, না পাখি'Ñ এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বম্বে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ১ সেপ্টেম্বর বম্বে পরিদর্শনকারী পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও মৌলানা আজাদকে নাগরিক সংবর্ধনা দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিরোধী সদস্যরা দাবি করেন যে, আম্বেদকর, গ্যাডগিল ও ভাবার মতো বম্বে থেকে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্যকেই সংবর্ধনা দেওয়া উচিত। কিন্তু বম্বে কংগ্রেস দলের প্রধান এস.কে. পাতিল বলেন যে, যে চারজন নেতাকে তাঁরা সম্মানিত করতে চান, তাঁরা বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ এবং নিজেরাই এককভাবে এক একটি শ্রেণি। আসলে বম্বের কংগ্রেসিরা আম্বেদকরের প্রতি বিরূপ মনোভাব তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং তাঁদের ইচ্ছাও নয় আম্বেদকরকে তাঁদের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের সমান শ্রদ্ধা করবেন। পূর্বসংস্কার দূর হওয়া বেশ কঠিন। পরে বম্বে করপোরেশন আম্বেদকরকে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাব নিয়েছিল; কিন্তু তিনি মেয়রের চিঠির জবাব পর্যন্ত দেননি।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আম্বেদকর বম্বেতে তপশিলি জাতির যুবসমাজের এক সভায় বলেন যে, স্বাধীনতা এতটাই হঠাৎ এসে গেছে যে, সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মধারা নেই। যে কোনো পরিস্থিতিতে তপশিলি জাতি ফেডারেশনকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব দেন এবং সংগঠনকে আন্তরিকভাবে নেওয়ার জন্য তাঁদের কাছে তিনি আবেদন রাখেন।

ইতিমধ্যে ভারত-ভাগের বীভৎস পরিণতি সমগ্র জাতিকে ভয়ঙ্কর আঘাত করে। কমলাকান্ত চিত্রের কাছে লেখা এক চিঠিতে আম্বেদকর বলেছেন, দিল্লির গোলযোগকে দাঙ্গা বললে কম বলা হয়। এটাকে সহজেই বিদ্রোহ বলা যায়। তিনি বলেন, "আহত ও নিহতের সংখ্যা দিল্লির মতো নগরীতে বিশাল। গত কয়েকদিন ধরে জনজীবন সম্পূর্ণ স্তব্ধ।" আম্বেদকর নিজ নিজ এলাকা থেকে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার সম্পূর্ণ বিনিময়সহ দেশবিভাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাতে গৃহযুদ্ধ ও তার আনুসঙ্গিক নির্বিচার হত্যাকাণ্ড নিবারণ করা যায়। লিঙ্কনের মতো সাভারকরও ভারতের একতা বজায় রাখতে কিছুদিনের জন্য গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হতেও তৈরি ছিলেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্য যাঁদের হাতে সেই কংগ্রেস-নেতারা শেষপর্যন্ত দেশভাগ ও নৃশংস

হত্যাকাণ্ড মেনে নিলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আনন্দ-উচ্ছাসের মধ্যে লোক বিনিময়ের ধারণাকে উপহাস করলেন, যেমন পাকিস্তান সৃষ্টির উষালগ্ন পর্যন্ত পাকিস্তানের ধারণাকেও করেছেন। যথারীতি তাঁদের কার্যসূচি পাকিস্তানে থাকা হিন্দুদের ভাগ্যকে আরও খারাপ করে দেয়। এইভাবে আম্বেদকরের ভবিষ্যদ্‌বাণী ও আশঙ্কা উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

এই ধ্বংসযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হলেন; লক্ষ লক্ষ মানুষ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন। শিশু ও মহিলারা নিগৃহীত হল, অপহৃত হল অথবা জোর করে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হল। রাস্তায় রাস্তায় অজস্র ভাঙা মাথার খুলি আর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহের বন্যা বয়ে গেল। প্রতিধ্বনিত হলো মৃত্যুপথযাত্রী নরনারী আর শিশুদের আর্তচিৎকার। হিন্দু হওয়ার কারণে অস্পৃশ্যদেরও একই দুর্দশা ভোগ করতে হলো।

আম্বেদকর ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাকিস্তানের নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, তপশিলিদের হিন্দুস্তানে আসতে দেওয়া হয়নি এবং জোর করে তাঁদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, হায়দারাবাদ রাজ্যেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। সুতরাং তিনি তাঁর লোকদের উপদেশ দিয়ে বলেন, "যেসব তপশিলি জাতির মানুষ ঘটনাক্রমে আজ পাকিস্তানে আটকা পড়েছেন, আমি তাঁদের বলতে চাই যে, তাঁরা যেভাবেই পারেন, পাকিস্তান থেকে যেন ভারতে চলে আসেন। দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চাই, তা হচ্ছে, পাকিস্তানে হোক, আর হায়দারাবাদেই হোক, মুসলিমদের প্রতি বা মুসলিম লিগের প্রতি আস্থা স্থাপন করাটা হবে তপশিলি জাতির পক্ষে মারাত্মক। হিন্দুদের তাঁরা অপছন্দ করেন বলে মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে দেখা তপশিলি জাতির মানুষদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা একটা ভুল চিন্তাধারা।"

আম্বেদকর পাকিস্তান ও হায়দারাবাদের তপশিলি জাতির লোকদের আরও বলেন, মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় হিসাবে তাঁরা যেন ইসলামে ধর্মান্তরিত না হন এবং যাঁদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাঁদের সকলকেই যাতে আবার হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয় ও ধর্মান্তরিত হওয়ার আগেকার মতোই ভাইয়ের মতো তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তা তিনি দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, তাঁদের উপর হিন্দুরা যত নির্মম অত্যাচার আর নিপীড়নই করুক না কেন, তা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে না দেয় ও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না করে। হায়দারাবাদের তপশিলিদের তিনি সতর্ক করে দেন এই বলে যে, ভারতের শত্রু নিজামের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিজ সম্প্রদায়ের অসম্মান ডেকে যেন না আনেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে পাকিস্তান থেকে তপশিলিদের সরিয়ে আনার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আবেদন জানান।

সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র আম্বেদকরের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন সকলের কাছেই দারুণভাব সমাদৃত হয়। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা বলে, এটা আনন্দের যে, বর্ণহিন্দুরা অতীতে হরিজনদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে বলে তাঁদের হিন্দুধর্ম ত্যাগ করাটা উচিত হবে, এ কথা আর আম্বেদকর মনে করেন না। এটা প্রমাণ করে পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি হরিজনদের প্রবল আবেগপূর্ণ সংযোগ রয়েছে এবং তাঁদেরকে হিন্দুসমাজের সঙ্গ ছাড়ানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাতে তাঁদের লেগে থাকার দৃঢ়তা আছে।

দু'মাসের মধ্যে বম্বের কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা সামাজিক অন্যায় দূর করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে হরিজনদের মন্দির-প্রবেশের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রীসভা সেপ্টেম্বর মাসে মন্দির-প্রবেশ বিল পাশ করে এবং এই আইন ও জনসাধারণের চাপের ফলেই পান্ধারপুরের বিখ্যাত বিঠোবা মন্দির, আলান্দির ধ্যানেশ্বর মন্দির ও নাসিকের কালারাম মন্দিরের দরজা তপশিলি জাতির হিন্দুদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এটা গুরুত্বহীন কৃতিত্ব নয়, যার জন্য পনেরো বছর আগে দলিত মানুষেরা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এটা কদর্য কলঙ্ককে ধুয়েমুছে দেয় এবং নতুন যুগের আগমনকে ঘোষণা করে আবহমণ্ডলকে নির্মল ও পবিত্র করে তোলে।

এই সময় গণপরিষদ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। গুরুত্ব সহকারে লক্ষ করার বিষয় যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর তাঁর এক বক্তৃতায় স্বীকার করেন যে, যদিও প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই তপশিলি জাতিগুলির অক্ষমতা দূর করার জন্য আইন আছে, তবুও সকলেই জানেন যে, সেগুলোকে বাস্তবে মেনে চলার চেয়ে লঙ্ঘনই করা হচ্ছে বেশি।

এই সময় আম্বেদকর অধ্যাপক পি.লক্ষ্মী নারাসুর লেখা 'The Essence of Buddhism' বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তিনি মনে করেন, বৌদ্ধধর্মের উপর তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে এই বইখানিই সব থেকে ভাল। এর মূল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ও ব্যাখ্যায়ও সহজবোধ্য। তিনি নারাসুকে একজন সমাজসংস্কারক ও অতিবিপ্লবী (প্রচলিত সংস্কারের তীব্র সমালোচক) হিসাবে প্রশংসা করেন।

আম্বেদকর এবার সংবিধানের খসড়া তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে লেগে পড়েন। স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকা সত্ত্বেও পূর্ণবিশ্বাসে তিনি প্রায় একাই উন্মত্তের মতো তাঁর কর্মনিপুণতা, আন্তরিকতা ও মেধাকে কেন্দ্রীভূত করে এই কাজটি করছিলেন। তিনি কীভাবে কাজ করেছিলেন এবং কেন তাঁকে সংবিধানের প্রধান স্থপতি বলা হয়, তা বোঝা যায় ১৯৪৮ সালের ৫ নভেম্বর গণপরিষদে টি.টি. কৃষ্ণমাচারির দেওয়া একটি বক্তৃতায়। তিনি বলেছিলেন, **"সম্ভবত এই সভার স্মরণ আছে যে, আপনাদেরই**

মনোনীত সাতজন সদস্যের মধ্যে একজন কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এবং তার বদলে একজনকে নেওয়া হয়। একজন মারা যান, তার বদলে কাউকে নেওয়া হয়নি। একজন আমেরিকা চলে যান, তাঁর স্থান পূরণ করা হয়নি ও অন্য একজন সরকারি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেটুকু শূন্যতাই ছিল। একজন, কি দু'জন সদস্য দিল্লি থেকে অনেক দূরে ছিলেন এবং সম্ভবত স্বাস্থ্যের কারণে তাঁরা সভায় উপস্থিত হতে পারতেন না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সংবিধানের খসড়া তৈরি করার গুরুভার ডঃ আম্বেদকরের উপরেই এসে বর্তায় এবং এ ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নেই যে, এ কাজটি তিনি এমনভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তাই আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।" এমনকি খসড়া কমিটির কোনো কোনো সভায় শুধু আম্বেদকর ও তাঁর সেক্রেটারিই উপস্থিত থাকতেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আম্বেদকর বম্বে ফিরে আসেন। তাঁর অবস্থানকালে সিদ্ধার্থ কলেজপ্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ধোবি তালাও নৈশ বিদ্যালয়ের বাগ্মিতা-পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সভায় তিনি বক্তৃতা দেন। যথেষ্ট প্রচেষ্টায় প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বাকপটুতা বৃদ্ধি করা যায়, এ কথা বলে তিনি বালকদের মনে রেখাপাত করেন। তিনি তাদের বলেন যে, মহান বাগ্মী জি.কে. গোখেল কীভাবে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় অপ্রতিভ হয়েছিলেন, কীভাবে ফিরোজশা মেহতা ঘরে আয়না লাগিয়ে বক্তৃতা আবৃত্তি করে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। কীভাবে তাঁর প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন হয় এবং কীভাবেই বা তাঁর হাত নড়াচড়া করে, তা ওই আয়নায় তিনি দেখতে পেতেন। পোশাক ও চেহারা যাতে পরিচ্ছন্ন ও চিত্তাকর্ষক হয় সেদিকেও মেহতা যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। তিনি আরও বলেন যে, বিখ্যাত বক্তা চার্চিল কখনই প্রস্তুতি না নিয়ে বক্তৃতা দিতেন না।

দেশভাগের কারণে সৃষ্ট একটির পর একটি ভয়াবহ আঘাত আসতে শুরু করে। নেহরু স্বীকার করেন যে, অতিকষ্টে জাতিকে রক্ত ও অশ্রুসাগর অতিক্রম করতে হয়েছে। জনগণ গান্ধিবাদে গভীর অনাস্থা প্রকাশ করেন। কংগ্রেসি নেতাদেরও বিশ্বাসে ভাঙন ধরে। এক সভায় ট্যাণ্ডন ঘোষণা করেন, গান্ধির চরম অহিংস মতবাদই ভারত-ভাগের জন্য বিশালভাবে দায়ী। স্বাধীনতাসূর্য উদয়ের মাত্র চব্বিশঘণ্টা আগে মহাত্মা গান্ধির কলকাতার বাসস্থানের উপরে জনতা পাথর ছুঁড়ে মারে।

১৯৪৮ সালে ১৩ জানুয়ারি শুরু করা গান্ধির বিখ্যাত অনশন দিয়ে এই সংকটকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। যার লক্ষ্য ছিল দিল্লির মুসলিমদের তাদের বাড়িতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ও কয়েকটি মসজিদকে আগের ব্যবহারিক পর্যায় ফিরিয়ে আনা। অন্য আরও পাঁচটি কারণও ছিল। পরিণাম স্বরূপ ভারত-সরকারের উপর পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ভারত

সরকার তার তীব্র নিন্দা করে ও ওই দাবি প্রত্যখ্যান করে।

এমন এক চরম বিষাদ, বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের মধ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গড্‌সে মহাত্মা গান্ধিকে গুলিবিদ্ধ করেন।

সর্বকালের মহান ব্যক্তিদের অন্যতম ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ব আতঙ্কের সাথে প্রচণ্ড আঘাত পায়। কিন্তু কোমলে-কঠোরে অদ্ভুত সমন্বয়কারী আম্বেদকর এ ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। উপরে উল্লেখিত নির্মম ঘটনাগুলি তাঁকে মনঃপীড়া দিয়েছিল ও তাঁর মনের পুরোনো তিক্ততা তখনও প্রশমিত হয়নি। এই শোকাবহ ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ্যে তিনি একটা কথাও বলেননি, কোনো বিবৃতিও দেননি। অল্প সময়ের জন্য শবযাত্রায় যোগ দিয়ে তিনি তাঁর অধ্যয়নে চলে যান। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, গান্ধির বিশাল ব্যক্তিত্ব ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাধীন গতিপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। বলা হয় যে, তাঁর মনে ছিল তখন সিসেরোর সারগর্ভ মন্তব্য, যিনি সিজার হত্যার সংবাদে অকস্মাৎ বলে উঠেছিলেন, মুক্তি-প্রভাত এসে গেছে!

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আম্বেদকর খসড়া সংবিধান লেখা শেষ করেন এবং গণপরিষদের সভাপতির কাছে তা জমা দেন। এবার খসড়া সংবিধানকে মতামতের জন্য দেশের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আম্বেদকর তখন খসড়ার প্রস্তাবনায় 'প্রজাতন্ত্র' শব্দের পরিবর্তে 'রাষ্ট্র' শব্দ ব্যবহারের এক সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চান। এটা করার মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে, সংবিধানের মধ্যে এমন কিছু না থাকে, যা ভারত এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ও তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদ আনতে পারে। 'রাষ্ট্র' শব্দটি অনেক বেশি নিরপেক্ষ এবং আয়ারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে তা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ ভারতীয় নেতারা এবং সংবাদপত্র এ ধারণা পছন্দ করেননি।

খসড়ার কাজ সম্পূর্ণ করার পর আম্বেদকরের বিশ্রামের খুব দরকার হয়ে পড়ে। তিনি চিকিৎসার জন্য বম্বে আসেন। এবার তিনি অনুভব করেন তাঁর একজন সঙ্গীর দরকার যে বার্ধক্যে তাঁর যত্ন নেবেন। হাসপাতালে তিনি ডাক্তার কুমারী সারদা কবিরের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে আম্বেদকর তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুতর দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্য তখন অবনতির দিকে। তিনি ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে লিখেছিলেন, গত পনেরো দিন ধরে এক নিমেষের জন্যও তাঁর ঘুম ছিল না। রাতগুলো ছিল তাঁর কাছে দুঃস্বপ্ন। সবসময়ই মাঝরাতে একটা স্নায়বিক ব্যথা দেখা দিত এবং সারারাত সেটা থাকত। তখন তিনি ইনসুলিন ও হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করতেন। মনে হয় এর কোনোটাই তাঁকে স্বস্তি দিতে পারেনি। তিনি বলতেন, যা আরোগ্যের বাইরে, তা অবশ্যই তাঁকে ভোগ

করতে হবে। সুতরাং ১৯৪৭-এর আগস্টে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন "আমাদের ডাক্তারবাবুরা কী বলেন" তা জানতে।

১৯৪৮ সালে জানুয়ারি মাসে তিনি জানান যে, বিকেল চারটে থেকে তাঁর পায়ের ব্যথা শুরু হয় এবং তা সারারাত থাকে। ঠিক একমাস পরে তিনি চিত্রেকে লিখে জানান যে, তাঁর স্বাস্থ্য হঠাৎ খারাপ হয় ও আবার অবনতির মুখোমুখি হন। তিনি দু'পায়ে অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যাথায় পরপর চাররাত একটুও না ঘুমিয়ে কাটান এবং তাঁর পরিচারকেরা সারারাত জেগে তাঁর শুশ্রূষা করে। "দু'জন বিশিষ্ট চিকিৎসক দ্বারা আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আমার অবস্থার এখনই উন্নতি না হলে পায়ের এই দুর্ভোগ দীর্ঘস্থায়ী এবং দূরারোগ্য হতে পারে। আমার স্বাস্থ্যের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন ভাবে দেখাশোনা করার জন্য কাউকে এখন কাছে রাখার জন্য তোমার উপদেশ সম্পর্কে ভাবছি, যা করার জন্য আমি আগে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি ডাক্তার কবীরকে বিয়ে করতে মন স্থির করেছি। আমার কাছে তিনিই সব থেকে বেশি উপযুক্ত ভেবেছি। ঠিক বা বেঠিক যাই হোক, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।" চিত্রের যা বলার তিনি তাঁকে তা বলতে বলেন।

তাঁর প্রস্তাবিত বিয়ের সংবাদ তিনি প্রধান সহযোদ্ধা ভৌরাও গাইকোয়ারকে জানান। যদিও তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবুও এখন তিনি বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেন। তিনি একজন শিক্ষিতা মহিলা চেয়েছিলেন, যিনি রান্না জানেন এবং যিনি একজন চিকিৎসকও। যেহেতু তপশিলি জাতির মধ্যে এমন মহিলা খুঁজে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেহেতু তিনি একজন সারস্বত ব্রাহ্মণ মহিলাকে (বিয়ে করবেন বলে) নির্বাচন করেন।

তিনি চিত্রেকে গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন যে, তাঁর এক ঘনিষ্ট সহকর্মী তাঁর পুত্র যশোবন্ত ও তাঁর বাগদত্তা স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের বীজ বপন করছেন। তিনি আরও লিখেছেন, তিনি ভয় পাচ্ছেন এ বিয়ে বন্ধ হলে বৃহত্তর প্রচারের ক্ষেত্র খুলে যাবে এবং দুষ্ট লোকদের জিহ্বা নাড়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে। তিনি ঠিক করেছেন ১৯৪৮ সালের ১৫ এপ্রিল এ বিয়ে হবে, এর কোনো নড়চড় হবে না। বিয়ের অনুষ্ঠানে চিত্রের উপস্থিতি কামনা করে তিনি চিঠির উপসংহারে বলেছেনÑ "আমি যা করতে যাচ্ছি তাকে কোনো নৈতিক ভ্রষ্টাচার বলে আমি মনে করি না। কারও কোনো অভিযোগ করারও কারণ নেই; এমনকি যশোবন্তেরও (পুত্রের) নয়। আমি যশোবন্তকে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছি সেইসঙ্গে একটি বাড়িও দিয়েছি, যার দাম বর্তমানে কমপক্ষে আশি হাজার টাকা। আমি নিশ্চিত যে, আমি যা করেছি কোনো বাবাই তাঁর ছেলের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেন না।" বিবাহ ঠিকঠাক, ডাক্তার কুমারী সারদা কবীর বিমানে দিল্লি আসেন। ১৯৪৮ সালের ১৫

এপ্রিল সকালে আম্বেদকর তাঁর ছাপ্পান্ন বছর বয়সের দ্বিতীয় দিনটিতে নতুন দিল্লির ১ নং হার্ডিঞ্জ এভিনিউতে তাঁর বাসভবনে সারস্বত ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত ডাক্তার কুমারী সারদা কবীরকে বিয়ে করেন। 'সিভিল ম্যারেজেস অ্যাক্ট' অনুযায়ী দিল্লির ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক আম্বেদকরের কয়েকজন ব্যক্তিগত বন্ধুর উপস্থিতিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এই বন্ধুরাই পরে তাঁদেরকে এক মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়ন করেন। 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' এই বিয়েকে এক সাধারণ পরিবারের সঙ্গে রাজপরিবারের বিয়ে থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করে।

গত চার বছর ধরে পুত্রকে কোনো ব্যাবসার কাজে নিযুক্ত করার চিন্তাই আম্বেদকরের মনকে পীড়া দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর বন্ধু নেভাল ভাতেনার কাছে চিঠি লিখে বলেন, ছেলে ও তাঁর ভাইপোর জন্য একটি কর্মোদ্যোগের পরিকল্পনা তৈরি করে দিতে, যা তিনি তাদের পক্ষে উপযুক্ত মনে করবেন, যাতে বেঁচে থাকার উপায় হিসাবে ছেলেরা একটি সৎ পেশায় নিযুক্ত হতে পারে ও তিনি শান্তিতে মরতে পারেন। বাবা যেমন ছেলের স্বার্থ দেখেন, ঠিক সেইভাবে বিষয়টা দেখার জন্য এবং তাঁদেরকে একটি স্থায়ী ব্যাবসা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ভাতেনাকে অনুরোধ করেন। কিছু একটা ব্যাবসা শুরু করাও হয়েছিল, কিন্তু পিতা আম্বেদকরের কাছে তা চরম আশাভঙ্গে পরিণত হয়।

জাঁকজমকের সাথে যথানিয়মে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। বম্বের মুখ্যমন্ত্রী বি.জি. খের আম্বেদকরের প্রতি আবেগোচ্ছল শ্রদ্ধা জানান। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতদের অন্যতম বলে তাঁকে বর্ণনা করে তিনি বলেন, বাবাসাহেব শুধু তাঁদেরই নেতা নন, তিনি ভারতেরও নেতা। বম্বের সিউরির এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এস. কে.পাতিল শ্রোতাদের বলেন যে, আম্বেদকর একজন মহান সেবক ও এক বড়ো শক্তি; তাঁর ক্ষমতা এমনই যে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে একাই পরিচালনা করতে পারেন। বম্বে কংগ্রেসের প্রধান কর্মকর্তা আম্বেদকরকে ভবিষ্যৎ ভারতের এক মহান স্থপতি রূপে বর্ণনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যে, ভারতের এই মহান সন্তানকে যেন তিনি জাতীয় কর্ম পরিচালনার জন্য আরও পঁচিশ বছর বাঁচিয়ে রাখেন। বম্বের 'ন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা বলে যে, আম্বেদকরের সংস্কার বিষয়ে পরিকল্পনা হিন্দু-পুনর্জীবনের সকল ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য বলে এক বিরল রাজনৈতিক ধীশক্তিসম্পন্ন নেতারূপে তাঁকে বর্ণনা করে। পত্রিকাটি মন্তব্য করে যে, তিনি এমন এক যোদ্ধা, যিনি নীতির জন্য যুদ্ধ করেন, যাঁর আদর্শবাদ সামাজিক অন্যায়-অবিচার দূর করার এবং নিপীড়িতদের উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়; আইনমন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে আম্বেদকর United Provincial

Scheduled Castes Conference-এর ভাষণে বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা সামাজিক প্রগতির চাবিকাঠি। তপশিলি জাতির লোকেরা যদি নিজেদেরকে সংগঠিত করে তৃতীয় শক্তি হিসাবে ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলÑ কংগ্রেস ও সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ধরে রাখতে পারেন, তাহলেই তাঁরা মুক্তি অর্জন করতে পারেন।

তিনি বলেন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিয়েছেন, কংগ্রেস দলে নয়। কংগ্রেস দল এক জ্বলন্ত বাড়ি; যদি দু'বছরের মধ্যে এ দল ধ্বংস হয়ে যায় তাতেও তিনি আশ্চর্য হবেন না। তিনি যদি কংগ্রেসে যোগ দেনও, তাহলেও জলের মধ্যে পাথরের মতো তিনি অপরিবর্তিতই থাকবেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা যদি যোগ দেন, তাহলে মাটির ঢেলার মতো তাঁরা গলে যাবেন। সুতরাং তাঁদের সংগঠনকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি তাঁদের সাবধান করে দেন। তাঁর এ বক্তৃতা যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেয়। তিনি চিত্রেকে লেখেন, "আমার বক্তৃতায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। আমার এবং প্যাটেল ও পণ্ডিতের (পণ্ডিত নেহরু) মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলেছি যে, তাঁরা যদি অস্বস্তি বোধ করেন, তাহলে আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে যেভাবে হোক এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।" নতুন দিল্লি থেকে তিনি একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, এটা তাঁর একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং এটিকে বিকৃতভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন, কারণ, যোগদানের আমন্ত্রণ ছিল নিঃশর্ত; তিনি ভেবেছিলেন মন্ত্রীসভায় যোগ দিলে তপশিলি জাতির স্বার্থ বেশি করে রক্ষা করা যাবে এবং বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করার নীতিকে তিনি ঘৃণা করেন। কিন্তু এই আগুন ১৯৪৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। বম্বে যাওয়ার কর্মসূচি তাঁর বাতিল করতে হয়, "কারণ, এমন সব রাজনৈতিক ঘটনা সেখানে আছে, যা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এবং সরকার পতনও ঘটাতে পারে।"

আম্বেদকর এক সময় "Army in India" নামে একখানি বই লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন; বরোদার জি.এম. যাদবের সঙ্গে বিশাল আগ্রহ নিয়ে তিনি বিষয়টির উপর এবারে আলোচনা করেন। সমর-বিজ্ঞান ও ভারতের প্রতিরক্ষা সমস্যার উপর লেখা বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহ ছিল যাদবের। আম্বেদকর সমর-বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নে ইচ্ছুক ছেলেদের জন্য একটি ক্লাস চালু করতে চেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন যাদব সেই ক্লাসে শিক্ষাদান করুন। এই ধারণাটি তাঁর মনে এমন রেখাপাত করেছিল যে, সেই সন্ধিক্ষণে তিনি চিত্রেকে লিখেছেন, "আমি মনে করি সমর-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাকে কলেজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে নেওয়া উচিত। এর দ্বারা কলেজ জাতির জন্য এক মহান সেবার কাজ করবে ও তপশিলি জাতির জন্যও সেবার কাজ

করবে।" তাঁর এ ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি, তবে যাদবের কাছ থেকে তাঁর কলেজ অনেক বই কিনেছিল।

এ সময় কেন্দ্রীয় সরকার ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবির ভিত্তিতে সে বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করার জন্য একটি ভাষা-কমিশন গঠন করে। মহারাষ্ট্রের পক্ষে যাঁরা কমিশনের সামনে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেছিলেন, আম্বেদকর ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। কমিশনের কাছে পেশ করার জন্য প্রথামাফিক যত্ন ও মনোযোগ সহকারে তিনি তাঁর স্মারকলিপি তৈরি করেছিলেন।

১৯৪৮ সালের ১৪ অক্টোবর কমিশনের কাছে তিনি স্মারকলিপিটি জমা দেন; তাতে তিনি বলেন, "ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গণতন্ত্রের পক্ষে যা দরকার, তা-ই সৃষ্টি করে। যেমন, সামাজিক সমরূপতা এবং মিশ্র ভাষার প্রদেশের চেয়ে বেশি ভাল কাজ করতে পারে এমন গণতন্ত্র সৃষ্টি করে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনে বিপজ্জনক কিছু নেই। তবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের বিপদ হচ্ছে প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাকে তার অফিসিয়াল ভাষা করতে হলে।" এই শেষের পদ্ধতিটি প্রাদেশিক জাতীয়তার দিকে এগিয়ে যাবে। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে প্রাদেশিক সংস্কৃতিগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, জমাট বাঁধবে, অনুভূতিহীন ও কঠিন হবে। ফলে ভারত টুকরো টুকরো হবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার বদলে ভারতের পরিণতি ইউরোপের মতো হতে পারে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতের অফিসিয়াল ভাষার প্রশ্নে তিনি তাঁর মূল্যবান মতামত ১৯৪৭ সালের ১৯ এপ্রিল গণপরিষদে মতদ্বৈততার কার্যবিবরণীতে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য একটি মাত্র অফিসিয়াল ভাষা ব্যবহার করার পক্ষে অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গণপরিষদ অন্য রকম প্রস্তাব করে এবং তাঁর সতর্কবাণী উপেক্ষিত হয়।

আম্বেদকর একক মহারাষ্ট্র প্রদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ভাষা-কমিশনকে দেওয়া স্মারকলিপিতে মন্তব্য করেছিলেন যে, এটা যে শুধু স্থায়ীভাবে টিকে থাকার মতো একটি প্রদেশ হবে তা নয়Ñ আয়তন, জনসংখ্যা ও রাজস্ব আয়ের দিক থেকেও একটা শক্তিশালী প্রদেশ হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, "মহারাষ্ট্র ও বম্বে কেবল পরস্পরের উপর নির্ভরশীলই নয়, আসলেই তারা এক ও অবিচ্ছেদ্য। বাইবেলের ভাষায় বলা যায়, বম্বে ও মহারাষ্ট্রকে ঈশ্বর একসাথে বেঁধে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করা বিয়ের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার মতো নিরর্থক। মহারাষ্ট্রের বম্বেকে দাবি করার অধিকার সত্য বলে স্বীকার না করা অনুচিত, কারণ এটা সারাভারতেরই একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রত্যেক বন্দর, সে যে অঞ্চলেই থাকুক, তার চেয়ে অনেক বেশি অঞ্চলের সেবা করে থাকে। বাঙালিরা কলকাতায় সংখ্যালঘু এবং

সেখানকার ব্যাবসা-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মালিক তারা নয় বলে কলকাতাকে কি বঙ্গপ্রদেশ থেকে আলাদা করা যাবে? বিহারের কয়লাখনিগুলি কি বিহার প্রদেশের, না গুজরাটি, কাথিয়াওয়ারি বা ইউরোপিয়ান খনিমালিকদের? বম্বের ব্যাবসা ও শিল্প গড়ে উঠেছিল ইউরোপিয়ানদের হাতে, প্রধানত মহারাষ্ট্রের শ্রমে। মহারাষ্ট্রীয়রা কোনো অসৎ প্রবৃত্তি প্রণোদিত নয়। তারা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নয়। অন্য সম্প্রদায়গুলির মতো অর্থের প্রতি তাদের মোহ নেই এবং যারা বিশ্বাস করে শ্রেষ্ঠতম গুণাবলির মধ্যে এটি একটি যে, অর্থই তাদের ঈশ্বর নয়, আমি তাদের মধ্যে একজন। এটা তাদের সংস্কৃতিরও অঙ্গ নয়।" তিনি উপসংহারে বলেন যে, এইজন্য তারা মহারাষ্ট্রের বাইরে থেকে আসা অন্য সব সম্প্রদায়কে মহারাষ্ট্রের ব্যাবসা ও শিল্পের একচেটিয়া অধিকার করে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

ওই মাসেই আম্বেদকরের বিখ্যাত বই "The Untouchables" প্রকাশিত হয়। বিশাল পাণ্ডিত্য ও জোরের সাথে লেখক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অস্পৃশ্যরা হচ্ছেন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী এবং ওইসব গরিব মানুষেরা গোমাংস ভক্ষণ ও বৌদ্ধধর্মকে ত্যাগ করতে পারেননি বলে তাঁরা অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হয়েছেন। তিনি অনুসন্ধান করে জেনেছেন, মোটামুটি ৪০০ খ্রিস্টাব্দই অস্পৃশ্যতার সূচনাকাল। তিনি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের বলে প্রমাণ করেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের ফলেই অস্পৃশ্যতার উৎপত্তি। তিনি তাঁর পাঠকদের বলেন যে, ব্রাহ্মণরা গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করে এবং বৌদ্ধধর্মের উত্থানের ফলে যে সম্মান-প্রতিপত্তি তাঁরা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁরা বৌদ্ধ জীবনযাপনের পথ অবলম্বন করতে শুরু করেছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে কর্নেল আলকট তাঁর "The poor Pariah" নামক বইয়ে এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর "Modern Buddhism and Its Followers in Orissa" বইয়ে কয়েক বছর আগে এই মতবাদটি উপস্থাপন করেছেন যে, অস্পৃশ্যরা বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁরা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন।

তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই এই বই প্রমাণ করে যে, ডঃ জনসনের মতো আম্বেদকরও ভাষাশক্তি, চিন্তাশক্তি এবং শক্তিশালী লেখনীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখায় সারল্যের এক স্বতন্ত্র সৌরভ ও দ্ব্যর্থহীনতা ছিল। তাঁর রচনাশৈলী তীক্ষ্ণ, যুক্তিসিদ্ধ ও বিচারসম্মত এবং প্রায়ই এর গঠনরীতির আড়ালে আইনি চতুরতাকে লুকিয়ে রেখে উন্নীত করেছে সংযত, প্রবল আবেগপূর্ণ বাকপটুতায়। তাঁর রচনাশৈলী সরস বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যোক্তি, উদ্দীপনাদায়ক বাগ্‌ধারা ও ছবির মতো প্রকাশভঙ্গিমায় প্রাচুর্যময়।

আম্বেদকরের জ্ঞান বিশাল, বিচিত্র, অগাধ ও সর্ববিদ্যাবিষয়ক। তাঁর পাণ্ডিত্য

শিক্ষাদায়ক এবং ভাবনা চিন্তাভাবনা করতে উদ্দীপ্ত করে। তিনি লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য লিখেছেন। তিনি শব্দ চয়ন করতেন শিল্পী হিসাবে নয়, একজন যোদ্ধা হিসাবে। সাহিত্য খ্যাতির জন্য তিনি বই লেখেননি, লিখেছেন মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এ কারণেই অনেক সমালোচকের মতে, একজন ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর রচনা রূঢ়তার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে। সেবাব্রতী আম্বেদকর ঐতিহাসিক আম্বেদকরের উপর কর্তৃত্ব করেছেন। তিনি শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তিকে খণ্ডন করেই সন্তুষ্ট হতেন না, প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুক্তিজালে বিদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত করতেন, যতক্ষণ না সে মূর্ছা যেত। এটা ছিল অনিবার্য। কারণ, ব্যবচ্ছেদের সাথে সর্বদাই রক্তপাতের সম্পর্ক। সমালোচকরা বলেন, তাঁর তত্ত্ব অভিনব, কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদক।

খসড়া সংবিধান জনতার দরবারে ছ'মাস ছিল। অবশেষে আম্বেদকর ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশ করেন। সংবিধানে ৩১৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি তপশিল ছিল। খসড়াটিকে দুর্দান্ত দলিল হিসাবে বর্ণনা করে তিনি এক চমৎকার, প্রাঞ্জল ও বিস্তারিত ভাষণে এর প্রধান এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন। সমস্ত সভা তখন তাঁর কথা একাগ্র মনে শুনছিল। অনুচ্ছেদগুলি সম্পর্কে ভুল ধারণা বা অপর্যাপ্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত সমালোচনা হয়েছিল, সেগুলি সবই তিনি খণ্ডন করেন।

খসড়া সংবিধানে যে সরকারের কথা বলা হয়েছে, প্রথমেই সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "আমেরিকার সরকারকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential System of Government)। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রধান। খসড়া সংবিধান অনুযায়ী ইংলিশ সংবিধানে রাজার যে স্থান, রাষ্ট্রপতি সেই স্থান অধিকার করবেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রধান নন। তিনি জাতির প্রতিনিধি, তবে জাতিকে (তিনি) শাসন করবেন না।"

নির্বাহী কর্মকর্তা (Executive) সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "আমেরিকার Executive Body হচ্ছে অসংসদীয় Executive Body। অর্থাৎ কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কিন্তু ব্রিটিশ পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় Executive Body, যা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল। অসংসদীয় Executive Body হওয়ার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস Executive Body-কে অস্বীকার করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আইন-পরিষদে Executive Body-র দায়বদ্ধতা হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু সংসদীয় Executive Body আইনসভার কাছে বেশি দায়বদ্ধ থাকে। এই অধিকতর দায়বদ্ধতাই খসড়া সংবিধান শ্রেয় মনে করে।

খসড়া সংবিধানের অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে নির্দেশ করে আম্বেদকর বলেন, "যদিও খসড়া সংবিধান একটা দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা, তথাপি সমগ্র ভারতের জন্য এক-নাগরিকত্বের ব্যবস্থা ও একটি মাত্র সংহতিপূর্ণ বিচার বিভাগ আছে। সাংবিধানিক, নাগরিক ও ফৌজদারি আইনের অধীনে উদ্ভূত সকল সমস্যার প্রতিবিধানের আইনগত অধিকার থাকবে এই বিচার বিভাগের। সেইসঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে নাগরিকদের জন্য চাকরির ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আছে দ্বৈত-নাগরিকত্বের ব্যবস্থাÑ একটি হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব, আর একটি হচ্ছে রাজ্যের নাগরিকত্ব। তার মধ্যে আছে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা ও একটি রাজ্য বিচার ব্যবস্থা; আর আছে যুক্তরাষ্ট্রীয় অসামরিক চাকরি ও রাজ্য অসামরিক চাকরির ব্যবস্থা।" আম্বেদকর বলেন, "প্রজাতান্ত্রিক সরকার অক্ষুণ্ণ রাখতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি রাজ্য তার নিজস্ব সংবিধান তৈরি করার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও তার রাজ্যগুলির জন্য সংবিধানের একটিই মাত্র পরিকাঠামো, যার ভিতর থেকে তারা কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না, তার মধ্যে থেকেই তাদের কাজ করতে হবে।" কঠোরতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা প্রশমিত করার জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় সংসদকে পুরোপুরি প্রাদেশিক বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং তাকে সংবিধান সংশোধন করার সুযোগও দেওয়া হবে। তিনি বলেন, "সুতরাং এর (সংবিধানের) স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল এটি এক নমনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।"

সংবিধানে নতুন কিছু নেইÑ এই অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন, "প্রথম সংবিধানের খসড়া যখন লিখিত হয়, তখন থেকে একশো বছরেরও বেশি সময় চলে গেছে। অনেক দেশ তা অনুসরণ করে তাদের সংবিধান লিপিবদ্ধ করেছে। সংবিধানের সুযোগ কতটা হবে সে মীমাংসা অনেক আগেই হয়েছে। একইভাবে, সংবিধানের মূলসূত্রাবলি কী হবে সমস্ত পৃথিবীতে তাও চেনা হয়ে গেছে। এ ছাড়া প্রধান নিয়মগুলির ব্যাপারে সব সংবিধান দেখতে একই রকম। এত দেরিতে তৈরি কোনো সংবিধানে যদি নতুন কিছু থেকে থাকে, তা হচ্ছে তার দোষগুলি দূর করতে ও দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে কিছু ভিন্নতা তৈরি করা। এই সংবিধানে ১৯৩৫ সালের Government of India Act-এর অনুবিধির একটা বড়ো অংশ নেওয়াটাকে আমি কোনো ভুল মনে করিনি। এই ধার করায় লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। এখানে লেখা চুরির ব্যাপারটা আসে না। কোনো সংবিধানের মৌলিক ভাবনায় কেউ সত্ত্বাধিকার ধারণ করে না।"

গ্রামীন সরকারের জন্য প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আম্বেদকর বলেন যে, গ্রাম এখন অশুভ তৎপরতার জায়গা। অজ্ঞতা, সংকীর্ণ মানসিকতা ও

সাম্প্রদায়িকতার আখড়া এবং গ্রামের সামাজিক শাসনব্যবস্থা ভারতের সর্বনাশ করেছে। তিনি বলেন, তিনি আনন্দিত যে, খসড়া সংবিধান একক হিসাবে গ্রামকে বাতিল করে ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছে।

উপসংহারে তিনি বলেন, "আমি মনে করি যে, এই সংবিধান কর্মক্ষমযোগ্য; এটি নমনীয় এবং শান্তি ও যুদ্ধ, উভয় সময়ে দেশকে একতাবদ্ধ রাখার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। বস্তুত, আমি বলতে পারি, এই নতুন সংবিধান অনুযায়ী যদি কারও কাজে ভুল হয়, তার কারণ এই নয় যে, আমাদের সংবিধান খারাপ। আমাদের বলতে হবে যে, (যার উপর এই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব পড়েছে) সেই লোকটিই খারাপ। স্যার, (এই খসড়া সংবিধান) আমি (সভায়) পেশ করছি।"

এই চমৎকার ধারাভাষ্যে গোটা গণপরিষদ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং একের পর এক বক্তা আম্বেদকরকে তাঁর সহজবোধ্য, ধীশক্তিসম্পন্ন ও সুষম বক্তৃতা এবং সংবিধান সম্পর্কে চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানান। অধ্যাপক কে.টি. সাহা, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ও খসড়া কমিটির সদস্য টি.টি. কৃষ্ণমাচারি তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেন। ডঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ সংবিধানের উপরে আম্বেদকরের চমৎকার কৃতিত্ব ও চিত্তাকর্ষক ধারাভাষ্যের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, আম্বেদকর সুযোগ পেলে সংবিধানের পরিকাঠামো ভিন্নভাবে রূপ দিতে পারতেন।

কাজি সৈয়দ কামরুদ্দিন সংবিধানের প্রস্তাবনার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, তিনি নিশ্চিত যে, ভবিষ্যৎ উত্তরপুরুষ একজন মহান সংবিধান প্রণেতারূপে আম্বেদকরকে স্মরণ করবে।

এরপর সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলি নিয়ে আলোচনা হয় ও একের পর এক গৃহীত হয়। অস্পৃশ্যতার অবসান ঘোষণা করে ১৯৪৮ সালের ২৯ নভেম্বর সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদটি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হয়।

১৯৪৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর আম্বেদকর বম্বে ফিরে তপশিলি জাতি ফেডারেশনের কর্মী ও নেতৃবর্গের এক সভায় বক্তৃতা দেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি মানমাড়ে তাঁকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়। সেই সময় বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর লোকেরাই কৃষক ও শ্রমিক আইনের আওতায় এদেশে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের মনে দাগ কাটেন এই বলে যে, একটি সম্প্রদায়ের উন্নতি সব সময়ই নির্ভর করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগতির উপর। এরপর আম্বেদকর তাঁর প্রস্তাবিত ঔরঙ্গাবাদে কলেজ শুরু করার ব্যাপারে কয়েকদিন হায়দারাবাদে কাটান। সেখানে থাকাকালে তিনি পার্শ্ববতী জায়গাগুলির খননকার্য ঘুরে দেখেন এবং জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে দলের এক সভায় যোগ দিয়ে

দিল্লি ফিরে যান। ১৯৪৯ সালের মার্চ এবং মে মাসে তিনি দু'বার বম্বে যান। তাঁর এই ঘন ঘন বম্বে যাতায়াতের কারণ ছিল People's Education Society-র কাজকর্ম দেখা ও চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া।

২৬ মে গণপরিষদ পুনরায় কাজ শুরু করে এবং ১০ জুন মুলতুবি হয়। ৭ জুলাই আম্বেদকর বম্বে ফিরে যান। ইতিমধ্যে বম্বে মিউনিসিপ্যাল কামগড় সংঘ যে ধর্মঘট শুরু করেছিল, তা এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছায়। ওই সংঘের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় আম্বেদকর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়েন। জানা যায়, মাননীয় ডঃ আম্বেদকর বিতর্ক মেটানোর জন্য যখন বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে একটি চরমপত্র দেওয়া হয়েছিলÑ হয় তাঁকে মিউনসিপ্যাল কামগড় সংঘের সভাপতির পদ ছাড়তে হবে, নয়তো মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। মাননীয় ডঃ আম্বেদকরকে (তখন) মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ না করার জন্য বোঝাতে হয়েছিল, কারণ ভারতের তপশিলি জাতির সাধারণ স্বার্থের জন্য তাঁর ওই পদটিতে থাকা অনেক বেশি মঙ্গলজনক।

জাতীয় ভাষার প্রশ্নে সে সময় এক গুরুতর লড়াই বাধে এবং নাগরি অক্ষরে হিন্দি ভাষাকেই মাত্র একটি ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আম্বেদকরকে গণপরিষদে বহু জটিল বিষয় ও আইনের সূক্ষ্মতা নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। কেন্দ্রের ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, এর শক্তিকে অবশ্যই এর গুরুত্বের সঙ্গে যথোপযুক্ত হতে হবে। বোকামি হবে যদি তাকে এমন শক্তিশালী করা হয় যে, যার ফলে সে নিজেই নিজের ভারে পড়ে যেতে পারে।

তিনি ৩২ নং অনুচ্ছেদ, যেটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে পার্লামেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করে, তাকে সংবিধানের মূল আত্মা ও তার অন্তঃকরণ বলে বর্ণনা করেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি বলেন, "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সাধারণত তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য। তাঁদের পরামর্শ বিরুদ্ধ কোনো কিছু যেমন তিনি করতে পারেন না, তেমনি তাঁদের পরামর্শ ছাড়াও কিছু করতে পারেন না।" তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতির ইচ্ছামতো করার কিছু নেই; তবে তাঁর কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকবে।

সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (R.S.S.) প্রধান এম.এস. গোলওয়ালকর তাঁর সঙ্গে নতুন দিল্লিতে দেখা করেন। এই অধিবেশনে গণপরিষদ সংবিধানের দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত করে। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আম্বেদকর কঠোর পরিশ্রম করেছেন,

বলতে গেলে প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ উপস্থাপিত করেছেন, সমস্ত বিষয় বিচারবিশ্লেষণ করেছেন ও সমস্ত বিতর্কের জবাব দিয়েছেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আম্বেদকর ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য বম্বে ফিরে আসেন এবং ১০ নভেম্বর আবার তিনি দিল্লি রওনা হন। ১৪ নভেম্বর গণপরিষদ সংবিধানের তৃতীয় পাঠ আরম্ভ করে। ওইদিন আম্বেদকর প্রস্তাব দিয়ে বলেন, "পরিষদে স্থিরীকৃত সংবিধান এখন পাশ করা হোক।" সদস্যবৃন্দ তাঁর বক্তৃতা শোনার আশায় তাঁকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু আম্বেদকর সিদ্ধান্ত নিলেন অন্যান্য সদস্যরাই আগে তাঁদের বক্তব্য রাখুন। মুনিস্বামী পিল্লাই বলেন যে, তাঁর হরিজন সম্প্রদায় একজন নান্দনার (মহান ভক্ত), একজন তিরুপানালওয়ার (বৈষ্ণব সন্ত) ও একজন তিরুভাল্লুভার (দার্শনিক)-এর জন্ম দিয়েছে এবং এবারে জন্ম দিয়েছে আম্বেদকরকে, যিনি বিশ্বকে দেখিয়েছেন, তপশিলি জাতির লোকেরাও উচ্চতায় উঠতে পারে এবং তাঁরাও বিশ্বের সেবা করতে সক্ষম। সংবিধান রচনা ও তার জন্য সদস্যরা তাঁকে যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তার জন্য ডেপুটি স্পিকার আম্বেদকরকে অভিনন্দিত করেন। আম্বেদকর এখন কংগ্রেসিদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব তাই তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান করে সমগ্র জাতির নেতা হতে আহ্বান জানান।

এরূপ সংবিধানে সব সদস্যই যে সন্তুষ্ট ছিলেন তা নয়, কয়েকটি বিরোধী স্বরও ছিল। একজন সদস্য বলেন যে, এ সংবিধান মূল্যহীন, কারণ এতে প্রদেশগুলিকে পৌরসভায় পরিণত করা হয়েছে। আর একজন সদস্য দুঃখ করে বলেন যে, গান্ধি যে বিকেন্দ্রীকরণকে পছন্দ করেন, সংবিধানপ্রণেতা তা বাতিল করে দিয়েছেন। তৃতীয় আর একজন দুঃখিত হন এই কারণে যে, গোহত্যা বন্ধের কোনো সংস্থানই এই সংবিধানে নেই। কয়েকজন এটাকে পৃথিবীর সংবিধানগুলির এক মিশ্ররূপ বলে বর্ণনা করে বলেন, এটা আইন ব্যবসায়ীদের এক স্বর্গোদ্যান। তারা আরও বলেন, যদিও এটা একটি চমৎকার দলিল, তবুও এটা গান্ধির সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শগুলিকে বাস্তবায়িত করেনি। এসব যুক্তি আম্বেদকর আগেই প্রতিহত করে তাঁর সূচনা বক্তৃতায় খণ্ডনও করেছেন।

এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ছিল। খসড়া কমিটির সদস্য এম. সাদুল্লা জানিয়েছিলেন যে, খসড়া কমিটি কোনো স্বাধীন প্রতিনিধিসভা ছিল না; পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার দ্বারা সে বাধাপ্রাপ্ত ছিল। তিনি বলেছিলেন, কমিটিকে গণতান্ত্রিক চেতনাবিরোধী অনেক নিয়মকানুনই এর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে, কারণ এর পিছনে চালনা করার জন্য উচ্চতর প্রভাবশালী অনেক শক্তি ছিল।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর সংবিধানের প্রধান রূপকার তুমুল হর্ষধ্বনির সাথে

সংবিধানের তৃতীয় পাঠে বিতর্কের উত্তর দিতে উঠে দাঁড়ান। শুরুতেই আম্বেদকর পরিষদসভায় বলেন যে, তিনি গণপরিষদে যোগ দিয়েছিলেন তপশিলি জাতির অধিকার সুরক্ষার জন্য। গণপরিষদ তাঁকে খসড়া কমিটির সদস্য নির্বাচন করায় তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি আরও বেশি অবাক হয়েছিলেন খসড়া কমিটি যখন তাঁকে তার চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচন করে। সুতরাং আত্মবিশ্বাসের সাথে তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করার জন্য ও তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করে দেশের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি গণপরিষদ ও খসড়া কমিটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি সহযোগিতা করার জন্য স্যার বি.এন. রাও, সেক্রেটারিয়াল স্টাফ ও যারা আনন্দোচ্ছল আগ্রহ দেখিয়েছেন Ñ সেই এইচ.ভি. কামাথ, ডঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ, সাকসেনা, কে.টি. শাহ, পণ্ডিত ঠাকুর দাস, আর.কে. সিদ্ধা ও এইচ.এন. কুঞ্জরুরের যারপরনাই প্রশংসা করেন।

সংবিধানের উৎকর্ষ সম্পর্কে তিনি বলেন, যেসব নীতিনিয়ম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা বর্তমান প্রজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে, অথবা এটা যদি অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে, তাহলেও এগুলি পরিষদসভার সদস্যদের অভিমত। তিনি বলেন, একটি সংবিধান যতই ভাল হোক না কেন, তাকে কার্যকরী করার জন্য যাঁদের উপর এ দায়িত্ব বর্তাবে তাঁরা যদি সবাই খারাপ হন, তবে তাও খারাপ হবে। আবার যদি তাঁরা সবাই ভাল হন, তাহলে এটাই ভাল হবে।

দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "যে বিষয়টা ভীষণভাবে আমাকে ভাবিয়ে তুলছে, তা হল ভারত যে একবারই স্বাধীনতা হারিয়েছিল তা নয়, সে তা আগেও হারিয়েছিল তারই আপন লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ফলে। মহম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধু আক্রমণ করে, তখন রাজা দাহিরের সৈন্যাধ্যক্ষরা মহম্মদ বিন কাসিমের এজেন্টরদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তাঁদের রাজার পক্ষে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। ভারত আক্রমণ ও পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জয়চাঁদ মহম্মদ ঘোরিকে ডেকে এনেছিলেন এবং নিজে তাঁকে সাহায্য করবেন ও সোলাঙ্কি রাজাদের সাহায্যও তাঁকে পাইয়ে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। শিবাজি যখন হিন্দুদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং রাজপুত রাজন্যবর্গ মোগল সম্রাটদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশরা যখন শিখ-শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তখন তাঁদের প্রধান সেনাপতি চুপচাপ বসে ছিলেন, শিখ-রাজত্বকে রক্ষা করাতে কোনো সাহায্যই করেননি তিনি। ১৮৫৭ সালে ভারতের একটা বড়ো অংশ যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা করে, শিখেরা তখন নীরবদর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে গেছেন।"

"ইতিহাসের কি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে?" Ñ পরিষদসভাকে প্রশ্ন করেন তিনি।

তাঁর উদ্বেগ আরও বেড়েছে জাতপাত ও ধর্মীয় মতবাদ আকারে তাঁদের পুরোনো শত্রুদের সাথে যুক্ত হয়েছে আরও বিভিন্ন বিরোধী মতাদর্শের অনেক রাজনৈতিক দল। সুতরাং তিনি ভারতের জনগণের কাছে জোরালো সুপারিশ করে বলেন, দলগুলির ধর্মীয় মতাদর্শের ঘটনাসমূহকে দেশের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা যেন দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সতর্ক থাকেন। অন্যথায় "আমাদের স্বাধীনতা দ্বিতীয়বার বিপদে পড়বে এবং সম্ভবত চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য দৃঢ়সংকল্প নিতে হবে।" (করতালি)

এরপর তিনি গণতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখার উপায় সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, প্রথমে অবশ্যই সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তু অর্জন করার জন্য তাঁদের দৃঢ়তার সাথে সাংবিধানিক পন্থা ধরে রাখতে হবে, আর আইন-অমান্য, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, ওইসব পন্থা বিশৃঙ্খলার ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি বলেন, আর এক বিপদ আসে 'বীরপূজা' থেকে। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের উদ্ধৃতি দেন, যিনি গণতন্ত্রের রক্ষকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের স্বাধীনতাকে এমনকি একজন মহান ব্যক্তির পায়েও সঁপে না দেন, বা ক্ষমতা নিয়ে তাঁকে বিশ্বাস না করেন। কারণ তা তাঁদের প্রতিষ্ঠানকেই উৎখাত করতে তাঁকে ক্ষমতা দেবে। দেশে বহুল প্রচলিত যুক্তিহীন অন্ধ 'বীরপূজা'র ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সাবধান করে তিনি মন্তব্য করেন, "যেসব মহান ব্যক্তি জীবনভর দেশের সেবা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াতে কোনো দোষ নেই; কিন্তু কৃতজ্ঞতাবোধেরও একটা সীমা আছে। আইরিশ দেশপ্রেমিক ড্যানিয়েল ও' কনেল সঠিকভাবে বলেছেন, 'কোনো পুরুষ তার সম্মানের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকতে পারে না; কোনো নারী তার সতীত্বের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকতে পারেনা এবং কোনো জাতিও তার স্বাধীনতার বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকতে পারে না।' এই সতর্কীকরণ অন্য কোনো দেশের চেয়ে ভারতের জন্যই বেশি প্রয়োজনীয়। কারণ, ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে ভক্তি যে ভূমিকা পালন করে, তা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশে তার ভূমিকা থেকে অনেক বড়ো। ভক্তি আত্মার মোক্ষলাভের একটি পথ হতে পারে; কিন্তু রাজনীতিতে ভক্তি বা 'বীরপূজা' অধঃপাত ও পরিণামে একনায়কতন্ত্রের নিশ্চিত পথ।"

তিনি বলেন, তৃতীয় কাজটি হল, ভারতীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে অবশ্যই যা করতে হবে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিয়েই তাঁদের তৃপ্ত থাকলে চলবে না, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে পরিণত করতে হবে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে যদি সামাজিক গণতন্ত্র না থাকে, যা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে জীবনের নীতিরূপে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তা

টিকে থাকতে পারে না। এই নীতিগুলিই গঠন করে এক অবিচ্ছেদ্য ত্রয়ী। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠের আধিপত্য তৈরি করে। স্বাধীনতা ছাড়া সাম্য ব্যক্তিগত পদক্ষেপকে ধ্বংস করে। ভ্রাতৃত্ব ছাড়া স্বাধীনতা ও সাম্য কখনও স্বাভাবিক গতিতে চলে না। তিনি আরও বলেন, এ সত্য তাঁদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতীয় সমাজে দু'টো জিনিস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত Ñ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমতা।

এক গুরুতর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আম্বেদকর বিশাল উৎসাহ নিয়ে বলেন, "১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমরা এক অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা সাম্য লাভ করব ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের থাকবে অসাম্য ...। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অসঙ্গতিকে আমাদের অবশ্যই দূর করতে হবে; অন্যথায় যাঁরা অসাম্যে ভুগছেন, তাঁরা গণপরিষদ এত পরিশ্রম করে যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে, সেটাকেই বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবেন।"

সবশেষে জাতব্যবস্থা সামাজিক জীবনে যে বিভেদ এনেছে ও জাতিতে জাতিতে যে ঈর্ষাপরায়ণতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে, তা ধ্বংস করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক জাতিতে পরিণত হতে ভারতীয়দের কাছে তিনি আবেদন জানান।

চল্লিশ মিনিট ধরে তাঁর এই প্রাঞ্জল, বাকপটু, ভবিষ্যৎসূচক বক্তৃতা সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনেন; শুধু মাঝে মাঝে প্রশংসাধ্বনিতে বক্তৃতাটি বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরে সভার সদস্যগণ একে ভারতে প্রচলিত রাজনৈতিক অবস্থার এক চিত্রিত বাস্তবধর্মী মূল্যায়ন হিসাবে বর্ণনা করেন। পরদিন সংবাদপত্রগুলি ভীষণ আনন্দ ও গর্বের সাথে তাঁর এই ভাষণ প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও সতর্কবাণীর উচ্চপ্রশংসা করে।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর ভারতের জনগণের নামে ৩৯৫ টি অনুচ্ছেদ ও ৮ টি তপশিলসহ এই সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, "সভাপতির আসনে বসে এবং দিনের পর দিন কর্মধারা পর্যবেক্ষণ করে অন্য কেউ না করলেও আমি উপলব্ধি করেছি, কী সতেজতা ও উদ্দীপনা এবং অনুরক্তি সহকারে খসড়া কমিটির সদস্যগণ, বিশেষ করে তার চেয়ারম্যান ডঃ আম্বেদকর অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ করেছেন। (হর্ষধ্বনি) আমরা কখনই এতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না, যা তাঁকে খসড়া কমিটিতে নিয়ে ও তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে নিতে পেরেছি। তিনি তাঁর এই নির্বাচনকে শুধু যে উপযুক্ত প্রমাণ করেছেন তা-ই নয়, তিনি যে কাজ করেছেন সেই কাজের উজ্জ্বলতাও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।"

গণপরিষদ বিপুল প্রচেষ্টায় দু'বছর এগারো মাস সতেরো দিন ধরে কাজ করে।

খসড়া সংবিধানের উপর ৭,৬০০ টিরও বেশি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়; তার মধ্যে ২,৪৭৩ টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ও মীমাংসা হয়।

গান্ধি-মতাদর্শের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা উপালির সঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের তুলনা করে, যাকে বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণের' তিনমাস পর অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ-অধিবেশনে "বিনয়" আবৃত্তি করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল।

সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছেÑ সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে জনসাধারণের হাতে এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা বহন করে সংসদ। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হচ্ছেÑ আমাদের আদর্শ সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র; এবং কে.সি. হোয়েয়্যার তাঁর 'Modern Costitution' বইয়ে একটি মন্তব্য করে বলেছেন, সংশোধনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান একটি চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মের ছায়া

গণপরিষদে বিশাল সাফল্য লাভের পর আম্বেদকর ১৯৫০ সালের ২ জানুয়ারি বিমানযোগে বম্বে ফিরে আসেন। তাঁর সহযোদ্ধাগণ ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বিমানবন্দরে তাঁকে বিপুলভাবে সম্ভাষণ জানান।

সংবিধান সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আম্বেদকর এবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এক নতুন রণহুংকার। এটা ছিল 'হিন্দু কোড বিল', যেটাকে তিনি নতুন করে সংশোধন করেন এবং ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদে (আইনসভা) পেশ করেন। হিন্দু আইন সংশোধন ও তা সঙ্কলন করার কাজ চলছিল গত দশ বছর ধরে। ভারত সরকার ১৯৪১ সালে স্যার বি.এন. রাওকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি সারাদেশ ঘুরে অনেক মতামত নিয়ে হিন্দু কোড বিলের খসড়া তৈরি করে। এই বিল ১৯৪৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার বিচার্য ছিল। আম্বেদকর এটির রূপান্তর ঘটান, ফলে (কোড বিলের) যৌথপরিবার ও মহিলাদের সম্পত্তি সম্পর্কিত অংশগুলি সিলেক্ট কমিটির বেশির ভাগ সদস্যের কাছে এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিক্রিয়াশীল বিরুদ্ধবাদীদের উপরে এটা এক বিশাল আঘাত করে।

আম্বেদকর যখন কোড বিলে হাত দেন ও তার প্রবক্তা হন, অমনি সমগ্র ভারতের বুদ্ধিজীবীমহল প্রকাশ্যে জোরদার নিন্দা করা এবং জোরদার প্রশংসা করা Ñ এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। মতভেদ ঘটে পরম্পরার সাথে আধুনিকতার, সামাজিক প্রগতি চলে যায় ধর্মধ্বজীদের মুঠোয় এবং বৈপ্লবিক বিচারবুদ্ধির বদলে পাণ্ডিত্য মিশে যায় ধুলোয়। উভয় দিকেই শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এক দিকে মনু; অন্যদিক আম্বেদকর। যাঁরা পরিবর্তনকে পছন্দ করেন না, তাঁরা বিভিন্ন যুক্তিতে কোডের বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়ে বলেন, কোডের ব্যাপারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরে বিবেচনা করা হবে। কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠে বলেন, যুক্ত এলাকার জনসাধারণের সামনে এটাকে উপস্থাপিত করতে হবে এবং অন্যরা আর্ত চিৎকার করে বলেন, এ হচ্ছে হিন্দুরীতি ও পরম্পরার সম্পূর্ণ রদকরণ। কেউ কেউ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের প্রতিও আঙুল তোলেন।

১৯৫০ সালের ১১ জানুয়ারি আম্বেদকর বম্বের সিদ্ধার্থ কলেজ পার্লামেন্টের দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার সময়েই লড়াই শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, হিন্দু কোড বিলকে প্রগতিবাদী অথবা বৈপ্লবিক বলে বর্ণনা করলে ভুল করা হবে। তিনি বলেন যে, বিলটি অগ্রগতির নতুন পন্থাকে অনুমোদন করলেও সাধারণ্যে

গৃহীত দেশাচারের বিরোধিতা করেনি। ভারতের নতুন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, সারাদেশের মঙ্গলের জন্য সরকারকে একটি সিভিল কোড তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। হিন্দু কোড বিল আসলে হিন্দু-আইনের কেবলমাত্র কয়েকটি শাখাকে সংকলন করা ও সংশোধন করে নেওয়া। এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় তিনি বলেন, দেশের একতার পক্ষে হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন একই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করাটাই মঙ্গলজনক। হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণে বাধা দেওয়ার পক্ষে হিন্দুরা দুর্বল বলে হিন্দু-আইন সংশোধন করা হচ্ছে না, করা হচ্ছে সমতার জন্য। হিন্দু কোড নাগরিক আইনের দিকে এক সঠিক পদক্ষেপ। আইন হওয়া উচিত সহজবোধ্য এবং আঞ্চলিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে সকল সমাজে তার প্রয়োগ হওয়া উচিত। তা ছাড়া, একজন হিন্দু হিন্দুসমাজের যে কেউকে দত্তক নিতে পারে এবং তার কন্যার উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে তার সম্পত্তি উইল করে দিতে পারে।

খসড়া তৈরি করার প্রামাণ্যতা সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত সংশোধন হিন্দুশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সম্পত্তি দায়ভাগ প্রথায় পরিচালিত হবে। 'পিতৃসবর্ণ্য' নিয়মে সন্তান তার পিতার জাতির পরিচয় পাবে। বিবাহবিচ্ছেদ কৌটিল্য ও পরাশর স্মৃতির সমর্থনে হবে এবং স্ত্রীলোকের সম্পত্তিতে অধিকার হবে বৃহস্পতি স্মৃতির সমর্থনে।

১৯৫০সালের ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বম্বের প্যারেলে বম্বের তপশিলি জাতি ফেডারেশন কর্তৃক আহূত এক সভায় আম্বেদকরকে ভারতীয় সংবিধানের কপিসহ একটি সোনার ক্যাস্কেট উপহার দেওয়া হয়। আম্বেদকর তাঁর জবাবি ভাষণে বলেন যে, তপশিলি জাতিগুলির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গণপরিষদে আসেন, সংবিধানের খসড়া তৈরি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়। যাই হোক, যদিও কতকগুলি পরিস্থিতিতে সংবিধানের খসড়া তৈরির দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তিনি বলেন, তাঁর নাম যে সংবিধান-রচয়িতাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এজন্য তিনি গর্বিত; কারণ, কেউ তাঁর জীবনকালে এই অদ্বিতীয় সুযোগ একবারই মাত্র পেতে পারেন।

তিনি বলেন, তিনি গত বিশ বছর ধরে মুসলিম ও ব্রিটিশ সমর্থক নেতা হিসাবে নিন্দিত হচ্ছেন। এবার তিনি আশা করেন, ভারতের সংবিধানের জন্য তাঁর কাজে হিন্দুদের তাঁকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং তাঁর প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া অভিযোগ যে চরম মিথ্যা তাও দেখিয়ে দেবে।

আশায় উদ্দীপ্ত আম্বেদকর তাঁর লোকদের সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করে সমগ্র জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবতে বলেন। তিনি বলেন, এতদিন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ভাবনা তাঁদের ছিল না, কিন্তু এখন সময় এসেছে সমগ্র জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের চিন্তাভাবনা করার। সুতরাং তিনি তাঁর লোকদের তাঁদের

স্বতন্ত্র সত্তা বজায় না রাখার কথা ও দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহানুভূতি জয় করে নেওয়ার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এই বিশাল জনসভাই প্রমাণ করছে যে, তাঁর পায়ের নিচের মাটি সরে যাওয়ার অভিযোগ ভুল, বরং তাঁর মাটি আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়েছে।

২৯ জানুয়ারি নতুন দিল্লির মারাঠি প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারাও আম্বেদকর সম্মানিত হন। তিনি অভিভাষণের উত্তরে বলেন, মারাঠিরা জাতির প্রতি কর্তব্যে বেশি আন্তরিক, বেশি সচেতন এবং নিরন্তর তাঁরা জাতির জন্য ত্যাগস্বীকার করতে তৈরি। তিনি গর্বিত যে, দু'জন মারাঠি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আছেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরও একজন মারাঠি। রাজনীতিতে, পাণ্ডিত্যে ও ত্যাগস্বীকারে মারাঠিরা অনেক এগিয়ে।

আম্বেদকর এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। স্বাভাবিকভাবেই এপ্রিল মাসে সমস্ত দেশব্যাপী তাঁর জন্মদিন পালিত হয় এবং এই অনুষ্ঠানগুলিতে বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চাগলার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকেন। বম্বের নঙ্গাঁওয়ে এক জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে বিচারপতি চাগলা বলেন, ভারতের প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার ভোগ করতে গিয়ে কৃতজ্ঞার সাথে আম্বেদকরের নাম স্মরণ করবে। তিনি বলেন যে, তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন শুধুমাত্র আম্বেদকর তপশিলি জাতির নেতা বলে নয়; তিনি তাঁকে সমগ্র জাতির নেতা মনে করেন বলেই। ভারতের বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় বিচারপতি গর্বের সাথে স্মরণ করেন Ñ আম্বেদকর ও তিনি কীভাবে লণ্ডনে একই সময়ে ব্যারিস্টারি পড়েছেন, কীভাবে তাঁরা একই সময়ে আইন-ব্যবসায় শুরু করেছেন এবং কীভাবে তাঁরা দু'জনে বম্বের আইন কলেজে পড়িয়েছেন। মন্তব্য করে তিনি বলেন, আম্বেদকর এখন সমগ্র বিশ্বে সাংবিধানিক আইনে বিশেষ জ্ঞানীব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত একটি নাম। আম্বেদকর রাজনীতিতেও একজন বিশেষজ্ঞ।

নতুন দিল্লিতে আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় সাংসদ কে. হনুমান্তাইয়া বলেন, আম্বেদকর উত্তরপুরুষের কাছে একজন পরিত্রাতা, একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসাবে গণ্য হবেন ও এমন একদিন আসবে, যখন লোকে আম্বেদকরকে জাতির কাণ্ডারী হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখতে পাবে। সংসদের আর এক সদস্য আর.কে. সিদ্ধা বলেন, সত্যি কথা বলতে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার লক্ষ্যে কিছু করার জন্য গান্ধি আম্বেদকরের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। সিদ্ধা আরও ঘোষণা করেন যে, আম্বেদকর নির্যাতিত মানুষের মুক্তিদাতা ও সেইসঙ্গে একজন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টাও।

এবার আম্বেদকর তাঁর পুরোনো 'আইকনোক্লাস্ট'-এর (পুরোনো ধ্যানধারণার

বিরুদ্ধে সমালোচকের) ভূমিকায় নামেন। দিল্লিতে বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি হিন্দুধর্মগুরুদের আক্রমণ করেন। তিনি বলেন যে, বুদ্ধের ধর্ম নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্ম নৈতিক নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছেন, দেবতা হিসাবে নয়। অথচ কৃষ্ণ বলেছেন, তিনি দেবতাদেরও দেবতা; খ্রিস্ট বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র আর মহম্মদ পয়গম্বর বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের শেষ নবি (দূত)। বুদ্ধ ছাড়া অন্য সব ধর্মস্থাপকরা যেখানে নিজেদের মোক্ষদাতা ও অভ্রান্ত বলে দাবি করেছেন, সেখানে বুদ্ধ 'মার্গদাতা' অর্থাৎ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায়ই সন্তুষ্ট থেকেছেন। বুদ্ধের ধর্মই হচ্ছে নৈতিকতা। বুদ্ধধর্মে ঈশ্বরের বদলে আছে নৈতিকতা। বুদ্ধ 'ধর্ম' কথাটির অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক অর্থ উপস্থাপিত করেছেন। ব্রাহ্মণদের কাছে ধর্ম হচ্ছে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ ও বলিদান। বুদ্ধ কর্মের বিকল্প হিসাবে নৈতিকতাকে ধর্মের মূল নির্যাসরূপে স্থান দিয়েছেন। হিন্দুধর্মে অসাম্যই হচ্ছে সামাজিক নীতিমালা, যেখানে বৌদ্ধধর্মের নীতিমালা হচ্ছে সাম্যের। তিনি আরও বলেন, গীতা চতুর্বর্ণকে সমর্থন করে।

'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের ভবিষ্যৎ' (Buddha and the Future of his Religion) নামে তাঁর একটি রচনায়, যা তিনি মহাবোধি সোসাইটির পত্রিকার মে সংখ্যায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন, আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা এভাবে প্রকাশ করেছেনÑ

"(১) সমাজকে একত্রে ধরে রাখতে হলে অবশ্যই হয় আইনগত, নয়তো নৈতিক অনুমোদন থাকতে হবে। এর একটিও না থাকলে সমাজ অবশ্যই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। (২) ধর্মকে যদি তার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাহলে অবশ্যই তাতে যুক্তি থাকতে হবে, যা বিজ্ঞানেরও অপর একটি নাম। (৩) নৈতিক বিধান থাকাই ধর্মের জন্য যথেষ্ট নয়, মৌলিক নীতিগুলিতে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মতবাদকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। (৪) ধর্ম অবশ্যই দারিদ্রকে ধর্মপ্রাণতা বা মর্যাদাসম্পন্ন করবে না।"

তাঁর মতে বৌদ্ধধর্ম এই চাহিদাগুলি পূরণ করে। সুতরাং বিদ্যমান ধর্মগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মই একমাত্র ধর্ম, যা বিশ্ববাসী গ্রহণ করতে পারে। তিনি মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম প্রসারণের জন্য দরকার একখানি ধর্মগ্রন্থের এবং মত প্রকাশ করেন যে, আজকের দিনে ভিক্ষুদের অধিকাংশের মধ্যেই না আছে বিদ্যাবুদ্ধি, না আছে সেবাপরায়ণতা।

দিল্লিতে এই রাগত ভাষণের পর আম্বেদকর ১৯৫০ সালের ৫ মে বম্বে আসেন। বৌদ্ধধর্মে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি তাঁর পুত্র যশোবন্তরাও আম্বেদকরের পরিচালিত এবং সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনতা'-র এক প্রতিনিধিকে

বলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি নিঃসন্দেহে ঝুঁকে আছেন, কারণ বৌদ্ধধর্মের নীতিগুলি চিরন্তন ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি কিংবা তাঁর অনুগামীদেরও তা করার কোনো বার্তা দেননি।

তিনি ঔরঙ্গাবাদে যে কলেজটি চালু করবেন বলে ভেবেছিলেন, সে ব্যাপারে আম্বেদকর ১৯ মে হায়দারাবাদে যান। হায়দারাবাদে থাকার সময় তিনি জানান যে, তিনি কলম্বোতে Young Men's Buddhists Association-এর আহূত বৌদ্ধসম্মেলনে যোগ দিতে যাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি যখন হায়দারাবাদে, তখন Boat Club-এর এক সভায় ভাষণে তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেওয়া নয়।

১৯৫০-এর ২৫ মে তাঁর স্ত্রী ও তাঁর দলের সেক্রেটারি রাজভোজকে সাথে নিয়ে আম্বেদকর বিমানযোগে কলম্বো পৌঁছান। কলম্বো পৌঁছেই সাংবাদিকদের তিনি বলেন যে, তিনি এখানে এসেছেন বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি দেখতে এবং খোঁজ নিয়ে জানতে যে বুদ্ধের ধর্ম সেখানে কতটা জীবন্ত।

কান্দিতে আম্বেদকর প্রতিনিধি হিসাবে অধিবেশনে ভাষণ দিতে অস্বীকার করেন। এমনকি সম্মেলনে পাশ হওয়া কিছু কিছু সিদ্ধান্তেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তথাপি তিনি বৌদ্ধসম্মেলনের তরফ থেকে একটি ঘোষণা দেওয়ার জন্য জোরালো সুপারিশ করেন এই বলে যে, শুধুমাত্র ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার জন্যই যে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তা নয়, এ ধর্মের ব্যাপক প্রচারও তাঁরা করবেন এবং এজন্য ত্যাগস্বীকারও করবেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, "যদিও আমি নিজেকে এই সংঘের সদস্য ঘোষণা করিনি, তবুও আমি যে এখানে পরিদর্শনে আসতে সম্মত হয়েছি, তার একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে।"

আম্বেদকর কলম্বোতে Young Men's Buddhists Association-এর প্রতিনিধিদের কাছে 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্হিত, এ সম্পর্কে সমস্ত প্রস্তাবনা খণ্ডন করে তিনি বলেন, "আমি স্বীকার করি, বস্তুগতভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে অন্তর্হিত। কিন্তু একটি আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে এখনও তা বিদ্যমান।" হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এটা তিনটি পর্যায় পার হয়ে এসেছে Ñ বৈদিকধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিন্দুধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সময়েই বৌদ্ধধর্মের জন্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্ম অসাম্য প্রচার করেছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছে সাম্যের। তিনি মন্তব্য করেন, একথা সত্য নয় যে, শংকরাচার্যের পর ভারতে বৌদ্ধধর্ম মৃত। বহু বছর ধরেই এটা একসঙ্গে চলে আসছিল। তিনি আরও বলেন, আসলে শংকরাচার্য ও তাঁর গুরু উভয়েই ছিলেন বৌদ্ধ।

যেসব কারণে ভারতে বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়েছে ও পতন ঘটেছে, সে সম্পর্কে

তিনি বলেন, বিষয়টির বস্তুগত দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তাঁর মতে কারণগুলি হল Ñ বৈষ্ণব ও শৈবরা বৌদ্ধধর্ম থেকে বহু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিজেদের বলে গ্রহণ করেন, অথচ তারাই বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধ প্রচারণায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজির ভারত আক্রমণের সময় বিহারে হাজার হাজার বৌদ্ধ পুরোহিতকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। সে সময় জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেক বৌদ্ধ পুরোহিত তিব্বত, চিন ও নেপালে পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে অধিকাংশ বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মে চলে যান। তৃতীয় কারণ হল বৌদ্ধধর্ম পালন করা কঠিন, কিন্তু হিন্দুধর্ম তেমন নয়। চতুর্থ কারণটি হচ্ছে ভারতে তখন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল ছিল না।

কিন্তু হিন্দু পণ্ডিত, চিন্তাবিদ ও কিছু বিদেশি পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধধর্মের পতন অনেক কারণের জন্যই হয়েছে। বিশ্বজনীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকার ফলে এর বিস্তৃতি সর্বত্র হয়েছে, কিন্তু এর কোথাও ভৌগোলিক কেন্দ্র ছিল না। বৌদ্ধধর্ম সমস্ত জাতীয় দেবতা ও ধর্মগুরুদের অস্বীকার করেছে ও সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ বলে বুদ্ধকে স্বাগত জানিয়েছে। উন্মত্তের মতো 'বীরপূজা' করার বিরুদ্ধে বুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর অনুগামীরা প্রতিহিংসা বশত বুদ্ধের দাঁত, চুল ও ভস্ম নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে বীরপূজারই অনুশীলন শুরু করে দেন। যতদিন বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের মধ্য দিয়ে চলেছে, ততদিন ভারতে তার অবস্থান দৃঢ় ছিল। কিন্তু যখনই সে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জাতীয় ধর্ম বৈদিকধর্মের বিরোধিতা করতে শুরু করে তখনই ভারতে সে সহানুভূতি হারায়। বৈদিক হিন্দুরা অন্য কোনো দেশে চলে না গিয়ে সাহসিকতার সাথে মুসলিমদের সাথে লড়াই করেছে, কিন্তু বৌদ্ধরা কোনো (ভৌগোলিক) কেন্দ্র না থাকায় বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি এ কথাও বলা হয়, অহিন্দুদের দ্বারা ভারত-আক্রমণকে ঘণ্টাধ্বনি করে তারা স্বাগতও জানিয়েছে। এর ঈশ্বরহীনতা (নাস্তিকতা) ছাড়াও, পরিত্রাণের (নির্বাণের) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ, এর দুঃখবাদ, জগতের প্রতি এর ঔদাসীন্য এবং পরিবারের প্রতি অবহেলা সাহসী উদ্যোগকে উৎসাহিত না করে বরঞ্চ বাধা দিয়েছে। সুতরাং হিন্দু নেতারা তপশিলি হিন্দুদের সাবধান করে বলেন, বাইরের বৌদ্ধজগৎ ভারতে তাঁদের ভাগ্যের উন্নতির জন্য প্রভাব খাটাতে সচেষ্ট হবে সেই আশায় তাঁরা যদি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তার চেয়ে বড়ো সাংঘাতিক ভুল বা মিথ্যা কল্পনা আর কিছু হতে পারে না। কারণ বহির্দেশীয় সহানুভূতির জন্য বৌদ্ধধর্ম ভারতে তার সমর্থন ও সহানুভূতি হারিয়েছে।

আম্বেদকর এরপর কলম্বোর টাউন হলে একটি সভায় বক্তৃতায় সেখানকার অস্পৃশ্যদের কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আবেদন করেন। তাঁদেরকে তিনি বলেন যে, তাঁদের আলাদা কোনো সংগঠন থাকার দরকার নেই। তিনি সিংহলের বৌদ্ধদের

উপর চাপ সৃষ্টি করে সিংহলের দলিত শ্রেণিকে মেনে নিয়ে পিতৃসুলভ যত্নে তাঁদেরস্বার্থ দেখার জন্য বলেন।

অধিবেশন শেষে আম্বেদকর দেশে ফেরার পথে ত্রিবান্দ্রম ও মাদ্রাজ পরিদর্শনে যান। ত্রিবান্দ্রমে আইনসভা-কক্ষে এক সভায় বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন যে, সাংবিধানিক নৈতিকতা সংবিধানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রকে যদি ভারতে সার্থক করে তুলতে হয়, তাহলে জনগণ ও সরকার Ñ উভয়েরই কতকগুলো নৈতিক ব্যাপার বা রীতি মেনে চলা উচিত। নিরপেক্ষ প্রশাসনের ব্যাপারে আলোচনায় তিনি ব্রিটেনের উদাহরণ দেন এবং মন্তব্য করেন যে, ক্ষমতাসীন দল বিশেষ সুনজর দেখিয়েছে এমন অনেক দৃষ্টান্তই ভারতে রয়েছে।

আম্বেদকর এরপর কেরলের মুখ্যমন্ত্রী, অ্যাডভোকেট-জেনারেল, বিশিষ্ট আইনজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের সাথে হিন্দু কোড বিলের সাধারণ নীতিনিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। ত্রিবান্দ্রমে অবস্থানকালে আম্বেদকরকে শহরে কয়েকটি মন্দির ঘুরিয়ে দেখানো হয়। মন্দির এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্তকিছু লক্ষ করার পর দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "ওহ্, সম্পদ ও খাদ্যের কী অপচয়!"

বম্বে পৌঁছে আম্বেদকর 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র বম্বে শাখার পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এক সভায় ২৫ জুলাই একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোগ তিনি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, তাঁর বাল্যকাল থেকেই তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। সেই একই সভায় ডঃ ভি.এম. কাইকিনি বলেন, আধুনিক হিন্দুধর্ম কিছু কিছু বিশেষ বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও জাতপ্রথা নিয়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা ছাড়া আর কিছু নয়। সভাটি অধ্যাপক এন.কে. ভাগবতের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়।

আম্বেদকর নতুন দিল্লির প্রধান কর্মকেন্দ্রে ফিরে যান। চোখের চিকিৎসার জন্য তিনি আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বম্বে যান। সেই সময় ২৯ সেপ্টেম্বর ওরলির বুদ্ধমন্দিরে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। ওই বক্তৃতায় তিনি বলেন, দুঃখকষ্ট দূর করতে হলে জনগণের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা উচিত। শেষে তিনি ঘোষণা করেন, ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান ও তার প্রসারের কাজে তিনি বাকি জীবন নিয়োজিত করবেন।

আম্বেদকরের রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে আক্ষেপ করে বম্বের 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া' বলে, যাঁরা এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিদ্বান ও সাহসী যোদ্ধার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা সম্পর্কে জানেন, তাঁরা আর কোনো মতিবিভ্রমে রইলেন না যে, তিনি ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদের পোশাকই পরবেন এবং একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল গঠনে নেতৃত্ব দেবেন। রাজনীতির প্রতি এটা তাঁর চরম বিরক্তির এক নতুন

বহিঃপ্রকাশ। 'শঙ্কর'স উইকলি' শ্লেষাত্মক সুরে বলেÑ যে লোক কাজ ও ক্ষমতার চেয়ে আত্মত্যাগে বেশি আকৃষ্ট, আম্বেদকর তেমন একজন ভারতীয়ের চেয়ে বেশি কিছু নন। সাপ্তাহিকটি পরামর্শ দেয়, দুঃখের সঙ্গে আম্বেদকরকে আলডুয়াস হাকসলি ও অরবিন্দদের দলেই ফেলা উচিত এবং তাঁকে ভিক্ষু ভীমরাও নামে ডাকা উচিত।

আম্বেদকর দিল্লিতে ফিরে গিয়ে তাঁর সুমহৎ শক্তি নিয়ে আলোচনাধীন হিন্দু কোড বিলের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন। সেখানে আধুনিক পরিবেশ ও সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ আরও বেশি উদার আদর্শের উপর ভিত্তি করে হিন্দুসমাজের মূল কাঠামোকে আইনগতভাবে পরিবর্তন করার একটা সুবর্ণ এবং একমাত্র সুযোগ ছিল। কয়েক মাসের জন্য তিনি একমাত্র এবং রোমাঞ্চকর একটি পরিকল্পনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন। পরিকল্পনাটি হলÑ একজন মাহার হিন্দুসমাজের পরিকাঠামোকে পুনর্গঠন করছেন! এই বিল প্রস্তুতিতে দরকার পড়েছিল ধমগ্রন্থাদি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা, অসংখ্য পণ্ডিত ও আইনজ্ঞদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা এবং নানা উপকরণ, পুস্তকাদি ও পাণ্ডুলিপির এক বিশাল সংগ্রহের যা একটি ঘর পুরো ভর্তি হয়ে যায়। যদিও লেখাপড়ার কাজে তাঁর চিকিৎসকদের নিষেধাজ্ঞা ছিল, তবুও তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা এবং চোখের ক্ষতি করেও অক্লান্তভাবে এ কাজ করে যান।

অক্টোবরের শেষদিকে আম্বেদকর চিকিৎসার জন্য বম্বে ফিরে যান। নভেম্বরে তিনি দিল্লিতে ফিরে এসে সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩৯ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা বিলি করেন, যাতে দেশের বিভিন্ন হিন্দু-সংগঠনের দেওয়া আবেদনের আলোয় আইনমন্ত্রকের সংশোধিত হিন্দু কোড বিলের প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের সুযোগের বিষয় সমূহ ছিল। তখন আশা করা হয়েছিল হিন্দু কোড বিল সম্পর্কে শীঘ্রই চিন্তাভাবনা করা হবে, কিন্তু ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসেও তা করা হয়নি। সংসদ ও রাজ্যবিধানসভার সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, নির্বাচন পরিচালনা এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সমূহের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ডিসেম্বরে 'Representation of the People (Number two) Bill, 1950' আইনমন্ত্রী পার্লামেন্টে উপস্থাপন করেন।

২২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৫১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পার্লামেণ্ট মুলতুবি রাখা হয় ও আম্বেদকর বম্বে ফিরে যান। ওই দিনগুলিতে তিনি বম্বে যেতেনÑ People's Education Society-র কাজে, নয়তো তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে। ১৪ জানুয়ারি বম্বের ওরলিতে বুদ্ধবিহারে তিনি একটি বক্তৃতায় বলেন, বৌদ্ধধর্ম ভারতে ১২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সমৃদ্ধিলাভ করে। ওই সপ্তাহেই বম্বের ডককর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পায়ে ব্যাথার জন্য তিনি সেই অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি। তাঁর পক্ষ থেকে ওই অর্থ গ্রহণ করেছিলেন আর.আর. ভোলে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিরোধী ভূমিকায়

হিন্দু কোড বিল নিয়ে লড়াই করার দিন এসে যায়। সমস্ত বিরোধীরাও একতাবদ্ধ। বিলটি ব্যাপকভাবে তিক্ত মতবিরোধের সৃষ্টি করে। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা ধর্মের নামে একটা সোরগোল তুলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিরোধীরা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন এ ব্যাপারে জনগণের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ নেই। সুতরাং এ বিল নিয়ে তাড়াহুড়ো করে সংসদে যাওয়া সরকারের পক্ষে অবিজ্ঞজনোচিত কাজ। অন্যরা বিলের বিরোধিতা করে বলেন, বিতর্কিত বিষয়ে আইন প্রণয়নে এগোনোর জন্য জোরাজুরি করার উপযুক্ত সময় এটা নয়। আবার অনেকে ছিলেন যাঁরা আগেই বুঝেছিলেন বিলটি ওই আকারে পাশ হলে হিন্দুসমাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিরোধীরা ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, কংগ্রেস দলের ১৯৪৫-এর ইস্তেহারে কোড বিলের কোনো উল্লেখ ছিল না; রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সংসদের এই বিষয়ের উপর সাধারণের সমর্থন পাওয়ার কোনো অধিকারও নেই এবং কেয়ারটেকার সরকারের মতো এই সরকার তা করতেও পারে না। তাঁরা আরও যুক্তি দেখান যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে এই নয় যে, হিন্দুরা তাঁদের সামাজিক পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন না।

কংগ্রেস দলও এই বিষয় নিয়ে নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু আমেরিকা থেকে ফিরে আবেগ উদ্দীপ্ত এক ঘোষণায় বলেন, সংসদে যদি হিন্দু কোড বিল পাশ না হয় তাহলে তাঁর সরকার পদত্যাগ করবে। অন্য একজন কংগ্রেস দলের বড়ো নেতা সর্দার প্যাটেল এই বিলে তাঁর অভ্রান্ত বিরোধিতা ঘোষণা করে বলেন, এ বিলকে কোনো বিবেচনার মধ্যেই আনা যাবে না। তখন পর্যন্ত নেহরু তাঁর প্রভাব বিলটির পক্ষেই প্রয়োগ করেছেন এবং সর্দার প্যাটেল ও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এর বিপক্ষে। হিন্দুসভার নেতা বীর সাভারকর বলেন, হিন্দু কোড বিল যদি প্রকৃতই জাতির হিতসাধন করে, তাহলে কংগ্রেস নেতাদের উচিত সেটাকে গ্রহণ করা। নির্বাচনের দিকে নজর রেখে সেটাকে গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৫১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আম্বেদকর হিন্দু কোড বিল সংসদে পেশ করেন। বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব বলেন, পাঞ্জাবকে এ বিলের আওতা থেকে বাদ দেওয়া উচিত। শিখদের মুখপাত্র হুকুম সিং এই বিলটিকে হিন্দুদের তরফ থেকে শিখ সম্প্রদায়কে আত্মীভূত করার

এক সন্দেহজনক প্রয়াস বলে ব্যাখ্যা করেন। আর এক সদস্য বলেন, আইনপ্রণেতাদের প্রতি আমজনতার কোনো নির্দেশ নেই।

এসব বিরোধিতার উত্তরে আম্বেদকর বলেন, হিন্দুকোড সমস্ত ভারতে এক হওয়া উচিত। শিখ বিরোধিতার উত্তরে তিনি বলেন, "শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনদের ক্ষেত্রে হিন্দুকোডের প্রয়োগ এক ঐতিহাসিক উন্নয়ন এবং এতে প্রতিবাদ করলে সমাজতাত্ত্বিক ভাবে আরও বেশি দেরি হয়ে যাবে। যখন বুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা করেছিলেন, তা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই করছিলেন, কিন্তু আইনি পরিকাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। অনুগামীদের জন্য তিনি কোনো আলাদা আইন তৈরি করেননি। মহাবীর ও দশজন শিখগুরুর ক্ষেত্রেও ঘটনাটি একই রকম ছিল। অনেক আগেই ১৮৫০ সালে প্রিভি কাউন্সিল বলে দিয়েছিল শিখরা হিন্দু আইনের দ্বারা শাসিত হয়।" যাঁরা Civil Code-এর কথা বলেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিল-বিরোধীরা রাতারাতি একটা Civil Code-এর অধিবক্তা হয়ে উঠেছেন দেখে তিনি অবাক। দেশের জন্য ভাল আইন তৈরি করার ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা ও সৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তিনি সন্দিহান। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গে বলেন, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ধর্মকে তুলে দেবেন। তার অর্থ সরকার জনগণের উপর কোনো বিশেষ একটি ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দিতে পারবে না। গণভোটের প্রস্তাব তিনি খারিজ করে দেন এই যুক্তিতে যে, সংসদ হচ্ছে সার্বভৌম। সংসদ আইন প্রণয়ন ও বাতিল করার জন্য ক্ষমতাবান।

এই বিতর্ক তিনদিন ধরে চলে এবং বিলটির বিবেচনা মুলতুবি রাখা হয় পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত, যা আবার বসার কথা ছিল ১৯৫১-র সেপ্টেম্বরে।

সেই সময় ডঃ আম্বেদকর কলকাতার "The Maha Bodhi" পত্রিকায় 'হিন্দু-নারীদের উত্থান ও পতন' (The Rise and the Fall of the Hindu Women) নামে একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এটা ছিল "Eve's Weekly"-তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উত্তর, যাতে লেখক বুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন যে, বুদ্ধ এমন এক ব্যক্তি যিনি ভারতে নারীজাতির পতনের জন্য দায়ী। এই প্রবন্ধটিকে আম্বেদকর প্রবলভাবে আক্রমণ করে বলেন, এটি বুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রায়শ উচ্চারিত এক গুরুতর ও ঘৃণ্য অভিযোগ।

আম্বেদকরের মতে রচনাটির যে অংশটিকে ভিত্তি করে লেখক তাঁর সিদ্ধান্ত টেনেছেন, তা পরবর্তীকালের ভিক্ষুদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত যাঁরা আসলে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধ নারীজাতি থেকে দূরে থাকেননি বা তাঁদের ঘৃণাও করেননি। বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে নারীর জ্ঞানার্জনের অধিকার অস্বীকার করা হয়, যা প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার। তার আধ্যাত্মিক সুপ্তশক্তি হৃদয়ঙ্গম করার অধিকারকেও অস্বীকার করা হয়। নারীর

প্রতি এটা ছিল এক নিষ্ঠুর আচরণ। নারীর জন্য "পরিব্রাজিকার" জীবন স্বীকার করে বুদ্ধ এক আঘাতে এই দু'টো অন্যায়কে দূর করেছিলেন। তিনি পুরুষের সঙ্গে নারীকে জ্ঞানার্জনের এবং আধ্যাত্মিক শক্তি উপলব্ধি করার অধিকার দেন। ভারতে এটা ছিল নারীদের জন্য এক বিপ্লব Ñ মুক্তিযুদ্ধ, যা তাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়। বৌদ্ধধর্মের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী মনু চেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের আক্রমণ থেকে ঘর বাঁচাতে। সুতরাং তিনি নারীকে নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ রাখেন এবং তার উপর চাপিয়ে দেন হরেক রকমের অসাম্য। উপসংহারে তিনি বলেন যে, বুদ্ধ নন, মনুই সেই ব্যক্তি যিনি ভারতের নারীসমাজের অবক্ষয় ও পতনের জন্য দায়ী।

আম্বেদকর তাঁর গ্রন্থাগারের বাইরে ছিলেন বিরোধী অবস্থানে, ঝড়ের মৌচাকের মতো। **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নতুন দিল্লিতে আম্বেদকর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় তিনি তপশিলি জাতির অধিকার সম্পর্কে সরকারি উদাসীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। এটা ছিল তিক্ততায় ভরা যা ভারতের চিন্তাজগতকে কাঁপিয়ে দেয়। কংগ্রেস দল গভীরভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই মন্তব্যের জন্য তাঁর অসন্তোষের কথা ডঃ আম্বেদকরের কাছে পৌঁছে দেন। কংগ্রেস নেতাদের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, যে মন্ত্রীসভার নীতির সঙ্গে তিনি সহমত নন, সেই মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে তাঁকে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। আইনমন্ত্রীর সমর্থকরা বলেন, তাঁর বক্তৃতার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অ-কংগ্রেসি নেতারা বলেন, আম্বেদকরের বাকস্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার আছে, অন্তত যেসব সমস্যা তাঁর নিজের সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কয়েকটি সংবাদপত্র, ক্যাবিনেট যৌথ দায়িত্ব না ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের নীতি মেনে চলছে Ñ এ প্রশ্নও করে বসে।

দু'দিন পর আম্বেদকর যখন Representation of the People (Amendment) Bill পেশ করেন তখন পার্লামেন্টে তাঁর রবিবারের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া চলছিল। জে.আর. কাপুর বিলটিকে শ্লেষাত্মক ভাষায় বর্ণনা করে বলেন, "আম্বেদকরের এটি একটি নির্বাচনী চমক, তিনি চাচ্ছেন, তিনিই যে তপশিলি জাতির পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমেছেন, তা দেখিয়ে তার সম্পূর্ণ সুবিধা আদায় করে নিতে।" আম্বেদকর এর প্রতিবাদে বলেন, রবিবারে তাঁর আঘাত হানবার আগেই এ বিল সংসদে পেশ হয়েছে এবং হুল ফুটিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "আপনি বলে যান মিঃ কাপুর, আমি এসব পঁচিশ বছর ধরে সহ্য করে আসছি।" কাপুর তারপরেও বলেন, আম্বেদকর "একজন নির্লজ্জ ও দুর্বিনীত ব্যক্তি যিনি তাঁর মন্ত্রীসভার সহকর্মী ও এম.পি. বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।" তিক্ততা বেড়েই যাচ্ছিল এবং এ কথাও বলা হয় যে, সংসদের চলতি অধিবেশন শেষে নেহরু রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেবেন, যাতে

তিনি মন্ত্রীসভার রদবদল করে পুনর্গঠিত করতে পারেন। বলা হয়, যদি আম্বেদকর তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে তৈরি না হন তাহলে তাঁকে নাকি তিনি পদত্যাগ করতেও বলেছিলেন। বস্তুত ব্যাপারটা এমনটাই ঘটেছিল। ১৯৫১-র এপ্রিল মাসের শেষে যখন আম্বেদকর বম্বে যান, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহল থেকে বলা হয়, আম্বেদকর যে সরকারে থেকে গেলেন তার একমাত্র কারণ তাঁর আবেগপূর্ণ অভিলাষ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই তিনি পার্লামেন্টে হিন্দুকোড বিল পরিচালনা করবেন।

মে মাসে নতুন দিল্লিতে ফিরে এসে আইনমন্ত্রী পার্লামেন্টে Representation of the People Bill পেশ করেন। তিনি তাঁর নব্বই মিনিটের বক্তৃতায় ধৈর্যসহ ব্যাখ্যা করেন, কিংবা উত্তেজিত হয়ে সমুচিত জবাবে সমস্ত সন্দেহ এবং বিবাদের নিরসন করেন। সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতাবলি সম্পর্কে যখন আলোচনা করেন তখন তিনি মন্তব্য করেন যে, সংসদকে "কোরাস বালিকাদের" সংঘে পর্যবসিত করা যায় না, যা কর্তব্য হিসাবে সব সময় সরকারকে সমর্থন জানিয়ে যায়। সংসদে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ফাঁকে রসিকতাপূর্ণ অবকাশও চলে। গম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাকরণ মাঝে মাঝে হাস্যরসের চমকে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। আম্বেদকর বলেন, যে সংসদ সদস্য পার্লামেন্টারিয়ান এবং পারমিট হোল্ডার দু'টোই হতে চান তাঁকে কিন্তু দু'টোর একটাকে বেছে নিতে হবে। বাংলার লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বাধা দিয়ে বলেন, "যেটা বেশি লাভজনক!"

বিতর্ক চলাকালীন ডঃ পারমার আম্বেদকরের কাছে জানতে চান রাজন্যবর্গের সংসদ সদস্য হতে বাধা থাকা উচিত কিনা। আইনমন্ত্রী উত্তর দেন, "প্রথম ইংরেজি অভিধানের লেখক ডঃ জনসন রাজনৈতিক পেনশনভোগীদের সরকারের ক্রীতদাস রূপে সংজ্ঞায়িত করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিই সরকারের কাছ থেকে পেনশন গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। তাই অনেক বেশি যুক্তিবাদী হয়ে লাভ নেই।" এরপর ডঃ পারমার প্রশ্ন করেন,"রাজনৈতিক পেনশনভোগীদের কি হাউস অব কমন্স-এ যাওয়ায় কোনো বাধা আছে?" প্রত্যুত্তরে আম্বেদকর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, "না, লোকে বলে, বাধা আছে শুধু লর্ডস আর মানসিক রোগীদের।" সংসদসভা তখন হাস্যরোলে ফেটে পড়ে।

ইতিমধ্যে হাইকোর্টের কিছু সিদ্ধান্ত এবং সুপ্রিম কোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংবিধানের ১৫(১) ও ২৯(২) আর্টিক্‌ল সম্পর্কিত কয়েকটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। কলেজে ছাত্রভর্তি ও চাকরির ব্যাপারে মাদ্রাজ রাজ্যসরকারের সাম্প্রদায়িক আদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেয়। পরপর কতকগুলি কোর্টসিদ্ধান্ত বাকস্বাধীনতা ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আর্টিক্‌ল ১৯(২) ও আর্টিক্‌ল ৩১ -কে বাতিল করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে সংবিধান সংশোধিনী বিল (Constitution Amendment Bill) উত্থাপন করে এই বলে যে, বিল অন্য কোনো পরিবর্তন চায় না, সংবিধানে যা

অস্পষ্ট, তা প্রকাশ করতে এবং ওই সনদের উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করতে চায়। সংশোধনীর স্বপক্ষে বলার প্রত্যাশী হয়ে ডঃ আম্বেদকর সভাগৃহে উঠে দাঁড়ান। বম্বের 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা মন্তব্য করে বলেন, "তারপর আম্বেদকর ধীরে এবং সুচিন্তিতভাবে, গতিশীল স্টিমরোলারের গুরুভার চাপে যেমন অনিবার্যভাবে কর্মসম্পাদন হয়, ডঃ আম্বেদকর তেমনি এর আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন ও সমালোচনার অনেকটাই খণ্ডন করেন। যখন তিনি বলার জন্য উঠে দাড়িয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আলোচনা শুরুর মূল বক্তব্যকেই প্রায় নস্যাৎ করে দিয়েছিল।"

সুপ্রিম কোর্টের বিচার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে যুক্তি দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মাদ্রাজ রাজ্যসরকারের যে সাম্প্রদায়িক আইন বাতিল করেÑ আম্বেদকর সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেনÑ "এটা সম্পূর্ণরূপে অসন্তোষজনক এবং সংবিধানের আর্টিক্‌লগুলির সাথে এর কোনো মিল নেই।" এই মন্তব্যে সভায় এক ঝড়ের সৃষ্টি হয়। ঝড় থামলে আম্বেদকর ব্যাখ্যা করে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট আর্টিক্‌ল নম্বর ২৯(২)-এর মধ্যে কার্যকরী 'Only' শব্দটিকে উপেক্ষা করেছে। সেখানে আছে "কোনো নাগরিককে শুধুমাত্র ধর্ম, প্রজাতি ও জাতি-র কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করা যাবেনা।" (No citizen shall be denied admission into any educational institution on grounds only of relegion, race and caste) তিনি আরও বলেন যে, আর্টিক্‌ল নম্বর ৪৬ রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে দুর্বল শ্রেণির লোকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে। যদি আর্টিক্‌ল নম্বর ৪৬ কে পালন করতে হয়, তাহলে আর্টিক্‌ল নম্বর ১৬(৪) ও আর্টিক্‌ল নম্বর ২৯(২) কে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। আর্টিক্‌ল নম্বর ১৯(২) কে সংশোধন করার সঙ্গে জড়িত আছে আরও তিনটি বিষয়Ñ বাকস্বাধীনতা ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা, অপরাধমূলক কাজে প্রকাশ্য আদেশ ও উসকানি দেওয়ার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা এবং বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সংশোধনীর এই অংশটিকেও তিনি সমর্থন করেন। ফলে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় ও বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়।

মে মাসে নতুন দিল্লিতে বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আম্বেদকর হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আবার জোরালো আক্রমণাত্মক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, সমস্ত রকম পাপ যেমন উগ্রতা, নীতিহীনতা ও সরকারি অফিসে দুর্নীতি ইত্যাদির ফলেই হিন্দুধর্মের অধঃপতন। তিনি ঘোষণা করেন, ভারতের প্রকৃত পাপ মোচন হবে যখন লোকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। দিল্লির প্রায়

সব রাষ্ট্রদূতেরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই ও আগস্ট মাসে আম্বেদকর তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ঔরঙ্গাবাদে তিনি একটি নতুন কলেজ চালু করেছিলেন। এর কিছুদিন পর ১ সেপ্টেম্বর ঔরঙ্গাবাদে সেই কলেজেরই নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক স্থাপিত হয়। আম্বেদকরের পাণ্ডিত্য এবং দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর গভীর অনুভূতির জন্য তিনি (রাষ্ট্রপতি) তাঁকে আবেগোচ্ছল শ্রদ্ধা জানান। People's Education Society-র লক্ষ্য ও আদর্শেরও তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

১৯৫১ সালের ১০ আগস্ট তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লেখেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য তাঁর নিজের ও তাঁর চিকিৎসকদের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে এবং চিকিৎসকদের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছে হিন্দু কোড বিল পরিত্যাগ করা হবে। সুতরাং তিনি পণ্ডিত নেহরুর কাছে ১৫ আগস্ট সংসদে ওই বিল বিবেচনার জন্য উত্থাপন করার উচ্চ অগ্রাধিকার দাবি করেন, যাতে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেটি সম্পূর্ণ করা যায়। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী জানেন যে, এই বিষয়টিকে তিনি (আম্বেদকর) অধিকতর গুরুত্ব দেন এবং বিলটির শেষ দেখার জন্য তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি যে কোনোরকম জোর খাঁটাতেও প্রস্তুত। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী ওই দিনই তাঁকে লেখেন, সবকিছু তাঁর সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত এবং ভিতরে ও বাইরে হিন্দুকোড বিলের বিরোধিতা আছে, সেজন্য মন্ত্রীসভা ঠিক করেছে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে এটিকে উত্থাপন করা হবে।

সেজন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় নেহরু নিজেই হিন্দুকোড বিলের নিষ্পত্তি দ্রুত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এটা ছিল সংসদের শেষ অধিবেশন। কংগ্রেস সংসদীয় দলের বেশীর ভাগ সদস্য প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাঁরা চাইছিলেন নতুন সংসদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিচারবিবেচনা স্থগিত রাখা হোক। সুতরাং তাঁরা তাঁদের দলের সব সদস্যকে সংসদে ভোটদানের স্বাধীনতা দিলেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিলটি উত্থাপন করা হল না। ঠিক সেই সময় কংগ্রেসের দলীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয় হিন্দুকোড বিলের একটি অংশ 'বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ'কে (Marriage and Divorce) ১৭ সেপ্টেম্বর সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং সময় থাকলে সম্পত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলি পরে উত্থাপন করা হবে।

১৭ সেপ্টেম্বর সকালবেলা সংসদে যখন দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত হিন্দুকোড বিল নিয়ে বিচারবিবেচনা শুরু হয়, তখন সংসদভবনের চারদিকে শক্ত পুলিশ দল প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তেজিত মহিলা বিক্ষোভকারীদের সামলাতে নিয়োজিত।

অপর দিক থেকেও আক্রমণের তর্জনগর্জন পূর্ণরূপে শুরু হয়ে যায়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, হিন্দুকোড বিল হিন্দুসংস্কৃতির বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দেবে ও নিরর্থক করে তুলবে একটি গতিশীল সর্বজনীন জীবনধারাকে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্ময়কর ভাবে নিজেকে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলেছে। তিনি প্রস্তাব দেন, মানবিক আইনের ভিত্তিতে এ নীতিকে সর্বধর্মের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত এবং বিদ্রূপ করে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের একটি সুযোগ এখানে আছে। এন.ভি. গ্যাডগিল বিলের পক্ষে এক প্রাণবন্ত বক্তৃতায় বলেন, জনগণের বর্তমান নৈতিকতার সাথে আইনকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা আছে। সর্দার ভোপেন্দ্র সিং মান এই সংহিতাকে (Code) ধর্মান্তর আইন আখ্যা দিয়ে বলেন, আম্বেদকরীয় ধর্মের নতুন মনুকে তাঁর উপরে চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। পণ্ডিত কুঁজরু তাঁর স্বভাবমতো পরিমিত বক্তৃতায় বিলটি সমর্থন করেন। পণ্ডিত মালব্য আইনকে শ্রদ্ধা করার পরিকাঠামো ভেঙে না ফেলার জন্য সরকারকে সাবধান করে দেন। মহিলা সদস্যরা এই বিলকে সংবিধানের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের এক উইল হিসাবে বর্ণনা করেন।

সংসদে হিন্দুকোড বিল নিয়ে আলোচনার সময় নেহরু সাহস হারিয়ে ফেলেন ও একটি আপসপ্রস্তাব দিয়ে বলেন, বিলের 'বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ' অংশটিকে একটি আলাদা বিল হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং ১৯ সেপ্টেম্বর আম্বেদকর সংসদে ঘোষণা করেন, সময়ের অভাবে এই অধিবেশনে সংসদ হিন্দুকোড বিলের দ্বিতীয় অংশের বেশি আর কিছু আইনে বিধিবদ্ধ করতে পারছে না। বিলের দ্বিতীয় অংশটিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ 'বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ' বিল (Marriage and Divorce Bill) রূপে গণ্য করা হবে।

বিরোধীরা এই খণ্ডিত বিলের উপর উত্তেজিতভাবে আলোচনায় যোগ দেন। তাঁরা এটিকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। হুইপের কোনো চাপ ছিল না। বক্তব্য রাখারও কোনো সময়সীমা ছিল না। বিলের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিলবিরোধীদের জ্বালানো আগুনে তেল জোগালেন স্বয়ং আইনমন্ত্রী। আলোচনার ধীরগতি, এই অধিবেশনে চারদিন ধরে আলোচনা ও গত অধিবেশনে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের উপর তিনদিন ধরে আলোচনার ফলে আম্বেদকর বেপরোয়াভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ২০ সেপ্টেম্বর একটি সংগ্রামী বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি রাম-সীতার কাহিনির উল্লেখ করেন, যাতে সভাগৃহে গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং জনমতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতে কয়েকজন হিন্দু সদস্যের ধর্মীয় সংবেদনশীলতায় আঘাত লাগে। তাঁদের মধ্যে একজন উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান এবং চিৎকার করে বলেন, "আমরা অগ্রগতির পক্ষে এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মন্ত্রীমহোদয়ের কাছ থেকে অমর্যাদা ও

কটুকাটব্য ছাড়াই বিলের পক্ষে ভোট দিতে প্রস্তুত।" উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন যে, সদস্যবৃন্দ যদি তাই করতেন, তাহলে তাঁর এই বক্তব্যের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। যদিও তিনি বলেন যে, কারও অনুভূতিকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করতে চাননি, যদি তিনি অসতর্কভাবে তা করে থাকেন, তাহলে তিনি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। অন্য এক সদস্যের অনুরোধে বক্তব্যের এই অংশটি রেকর্ড থেকে তিনি মুছে ফেলার ইচ্ছার কথাও বলেন।

বিতর্কের উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মন্তব্যের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই; কারণ তিনি মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন এই ধারার বিরোধিতা করেননি। কিন্তু এখন তিনি কেবল বিরোধী অবস্থানের জন্যই বিরোধিতা করছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, "পূর্বে বিধিবদ্ধ হিন্দু আইনের যে সংশোধনী হত, তা সব সময়ই শিখদের ক্ষেত্রে প্রযাজ্য ছিল এবং আইনগত ব্যাপারে শিখরা তাঁদের হিন্দু বলেই ধরে নিতেন।" সর্দার ভোপেন্দ্র সিং মানের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি বিদ্বেষপূর্ণ।

রাম-সীতার বিরুদ্ধে অনাহূত আক্রমণ ও কড়া বেপরোয়া সুরে পরিস্থিতি খারাপ হয় এবং অধিকাংশেরও বেশি সদস্যকে বিরূপ করে তোলে। আম্বেদকর তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং অনেকে নেহরুকেও আঘাত করেন। নেহরু তাঁর সম্পূর্ণ সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং বিভ্রান্ত অবস্থায় আম্বেদকরকে বিলটি তুলে নিতে বলেন। সেই সন্ধিক্ষণে নেহরুর মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে একজন সাংবাদিক গোল্ডস্মিথ সম্পর্কে গ্যারিকের বিখ্যাত সমাধিলিপি (epitaph)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "তিনি লিখেছেন একজন দেবদূতের মতন এবং বলেছেন এক বেচারার মতন" (He wrote like an angel and spoke like poor Poll)।

৪ নং অনুচ্ছেদের উপর ২২ সেপ্টেম্বর বিতর্ক শেষ হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর বিতর্ক আবার শুরু হয়। রামনারায়ণ বলেন, ডঃ আম্বেদকরকে মনুর সাথে তুলনা করা হয়, কিন্তু মনু মহাশয় ছিলেন সকলের দ্বারা স্বীকৃত। আইন তৈরি করার সময় তাঁর জন্য পুলিশের পাহারা ছিল না। ২৫ সেপ্টেম্বর হিন্দুকোড বিলের ৪ নং অনুচ্ছেদ উৎসাহ বা বাধাদান ছাড়াই সভায় গৃহীত হয়ে যায়। আলোচনার জন্য অন্যান্য বিল এসে পড়ায় গ্যালারিতেও ভাঁটা পড়ে। এমনকি হিন্দুকোড বিলের 'বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ' (Marriage and Divorce) অংশটিও সম্পূর্ণতা পায় না। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে বিলটি পরিত্যক্ত হয় এবং আম্বেদকরের ভাষায় "চারটি অনুচ্ছেদ পাশ হয়ে যাবার পর এটিকে হত্যা করা হয় এবং কোনো শোক প্রকাশ ও গানে কীর্তিত না করেই সমাহিত করা হয়।"

আম্বেদকরের এই আশাভঙ্গকারী ঘটনা বেদনাদায়ক। তিনি ছিলেন কঠোর প্রকৃতির

এবং হতাশাকে নীরবে সহ্য করতে পারতেন। সংবাদপত্র তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পদত্যাগের খবর প্রচার করে। ২৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভার আসন থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগপত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে লিখে জানান, "দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রীসভার আসন থেকে পদত্যাগ করার কথা আমি ভেবে আসছিলাম। কিন্তু আমার সে ইচ্ছা পূরণ করা থেকে একটা জিনিসই আমাকে বিরত রেখেছে , তা হল আমার আশা ছিল বর্তমান সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই হিন্দুকোড বিল কার্যকরী করা সম্ভব হবে। এমনকি বিলটিকে আমি খণ্ডিত করতেও রাজি হয়েছি এবং 'বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ'-এ (Marriage and Divorce) তা সীমিত রেখেছি, শুধু এই আশায় যে আমাদের পরিশ্রমের অন্তত এইটুকু সফল হোক। কিন্তু বিলের সেই অংশটিকেও হত্যা করা হল, আমি আপনার মন্ত্রীসভার একজন সদস্য থাকার আর কোনো উপযোগিতা দেখতে পাচ্ছিনে।"

যদিও প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার প্রতি সৌজন্যবশত আম্বেদকর তাঁর নিজের পেশ করা বিল এবং প্রস্তাবগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্যাবিনেটে থাকার ইচ্ছা জানান এবং সেগুলি শেষ করার জন্য অগ্রাধিকার দাবি করেন। নেহরু বিলটির জন্য তাঁর কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, ভাগ্য ও কর্মপ্রণালীর নিয়মগুলি এ বিলের বিরুদ্ধে। চলতি অধিবেশনের শেষ দিন থেকে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে তিনি রাজি হন এবং তাঁর বক্তৃতার একটি কপি অগ্রিম দিতে বলেন। উত্তরে আম্বেদকর ৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীকে জানান তিনি বক্তৃতা তৈরি করলে তার এক কপি তাঁকে দেবেন এবং বলেন, সংসদে তাঁর নামে যে কাজ এখনও রয়েছে, তা শেষ হওয়ার পরে ১১ অক্টোবর তিনি যে বিবৃতি দেবেন তার অনুমতি তিনি স্পিকারের কাছ থেকে পেয়ে গেছেন।

দশেরা ছুটির পর পর্যন্ত আম্বেদকর তাঁর পদে বহাল রইলেন। ১৯৫১ সালের ১১ অক্টোবর সংসদের কাজ আবার শুরু হয়। ওই দিন question hour ছিল না। প্রথমে গ্রহণ করা হয় Delimitation Order। সে কাজের পরে ডেপুটি স্পিকার Industries Development and Regulation Bill উত্থাপন করার জন্য এইচ.কে. মহতাবকে আহ্বান করেন। সেই মুহূর্তে আম্বেদকর দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, প্রথম তাঁর কথা শোনা হোক। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে যান যখন স্পিকার তাঁকে বলেন যে, তিনি যদি আগে তাঁর বিবৃতির একটি কপি স্পিকারের কাছে জমা দিতেন, তাহলে তাঁকে বলতে দেওয়া হত। যদিও ডিপুটি স্পিকার বলেন, তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন সন্ধ্যা ছ'টায়। একথা শুনে কঞ্জুরু ও কামাথ প্রশ্ন করেন এটা তাহলে Pre-censorship কিনা। একটি প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি স্পিকার বলেন যে, যেহেতু তিনি সংসদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের জিম্মাদার সেহেতু এটা দেখা তাঁর আবশ্যক যাতে বিবৃতির

মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বা কুৎসাপূর্ণ কিছু না থাকে। তারপর তিনি আম্বেদকরের দিকে ফিরে বলেন, "মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, ..." কিন্তু আম্বেদকর তাঁর কথায় প্রতিবাদ করে বলেন যে, তিনি আর এখন মন্ত্রী নন এবং তাঁর ওই জাতীয় নির্দেশ মেনে চলার ইচ্ছেও আর নেই। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে তিনি প্রতিবাদে সংসদ ত্যাগ করেন। যে মুহূর্তে তিনি মন্ত্রীত্বের আসন থেকে পদত্যাগ করলেন, সেই মুহূর্তেই সংবিধানের প্রধান স্থপতিকে এইভাবে সংসদভবন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হল।

ঘটনাবলি এভাবে ঘুরে যাওয়ায় বেশির ভাগ সদস্যই অখুশি হন। আম্বেদকরের কথা শোনার জন্য তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা করতালি দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেন। কার্যপদ্ধতির নিয়মাবলির ১২৮ নং অনুচ্ছেদে যে মন্ত্রী পদত্যাগ করেন ও বিবৃতি দিতে চান, সেই বিবৃতির অগ্রিম কপি স্পিকারকে আগেই পেতে হবে, এমন কোনো উল্লেখ নেই। ডেপুটি স্পিকার সন্ধ্যা ছ'টায় বলেন, এমনকি ডঃ আম্বেদকর যদি পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য তাঁর বিবৃতির একটি কপি অগ্রিম জমা নাও দিতে চাইতেন, তাহলেও তিনি এখন তাঁকে তাঁর বিবৃতি পাঠ করার অনুমতি দিতেন। যদিও সদস্যবৃন্দ বুঝতে পারলেন না কীভাবে সকাল ১০ টা পনেরো মিনিটের সময় Pre-censorship-এর প্রয়োজন হয় আর সন্ধ্যা ৬ টায় তা হয় না। পরদিন সংসদ "বিরোধী দলের নেতা" হিসাবে পুনরায় আম্বেদকরকে স্বাগত জানায়।

'বহির্গমন' (walk-out) করার সাথে সাথেই আম্বেদকর সংবাদপত্রে তাঁর বিবৃতি দেন। তার মধ্যে তিনি পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করেন, যা নিয়ে মন্ত্রীসভার সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়। যদিও নেহরু আম্বেদকরকে আইন দপ্তর দেওয়ার প্রস্তাবের সময় অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁকে প্ল্যানিং দপ্তরও দেবেন, তবুও নেহরু কীভাবে তাঁকে প্রত্যেকটি 'ক্যাবিনেট কমিটি' থেকে বাইরে রেখেছেন তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হল সরকারের বিরুদ্ধে তপশিলি জাতির উন্নতির প্রতি উদাসীনতার অভিযোগ। তৃতীয়ত কাশ্মীর সম্পর্কে সরকারি নীতির তিনি বিরোধিতা করেন ও বলেন, **"কাশ্মীরের জন্য সঠিক সমাধান হচ্ছে রাজ্যটিকে ভাগ করা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের অংশ ভারতকে দেওয়া এবং মুসলিমদের অংশটি পাকিস্তানকে দেওয়া; ঠিক যেমনটি আমরা ভারতের ক্ষেত্রে করেছি।"** চতুর্থ বিষয়টি হল ভারতের ভুল বৈদেশিক নীতি Ñ যা বন্ধু না বাড়িয়ে শত্রু বাড়িয়েছে। এই ভুল বৈদেশিক নীতির জন্য ভারত তার ৩৫০ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে ১০৮ কোটি টাকাই ব্যয় করে সেনাবাহিনীর পিছনে। তিনি আরও বলেন, এই বিশাল ব্যয় ভারতকে করতে হচ্ছে, কারণ তার বন্ধু নেই, যাদের কাছ থেকে সে কোনো জরুরি অবস্থা দেখা দিলে সাহায্যের জন্য ভরসা করতে পারে। সর্বশেষ বিষয়টি হল 'হিন্দু কোড বিল' (Hindu Code Bill)

সম্পর্কে নেহরুর উদাসীন নীতি এবং তাঁর ধারণা প্রধানমন্ত্রী নেহরু, যদিও আন্তরিক, তবুও হিন্দুকোড বিল পাশ করাতে গেলে যে স্থিরসংকল্প ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। তিনি বলেন, সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, তিনি চলে যাচ্ছেন অসুস্থ মানুষ হিসাবে নয়, একজন অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত মানুষ হিসাবে। তিনি বলতেন, অসুস্থতার জন্য কর্তব্য করবেন নাÑ এমন মানুষ তিনি নন।

আম্বেদকরের পদত্যাগ সম্পর্কে সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত অনুকূল। 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "মনুর মুকুটে বঞ্চিত হলেও ডঃ আম্বেদকর তাঁর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের পরিচয় রেখেই সরকার ছেড়েছেন। মন্ত্রীসভা যে প্রতিভাভারে ভারাক্রান্ত, তা নয় এবং এই প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ও জনগণের কাজে কঠোর অধ্যবসায়ী পর্যবেক্ষকের বিদায়ে তার (মন্ত্রীসভার) গৌরব-দ্যুতি মলিন না হয়ে পারেনি।" সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়, "রাজনৈতিক ঘটনাবলি জনগণ বেশিদিন মনে রাখে না একথা ঠিক, কিন্তু পুরোনো সংস্কার ঝেড়ে ফেলে নতুন দায়িত্ব ও সময়োপযোগী হওয়ার উচ্চতায় পৌঁছাতে যে তিনি সক্ষম, তার প্রমাণ আম্বেদকর দেখিয়েছেন।" সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়, "এই সক্ষম রাজনীতিকের সেবা হারানোয় ভারত কমজোরি হবে এবং আম্বেদকরকে যদি জাতীয় মঞ্চ ছেড়ে আবার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ফিরতে হয়, তবে তা ব্যক্তিগত ও জাতীয় শোকাবহ ঘটনা হতে আর বাকি থাকবে না।" সবশেষে বলা হয়, "ডঃ আম্বেদকর যেমন ভীষণভাবে বন্ধু, আবার শত্রু হিসাবে তেমনি গুণমানসম্পন্ন ইস্পাতের মতো কঠিন। শেষ কয়েকটি বছর তাঁকে অসাধারণ দক্ষতার সাথে গঠনমূলক কাজে দেখা গেছে এবং তিনি যদি এই পথেই চলতে থাকেন তবে দেশ ও তাঁর সম্প্রদায় উভয়ই লাভবান হবে।"

বম্বের 'দি ন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড' মন্তব্য করে, "ডঃ আম্বেদকরের মতো এতটা যোগ্যতাসম্পন্ন লোক দেশে খুব কমই আছেন, যাঁরা পরিকল্পনা বা অর্থ বা বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন। সরকার যা হারাচ্ছে, বিরোধীদের সঙ্গে তাঁর গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তাঁর কাছ থেকে সেটাই পাওয়ার আশা করছে।" বম্বের 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' দুঃখ প্রকাশ করে বলে যে, আম্বেদকরের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রীকে এমন দুঃখজনকভাবে মন্ত্রীসভা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ডেপুটি স্পিকারের রুলিং উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি বলে, "ডেপুটি স্পিকার তাঁর বিচক্ষণতা অনুযায়ী অন্যরকম ভেবেছেন। সেভাবে ভাবতে গিয়ে এমনকি তিনি মন্ত্রীর প্রতি মিথ্যা বদনাম দিয়ে বলেছেন, 'অপ্রাসঙ্গিক, কুৎসাপূর্ণ ও মিথ্যা বিবৃতি' বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা চেয়ারের ছিল। এটা ওই মন্ত্রীর প্রতি

কঠোর আচরণ যা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য ছিল না। নির্ধারিত তপসিল অনুযায়ী বিবৃতি দেওয়ার অনুমতি পাওয়া উচিত ছিল তাঁর।'

কয়েক মাস ধরে একদিকে মহারাষ্ট্রের 'পিজ্যান্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি' ও 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর নেতাদের মধ্যে এবং অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ও 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর নেতাদের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অশোক মেহতা আচার্য দণ্ডের মাধ্যমে আম্বেদকরের সাথে যোগাযোগ করেন। আচার্য দণ্ডে তাঁর সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করেন। আম্বেদকরের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, শংকর রাও মোরে পরিচালিত 'পিজ্যান্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি'র রুশীয় আদর্শের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক রয়েছে, পাশাপাশি তা একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্রের মারাঠি সংগঠনও। সুতরাং তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কোনো কিছু করতে রাজি নন। জয়প্রকাশ নারায়ণও আম্বেদকরকে বলেছিলেন, মোরে কম্যিউনিস্টদের পক্ষেই।

তপশিলি জাতি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সদস্যরা তাঁদের নেতা আম্বেদকরের সযত্নে রচিত নির্বাচনী ইস্তেহারের খসড়া বিবেচনার জন্য ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে একটি সভায় মিলিত হন। তপশিলি জাতি ফেডারেশন ঘোষণা করে যে, নির্বাচনে কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা বা লাল পার্টির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এ ব্যাপারে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। মিসেস মণিবেন কারা আচার্য দণ্ডেকে বলেছিলেন, এম.এন. রায় ওই ইস্তেহারের বিপুল প্রশংসা করেন এবং তিনি কাশ্মীরের ব্যাপারে আম্বেদকরের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

আম্বেদকর এখন তাঁর আন্দোলনে ও রাজনৈতিক মঞ্চে ফিরে আসার জন্য স্বাধীন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে জলন্ধরে একটি সভায় তিনি বলেন, কংগ্রেস দলের হৃদয়ে তপশিলি জাতির কোনো জায়গা নেই। জওহরলাল নেহরু মুসলিম বাতিকে (ম্যানিয়াতে) ভুগছেন এবং তাঁর অন্তঃকরণ তপশিলি জাতির প্রতি নির্মম। এর ক'দিন পর লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় আম্বেদকর তাঁর ভাষণে পিছিয়েপড়া শ্রেণির প্রতি ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে দেশকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, যদি সমতার স্তরে উঠে আসার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা হয়, তাহলে তপশিলি জাতি ফেডারেশন কমিউনিস্ট সিস্টেমকেই বেশি পছন্দ করতে পারে এবং তাতে দেশের ভবিষ্যৎ বিপর্যয় ঘটবে। কাশ্মীরের ব্যাপারে তিনি বলেন, "যদি আমরা সম্পূর্ণ কাশ্মীরকে রক্ষা করতে না পারি, আসুন অন্তত আমাদের স্বজনদের রক্ষা করি। এটা ঘটনার একটি সাধারণ বিশ্লেষণ যা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।"

এরপর ১৮ নভেম্বর আম্বেদকর বম্বেতে তাঁর স্থায়ী আবাসে ফিরে আসেন। বম্বে

পৌঁছালে 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন' ও 'সমাজতান্ত্রিক দল'-এর (Socialist Party) তরফে যৌথভাবে তাঁকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই বর্ণময় সংবর্ধনার পর শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে সিদ্ধার্থ কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। বোম্বেতে অবস্থানকালে সেটাই ছিল তাঁর বাসভবন। সেখানে পৌঁছেই তিনি নির্বাচনের জন্য দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করেন। সাথে সাথেই তিনি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে একটি নির্বাচনী ফ্রন্ট গড়ে তোলেন এবং বম্বের চৌপাটিতে এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস দল নয়, ভারতের স্বাধীনতা এনেছেন সুভাষ বসু। পরদিন সন্ধ্যায় তপশিলি জাতি ফেডারেশন ও সমাজতান্ত্রিক দলের যৌথ সহায়তায় স্যার কওয়াসজি জাহাঙ্গির হলে আয়োজিত এক সভায় আম্বেদকর বক্তৃতা করেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি নেহরুর বিবৃতিতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, যাতে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতে দুর্নীতি এমন কিছু বিশাল ক্ষতিকারক নয় যে, তার দিকে খুব নজর দিতে হবে। কংগ্রেস দলের প্রতি আম্বেদকর অকৃতজ্ঞ Ñ কংগ্রেসের এই সমালোচনার প্রসঙ্গে তিনি একজন আইরিশ দার্শনিকের উদ্ধৃতি দেন, যিনি বলেছিলেন, "কোনো মানুষই তার সম্মানের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হতে পারে না, কোনো জাতি তার স্বাধীনতার বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হতে পারে না এবং কোনো নারী তার সতীত্বের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হতে পারে না।"

অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এস. কে. পাতিলের প্রচেষ্টায় তিনি মন্ত্রীসভায় ঢুকেছেন Ñ একথা সত্য নয়। তিনি তাঁর শ্রোতাদের বলেন, কীভাবে যে তিনি মন্ত্রীসভায় ঢুকেছিলেন, সেটা তাঁর জীবনের চরম বিস্ময়গুলির মধ্যে একটি, বিশেষ করে যখন গণপরিষদে তাঁর প্রবেশে কংগ্রেসই ছিল ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, নেহরুই তাঁকে তাঁর চেম্বারে ডেকে মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আসলে এটা একটা নির্বাচনী প্রচারণা। যাইহোক, সর্দার প্যাটেল, পাতিল ও আচার্য দণ্ডে মন্ত্রীসভায় তাঁর প্রবেশের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন Ñ এই বিবৃতির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে।

বম্বের নারে পার্কের এক জনসভায় আম্বেদকর ভাষণ দেন এবং তিনি তাঁর লোকদের বলেন, তপশিলি জাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির মঙ্গলের দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি নেই। ২৫ নভেম্বর বম্বের শিবাজিপার্কে প্রায় দু'লক্ষ লোকের এক বিশাল সমাবেশে তিনি নেহরুকে সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দিয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিতে বলেন। তিনি বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করেন যে, ভারতে সদ্য জন্ম নেওয়া গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে ও শাসক দলকে সংযত রাখতে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন

নির্বাচনী ঝটিকা সফরে নেহরু বম্বে ও মাদ্রাজে যান ও সেসব জায়গায় তিনি আম্বেদকরের তপশিলি জাতি ফেডারেশনের সাথে সমাজতান্ত্রিকদের আঁতাতকে অশুভ আঁতাত বলে অভিযোগ করে বলেন, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অদ্ভুত যে, আম্বেদকর ক্যাবিনেটের মিটিং-এ কখনও বিদেশনীতির বিরোধিতা করেননি, যদিও তিনি প্রায় চার বছর মন্ত্রী ছিলেন। হিন্দু কোড বিল নিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে উত্তরে ডঃ আম্বেদকর যা বলেছিলেন তা অবশ্যই তাঁর মনে থাকবে।

দেশে কংগ্রেসই সবচেয়ে পুরোনো ও সুসংবদ্ধ একটি দল। কয়েকমাস ধরে সুশৃঙ্খলভাবে ও শক্তিমত্তার সাথে তাঁদের নির্বাচন প্রস্তুতি চলেছে। অপরদিকে, এটা শাসক দল, আম্বেদকর তাঁর দলকে সুসংগঠিত করার কাজ তেমন ভাবে করতে পারেননি এবং স্বাস্থ্যের অপারগতার জন্য নির্বাচনী প্রচারেও বম্বের বাইরে যেতে পারেননি। গত দশ বছর ধরে তিনি তাঁর সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন না, যেহেতু শ্রমমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে তখন দিল্লিতেই থাকতে হয়েছে। তাঁর নিজের দল এবং সমাজতান্ত্রিক দলের শক্তি ও দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা ছিল না। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জানুযারিতে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী জোয়ার নেহরুর পক্ষে বহমান। আম্বেদকর সেই নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিক দলসহ বিপর্যস্তভাবে হেরে যান। আম্বেদকর পান ১,২৩,৫৭৬ ভোট, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস মনোনীত এন.এস. কাজরোলকর পান ১,৩৭,৯৫০ ভোট। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভোট যা সংরক্ষিত আসনের পাওয়ার কথা, তা পরিকল্পনা মাফিক নষ্ট করে দেওয়া হয়।

এটা একটা বিশাল ব্যর্থতা যা আম্বেদকরকে হাউই-এর মতো পতন ঘটায়। এটা আবার একবার প্রমাণ করল যে রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই। যে জাতি তাঁকে নানাভাবে মহিমান্বিত করেছে, মনে হচ্ছে সেই এখন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও অনিচ্ছুক। কাশ্মীর ভাগ করার সপক্ষতা, মুসলিমদের জন্য আলাদা নির্বাচন সম্পর্কে বম্বের মুসলিমদের সামনে তাঁর ভাষণ, জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের অভাব এবং সর্বোপরি তাঁর অসংগঠিত দলের দুর্বলতার কারণেই এই ব্যর্থতা। তাঁর ব্যর্থতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটি পত্রিকায় বলা হয়, সমগ্র নির্বাচনী প্রচারাভিযানে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কংগ্রেস সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির উপর, কিন্তু তাঁর বিকল্প গঠনমূলক কর্মসূচির উপরে জোর দেননি। এই নির্বাচনী দুর্যোগে টিকেছিলেন কেবল দু'জন Ñ তাঁর উচ্চভাষী সহযোগী রাজভোজ সংসদে নির্বাচিত হন ও তরুণ সহযোগী বি.সি. কাম্বলে নির্বাচিত হন বম্বে বিধানসভায়।

ভোটের পরেই আম্বেদকর দিল্লি চলে যান। ৫ জানুয়ারি দিল্লি থেকে তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি বলেন, “বম্বেবাসীর এত বিপুল সমর্থন কী করে যে এত

বড়ো মিথ্যায় পর্যবসিত হল, বাস্তবিকই তা নির্বাচন কমিশনের তদন্ত করে দেখার বিষয়।" সমাজতান্ত্রিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ কলকাতা থেকে একটি বিবৃতিতে বলেন, ডঃ আম্বেদকরের মতো তিনিও এই বিপর্যয়ের কারণ বুঝতে পারছেন না, কারণ বম্বেতে সব দিক থেকেই সমাজতান্ত্রিকদের প্রতি বিপুল জনসমর্থন ছিল।

লোকসভার বম্বে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় আম্বেদকর দিল্লিতে ছিলেন। আম্বেদকরের পরাজয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল বিষণ্ণ ও বিস্ময়পূর্ণ। তিনি বলেন, তিনি এর জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না, সেজন্যই তিনি এটাকে করুণভাবে নেননি। তিনি বুঝতে পারেন, এস.এ. ডাঙ্গের ষড়যন্ত্রের ফলেই তাঁর এই পরাজয়।

ভোটে হারলেও আম্বেদকর সাধারণ জনতার জীবনে ফিরে যাবার পন্থা বের করার আশা হারাননি। তাই রাজ্যসভায় (Council of States) তাঁর নির্বাচন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে একটুবাজিয়ে দেখার জন্য কমলাকান্ত চিত্রেকে বলেন। আম্বেদকরের স্ত্রী কমলাকান্ত চিত্রেকে লিখেছিলেন যে, আম্বেদকরের দলের লোকদের তাঁর জন্য তাই করা উচিত যা কংগ্রেসের লোকেরা মোরারজি দেশাইয়ের জন্য করেছিলেন। চিত্রেকে লেখা এই অনুরোধপত্রে তিনি মন্তব্য করে বলেছিলেন, রাজনীতি ডক্টরের অস্তিত্ব, তাঁর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সব চেয়ে ভাল টনিক এবং সংসদীয় কাজকে তিনি চমৎকার উপভোগ করেন। শারীরিক অসুস্থতার বেশির ভাগটাই তাঁর মানসিক প্রকৃতির। তিনি যথেষ্ট প্রাণোচ্ছলতা ও আন্তরিকতার সাথে বলেছিলেন, "আমি সাহস করে বলতে পারি, তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দেবেন (এবং যদিও এটা একটা খুবই বড়ো 'যদি')। এ অভিলাষ তাঁরই এবং আমরা প্রার্থনা করি একদিন এটা পূর্ণ হোক।" তিনি আরও বলেন, যদিও এখনকার পরাজয়কে তিনি ভালভাবেই সয়ে নিয়েছেন, তবুও আগের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, সংসদে গিয়ে তিনি অনেক কিছু করবেন যেখানটা ডক্টরের মতো উচ্চমাপের বৈশিষ্টমণ্ডিত মানুষের একমাত্র জায়গা। তিনি বিহ্বল-করা ভাষায় লিখেছেন, "এখানেই একজন বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে আপনার ভূমিকার কথা এসে যায়।" উপসংহারে তিনি বলেন, তিনি নিশ্চিত যে, বিষয়টা নিয়ে তিনি (চিত্রে) এগিয়ে যাবেন ও এ বিষয়ে কোনো হতাশা দেখা দেবে না।

সেইমতোই ব্যবস্থা হল এবং ১৯৫২ সালে মার্চ মাসের মাঝামাঝি রাজ্যসভার (Council of States) বম্বে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ১৭ টি আসনের একটিতে আম্বেদকর তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেন এবং মাসের শেষে তিনি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন। এপ্রিল মাসে তাঁর লোকেরা যথারীতি তাঁর জন্মদিন পালন করেন। কংগ্রেস দল ও

হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বক্তব্যের জন্য আম্বেদকরের বিরুদ্ধে যেসব শিক্ষিত মানুষের মনে আক্রোশ জমেছিল, তারা গ্রামে গ্রামে তাঁর সরল, অশিক্ষিত লোকদের বলতে লাগল, মহান ডক্টর সাহেব এবার শেষ। দিল্লি থেকে তিনি পিছিয়ে সরে এসেছেন বম্বে; কিন্তু এখানেও তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি, চরম পরাজয়ে ছত্রখান হয়েছেন। লোকগুলি বদমায়েসি করে তাঁর লোকদের বলতে লাগল, তাঁর ভূমিকা এবারে শেষ। গরিব মানুষেরা এই বাজে নিন্দুকদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডে আম্বেদকরের অনেক কিছু করার ছিল। ঔরঙ্গাবাদের কলেজ সম্পর্কে People's Education Society-র এক সভায় যোগদান করার উদ্দেশ্যে তিনি ঔরঙ্গাবাদে যান। সেখানে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ অবিবেচনাপ্রসূত। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটিকে বেছে নিতে পারত।

এরপর তিনি রাজ্যসভার (Council of States) অধিবেশনে যোগদান করার জন্য দিল্লি যান যা শুরু হয় ১৯৫২ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে। সেখানে বাজেটের উপর এক বিস্ফোরক বক্তৃতায় তিনি প্রতিরক্ষা বাজেটকে দেশের অগ্রগতিতে সব চেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক বলে বর্ণনা করে বলেন, "দেশের কল্যাণের জন্য যে অর্থভাণ্ডার দরকার, তার অপরিহার্য অংশটাই সেনাবাহিনী খেয়ে নিচ্ছে।" তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা বাজেট যদি ৫০ কোটি টাকা কম করা হয়, তাহলে দেশের অনেক উপকার হতে পারে। তিনি প্রশ্ন করেন, যদি ভারতের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য হয় বন্ধুত্ব ও শান্তিরক্ষা করা, তাহলে শত্রু কারা, যাদের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী পুষতে হবে?।

এ সময় খবর আসে আম্বেদকর ৫ জুন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডক্টর অব ল' উপাধি পেতে চলেছেন। পাণ্ডিত্যই বিশ্বসম্মান পাওয়ার দাবি রাখে।

প্রকৃতপক্ষে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের হাত থেকেই আম্বেদকরের এই উপাধি গ্রহণ করার কথা ছিল, কারণ আইজেনহাওয়ার তখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু মন্ত্রীসভার দায়িত্ব ও পরে ভোটের কাজের জন্য তিনি (প্রেসিডেণ্ট) সেখানে যেতে পারছেন না। এই অনুপস্থিতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও উপাধি দিতে অনিচ্ছুক ছিল। আম্বেদকর বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত অভাবে নিউইয়র্ক যেতে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গী হচ্ছেন না।

৩১ মে শনিবার আম্বেদকর নতুন দিল্লি থেকে বম্বে ফিরে আসেন। রাত্রিবেলা বম্বের 'ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া'-তে তাঁকে এক 'ডিনার পার্টি'তে সিদ্ধার্থ কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ ভি.এস.পতনকর ও রেজিস্ট্রার কে.ভি. চিত্রে কর্তৃক অভিনন্দিত করা হয়। ডঃ পতনকর বলেন, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়

এখন পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি ডঃ আম্বেদকরকে সম্মানিত করার কথা ভাবেনি। এমনকি তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন সেই বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ও কোনো উদ্যোগ নেয়নি এবং এটা পড়ে থাকে (তাঁকে সম্মান জানানোর দায়িত্ব) এক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। উত্তরে (অভিনন্দনের) আম্বেদকর বলেন, যদিও তাঁকে একজন বদমেজাজি মানুষ বলা হয়ে থাকে এবং কর্তৃপক্ষের সাথে অনেক বিষয়ে তাঁর বিরোধ আছে, তাই বলে কারও উৎকণ্ঠায় থাকা উচিত নয় যে, তিনি সেখানে ভারত সম্পর্কে কোনো রূঢ় কথা বলবেন। কোনো ব্যাপারেই তিনি দেশের সঙ্গে প্রতারণামূলক কিছু করেননি এবং সব সময় দেশের স্বার্থকেই তাঁর হৃদয়ে রেখেছেন। এমনকি গোলটেবিল বৈঠকেও দেশের স্বার্থের ব্যাপারে তিনি গান্ধির চেয়ে অন্তত দু'শো মাইল এগিয়েছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন আম্বেদকর বম্বে থেকে T.W.A.-র ফ্লাইটে নিউইয়র্ক রওনা হন। বিপুল সংখ্যায় জড়ো হয়ে তাঁর অনুগামী ও গুণমুগ্ধরা সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান। ৫ জুন সমাবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছয় ব্যক্তিকে সাম্মানিক উপাধি Ñ 'ডক্টর অব ল' প্রদান করে। ১৯৮ তম অনুষ্ঠানে আম্বেদকরকে 'ডক্টর অব ল' উপাধি দ্বারা ভূষিত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়টি তাঁকে "সংবিধানের রচয়িতা, মন্ত্রীসভা ও কাউন্সিলের সদস্য, ভারতের প্রধান নাগরিকদের মধ্যে অন্যতম, একজন মহান সমাজসংস্কারক ও মানবাধিকারের একজন পরাক্রমশালী সমর্থকরূপে বর্ণনা করে" অভিনন্দিত করে। ১৭ টি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের মোট ৬৮৪৮ জন স্নাতকের উপাধি গ্রহণের দৃশ্য দেখার জন্য যে বিশাল জনতা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের সামনে আম্বেদকর তাঁর উপাধি গ্রহণ করেন। আরও যাঁরা যাঁরা সাম্মানিক উপাধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যানাডিয়ান সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ফরেন অ্যাফায়ার্স লেস্টার বি.পিয়ার্সন ও ফরাসি সাহিত্যের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ এম.ড্যানিয়েল মর্নেট।

১৪ জুন আম্বেদকর বম্বে ফিরে আসেন। পরদিন সংবাদ মাধ্যমকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তাঁর ধারণা যে আমেরিকার সাধারণ মানুষের সমর্থনের ঝোঁক পাকিস্তানের দিকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে আমেরিকায় তাঁকে বলা হয় এমন হবার কারণ হল বৈদেশিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত নির্বাচনে পাকিস্তান সব সময়ই খুব সতর্কতা অবলম্বন করে; আর ভারত তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিদেশে পাঠায় অনভিজ্ঞ লোকদের। তিনি আরও বলেন, আমেরিকার যে সব অধ্যাপক ভারত ভ্রমণ করেছেন তাঁদের অভিমত হচ্ছে Ñ ভারতীয় ছাত্ররা নিকৃষ্টমানের শিক্ষা গ্রহণ করে ও তা থেকে তারা যেমন যথেষ্ট পথনির্দেশ ও জ্ঞান আহরণ করতে পারে না, তেমনি গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রেও তারা কোনো অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে না।

বম্বের নারে পার্কে অনুষ্ঠিত তপশিলি সংগঠনগুলির এক সভায় ২৮ সেপ্টেম্বর আম্বেদকর একটি ভাষণে বিল্ডিং ফাণ্ড-এর সংগঠকদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন এবং অতি সত্বর তাদের হিসাব পেশ করতে বলেন। তিনি তাঁর লোকদের বলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের উপর তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন এবং যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনি তখন এতটাই রাগান্বিত যে, তাঁর দশ মিনিটকাল বক্তৃতার মধ্যে যখন সেই মঞ্চে এক ব্যক্তি ফিসফিস করে কথা বলেন, সেই মুহূর্তে তিনি গর্জে উঠে বলেছিলেন, "আমি কিন্তু এটা সহ্য করব না। আগামী দিন আপনারা আমার কাছে হিসাব দেবেন।" তাঁর এই ভাষণ সহযোগীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিল্ডিং ফাণ্ড শুরু হয়েছিল ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল।

আম্বেদকর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি যান ও ডিসেম্বর মাসে আবার বম্বে ফিরে আসেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ এলফিনস্টোন কলেজে ছাত্রদের বার্ষিক সমাবেশে তিনি "আধুনিক যুগে ছাত্রদের সমস্যা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি ছাত্রদের কাছে আবেদন রাখেন আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেরানি-প্রশিক্ষণের কেন্দ্র না করে জ্ঞানার্জনের পীঠস্থানে পরিণত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার জন্য।

১৯৫২-র ডিসেম্বর মাসে 'পুনা ডিস্ট্রিক্ট ল লাইব্রেরি'র সদস্যগণ এল.আর. গোখেলের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন ও গ্রন্থাগারে দান করা বই উন্মোচন করার ঘোষণার জন্য আম্বেদকরকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর পুনা শহরে আম্বেদকর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন ও গ্রন্থাগারের নতুন বিভাগ খোলার কথা ঘোষণা করেন এবং জনসমাবেশে "গণতন্ত্রের সাফল্যমণ্ডিত কাজের পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্ত" (Conditions Precedent for the Successful Working of Democracy) সম্পর্কে তিনি একটি ভাষণ দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তিনি বলেন, "গণতন্ত্র সব সময় তার রূপ পরিবর্তন করছে; এক দেশে সব সময় এটা একই রকম থাকে না ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তার উদ্দেশ্যেরও বদল ঘটে।" তাঁর মতে আধুনিক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য স্বৈরতান্ত্রিক রাজার ক্ষমতাকে লাগাম পরানোর চেয়েও বেশি সাধারণ মানুষের কল্যাণ করা। ওয়াল্টার বেজট-এর সংজ্ঞা হচ্ছে, 'গণতন্ত্র হচ্ছে আলোচনার মাধ্যমে সরকার' ও আব্রাহাম লিঙ্কনের দেওয়া সংজ্ঞা হল 'একটি সরকার হচ্ছে জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।' এই সংজ্ঞাগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আম্বেদকর বলেন, তাঁর নিজের সংজ্ঞা হচ্ছেÑ "এমন আকার ও পদ্ধতি বিশিষ্ট সরকার, যার দ্বারা একটি দেশে

রক্তপাত ছাড়াই মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।''

এরপর তিনি বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেন, সফল গণতন্ত্রের জন্য প্রথমেই যেটা দরকার, তা হল সমাজে স্পষ্ট দৃশ্যমান কোনো অসাম্য অবশ্যই থাকবে না, থাকবে না কোনো নিপীড়িত শ্রেণি কিংবা কোনো নিগৃহীত শ্রেণি। দ্বিতীয় দরকারি জিনিসটি হচ্ছে সরকার ভুল পথে যাচ্ছে কি না, তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বিরোধী দল। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে আইন ও প্রশাসনের চোখে থাকবে সমতা। চতুর্থটি হচ্ছে সাংবিধানিক নৈতিকতা পালন। পঞ্চম বিষয়টি হল গণতান্ত্রিক সরকারের কাজকর্ম সফলভাবে চালাতে সমাজের দরকার নৈতিক শৃঙ্খলা মেনে চলা; নৈতিক শৃঙ্খলাই গণতন্ত্র এনে দেয়। সবশেষ বিষয়টি হচ্ছে গণচেতনা। এই ভাবনা উদ্রেককারী বক্তৃতাটি অনেকদিন ধরে সংবাদপত্রে একটি আলোচ্য বিষয় হয়েছিল।

কোলাপুর গিয়ে আম্বেদকর ১৯৫২ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাজারাম কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "জ্ঞানই হল মানুষের জীবনের ভিত এবং সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে প্রত্যেকটি ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে ও তার ধীশক্তি জাগ্রত হয়।'' তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করার কথা বলেন ও তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার ব্যবহার করতে বলেন। ডঃ সবিতা আম্বেদকর পুরস্কার বিতরণ করেন।

কোলাপুরের মহিলারা হাজারে হাজারে সমবেত হয়েছিলেন আম্বেদকরকে স্বাগত জানাতে। তাঁদের স্বাগত ভাষণের উত্তরে আম্বেদকর হিন্দু কোড বিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, বিশিষ্ট ভারতীয় নেত্রীদের মধ্যে কেউই আসলে মহিলাদের সামাজিক উন্নয়নে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। হিন্দু কোড বিল এখন ঠিক তিক্ত অ্যাসিড মিশিয়ে নষ্ট করা দুধের মতো। তাঁরা যদি চান হিন্দু কোড বিল পাশ হোক, তবে তাঁদের দেখা উচিত দু'জন স্থূলকায় মহিলা সেজন্য যেন অনশনে বসেন! 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর বেলগাঁও জেলা-শাখার পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ৫০,০০০ লোকের এক জনসভায় আম্বেদকর ভাষণ দিতে গিয়ে শাসক দলের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, যদি পরবর্তী নির্বাচনের আগে তপশিলি জাতির ভাগ্যের উন্নতি না হয়, তবে 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন' কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে, যা সরকারের রথ উলটে দিতে পারে ও তার ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তিনি অতীতের ফরাসি ও রুশবিপ্লবের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বজ্রহুংকারে বলেন, "আমি আমার লোকদের দুরবস্থা লাঘব করার জন্য আর দু'বছর বা এমনকি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করব, এর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যদি নতুন কিছু ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা বেরিয়ে না আসে, তাহলে আমি তখন এক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে

বাধ্য হব।'' তপশিলি জাতির ভবিষ্যতের সমস্ত প্রসঙ্গই এ বক্তৃতায় তুলে ধরা হয়।

সমস্ত সংবাদপত্রই আবার তাঁর বক্তৃতার সমালোচনা করে, যদিও তার মধ্যে কোনো কোনোটি তাঁর ক্ষোভের গভীরতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে। অনেকগুলিতে বলা হয় তাঁর এই হুমকিকে বেশি উত্তেজনা না দেখিয়ে বাতিল করে দেওয়া যায়, কেননা মাঝে মাঝে তিনি এমন হুমকি দিয়েই থাকেন। তাদের কাছে তিনি হুমকি দেবার এক প্রবাদপুরুষ!

দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালের ১২ জানুয়ারি আম্বেদকরকে তাঁর উচ্চতম অবস্থানে উত্থান ও মহান কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সাম্মানিক 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করে। সমগ্র ভারতে এই একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই খ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি রূপে স্বীকৃতিদানের গৌরব আছে।

১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানে 'Indo-Japanese Cultural Association'-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এম.আর. মূর্তির সম্মানে নতুন দিল্লিতে রাজভোজ কর্তৃক আয়োজিত এক সংবর্ধনাসভায় ডঃ আম্বেদকর উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ দিতে গিয়ে সেখানে তিনি বলেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বর্তমান বা ভাবীকালের প্রজন্মকে বুদ্ধ ও কার্লমার্কস Ñ এই দু'জনের মতাদর্শের মধ্যে একজনের মতাদর্শকে শেষ পর্যন্ত বেছে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যেই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে, কিন্তু তাঁর ভয় Ñ যদি বুদ্ধের নীতি গৃহীত না হয়, তাহলে ইউরোপের সংঘাতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এশিয়া মহাদেশেও ঘটবে।

হুমকি বিফলে যায়নি। এপ্রিল মাসে অস্পৃশ্যতা দূর করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে সংসদে হৈচৈ-চেঁচামেচি হয় এবং এই সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি সমন্বিত বিধিবদ্ধ আইন তৈরি করার প্রস্তাব পাশ হয়। সংসদের অনেক সদস্য যাঁরা বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা অভিযোগ করেন যে, অস্পৃশ্যতা শুধু কাগজেকলমেই দূর হয়েছে, বাস্তবে নয়। অস্পৃশ্যতাজনিত অপরাধের জন্য অত্যন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা মনে হয় সব থেকে জরুরি। একজন হরিজন সাংসদ সভায় বলেন, কীভাবে এক হোটেলওয়ালা তিনি ও একজন এম.এল.এ. যে কাপ ব্যবহার করেছিলেন তা লাথি মেরে ফেলে দেয়, কীভাবে হায়দারাবাদে একজন হরিজন মন্ত্রী একটি মন্দিরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তাঁকে লাঠি দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয় ও দিল্লিতে এক নাপিত কীভাবে সংসদের একজন হরিজন সদস্যের দাড়ি কামাতে অস্বীকার করে। তবু এখনও বর্ণহিন্দু নেতারা বিড়বিড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আম্বেদকরের আচরণ এখনও রূঢ় ও অতীতকে তিনি ভোলেননি!

মে মাসে বম্বেতে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের উচ্চপ্রশংসা করে এক চমৎকার বক্তব্য রাখেন। বারবার তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আস্থার কথা বলেন এবং নিজেকে তার প্রসারণের কাজে উৎসর্গ করেন। এর কিছুদিন পরে ক্রাউলিকে দেওয়া তার ট্রান্সমিশন সিরিজের জন্য এক সাক্ষাৎকারে তপশিলি জাতির এই নেতা বলেন, যদি সমাজের পরিকাঠামো বদল না হয়, তবে বর্তমান ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই ধসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি বলেন, ভারতে যদি গণতন্ত্র কাজ না করে, তাহলে সাম্যবাদের কিছুটা তার বিকল্প হবে।

জুলাই এবং আগস্ট মাসে আম্বেদকর তাঁর কলেজের কাজকর্ম নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত থাকেন। জুলাই-আগস্টের অধিকাংশ দিন তিনি ঔরঙ্গাবাদে কাটান। সেখানে 'হায়দারাবাদ তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর কর্মী ও নেতাদের এক সভায় ভাষণে তিনি বলেন, জাতির জীবনে রাজনীতিই সবকিছু নয়। রাজনীতি, সমাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনীতিÑ সমস্ত বিষয়েই ভারতের সমস্যা নিয়ে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে অধ্যয়ন করার জন্য তিনি তাঁদের প্ররোচিত করেন ও তারপর পিছিয়ে পড়া মানুষদের পরিত্রাণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে বলেন। ওই সভায় তিনি তাঁর লোকদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, যাঁরা হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন তাঁদের তিনি সমাজচ্যুত করবেন। এতে তাঁদের কোনো মঙ্গল হয় না।

ঔরঙ্গাবাদে অবস্থানকালে তিনি সংবাদপত্রে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভাষাভিত্তিক রাজ্যের পরিণতি যাই হোক না কেন, একবার যদি অন্ধ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়, অন্যান্য ভাষাভিত্তিক রাজ্যেরও সৃষ্টি হবেই। যদি প্রশাসনের পক্ষে সুবিধা হয়, তাহলে তিনি দু'টো মারাঠি ভাষাভাষী রাজ্যের পক্ষে। কাশ্মীরের ঘটনাবলি প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, ভারতীয়রা যখন কোটি কোটি টাকা কাশ্মীরিদের নিরাপত্তার জন্য খরচ করছে তখন ভারতের সাথে তারা মিশে যেতে প্রস্তুত, না প্রস্তুত নয়Ñ একথা কাশ্মীরিদের জিজ্ঞাসা করার অধিকার ভারতীয়দের অবশ্যই আছে। ঔরঙ্গাবাদে থাকাকালীন তিনি তাঁর দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করতেন না, যতক্ষণ না তাঁরা প্রত্যেকে কলেজের বিশাল কম্পাউণ্ডে একটি করে গাছ লাগিয়ে নিজেকে তার যোগ্য করে তুলতেন। এর ফলে সেখানে শত শত গাছ লাগানো হয়ে যায়। একবার নিজেই কড়ুল, নিড়ানি ও গাঁইতি নিয়ে একদল সহকর্মী ও নেতাকে পরিচালনা করে মাহাদে একটি ছাত্রাবাসের কম্পাউণ্ড পরিষ্কার করেছিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সরকারের প্রস্তুতি পর্বে

তখন নতুন অন্ধ্ররাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে আনা 'অন্ধ্র স্টেট বিল' (Andhra State Bill) নিয়ে হঠাৎ এক ঝড় বয়ে গিয়ে শান্ত পরিবেশ নষ্ট হয়। কাউন্সিল অব স্টেটস-এ ১৯৫৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর বিলটির উপর আলোচনায় ডঃ আম্বেদকর ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন নিয়ে দ্বিধান্বিত নীতির জন্য সরকারের সমালোচনা করেন। রাজ্যগুলির ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন ভারতকে নানা অংশে বিভক্ত করবে এ কথা তিনি জোরালোভাবে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, পোট্টি শ্রীরামালুকে অন্ধ্ররাজ্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জীবন দিতে হয়। সরকারিভাবে গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অন্য কোনো দেশে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে সেই দেশের সরকারকে বিনা বিচারে বরখাস্ত করা যায়।

সংখ্যাগরিষ্ঠের নিপীড়ন, নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তপশিলি জাতির অধিকার রক্ষায় বিলটির মধ্যে কোনো ব্যবস্থা না রাখায় আম্বেদকর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাটজুর প্রতি দোষারোপ করেন। সংবিধানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজ্যের গভর্নরদের হাতে বিশেষ ক্ষমতার অভাব বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ঐতিহ্য পেয়েছি। লোকে সব সময়ই আমাকে বলে থাকে, 'ও, আপনিই তো সংবিধানের স্রষ্টা।' আমার উত্তর হচ্ছেÑ আমি ছিলাম একজন ভাড়াটে লেখক মাত্র। আমাকে যা লিখতে বলা হয়েছে, আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটাই তাই লিখেছি।"

এ কথায় ভীষণ বাধা আসে, যার ফলে বিতর্কে উত্তাপ ও তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং সকলের মেজাজ তুঙ্গে ওঠে। একজন সদস্য 'ডঃ আম্বেদকর নিজেই সংবিধানের পক্ষে বলেছেন' বলে বিদ্রূপ করে তাঁর ক্রোধের আগুনে বাতাস দেন এবং 'ডঃ আম্বেদকর স্বয়ং সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছেন' বলে সেই আগুনে খোঁচা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাটজু। প্রথম অভিযোগের উত্তরে আম্বেদকর বলেন, "আমরা আইনজীবীরা অনেক কিছুর সমর্থনেই বলি।" দ্বিতীয়টির উত্তরে তিনি বলেন, "আপনি আপনার নৈতিক ভুলের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করতে চান।" তারপর বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়ে তিনি বলেন, "মহাশয়, আমার বন্ধুরা বলেন, সংবিধান আমি তৈরি করেছি। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বলতে প্রস্তুত যে, এই সংবিধান পুড়িয়ে দিতে আমিই প্রথম ব্যক্তি। আমি এটা (সংবিধান) চাই না। এটা কাউকে সন্তুষ্ট করবে না। কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের লোকেরা যদি এটা (সংবিধান) নিয়ে চলতেই চান, তাহলে অবশ্যই তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, এখানে সংখ্যাগুরুরা আছেন, এবং সংখ্যালঘুরাও

আছেন। 'তোমাদের স্বীকৃতি দিতে গেলে গণতন্ত্রের ক্ষতি করা হয়' বলে তাঁরা সংখ্যালঘুদের পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারবে না। আমি বলতে চাই সংখ্যালঘুদের অনিষ্ট করা হলে সব চেয়ে বড়ো ক্ষতিই হয়ে যাবে। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় বম্বে প্রদেশে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তা যদি এভাবেই চলতে থাকে, আমি সংকীর্ণ হতে চাই না, আমি জানি না তাহলে শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে। আমি নিজেকে মহারাষ্ট্রের লোক বলে পরিচয় দিতে পর্যন্ত চাই না; আমি হিন্দির সমর্থক, কিন্তু বিপদ হচ্ছে, হিন্দি ভাষাভাষী লোকেরাই হিন্দির শত্রু।"

শেষের বিব্রতকর বাক্য দু'টি দেখায় যে, ক্রোধের ঝড় সেদিন সমস্ত পাল ছিন্ন করেছিল; জাহাজ প্রচণ্ডভাবে দোল খাচ্ছিল! চেয়ারম্যান ডঃ আম্বেদকরকে "ডঃ আম্বেদকর, এটা একটা স্বগতোক্তি!" বলে শান্ত হতে অনুরোধ করেন। ডঃ আম্বেদকর বলেনÑ "এটা একটা স্বগতোক্তি"।

সংবিধানের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের আক্রমণ ছিল সত্যি মারাত্মক। তিনি চরম আশাভঙ্গে বেপরোয়া হয়ে বজ্রহুংকার ছেড়ে আক্রমণ করেছিলেন। এটা ছিল ন্যায়সঙ্গত রাগে আবৃত তাঁর অস্থির অবস্থা। সংবাদপত্রজগৎ তাঁর এই ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় দুঃখ বোধ করে এবং সংবিধানের তৃতীয় পাঠের সময় তিনি যে চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সংখ্যালঘুদের জন্য আরও বেশি সাংবিধানিক রক্ষাকবচের জন্য আম্বেদকরের অনুরোধের সমালোচনা করে পি. কোদণ্ডরাও বলেন, "এটা খুবই দুঃখজনক যে, আমাদের আধুনিক মনু নিজেকে একজন অস্পৃশ্য ভাবেন।" কেউ কেউ আম্বেদকরকে সেই মায়ের সঙ্গে তুলনা করেন, যে মা আপন সন্তানকে অভিযুক্ত করেন ও সবাইকে আহ্বান করেন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

যাইহোক, মনে হয় আম্বেদকর তাঁর পুরোনো অবস্থান ফিরে পাচ্ছিলেন, যখন পরের সপ্তাহে সরকার সংবিধানের উপর মৃদু আক্রমণ করে। তিনি পেপসুতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি রাখার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩৫৬ ধারার আশ্রয় নেওয়ায় সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন, এ কাজ সরকারের নামে কালি লেপন করবে। তিনি মন্তব্য করেন, এ কাজ অন্যায়, এটা করা উচিত হবে না। ওই একই বক্তৃতায় তিনি দু'টো রাজ্যে রাজা গোপালাচারী ও মোরারজি দেশাইকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করার জন্য সরকারকে আক্রমণ করেন। রাজা গোপালাচারী Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন এবং মোরারজি দেশাই সাধরণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের এই পদোন্নতির প্রবল নিন্দা করেন এবং বলেন, সরকার কর্তৃক সংবিধানের উপর এ দু'টো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হামলার উদাহরণ।

অল্পদিন পরেই 'স্পেশাল ম্যারেজ বিল' আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। হিন্দু

আইন নিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে আলোচনা করার পদ্ধতিটি ছিল একটি মারাত্মক ব্যাপার এবং এটি সংস্কার করার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত। রাজ্যসভায় স্পেশাল ম্যারেজ বিল নিয়ে বলার সময় আম্বেদকর সাবধান করে দেন। ১৮৭২ সালের ধারাটি বাতিল না করে সংশোধনী বিল এনে সেটিকে সংশোধন করা উচিত। তিনি সবশেষে বলেন, হিন্দুসমাজ গোঁড়া; সুতরাং সরকারের উচিত সময় নিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা ও এমন বদল ঘটানো, যেগুলি সমাজ সমর্থন করবে।

১৯৫৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় 'এস্টেট ডিউটি বিল' নিয়ে আলোচনার সময় তিনি ভারত সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, এস্টেট ডিউটি থেকে আদায়ীকৃত অর্থ 'এস্টেট ডিউটি ল'-এর সংগৃহীত ও প্রশাসনিক খরচের সঙ্গে যথোপযুক্ত নাও হতে পারে। তিনি পুনরায় বলেন যে, ভারত এখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, কারণ অন্য কিছু কিছু দেশ কিছু না কিছু করে ফেলেছে। তিনি বলেন, অন্ধভাবে ইউরোপকে অনুসরণ করা ভারতের উচিত নয়। ইউরোপের পক্ষে যা ভাল, ভারতের পক্ষে তা ভাল নাও হতে পারে। ভারতের এমন পদক্ষেপ গ্রহণের আগে ইউরোপের লোকেরা যে মানে পৌঁছেছে, ভারতীয়দেরও সেখানে পৌঁছানো দরকার।

তিনি শ্লেষাত্মকভাবে মন্তব্য করেন, যদি ভারত একটি কম্যুনিস্ট দেশ হত তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত; এবং তার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত শীঘ্রই একটি কম্যুনিস্ট দেশে পরিণত হবে। তবে ভারত যতদিন না রুশীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, ততদিন সে এমন পদক্ষেপ নেবে না, যা ক্যাপিটাল ফরমেশনকে প্রতিহত করতে পারে। তিনি বলেন, তিনি বিলের বিরোধিতা করছেন না; কিন্তু তিনি চান ভারতের লোকেরা যাদের ঘৃণা করে সেই পুঁজিপতি ও পুঁজির মধ্যে তফাতটা সবাই বুঝুক। সুতরাং পুঁজিপতিদের জন্য তিনি কোনো আধার বানাচ্ছেন না।

পতিতজমি দখলের জন্য 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন' মারাঠওয়াড়ায় যে সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল আম্বেদকর তা ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তুলে নেন। তিনি এটা করেছিলেন জমির দাবির প্রতি ভালো সাড়া পাওয়ার আশায়। প্রায় ১৭০০ সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন এবং ১১০০-কে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। যাই হোক, কয়েকজন সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সময় গাছ কেটেছিলেন বলে আম্বেদকর দুঃখ প্রকাশ করেন।

সরকারের উপর আম্বেদকরের তিক্ত আক্রমণের আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়; ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে "অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন, ১৯৫৩" (The Untouchability (Offences) Act, 1953) নাম দিয়ে সরকার একটি বিলের ঘোষণা করে ও ১৯৫৪-র মার্চ মাসে তা উপস্থাপন করে। বিলটির উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ করা এবং ঘোষণা করা হয়, যারা অস্পৃশ্যতা মেনে চলবে

তাদের জেল, জরিমানা হবে ও ব্যাবসাবাণিজ্য, পেশা বা নিয়োগের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের অধিকার বাতিল করা হবে এবং অহিন্দুদেরও এ বিলের আওতায় আনা হয়। সাধারণভাবে সরকারের প্রস্তাবিত এই বিলকে স্বাগত ও সমর্থন জানানো হয় এবং ডঃ আম্বেদকর কয়েকদিন পর বিলটির উপর সরকারকে নানা রকম পরামর্শ দেন।

আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের পুনরায় অবনতি হয় ও দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে তিনি বম্বের হোটেল মিরাবেলে সযত্ন চিকিৎসাধীন থাকেন। শয্যাশায়ী হলেও তিনি ১৯৫৪ সালের ৪ জানুয়ারি রবিবার বম্বের ফেমাস স্টুডিওতে Atre Pictures' Marathi Offering "Mahatma Phooley"-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রযোজক আচার্য পি.কে. আত্রের সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন, "আজকাল প্রত্যেকেই রাজনীতি ও সিনেমার দিকে নজর দেন, কিন্তু সমাজসেবার একটি বৃহত্তর মূল্য আছে, কারণ তার মাধ্যমে চরিত্র গঠিত হয়। আত্রের ছবি জ্যোতিবা ফুলের স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে, যিনি ছিলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারকদের মধ্যে একজন।" বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং তাঁর "শ্যামচি আই" ছবির জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক বিজেতা আচার্য আত্রে জ্যোতিবা ফুলের জীবনের প্রাণবন্ত ঘটনাগুলিকে চিত্রিত করে চমৎকার একটি ছবি উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক ও শ্রমসাধ্য এই কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করেছেন।

আগের রবিবার বম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ময়দানে আম্বেদকর 'অল ইণ্ডিয়া সাই ডিভোটিস'-এর এক অধিবেশন উদ্বোধন করেন। তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আজকাল আমাদের ধর্মে না আছে ঈশ্বর, না আছে নৈতিকতা। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা মানব মনের এক বিরাট অধঃপতিত অবস্থা; এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রতর ও মহত্তর রূপে ধর্মকে ফিরিয়ে আনা।" তিনি আরও বলেন, তাঁর সময়ে 'পুতুলপূজা' ছাড়া ভারতে কোনো ধর্মই ছিল না, তা সে সাধুদের হোক কি সন্তদের হোক বা যাঁরা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন তাঁদেরই হোক। তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় ধর্ম ছিল ব্যক্তিগতভাবে মানবাত্মার মুক্তির বিষয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বোঝাত পারস্পরিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী নৈতিক নিয়মাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবিক ভ্রাতৃত্বকে মেনে চলা। এর তৃতীয় পর্যায়ে, মানুষ পূজা করে সেইসব ব্যক্তিত্বকে যাঁরা তাঁদের জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারেন এবং এর শেষ পর্যায়ে যে ব্যক্তি অলৌকিক ঘটনা ঘটানÑ মানুষ তাঁকেই পুজো করে। তিনি উপসংহারে বলেন, সন্তদের নামে সংগৃহীত অর্থ হাসপাতাল, শিক্ষা, ছোটো ছোটো শিল্প প্রতিষ্ঠান, অসহায় মানুষ ও বিধবাদের জন্য খরচ হওয়া উচিত। শুরুতেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি সাঁইবাবার সমর্থক নন বা তাঁর

সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগও তাঁর হয়নি।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি যান। কিন্তু শীঘ্রই ১৯৫৪ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে লোকসভার এক উপনির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ভাণ্ডারা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে তাঁকে নাগপুরে আসতে হয়। নির্বাচনী প্রচারের সময়ে তিনি বলেন, দেশ ধ্বংস হতে চলেছে বলেই তিনি নির্বাচনে লড়ছেন, যাতে বিরোধী পক্ষে থেকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি লোকদের কাছে বলতে পারেন। তিনি বলেন, সংসদে যাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হত না, যদি তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করতে তৈরি থাকতেন। নেহরু-সরকার ও নেহরুর নেতৃত্বকে তিনি সামনা-সামনি আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, নেহরুর বৈদেশিক নীতি ভারতকে বন্ধুহীন দেশে পরিণত করেছে। কাশ্মীর প্রশ্নে তিনি আনাড়ির মতো কাজ করেছেন এবং যারা অসৎ তাদের আশ্রয় দিচ্ছেন। এখন ভারতের একদিকে রয়েছে এক ধরনের ইসলামিক যুক্তরাষ্ট্র, অপরদিকে রয়েছে রাশিয়া ও চিনের মতো কম্যুনিজমের অধীনস্থ করার জন্য এশিয়াকে জয় করার যুগ্মশক্তি।

ডঃ আম্বেদকর বলেন, “যদি তোমরা ফলপ্রসূ হতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাদের বন্দুক থাকতে হবে, নরম বক্তৃতা নয়। তোমাদের মনকে তৈরি করতে হবে। তোমরা কি সংসদীয় সরকার চাও? সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে এটাই হচ্ছে অত্যন্ত জটিল। যদি তোমরা তা চাও, তাহলে যাদের সংসদীয় সরকার আছে এবং যারা আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুত্ব করতে হবে। যদি তা না চাও, তাহলে এস, আমরা রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে আগামীকালই যোগ দিই ও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।” সুতরাং, যে সরকার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হলেও কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, সেই সরকার বদলে দেওয়া জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য।

আম্বেদকর বলেন, গত নির্বাচনগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থীদের Ñ যাদের কোথাও কোনো শিকড় ছিল না, তাদের চরম পরাজয়ে ছত্রভঙ্গ হওয়ার ফলে তাঁর মোহমুক্তি ঘটে। তাঁর মতে, শহরে তাদের বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও গ্রামাঞ্চলে সে সম্ভাবনা ছিল সামান্যই। তিনি বলেন, “যে দলের গ্রামাঞ্চলে কোনো সমর্থন নেই, তার ভবিষ্যৎও নেই।” সমাজতান্ত্রিকদের কর্মসূচি গ্রামীণ লোকদের প্রয়োজনের সাথে এতই সম্পর্কহীন ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদের কাছে তা এতই বিরক্তিকর যে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না কোথা থেকে তাঁরা সমর্থন পাবেন। সুতরাং তিনি উপনির্বাচনে সাধারণ আসনে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে চাইলেন, যিনি তাঁর সাথি হবেন। যাইহোক, তিনি অশোক মেহতাকে যথেষ্ট যোগ্য প্রার্থী হিসাবে সমর্থন করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং

যদিও আম্বেদকর ১,৩২,৪৮৩ টি ভোট পান, তবুও কংগ্রেসের হরিজন প্রার্থীর কাছে ৮,৩৮১ ভোটে পরাজিত হন। তবে অশোক মেহতা কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে সংসদে নির্বাচিত হন।

এই উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের প্রাক্কালে বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে আম্বেদকর বিমানযোগে রেঙ্গুন রওনা হন। দিল্লি ত্যাগ করার আগে বিশ্বস্ত সহকর্মী কে.ভি. চিত্রেকে তিনি লিখেছিলেন, "অপরাপর সূত্র থেকে এখানে যে রিপোর্ট আসছে, তাতে উপনির্বাচনে আমার পরাজয়ের কথা বলা হচ্ছে। এটা অসম্ভব নয় এবং আমি এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতও আছি।" তিনি তাঁর এই পরাজয়ের খবর রেঙ্গুনের এক খবরের কাগজে পড়েন। প্রায় এক পক্ষকাল সেখানে থাকার পর তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন।

আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। তবু রাজ্যসভার অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। ১৯৫৪-র ২৬ আগস্ট তিনি বৈদেশিক নীতির উপর অত্যন্ত ভাবোদ্দীপক একটি ভাষণ দেন এবং Low-এর ব্যঙ্গচিত্রের কথা সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন; যেখানে ইউরোপের বিদেশমন্ত্রীদের নৃত্যগীতরত অবস্থায় চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁরা গাইছেনÑ 'ও! আমাদের শান্তি দাও, চুলোয় যাক নৈতিকতা।' তিনি বলেন, তিনি আনন্দিত যে, (আমাদের) প্রধানমন্ত্রীর কিছু নিশ্চিত নীতি আছে, যার উপর নির্ভর করেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। তিনি মন্তব্য করেন, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশনীতি তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছেÑ একটি শান্তি, দ্বিতীয়টি কম্যুনিজম ও মুক্ত-গণতন্ত্রÑ এই দুয়ের মধ্যে সহাবস্থান এবং তৃতীয়টি হল SEATO-র বিরোধিতা। আম্বেদকর যখন বলেন, রাশিয়া ইউরোপের দশটি রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছে এবং চিন, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার অনেক অঞ্চল দখল করে নিয়েছে, তখন একজন কম্যুনিস্ট সদস্য বারবার তাঁকে উত্যক্ত করেন। আম্বেদকর মন্তব্য করেন, পৃথিবীর দেশগুলিকে বিভাজিত ও ছিন্নভিন্ন করে শান্তি ক্রয় করা হচ্ছে।

রাশিয়ার প্রসঙ্গ তুলে আম্বেদকর বলেন, "এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন (কম্যুনিজম) অন্য লোকদের ধ্বংস করে একটা বিশাল দেশকে চিরদিনের জন্য দখল করে তাদের মতাদর্শে তাদেরকে শুষে নিচ্ছে; বলা হচ্ছে তারা মুক্তি দিচ্ছে। আমি যতটা বুঝতে পারি রুশীয় মুক্তিকে অনুসরণ করে দাসত্ব, স্বাধীনতা তাকে অনুসরণ করে না।" আম্বেদকর বলে চলেন, "এই প্রকার শান্তির দ্বারা আপনারা বেশি কিছু করতে পারছেন না, বরং দৈত্য যখন কিছু চেয়ে তার চোয়াল খুলছে তখন প্রত্যেকবার তাকে কিছু গেলাচ্ছেন।"

অতএব আম্বেদকর সাবধান করে দিয়ে বলেন, "গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ভারতীয়দের মনে রাখতে হবে, ভুলে গেলে বা উপেক্ষা করলে চলবে না যে, রাশিয়ানরা ভারতের দিকেও ঘুরে দাঁড়াবে কিনা! তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন, কম্যুনিজম ও

স্বাধীন গণতন্ত্র একসঙ্গে থাকবেÑ সে যা-ই হোক, একেবারেই অসম্ভব; কারণ, **“কম্যুনিজম হচ্ছে দাবানলের মতো, কেবল জ্বালিয়ে দিতে দিতে যায় এবং সামনে যা কিছু পড়ে, সবকিছুকেই সে গ্রাস করে নেয়।”** ওই দাবানলের সন্নিকটে থাকা দেশগুলিও রয়েছে বিপদের মধ্যে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অবশ্যই কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কোনো দেশের বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে ভৌগোলিক দিকটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি। প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে তার বৈদেশিক নীতিও অবশ্যই আলাদা হয়। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যা ভালো ভারতের পক্ষে তা ভালো নাও হতে পারে। তিনি বলেন, “সুতরাং আমার মনে হয়, সহাবস্থানের নীতি প্রধানমন্ত্রীর তরফে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা না করেই গ্রহণ করা হয়েছে।” তিনি সংসদকে স্মরণ করিয়ে দেন, কীভাবে চার্চিল অনুতপ্ত হয়ে বলেছিলেন, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের জন্য এতগুলি দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তারা একটা মস্তবড়ো ভুল ও একটা মস্তবড়ো অন্যায় করেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কর্তব্য ছিল তাদেরকে স্বাধীন করে দেওয়া; কিন্তু দু’দেশের কোনোটিরও এমন একটা বিশাল কাজের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা কিংবা নৈতিক শক্তিও ছিল না।

তিনি বলেন, আর কোনো আগ্রাসন ও মুক্ত বিশ্বের আর কোনো অংশকে দখল করে নেওয়া থেকে রাশিয়া ও চিনকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই, তাঁরা SEATO পরিকল্পনা করেছেন। আম্বেদকরের মতে, SEATO কোনো দেশের উপর হামলা করার জন্য সংগঠন নয়; এটা স্বাধীন দেশগুলির উপরে পুনরায় হামলা প্রতিহত করার জন্য গঠিত একটি সংগঠন। তিনি বলেন, SEATO-র প্রতি অনীহার মনোভাবের উৎস মনে হয় নেহরু ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার দূরত্ব ও ভারত যদি SEATO-তে যোগ দেয়, তবে রাশিয়া কী ভাববেÑ এই ভয়। তিনি ঘটনার প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ভারত এখন সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিতÑ একদিকে তার পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র এবং অপরদিকে লাসা দখলের অনুমতি পাওয়া চিন। আম্বেদকর বলেন, বলতে গেলে প্রধানমন্ত্রী চিনাদের সাহায্য করেছেন তাদের সীমান্তকে ভারতের সীমান্তের কাছে টেনে আনতে। এসব দেখে আমার মনে হয়, এটা বলা বাহুল্য হবে না যে, ভারত ঠিক এখন যদি নাও হয়, একদিন সে হামলার মুখোমুখী হবেই এবং সেই হামলা করবে সব সময় হামলা করা যাদের অভ্যাস, তারা।”**

আম্বেদকর বলে চলেন, মাও সেতুং-এর গৃহীত পঞ্চশীল এবং তিব্বত অনাক্রমণ

** ১৯৬২ সালে চিনের ভারত আক্রমণ এবং বর্তমানে সীমান্তে চিনের ভারতবিরোধিতা আম্বেদকরের ভবিষ্যদ্বাণীকেই প্রমাণিত করে।

চুক্তির উল্লেখের উপর প্রধানমন্ত্রীর নির্ভর করা উচিত নয়। পঞ্চশীলের উপর যদি মাওয়ের বিশ্বাসই থাকে, যা বৌদ্ধধর্মের একটি অপরিহার্য অংশ, তাহলে নিজের দেশে তিনি বৌদ্ধদের প্রতি অন্যরকম আচরণ করতেন। তিনি মন্তব্য করেন, "রাজনীতিতে পঞ্চশীলের কোনো স্থান নেই; বিশেষত কম্যুনিস্ট দেশের রাজনীতিতে। কম্যুনিস্ট দেশগুলির দু'টো সুপরিচিত নীতি আছে, যেগুলি তারা সব সময় অনুসরণ করে থাকে। একটি হল নৈতিকতা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়, এখানে নৈতিকতা নেই। আজকের নৈতিকতা আগামীকালের নৈতিকতা নয়। ... এশিয়া এখন প্রায়শ যুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পরিণত। এশিয়ার অর্ধেকেরও বেশি কম্যুনিস্ট। জীবনযাত্রা প্রণালীর একটি আলাদা নীতি এবং একটি আলাদা সরকারি নীতি সে গ্রহণ করেছে। সুতরাং আমরা যদি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা যাদের স্বাধীন দেশ বলি তাদের সঙ্গে আমাদের এক কাতারে দাঁড়ানোই বেশি সঙ্গত।"

তিনি ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য করে বলেন, "আমাদের বৈদেশিক নীতির প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে, অন্য দেশের সমস্যার সমাধান করা, আমাদের নিজেদের দেশের সমস্যা সমাধান করা নয়।"

গোয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা দখল করে বা কিনে নেওয়া যায় অথবা ভারত গোয়াকে লীজও নিতে পারে। তিনি নিশ্চিত যে, গোয়া দখল করে নিতে ভারতীয়দের ক্ষমতা প্রদান করতে ভারত সরকারের পক্ষে সামান্য পুলিশের ক্রিয়াই যথেষ্ট। কিন্তু নেহরু পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে কেবল চিৎকারই করছেন, আসলে কিছু করছেন না। বক্তৃতার শেষে তিনি চেম্বারলিনের তোষণনীতির পরিণতিকে অবহেলা না করার জন্য নেহরুকে সাবধান করে দেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর তপশিলি জাতি-উপজাতির কমিশনারের দেওয়া রিপোর্টের উপরে বক্তব্য রাখার সময় আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের প্রতি সরকারি নীতির এবং বর্ণহিন্দুদের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। 'প্রত্যেক শনিবারে' (ঘন ঘন) সংবিধান সংশোধন করার তিনি বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তিনি সংবিধান সংশোধন করে সমস্ত পতিত জমি কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় আনার প্রস্তাব দেন। তিনি লবণ-কর পুনরায় চালু করা এবং অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য একটি 'গান্ধি ট্রাস্ট ফাণ্ড' গঠন করার জন্য আন্তরিকভাবে যুক্তির অবতারণা করেন। পতিত জমিতে তপশিলি জাতিকে পুনর্বাসন দেবার কাজে এই ফাণ্ড ব্যবহৃত হতে পারে। সরকার এ কাজটি করতে পারে Ñ জমি রাখার পরিমাণ সীমিত করে বাড়তি জমি অধিগ্রহণ করে, অথবা তপশিলি জাতিকে জমি কেনার জন্য অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে। লবণ-কর থেকে রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে ২ কোটি টাকা। আম্বেদকর মন্তব্য করেন, "লবণ-কর

বিলোপ করা হয়েছে গান্ধির স্মৃতিরক্ষার জন্যই। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। মোটের উপর আমাদের সকলের মতেই অস্পৃশ্যরা ছিলেন তাঁর অত্যন্ত আপন ও প্রিয়জন। তেমন কোনো কারণ নেই যে, স্বর্গ থেকে গান্ধি এই প্রকল্পকে আশীর্বাদ করবেন না।''

আম্বেদকর নেহরুর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ করে বলেন, নেহরু মনে হয় কেবল উদাসীনই নন, অস্পৃশ্যবিরোধীও বটে। তিনি বলেন, নেহরু কংগ্রেসি হরিজনদের একটি সম্মেলন করারও বিরুদ্ধে এবং অস্পৃশ্যতা দূর করার সরকারি প্রচারও নিষ্ফল। তিনি সভার কাছে আরও বলেন, সি.রাজাগোপালাচারী, যাঁর অসাধু বিষয়কে সাধুতার রূপ দেওয়ার এক দক্ষতা ছিল, সেই তিনিই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েই তপশিলি ছাত্রদের বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন। স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কাটজু তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, আম্বেদকর সম্ভবত অবগত নন যে, ঠিক সেই সময়েই বৈদেশিক বৃত্তি দিয়ে তপশিলি ছাত্রদের বাইরে পাঠানো হয়েছে।

আম্বেদকর সংবিধানের বিরুদ্ধে উত্তেজনায় গর্জে উঠেছিলেন; মনে হয় এবার নিজেকে সংশোধন করে নিচ্ছিলেন। সুতরাং যখনই সরকার সংবিধানের উপর বিরুদ্ধবাদী হস্তক্ষেপ করে তখনই তিনি তাঁর অবস্থান ফিরে পেতে এবং সংবিধানের স্থায়িত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করেন। এই সন্ধিক্ষণে সরকার সপ্তম তপশিলে লেজিসলেটিভ লিস্টে একটি অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করবে বলে সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) বিল উত্থাপন করে। এ বিলটির উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রালয়কে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ক্ষমতা দেওয়া।

জনগণের ম্যাণ্ডেট না নিয়ে সরকার যেভাবে মাঝে মাঝে সংবিধান সংশোধন করছিল আম্বেদকর তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সংবিধানের বয়স চার বছর কয়েক মাস; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একে দু'বার সংশোধন করা হয়েছে; এবং এটা হচ্ছে তার তৃতীয় সংশোধন। পৃথিবীতে এমন কোনো সংবিধানের কথা তাঁর জানা নেই, যা ক্ষমতাসীন সরকার এত দ্রুত ও অপরিণামদর্শীতার সাথে সংশোধন করেছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, সরকার মনে করছে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলেই তার কেবল আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা আছে তা নয়; জনসাধারণকে তাঁদের উদ্দেশ্যের কথা না জানিয়েই সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতাও তার আছে। তিনি বলেন, তিনি লক্ষ করছেন যে, সংবিধানের প্রতি সরকারের প্রবল অবজ্ঞা আছে এবং শ্রদ্ধা ও সমীহ অনেক কম। আম্বেদকর রাগত স্বরে অভিযোগ করে বলেন, সংবিধান ও আইনের মধ্যে যে অপরিহার্য পার্থক্য রয়েছে, সরকারকে তা উপলব্ধি করতে হবে। তাদের উচিত সংবিধান সম্পর্কে আরও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চলা। এবার আসল জায়গায় আঘাত করেন আম্বেদকর। দেশের প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলি তাঁর এই অবস্থানকে সমর্থন করে। যখন তিনি দেখেন শিশু-সংবিধান অত্যাচারিত হচ্ছে এবং

শাসকদলের কর্মপদ্ধতি, নীতি, সংকল্প ও পরিকল্পনার উপযোগী করে তোলার জন্য তাকে দোমড়ানো-মোচড়ানো হচ্ছে, তখন তিনি একজন মায়ের মতোই মর্মবেদনা অনুভব করছেন।

১৯৫৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর 'অস্পৃশ্যতা অপরাধ বিল'-এর (Untouchability Offences Bill) উপর বক্তৃতা করার সময় আম্বেদকর বলেন, কারাবাসের ন্যূনতম দণ্ডাদেশের ব্যবস্থা না থাকলে অসৎ কার্যকলাপ সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। তিনি সামাজিকভাবে একঘরে করার বিরুদ্ধেও শাস্তিদানের পক্ষে যুক্তি দেন; কারণ, উচ্চবর্ণীয়রা এর দ্বারা অর্থশক্তির বলে গ্রামের তপশিলি জাতির লোকদের সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করতে বাধা দেয়। তিনি বলেন, পাঞ্জাব-আইনের মতো কিছু সংখ্যক রাজ্য-আইন সংশোধন করার জন্য ক্ষমতার ব্যবহার করা উচিত ছিল। এই আইনগুলি তপশিলি জাতির বিরুদ্ধে পার্থক্যের সৃষ্টি করে এবং তপশিলি জাতি ও নিম্নশ্রেণির লোকদের, এমনকি তাঁদের স্থায়ী বাসগৃহ তৈরিতেও বাধা দেয়। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও আইনমন্ত্রকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেন এবং বলেন, বিষয়টা নিয়ে ওঁদের এগোনোর কোনো অনুভূতি বা তাড়া নেই এবং কোনো আদর্শবাদও নেই। একঘণ্টা ব্যাপী জোরালো বক্তৃতায় তিনি উপসংহারে বলেন, বিলটির নাম হওয়া উচিত Ñ "Civil Rights (Untouchables' Protection) Act." এবং এটা আরও ভাল হত যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষভাবে বিলটিতে বলতেন যে, এ বিলটি তপশিলি জাতির নাগরিক ও সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করার বিরুদ্ধে যে কোনো রকম বাধাকে দূর করতে চায়।

১৯৫৪-র ৩ অক্টোবর 'আকাশবাণী' (All India Radio) থেকে ডঃ আম্বেদকরের একটি বক্তৃতা "আমার ব্যক্তিগত দর্শন" (My Personal Philosophy) সিরিজে প্রচারিত হয়। তাতে তিনি বলেন, "প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা দর্শন থাকা উচিত, প্রত্যেকেরই একটা মানদণ্ড থাকবে যা দ্বারা আচরণ পরিমাপ করা যাবে। দর্শন একটি পরিমাপ করার মানদণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলে চলেন, "নেতিবাচকভাবে, আমি হিন্দুর সামাজিক দর্শনকে বর্জন করি যা সাংখ্যদর্শনের ত্রিগুণের ভিত্তিতে ভগবদ্‌গীতায় উপস্থাপন করা হয়েছে, যা আমার বিচারে কপিল-দর্শনের একটি নিষ্ঠুর বিকৃতি এবং যা হিন্দুর সমাজজীবনে জাতব্যবস্থা ও ক্রমানুসারে অসাম্যের সৃষ্টি করেছে।"

তিনি বলেন, "নিশ্চিতভাবে, আমার সামাজিক দর্শন বলা যেতে পারে তিনটি শব্দে সন্নিবেশিত Ñ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। কেউ বলতে পারবে না আমি আমার দর্শন ফরাসি বিপ্লব থেকে ধার করেছি। আমি তা করিনি। আমার দর্শনের মূল রয়েছে ধর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে নয়। আমি তা আহরণ করেছি আমার

শিক্ষক বুদ্ধের শিক্ষা থেকে।'' তাঁর দর্শনে স্বাধীনতা ও সাম্যের একটি স্থান আছে; কিন্তু তিনি বলেন, সীমাহীন স্বাধীনতা সাম্যকে ধ্বংস করে এবং নিরঙ্কুশ সাম্য স্বাধীনতাকে জায়গা দেয় না। তাঁর দর্শনে, যেখানে স্বাধীনতা ও সাম্যের লঙ্ঘন হয়, রক্ষাকবচ হিসাবে আইনের স্থান আছে কেবল সেখানেই; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে, স্বাধীনতা ও সাম্য ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে আইন কোনো গ্যারাণ্টি হতে পারে। তিনি স্বাধীনতা বা সাম্য বা ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে একমাত্র আসল রক্ষাকবচ হিসাবে ভ্রাতৃত্বকেই উচ্চতম স্থান দিয়েছেন। ভ্রাতৃত্বেরই অপর নাম ভ্রাতৃত্ববোধ বা মানবতা, যা ধর্মেরও অপর নাম।

তিনি বলে যান, "আইন হচ্ছে লোকায়ত (secular), যে কেউ তা ভাঙতেই পারে, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব বা ধর্ম হচ্ছে পবিত্রÑ যাকে সবাই মান্য করে। আমার দর্শনের একটি উদ্দেশ্য আছে। আমাকে ত্রিগুণ তত্ত্বের উন্নতিকল্পে তার অনুসারী তৈরি করতে হবে এবং নিজে গ্রহণ করে ধর্মান্তরণের কাজ করতে হবে। ভারতীয়রা আজকাল দু'টি ভিন্ন মতাদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক আদর্শ রূপে সংবিধানের প্রস্তাবনায় একটি স্বাধীন, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের জীবন সুনিশ্চিত করা হয়েছে। অপর দিকে সামাজিক আদর্শে তাদের ধর্ম এ সমস্ত দিতে অস্বীকার করেছে।'' তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, অধিকাংশ ভারতীয়ের জন্য যে রাজনৈতিক আদর্শ আছে, সেটাই হবে সকলের জন্য সামাজিক আদর্শ। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুসলিম স্নাতক তার বক্তব্য উপলব্ধি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে তাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আম্বেদকরের প্রশংসা করেন।

১৯৫৪ সালের ২৯ অক্টোবর 'বম্বে নগর তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর (Bombay Scheduled Castes Federation) পক্ষ থেকে আম্বেদকরকে ১,১৮,০০০ টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। ফেডারেশনটি কিছুকাল আগে তাঁর হীরকজয়ন্তী উৎসব পালন করার প্রস্তুতির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল যা উদ্‌যাপনের তারিখ ছিল ১৯৫১ সালের ১৪ এপ্রিল। বম্বের 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর সভাপতি আর. ডি. ভাণ্ডারে কর্তৃক উপহারটি দেওয়া হয়।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর লোকদের কথা দেন যে, দাদারে একটি হলঘর ও একটি গ্রন্থাগারের জন্য যে বাড়ি তখন তৈরি হচ্ছিল, এই টাকা তিনি সেই কাজে খরচ করবেন। তিনি ঘোষণা করেন, শীঘ্রই তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা করবেন এবং বলেন, নম্রতা, চরিত্র ও জ্ঞানে তিনি বিশ্বাস করেন। অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছিলেন বলে তিনি গর্ব বোধ করেন; এবং যা কিছু তিনি সম্পন্ন করেছেন তার সবটাই তিনি করেছেন তাঁর সম্প্রদায়ের শক্তির জোরে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ বয়সে

আম্বেদকরের বয়স তখন ৬৩। যাঁরা ভূমিহীন, গায়ে জামা নেই, নগ্নপায়ে চলেন এবং ক্ষুধার্ত, তাঁর সেইসব লোকদের জন্য সংবিধান নিংড়ানো মঙ্গলকর যা কিছু আশা করতেন, যা তাঁর মস্তিষ্কে দুর্দমনীয় তরঙ্গের মতো ধাবিত হতো, জোরপূর্বক সেই কাজের সাথে তাঁর দুর্বল শরীর এঁটে উঠতে পারত না। তিনি বেদনার্ত হৃদয়ে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, তাঁর লোকদের অপেক্ষাকৃত উন্নত ভবিষ্যতের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষার বেশির ভাগটাই অপূর্ণ থেকে গেল। বারংবার তাঁর ভয়ঙ্কর আক্রমণ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু আম্বেদকর প্রায়ই ছিলেন আক্রমণোদ্যত নেকড়ের মতো Ñ এ কথা বলা বাস্তবোচিত হবে না। সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল যে ভূমিহীন মানুষদের সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এবং কোনো চিন্তাভাবনাও করেনি বা জাতীয় শান্তি ও ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর যে হুমকি রয়েছে, যা তাদের সমস্যা সূচিত করে, তার গুরুত্ব সরকার আগে থেকে উপলব্ধিও করেনি।

অস্পৃশ্যদের জন্য আম্বেদকর কী অর্জন করেছিলেন? তপশিলি জাতির হিন্দুদের অতীত জীবন ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা। **সেই ছ'কোটি মানুষের ভাগ্য ছিল নিগ্রোদের চেয়েও বেশি দুর্বিসহ, কারণ নিগ্রোরা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হত না। তারা অন্তত শ্বেতাঙ্গদের ঘরে ভৃত্য হতে পারত। এটা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, মিশরে ইজরায়েলিদের ভাগ্য বা আমেরিকার নিগ্রোদের জীবন বা জার্মানিতে ইহুদিদের অবস্থা ভারতের তপশিলি জাতির লোকদের চেয়ে ভাল, যদিও ওই দেশগুলিতে তারা ছিল বহিরাগত আর ভারত অস্পৃশ্যদের নিজেদের দেশ।**

আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম তাঁদের ভাগ্যাকাশে উন্নততর ভবিষ্যতের সূর্যোদয় হয়। তাঁদের মাটির সন্তান, তাঁদের একান্ত আপনজন আম্বেদকর তাঁদের নাগরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে অস্পৃশ্যতাকে সেদিনের এক জ্বলন্ত আলোচ্য বিষয় তৈরি করেন এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের পর্যায়ে তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী প্রচার দেন। তাঁর বিরামহীন কঠোর সংগ্রাম ও তাঁর ক্ষমাহীন আঘাত ভেঙে দেয় তাঁদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা এবং সূচিত হয় আলো আর স্বাধীনতার যুগ। তিনি তাঁদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন মানবিক মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মানের অনুভূতি এবং দাসত্বের চেয়েও যা নিকৃষ্ট সেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত ঘৃণা। তিনি তাঁদের পঙ্কিল জলাশয় থেকে টেনে

তোলেন এবং তাঁদের মন থেকে দূরীভূত করেন নৈরাশ্য ও হতাশা। তিনি তাঁদের মনোবলহীন ও মনুষ্যত্বহীন করে রাখা জীবকোষে সাহস ও নতুন জীবনের সঞ্চার করেন। তিনি তাঁদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেন ও এমন একশক্তি দিয়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেন যা দিয়ে তাঁরা তাঁদের ক্ষোভকে ভাষায় প্রকাশ করতে এবং ন্যায়বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হন। তাঁর নেতৃত্বে আসার আগে তাঁরা পশুর চেয়েও খারাপ ব্যবহার পেতেন। তাঁর বীরোচিত সংগ্রামই ভারতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তাঁদেরকে রাজনৈতিক সাম্যে তুলে দিয়েছে।

ভারতে লজ্জা আর নৈরাশ্যের রাত্রি শেষ হয়েছে। পুরোনো নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে উদিত হচ্ছে এক নতুন ভারত। অস্পৃশ্যরা ধুলোর ভিতর থেকে জেগে উঠছেন। তাঁদের লোক ক্রমশ প্রশাসন, পুলিশবাহিনী, আদালত, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীতে নিয়োজিত হচ্ছেন। গত কয়েক বছরে তাঁদের অগ্রগতি কম উৎসাহজনক নয়। তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতো করে পোশাক, আচার-আচরণ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অবস্থার উন্নতিও করেছেন। রাজনৈতিকভাবেও তাঁরা এখন পূর্ণ সচেতন। পরিচালনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁরা আর অপরের উপর নির্ভর করেন না। তাঁদের সংগঠকরা এখন বড়ো বড়ো সভাসম্মেলন পরিচালনা করেন এবং তাঁদের নেতারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছেন। **কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাঁরা তপশিলি জাতির ভিতর থেকে উঠে এসেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই আর পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন না। তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করছেন।**

তৎসত্ত্বেও এটা অবিসংবাদী সত্য যে, তপশিলি জাতির লোকেরা গ্রামাঞ্চলে এখনও সামাজিক ও আর্থিক দুর্ভোগে এবং জমি ও আইনি সমস্যায় ভুগছেন। সবচেয়ে নিচুতলার এইসব মানুষেরা লক্ষ করছেন সরকার সারা পৃথিবীতে প্রতিনিধিদল ও মিশন পাঠানোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তাঁদের দুর্দশা দূর করা, গ্রামীন দাসত্ব ও আর্থিক সঙ্কুলতা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা এবং স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে তাঁদের পুনর্বাসিত করার কাজে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাঁরা চেয়েছিলেন সব রাজ্যসরকারগুলি একটি সাহসী ও মৌলিক ভূমিনীতি (স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয়) গ্রহণ করবে। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুভব করেছিলেন, নির্ণীত পরিমাণের ভিত্তিতে মাটির মানুষ, ভূমিহীন লোকদেরই জমি দেওয়া উচিত। থাকা-খাওয়ার জন্য হিন্দু হোটেল ও হোস্টেলে তাঁদের জায়গা হবে এবং এর কোনোরকম লঙ্ঘন হলে তা অবশ্যই অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে, যাতে হোস্টেল ও হোটেলের মালিকরা কোনো কল্পিত ঘটনার অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারে। তাঁদের জন্য গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। তাঁদের জীবনে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক

সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হলো গ্রামে পানীয় জলের অভাব।

পণ্ডিত গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন যে, তাঁদের ঘরবাড়ির অবস্থাÑ তাঁদের ছোটো কুঁড়েঘরগুলি টিন বা নারকেল গাছের পাতা ও মাটির তৈরি, যাতে অনেক পরিবার থাকেÑ এতে তাঁদের নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের উপরে সরাসরি প্রভাব পড়ে। তাঁদের আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা বিলোপ করা উচিত এবং শহরের মধ্যেই তাঁদের বসবাসের জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। যদিও পাবলিক সার্ভিসের বেলায় সবই মেধা অনুসারে হওয়া উচিত, তবুও মিল, কারখানা ও রেলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো অছিলায় তাঁদের অস্বীকার করা উচিত নয়। চাকরির ক্ষেত্রে সংবিধানে তাঁদের জন্য সংরক্ষণের যে কোটা নির্ধারিত রয়েছে সরকারকে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। গ্রামে ও শহরে তাঁরা ভয়াবহ দারিদ্রে ভুগছেন। দীর্ঘ দারিদ্র তাঁদের ভিখারিতে পরিণত করেছে। এটা তাঁদের শালীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধে অক্ষম এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার সম্ভাব্য বলিতে পরিণত করেছে। যখন লজ্জা ঢাকার মতো ছেঁড়া কাপড়ও তাঁদের নেই, ধোয়ার মতো কোনো পোশাক নেই, তখন সভ্যতার সমস্ত রকম পার্থিব সুবিধা ভোগকারী মানুষেরা অতীব বিস্ময়করভাবে এঁদের নোংরা পোশাক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন!

যাইহোক, অস্পৃশ্যতা রোগ সেরে উঠছিল। এটা ক্রমশ দৃষ্টির অগোচরে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু অজুহাত দিতে পারবে না যে অস্পৃশ্যরা এ থেকে বেরিয়ে এসেছে। জাতব্যবস্থাÑ অস্পৃশ্যতা যার বিকৃত পরিণতিÑ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ মরে যায়নি। যাঁরা উদাসীনতার সাথে সমস্যাটিকে দূরে রেখে দায়িত্ব এড়ান, তাঁরা সেই নিগ্রো মেয়েটির কথা স্মরণ করলে ভাল করবেন, যে, হিটলারের জন্য উপযুক্ত শাস্তি কী হবে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দিয়েছিলÑ "তাকে কালো বানান এবং আমেরিকায় বাস করতে দিন।" স্বাধীন ভারতে একজন নেতাই সত্বর অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য অনবরত চিৎকার করছেনÑ তিনি হচ্ছেন বীর সাভারকর। তিনি হিন্দুদের সব সময় সাবধান করে দিয়ে চলেছেন, তাঁরা যদি বর্তমান মুমূর্ষু অস্পৃশ্যতাকে কবরস্থ করে এই অভিশাপকে দূর না করেন, তাহলে এটি আবার উদয় হবে এবং দেশকে ধ্বংস করবে। তাঁর কাছে দেশের জন্য একটা বড়ো যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অস্পৃশ্যতা দূর করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আম্বেদকর-বিরোধীদের মতে তপশিলি জাতির আর্থিক সমস্যা দারিদ্র ও কর্ম সংস্থানের মতো বৃহত্তর বিষয়ের সাথে জড়িতÑ এ কথা পক্ষপাতহীন নয়। দারিদ্র উচ্ছেদ হলে অস্পৃশ্যতা থাকবে না ভেবে এই বিষয়টি স্থগিত রাখলে সেটা হবে বিপজ্জনক। এটাও মনে করা হয় যে, অস্পৃশ্যতার ভূতকে কবর দিতে হলে, একসঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের কর্মসূচি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যেসব

গ্রামে আইন অনুযায়ী কাজ হবে না সেখানে সরকারকে এমনকি শাস্তিমূলক করও চাপাতে হবে। সরকার থেকে সমাজ সংস্কারকদের প্রাসঙ্গিকভাবে এবং প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করতে হবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ জে.এইচ. হোমসের বক্তৃতা থেকে ভারত সরকারের পথনির্দেশ লাভ করা উচিত, যিনি একবার বম্বেতে বলেছিলেন, "আমাদের নিজেদের মধ্যেও অবিকল আপনাদের যেমন আছে তেমনি অস্পৃশ্য রয়েছে। তারা সংখ্যায় ১৪ মিলিয়নের বেশি।" অথচ, কয়েক দশক আগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দাসত্ব উচ্ছেদ করা হয়েছে! একটি নিগ্রো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ক্ল্যারেন্স মিচেলের আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে করা এক আবেদন থেকে ভারত সরকারকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে Ñ যেখানে Schools on army posts-এ নিগ্রো শিশুদের আলাদা করে রাখার নিয়মের অবসান দাবি করা হয়েছে। মালানের রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান ও ভর্ৎসনা অত্যন্ত উদাহরণমূলক। তপশিলি জাতির নেতারা মনে করেন এটা অত্যন্ত করুণ ব্যাপার যে, শাসকরা সারা পৃথিবীর বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, অথচ তাঁদের নিজের দেশের প্রায় ছ'কোটি নিম্নবর্গের অবস্থা নিয়ে এক মুহূর্তও চিন্তা করেন না। তপশিলি জাতির নেতারা সঠিকভাবেই মনে করেন যে, শহর-নগরগুলির চাকচিক্য বাড়াবার পরিবর্তে সরকারের উচিত তাঁদের সারাজীবনের দুঃখকষ্ট দূর করা।

আম্বেদকরের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, নির্যাতিত শ্রেণির মানুষদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা ও নিজেদের মুক্তি অর্জন করা। এক কথায় মানুষ তৈরি করা! আম্বেদকর ছিলেন একজন মহান শিক্ষক। তিনি সাধারণ মানুষকে তাঁদের ভিতরের সম্ভাবনাত্মক শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে, তাকে জাগিয়ে তুলতে, উন্নতি ঘটাতে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিক্ষা দিতেন। কোনো মানুষের ভাবা উচিত নয় যে, সে একজন তুচ্ছ ব্যক্তি, সে কোনো কাজের নয়, সে একজন অসহায় অচল।

নির্যাতিত শ্রেণির প্রতি, বিশেষ করে যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তিনি তাঁদের নিজেদের উপর, নিজেদের প্রচেষ্টার উপর, নিজেদের বিশ্বাসের উপর ভরসা রাখতে বলতেন এবং নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করতে ও যুক্তির আশ্রয় খুঁজতে বলতেন। তাঁর কাছে জ্ঞানার্জনের চেয়ে বেশি পবিত্র আর কিছু ছিল না। প্রকৃতি কাউকে ক্রীতদাস তৈরি করেনি। কোনো মানুষ নির্বোধ হয়ে জন্মায়নি। তিনি রাণাডে, তিলক ও গোখেলের গৌরবময় ঐতিহ্য ও অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং তাঁদের উচ্চ সংকল্প ও জনজীবন সম্পর্কে তাঁদের উচ্চ জ্ঞানের কথা ছাত্রদের

স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাঁর লোকদের কাছে গ্রিক পুরাণ থেকে দেবী ডেমিটারের গল্প বলতেন, যিনি প্রতিদিন আগুনের উপর একটি শিশুকে রেখে তাঁর অতিমানবিক শক্তি জাগ্রত করার চেষ্টা করতেন।

তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর বার্তা ছিল Ñ তাঁদের প্রাণপণে অন্তহীন চেষ্টা করতে হবে, বর্তমানের আমোদ-আহ্লাদ এক মহান ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করতে হবে, যেতে হবে অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত ত্যাগস্বীকার করতে হবে। তিনি বলতেন, "তোমাদের অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পবিত্রতায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তোমাদের লক্ষ্য হবে মহৎ এবং তোমাদের ব্রত হবে মহিমান্বিত ও দ্যুতিময়। যাদের মধ্যে জন্ম হয়েছে তাদের প্রতি যারা কর্তব্যে সজাগ থাকে তারাই সৌভাগ্যবান। যারা তাদের সময়, প্রতিভা এবং সমস্ত কিছু দাসত্ব নির্মূল করার কাজে নিয়োজিত করে তারাই যশলাভ করে। যারা দাসত্ব মুক্তির জন্য ভীষণ বিশ্রী, ছিদ্রান্বেষী অবমাননা, ঝড় ও আশঙ্কা সত্ত্বেও নিপীড়িতদের মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার সংগ্রাম জারি রাখে তারাই বিজয় গৌরব লাভ করে।"

সুতরাং তাঁর সমাজের ক্ষুধার্ত মানুষেরা ভক্তির আবর্তে অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তির শ্রদ্ধায় অসহায়তার আফিমে নিজেদের ডুবিয়ে রাখুক তা আম্বেদকর পছন্দ করতেন না। তিনি সাধারণ মানুষকে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন না করার এবং তাঁর (শোচনীয়) অবস্থাকে বিধির বিধান বলে মেনে না নিতে বলতেন। অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করেন তাঁদের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত ও অপ্রতিরোধ্য। আম্বেদকর তাঁদের মন থেকে এই রোগের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁদের বলতেন, এটা একটা আবেগাত্মক নির্বোধ ধ্যানধারণা, যা তাঁদেরকে পুরুষত্বহীনতায় পরিণত করেছে। ভক্তিবাদই তাঁদের স্নায়ুগুলিকে কোমল, সুকুমার ও নমনীয় করে তুলেছে।

আম্বেদকর নিপীড়িত মানুষদের মনকে মৃত্যুর পরের জীবনের ভাবনা থেকে তাঁদের বর্তমান অধঃপতিত জীবনের দিকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁরা বস্তুগত সুখসুবিধা ভোগ করবেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সংস্কৃতির সমপর্যায়ে উঠে আসবেন। নিজেদের অবস্থাকে যাঁরা নিয়তির বিধান বলে মেনে নিতেন, সেই তপশিলি জাতির লোকদের, যাদেরকে মানসিকতার দিক থেকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের পক্ষে এটা ছিল এক প্রতিষেধক। একই সময় তিনি অধিকতর অগ্রসর মানুষ ও সমাজকে সতর্ক করে দেন যে, বস্তুগত আরাম-আয়েশই মানুষের সব সমস্যার সমাধান নয়। মানুষ শুধুমাত্র রুটি খেয়ে বাঁচে না। তার জীবনে সংস্কৃতিরও প্রয়োজন আছে।

এ জন্যই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আধুনিক ভারতের মহত্তম প্রতিবাদী হিন্দুনেতাদের একজন Ñ আম্বেদকরের জীবনকে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও হিন্দু-সমাজবিন্যাস

পুনর্গঠনের একটি পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করেন। হিন্দুধর্মের প্রথম পুনর্জাগরণের উদ্বোধন হয় উপনিষদের নতুন চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে যখন দেবদেবী, পুরোহিত ও বলিপ্রথা পর্দার আড়ালে চলে যায়। গোঁড়া পুরোহিততন্ত্র ও বলিপ্রথার ধারণার পুনর্জাগরণের ফলে মানসিক শক্তির অধঃপতন পুনরায় শুরু হয়। এই সময়ে বুদ্ধ এগিয়ে আসেন হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় পদ্ধতিকে নতুন রূপে পুনর্গঠন করতে। তিনি বলিপ্রথার প্রতিষ্ঠান পুরোহিততন্ত্রকে আক্রমণ করেন এবং সমাজবিভাজন উচ্ছেদ করার জন্য রুখে দাঁড়ান।

শঙ্করাচার্যের উত্থানের ফলে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রকে প্রতারণাপূর্ণভাবে আত্মীভূত করে, কিন্তু তার জাতব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ডকে শক্ত করে আঁকড়ে রাখে। তারপর রামানুজ, চক্রধর, কবির, রামানন্দ, নানক, চৈতন্য, নামদেও ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সন্ত-কবিদের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে আসে আর এক পুনর্জাগরণ। চতুর্থ পর্যায় শুরু হয় রামমোহন, ফুলে, রাণাডে, দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দের জাগরণে এবং সাভারকর সেটাকে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। গান্ধির অবদান ছিল সামাজিকের চেয়ে অধিকতর মানবহিতৈষী।

আম্বেদকরের আন্দোলনে দেখা দেয় হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পঞ্চম পর্যায়। তাঁর হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল আগ্নেয়গিরি সদৃশ এবং বুদ্ধ থেকে বীর সাভারকর পর্যন্ত বিপ্লবীরা যেসব বিদ্রোহ ঘটিয়েছেন তা থেকে আলাদা; কারণ, আম্বেদকর ছিলেন প্রথম বড়ো বিপ্লবী নেতা, যিনি দু'হাজার বছরেরও বেশি সময়কালের নিপীড়িত জনতার দাসত্বগিরির ইতিহাসে প্রথম তাঁদের ভিতর থেকে উঠে আসেন। তিনি কেবল হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেননি, হিন্দুধর্মকে পরিশোধনের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন এনে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করে নবজীবন সঞ্চার করা এবং অবক্ষয় ও মর্যাদাহানি থেকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক মানবিক বিপ্লবও শুরু করেছিলেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুস্থানের জন্য আম্বেদকরের অবদান রামমোহন, দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দের মতো অধিকাংশ আধুনিক হিন্দু নেতার অবদানের চেয়েও অনেক বড়ো বলে বিবেচিত হবে। কারণ, তিনি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় এবং এ দেশের উন্নয়নেও অবদান রেখেছেন, যা তাঁরা রাখেননি।

আম্বেদকর চেয়েছিলেন স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে হিন্দু-সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন হোক। তিনি জাতব্যবস্থা ও পুরোহিততন্ত্র থেকে হিন্দুসমাজের মুক্তি দাবি করেছিলেন। হিন্দুরা যদি তাঁর নীতিতে চলতেন, তবে তাঁরা এক মুক্ত জনগোষ্ঠী, একটি প্রাণোচ্ছল জাতি ও একটি গতিশীল সমাজে পরিণত হতে পারতেন। তাঁর সামাজিক দর্শন অনুসারে প্রত্যেক হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত ভাবে অবশ্যই তাঁর স্বধর্মীদের

সঙ্গে মেলামেশা করার স্বাধীনতা থাকবে। হিন্দুদের অবশ্য একটি সাধারণ সামাজিক নীতিমালা ও নিয়মাবলি তৈরি করতে হবে। যদি তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে করার, একত্রে বসে ভোজন করার, জীবনের সব ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার স্বাধীনতা থাকে, তবেই তাঁরা এক ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবেন এবং তাঁদের গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন সদস্যদের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করবেন। আম্বেদকর ছিলেন একটি মাত্র জাতীয় ভাষা Ñ হিন্দির পক্ষে, যার থাকবে এক সাধারণ অক্ষর 'নাগরি'। তিনি আশা করতেন সব শ্রেণির লোকেরাই তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা করুন। যাঁরা ভাবেন, কেবলমাত্র তাঁরাই জ্ঞানের জিম্মাদার, চিন্তাভাবনা করার বিষয়টা সেই শ্রেণির উপর ছেড়ে দেওয়া দলিত শ্রেণির পক্ষে কখনোই মঙ্গলজনক নয়। যেসব সমস্যা তাঁদের ভাগ্য, ধর্ম ও দেশকে প্রভাবিত করে সেগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা তাঁদের বাড়াতে হবে।

এইভাবে হিন্দুধর্মকে মুক্ত ও হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, হিন্দুভাবনায় নবজীবন সঞ্চার করা এবং জাতব্যবস্থা ও ছুঁত-অচ্ছুতের বিলোপ করার জন্য তাঁর সমাজদর্শন হিন্দুদের কাছে আবেদন রাখে। জাতব্যবস্থার বিলোপ করার প্রতি বস্তুত তাঁর এই গুরুত্ব আরোপ এতটাই প্রবল ছিল যে, কার্লমার্কসের শ্রেণিসংগ্রামের কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো আম্বেদকরও জাতব্যবস্থার কথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, তাঁর এই কাজটি ছিল হিন্দুসমাজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে এবং মানবজাতির স্বার্থে। তপশিলি জাতি হিন্দুদের স্বার্থে যে কাজ করা হয়েছে, তা করা হয়েছে বিশ্বের দরিদ্র মানুষের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে দরিদ্র তাঁদেরই স্বার্থে।

আম্বেদকরের ব্যক্তিত্বে প্রশান্তি ও বিশালতায় জীবনসায়াহ্ন গৌরবদ্যুতিতে ভরে ওঠে। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠদেহী, সংহত, রাশভারী ও প্রাণবন্ত ডিম্বাকার মুখমণ্ডল বিশিষ্ট, চরিত্রে বজ্রের মতো কঠিন আবার কুসুমের মতো কোমল। দৈর্ঘে ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, ওজন ১৮০ পাউণ্ড। তাঁর রাজকীয় ললাটদেশ ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সূচক; তিনি বলেছেন, এমনকি দেশের সর্বোচ্চ স্থানটিও তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমকক্ষ নয়। তাঁর বাইরে প্রসারিত স্পর্ধিত চিবুক সূচিত করত তাঁর অসাধারণ সাহস যা আকাশ ভেঙে পড়লেও একেবারে শেষ পর্যন্ত কাজে লেগে থাকতেন। তাঁর চিবুকের খাঁজে নরকের তামাম ঘৃণা ধরে রাখার ইচ্ছাশক্তি ধারণ করত। তাঁর চ্যালেঞ্জ দেওয়া নাসিকা ছিল ঝড়ের মুখে স্থির থাকা জাহাজের হালের মতোই। তাঁর চোখ ছিল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও প্রাণচঞ্চল, কিন্তু তার ভিতরে ছিল সংশয়ের ছাপ। তিনি ক্রুদ্ধ হলে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন চোখ থেকে বেরিয়ে আসত সমস্ত যুগের তিক্ততা ও তাঁর ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসত এক অস্পৃশ্যের ঘৃণার জ্বলন্ত ছাই। তিনি ছিলেন এক যমদগ্নি।

তবুও যখন তিনি খোশমেজাজে থাকতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল বাতিঘরের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠত। যাদের নিজস্ব আলো আছে, তারা উপগ্রহের মতো ঘোরে না।

আম্বেদকরের মানসিক শক্তি ছিল ঘূর্ণিঝড়ের মতোই অপ্রতিরোধ্য; ন্যূনতম উত্তেজনায়ও তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠতেন। টেবিলের উপর সাজানো বইয়ের সামান্য নড়াচড়ায়ও তিনি কুপিত হতেন এবং গর্জে উঠতেন, "কোথায় কাগজ, বই? কে সরালো এগুলি?" তাঁর ডাক্তার স্ত্রী ও তাঁর ভৃত্যরা আতঙ্কিত হতেন। তখন কেউ আস্তে ঘরে ঢুকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, কাগজ বলতে তিনি কী বোঝাচ্ছেন। "এটা কি কোনো বই না নোটবুক? কী রঙের ও কী সাইজের।" তখন, যতক্ষণ সে বই বা নোটবুক খুঁজে না পাওয়া যেত ততক্ষণ খোঁজাখুঁজি চলত এবং যখন সেটা তাঁর সামনে এনে হাজির করা হত, তিনি সংক্ষেপে বলতেন, "ও! এই তো সেটা, কোথায় ছিল এটা?" পরক্ষণেই তাঁর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

যদি কেউ বলেন যে, আম্বেদকর পরিবারের কেউ ছিলেন না, তাহলে সেটা খুব একটা মিথ্যে নয়। তিনি নিজেকে বলতেন 'অসং' (asang), অর্থাৎ সাংসারিক জীবনে অনুপযুক্ত। অনবরত ঘোরাঘুরি, লাগাতার পড়াশোনা এবং সার্বজনিক সাক্ষাৎকারে একজন বড়ো মাপের নেতাকে সব সময় লেগে থাকতে হয়। স্বভাবতই তিনি তাঁর পরিবারেও একজন নেতা হিসাবে পরিগণিত হতেন। আম্বেদকরও তাঁর ছেলে ও ভাইপোর কাছেও একজন নেতা এবং এতটাই নেতা যে, তিনি তাঁর একমাত্র ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে পারেননি। যদিও তাঁর স্ত্রী মিসেস সবিতা আম্বেদকর প্রসন্নমনেই তাতে যোগদান করেন।

আম্বেদকরের রাশভারী মুখমণ্ডল ও তাঁর অধ্যবসায়ী জীবন পারিবারিক জীবনযাপনে সহায়ক ছিল না। তাঁর কাছাকাছি থাকা এমন কেউ ছিলেন না যিনি কোনো না কোনো সময় তাঁর তিরস্কার ভোগ করেননি। অনেক বিখ্যাত লোক তাঁকে ব্রিটিশ বুলডগ বলে বর্ণনা করেছেন এবং সরোজিনী নাইডু তাঁকে বলতেন মুসোলিনি। তাঁর সামর্থ্য, চারিত্রিক সততা, বিশাল পাণ্ডিত্য ও তাঁর অবর্ণনীয় ত্যাগস্বীকার শ্রদ্ধা ও আস্থার উদ্রেক করত। তবু তাঁর এই কর্তৃত্বব্যঞ্জক জীবন ছিল একটি সাম্রাজ্যের মতো, যার অনেক নগর বিস্মৃতি আর অবহেলায় হারিয়ে গেছে।

আম্বেদকরের পাশে যাঁরা থাকতেন বা তাঁর প্রতি যাঁরা বিশ্বাসী ও অনুরক্ত ছিলেন, সন্দেহ নেই, তিনি তাঁদের কল্যাণ সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করতেন; কিন্তু তিনি কারও প্রতি অত্যুৎসাহী ঘনিষ্ঠতা বা প্রশস্তিবোধ দেখাতেন না। বিরোধীরা কখনও তাঁর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ভাব দেখালেও তাঁরা কখনও তাঁর প্রতি উদার ছিলেন না; সুতরাং তিনিও তাঁদের প্রতি উদার ছিলেন না।

তাঁর সত্যবাদীতা ছিল ভীষণ রকমের। সত্যের মতো তিনি ছিলেন কঠোর।

অন্যান্য মহাপুরুষদের মতো তিনিও ছিলেন শক্তির উৎস এবং সময় সম্পর্কে হিসাবি। তাঁর ছিল বুদ্ধের অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু তাঁর প্রশংসনীয় গুণের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষক বিনম্রতা ছিল না। এজন্য অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কখনও অভিযোগ করেননি। তাঁর গর্বিত আত্মবিশ্বাস প্রায়ই দাম্ভিকতার শেষ পর্যায়ে চলে যেত। কিন্তু তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে তিনি যে মতামত প্রকাশ করতেন, জাতির জন্য কাজ করে তিনি তা যুক্তিসম্মত বলে প্রমাণ করতেন। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে যে নতুন পদ্ধতি চালু করেছিলেন তিনিও তাঁদের অভিনন্দনের উত্তরে সেই 'জয় ভীম' শব্দেরই পুনরাবৃত্তি করতেন।

কথিত আছে যে, যে যত উঁচুতে ওঠে সে তত দূরে সরে যায়। আম্বেদকরের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য, তবুও তিনি হালকা মেজাজে থাকার সময় অফুরন্ত কথা বলতেন। তাঁর কথায় দর্শনার্থীরা আনন্দ এবং যুক্তি-তথ্য দুইই লাভ করতেন। কাউকে খোঁচা দিয়ে কথা বলার সময় তিনি খুব জোরে হাসতেন এবং উপদ্রুত ব্যক্তির প্রতিবাদ তাঁর হাসির শব্দেই হারিয়ে যেত। লুঙি ও শার্টে সজ্জিত তিনি তখন হাসি আর আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতেন। হাস্যকৌতুকবোধের পাশাপাশি গ্রাম্য রসিকতা ও গ্রাম্য বাগ্ধারার দিকেও তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। সেসব ছিল কঠিন, রূঢ়, অমার্জিত, হয়রানিমূলক ও স্ফূর্তিবাজ ভাবের। শ্রোতারা হাসির চোটে তাঁদের পেট চেপে ধরতেন এবং তাঁর সরস মন্তব্যে আনন্দ পেতেন। তাঁর হাস্যকৌতুক ছিল বিদ্রূপাত্মক এবং প্রায়ই তা রূঢ়তার সীমায় পৌঁছে যেত; যেটা হতে পারে অন্ধকার জগৎ থেকে পাওয়া তাঁর একটি উত্তরাধিকার, যেখানে তিনি তাঁর প্রথম জীবন কাটিয়েছেন। তবে স্বস্তিদায়ক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অন্য সব রাজনীতিকদের কাছ থেকে কেউ পাঁচ বছরে যত হাসিঠাট্টা পেত, তার থেকেও সে বেশি পেত তাঁর কাছ থেকে মাত্র একঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু সেই হাসিঠাট্টায় প্রায়ই সূর্যালোকের চেয়ে বিদ্যুতের চমক ছিল বেশি।

সেই আমুদে ও আলাপী মেজাজ ক্রমশই তাঁর ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের সাথে সাথে মলিন হতে থাকে। জীবন সায়াহ্নে তিনি এক বর্ণময় রাজকীয় মহিমা ধারণ করেন। দশনার্থীদের সাথে দেখা করার জন্য বাইরে আসার আগে ঘোষণা করা হত তিনি আসছেন। কখনোসখনো তিনি আটোসাটো পাজামা ও নকশি করা কুর্তা পরতেন; তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতেন। পরিচারকরা তাঁর পাপোষ, যার উপর তিনি পা রাখতেন, ঠিক করার জন্য ব্যস্ত হত; এবং বাইরে অপেক্ষমান জনতার চলত নিচুস্বরে কথাবার্তা।

শক্ত খোলার ভিতরেই থাকে মিষ্টি বাদাম। যদিও দেখতে রাশভারী ও রাগী, তবুও আম্বেদকর ছিলেন ভাবাবেগের ঝরনার মতো। একবার ছায়াছবির এক করুণ দৃশ্য দেখে তিনি মাঝখানেই প্রদর্শনী ছেড়ে চলে যান। যখন তাঁর পোষা কুকুর অসুস্থ

হয়, ব্যক্তিগতভাবে তিনি দিনে দু'বার তার স্বাস্থ্যের খবর নিতে হাসপাতালে যেতেন এবং যখন খবর আসে বেচারা কুকুরটি মারা গিয়েছে, তখন তিনি চেয়ারে বসেই সন্তানহারা মায়ের মতো অস্থির হয়ে পড়েন। একবার এক হতভাগী মহিলা রাত দু'টোর সময় এসে তাঁর দরজার কড়া নাড়েন এবং বিলাপ করে বলেন, প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে তিনি তাঁর মরণাপন্ন স্বামীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। আম্বেদকর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তাঁর গাড়িতে তুলে নেন, সোজা হাসপাতালে চলে যান এবং তাঁর স্বামীকে ভর্তি করে দেন। তারপর ভোর চারটের সময় বন্ধু আচার্য এম.ভি. দণ্ডেকে ডেকে তোলেন; যিনি হাসপাতালের পাশেই থাকতেন এবং তাঁকে চা-এর জন্য বলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিনা পয়সায় আইনি পরামর্শ দিতেন এবং যেখানে গরিবদের স্বার্থ হুমকির মুখে পড়ত, তেমন বিভিন্ন মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের মামলা পরিচালনা করতেন।

যখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়, আম্বেদকর শোকে এতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সেই শবদেহ তাঁর কাছছাড়া করতে চাননি এবং যে ঘরে পুত্র শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সেই ঘরে বহুদিন তিনি প্রবেশ করেননি। যখন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয় তখনও তাঁর শোকের সীমা ছিল না। শোকে তিনি গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। একবার তিনি চোখের অসুখে ভীষণভাবে ভোগেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবেন আশঙ্কায় কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তিনি বলেন, এ অবস্থায় জীবনে বেঁচে থাকাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব করে তুলবে। একবার দাহ করার সময় শ্মশানে এক সহকর্মীর মৃতদেহকে এক নজর দেখতে গিয়ে নিদারুণ কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

অন্যান্য ব্যস্ততা, নানা কাজে লেগে থাকা ও ঝটিকাসঙ্কুল জীবনে আম্বেদকর বৃদ্ধবয়সেও গান শোনার মতো সময় করে নিতেন, যা তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর অভিমত ছিল প্রত্যেকেরই সঙ্গীতের ঐকতান ও শিল্পের সৌন্দর্যকে ভালবাসা উচিত। জীবনসায়াহ্নে তিনি বেহালা বাজানোর প্রশিক্ষণ নিতেন। প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মতো তিনিও ছবি আঁকতেন এবং ভৃত্যেরা ছবি জীবন্ত হয়েছে বললে রোমাঞ্চিত হতেন। যখন তাঁর ডাক্তার স্ত্রী ও ভৃত্যেরা মনে করতেন অনেকদিন যাবৎ তিনি বইয়ের সঙ্গ ছাড়ছেন না, তখন ভৃত্যদের বিচক্ষণতার সাথে আম্বেদকরের মধ্যে শিল্পী ও চিত্রকরের ওই মেজাজ লাভের চেষ্টা করতে হত। চমৎকার ছবি ও স্থাপত্যশিল্পের সুন্দর নমুনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি অভিযোগ করতেন, ভারতে শিল্পের মূল্যায়ন জাতপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই সেই জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হবে, যে জাতি বিশেষ কোনো শিল্পের চর্চা করে। সেক্ষেত্রে শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ মানুষ তাঁর দক্ষতা অনুসরণ করতে পারে না।

আম্বেদকরের বাসগৃহ অসংলগ্ন কুঠিবাড়ি ছিল না, যা দেখে কারও নির্জন বলে

মনে হবে। তাঁর বিশাল লাইব্রেরি, তাঁর মূল্যবান পোশাক, তাঁর প্রচুর কলম, তাঁর চমৎকার গাড়ি, বিপুলসংখ্যক রকমারি জুতো ও বুটজুতো এবং দুর্লভ ছবির সংগ্রহ নিছক এক বিনোদনের প্রকাশ নয় বরং সে তাঁর জয় করা ব্যক্তিত্বের এক জীবন্ত নিদর্শন, যা সমস্ত বাধা সরিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছে, যতক্ষণ না তাঁর মনে হয়েছে তাঁর বাসস্থানে এই পৃথিবীতে যা যা তিনি জয় করতে সক্ষম সেগুলির সবই তিনি জয় করে নিয়েছেন। ওইসব চমৎকার, উন্নত ও দুর্লভ বস্তুগুলি নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত নয়, বরং সেগুলি শ্রেষ্ঠতা, ঔজ্জ্বল্য, ক্ষমতা ও জ্ঞানের বিস্তার বোঝাতে বিশাল মনের দৃঢ়সংকল্প এক অগ্রযাত্রা। এসব জীবনে চলার পথে পিছনে ফেলে যাওয়া কোনো এক মানুষের চিহ্ন, যিনি দীর্ঘকাল দারিদ্রসীমার নিচে জঘন্য আবর্জনার ভিতরে বাস করেছেন, যাঁকে সেলুন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, লাথি মেরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে গোরুরগাড়ি থেকে, হোটেল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং একঘরে করে রাখা হয়েছে কলেজে, কোর্টে ও অফিসে; তবু যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জীবনে অনেক বড়ো হবেন।

বড়ো ও নানা ধরনের ঝরনা কলমের (ফাউন্টেন পেন) প্রতি আম্বেদকরের অদম্য মোহ ছিল। উত্তম কাটের দামী পোশাক তাঁকে আকৃষ্ট করত। বোধ হয় নিজেকে যতটা সম্ভব বড়ো দেখতে পেলে মনে মনে তিনি আনন্দ পেতেন। তবুও জীবনের অন্যান্য বিষয়ে মিতব্যয়িতা, যা ছিল প্রথমদিকের দুঃসহ জীবনের ফসল, তাঁর উপরে এক আশ্চর্যজনক নিয়ন্ত্রণ রেখে চলত। তিনি ধূমপান করতেন না। মদ্যপানে তিনি সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন।

বই পাগল আম্বেদকরের সামাজিকতা করার কোনো সময় ছিল না। বহুদিন পরে হয়তো একদিন তিনি সিনেমায় যেতেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে তিনি "আংক্‌ল টম" দেখেছিলেন। অস্পৃশ্যদের জীবন নিয়ে লেখা "অচ্ছুত কন্যা" সিনেমাটি তিনি চোখে এক অদ্ভুত আবেগ নিয়ে দেখেন। ডাক্তার স্ত্রীকে নিয়ে তিনি "অলিভার টুইস্ট" দেখেন। হতভাগ্য, দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণির জীবনের কথা ভেবে তিনি ছটফট করতেন। ছেলেবেলায় তিনি ক্রিকেট খেলতেন এবং প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে যখন তিনি হাওয়া বদলের জন্য ধাওয়ারে যান, সেখানে ছাত্রাবাসের ছেলেদের সঙ্গে তিনি ক্রিকেট খেলেন। সে সময় দলিত শ্রেণির ছাত্রদের ক্রিকেট পরিচালনা করতেন তিনি। বিশের দশকে তিনি তাসখেলা উপভোগ করেছেন এবং কখনো-কখনো অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ব্রিজ খেলেছেন। প্রতিদিন তিনি বিনোদন ও ব্যায়ামের জন্য সমুদ্রে স্নান করতেন।

আম্বেদকর রান্নার কাজে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাই বলে বিশেষ কোনো খাবারের প্রতি তাঁর অতি আগ্রহ ছিল না। সময়ে সময়ে তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে বসেই খাবার

খেতেন। পরিবারের লোকদের উপরে রাগ করলে তিনি কথা না বলে, খাবার না খেয়ে প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হয়ে থাকতেন। বিড়বিড় করে বলতেন, তাঁর সঙ্গে অন্যরা মেলামেশা করবে এমন লোক তিনি নন। বহু বছরের তেজপূর্ণ সংগ্রাম, দলিত শ্রেণির ব্যাপারে চিন্তায় আকুল, নানা রোগে ভুগতে থাকা এবং ভয়ঙ্কর বিপদসমূহ যা তাঁর চলার পথকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এসব কোনো কিছুই তাঁর দীপ্ত মুখমণ্ডলে কোনো দাগ কাটে না। কিছুদিন তিনি অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে ভুগেছিলেন এবং রক্তচাপও ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষের বছরগুলিতে ডায়াবেটিস তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে। মনে হয় তাঁর শরীর যেন সে রোগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে; কিন্তু তাঁর মনোবল ছিল অনমনীয়। তাঁর বিস্ময়কর মানসিক শক্তির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে তাঁর পায়ের জন্য তিনি বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করান, যে পা তখন তাঁর শরীর বহন করতে সক্ষম ছিল না। লাঠির সাহায্যে কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত অবৈতনিক সচিব অথবা বেয়ারার কাঁধের উপর হাত রেখে তিনি অবসন্ন ভাবে পা টেনে টেনে হাঁটতেন।

তাঁর হাতের লেখায় একটি রুচিশীল শৈলী ছিল যা তাঁর দৃঢ়তা, স্পষ্টতা ও প্রদর্শনী সূচিত করত। তিনি সুন্দর কুকুর ভালবাসতেন এবং আকর্ষণীয় প্রজাতির কুকুরছানা চোখে পড়লে দেশের দূরতম জায়গা থেকেও তিনি তা নিয়ে আসতেন।

আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করা মানে এক কথা-বলা-যাদুঘর দেখতে যাওয়া। তাঁর আলাপচারিতা ছিল উদ্দীপনামূলক, আকর্ষণবৃদ্ধিকারী, বলিষ্ঠ ও সদালাপী। তাঁর কথাবার্তার পরিসর ছিল বহু বিষয়ের উপর, যেগুলি সঞ্চিত ছিল তাঁর অতিবৃহৎ মনের যাদুঘরে। তিনি ইতিহাসের আলোয় শ্রোতাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে অন্ধকার যুগের ভিতর থেকে পৃথিবীর ছাদ পামির মালভূমিতে নিয়ে যেতেন, যেখানে তাঁর শ্রোতা সমস্ত পৃথিবীকে পাখির নজরে দেখতে পেতেন। আম্বেদকর তাঁর কাছে অতীতের উপরে বিষদ ব্যখ্যা করতেন, পুরাণের তাৎপর্য বোঝাতেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, ধর্ম ও মতবাদ ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর আকর্ষণক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণভাবে অব্যর্থ। শ্রোতা তখন আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদদের একজনের সান্নিধ্য উপভোগ করতেন।

শ্রমমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার আগে আম্বেদকরের নিয়মিত কোনো কর্মসূচি ছিল না। ওই দিনগুলিতে তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন অথবা সারারাত বই পড়ার পড় ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ঘুমোতেন এবং সামান্য ব্যায়াম করে স্নান সেরে প্রাতরাশ করতেন। এরপর খবরের কাগজ পড়ে তিনি খাবার খেতেন এবং অবিলম্বে গাড়ি করে নতুন যে বইখানি সকালবেলার ডাকে এসেছে, তাই দেখতে দেখতে কোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে যেতেন। কখনো-কখনো কোর্টে মামলা থাকলে তিনি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন করতেন। কোর্টের কাজ শেষ হলে বইয়ের দোকানগুলিতে

একবার ঘুরে যেতেন এবং একগাদা নতুন বই নিয়ে বাড়ি ফিরতেন; অথবা ফিরে আসার পথে কদাচিৎ তিনি কোনো দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে আনতে পরিচিত কারও বাড়িতে যেতেন। এরপর বই নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে নৈশ-আহারে বসতেন এবং তারপর চলত তাঁর অবিরাম বই পড়া।

আম্বেদকর যখন বই পড়ায় লেগে থাকতেন, তখন কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে কথা বলার কিংবা নৈশ-আহার করা বা এমনকি কারও উপর রাগ করারও তাঁর সময় হত না। তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীর দিকে একপলক মাত্র চেয়ে দেখতেন এবং তারপরই আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতেন। সাক্ষাৎপ্রার্থী অপেক্ষা করতেন ও অস্বস্তি বোধ করতেন এই ভেবে যে তাঁর (আম্বেদকরের) গভীর মনোযোগ ও প্রগাঢ় ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটানো একটা কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কাজ। সুতরাং তিনি নিচে নেমে যেতেন এবং স্থান ত্যাগ করতেন। 'থ্রি মাস্কেটার্স'-এর লেখক আলেকজাণ্ডার ডুমাস তাঁর যে বন্ধুটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেন, হাত বাড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন ঠিকই, কিন্তু ডানহাতে তিনি লিখেই যেতেন! আম্বেদকর তেমন করতেন না। এমন মুহূর্তে তিনি তাঁর চোখের পাতাও নাড়াতেন না। শুতে যাবার আগে তিনি একগ্লাস দুধ খেতেন। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের পর, ডাক্তার স্ত্রী তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আরোপ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন যে, ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব।

সময়ের ব্যাপারটা এক লৌকিক উপাখ্যানের মতো আম্বেদকরের নামের চারপাশে ঘুরে বেড়াত। কেউ তাঁর সময়ের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে পারত না। নেপোলিয়নের কাছে সময়ই ছিল সবকিছু। একজন বড়ো ব্যবসায়ীর কাছে সময়ই হচ্ছে টাকা, কিন্তু আম্বেদকরের কাছে সময়ই ছিল জ্ঞান। আমাদের সময়ের দু'জন মহান ভারতীয় তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা হলেন গান্ধি ও আম্বেদকর। তাঁরা মুহূর্তকালেরও গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। তাঁদের কাছে সময় ছিল এক মহামূল্যবান স্বর্ণখনি। আম্বেদকর ছিলেন আমাদের কালের অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ়সংকল্প, ধৈর্যসহকারে পরিশ্রম ও সতর্কতার সাথে সময়ের মিতব্যয়িতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতেন এবং কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেন যে কাজের জন্য সাধারণ মানুষের দশটি জীবনের দরকার হত। আম্বেদকরের কাছে বইয়ের প্রতি আসক্তি ছিল শিক্ষা, আত্মোন্নতি ও উন্নত ধরনের ক্লান্তি বিনোদন ও আনন্দ উপভোগ। আম্বেদকর কখনও কৌতুকানুভূতির জন্য বই পড়তেন না। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "যা আমাকে শিক্ষা দেয়, তাই আমাকে মজা দেয়।"

বইয়ের সংসর্গই আম্বেদকরকে জীবনের পরম আনন্দ এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ উদাসীনতা দিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছেÑ নৈশভোজনের পরে চলত তাঁর বই পড়া। রাত

শেষ হয়ে যেত, ভোর হত, কাছাকাছি আধজাগা বাড়িগুলিতে গুঞ্জণ শুরু হত; তখনও এই বিদ্বান ব্যক্তিটি বিশ্বের মহামনীষী ও সর্বযুগের মহান চিন্তাবিদদের সাথে একাত্ম হয়ে থাকতেন, যাঁরা ছিলেন তাঁর অন্তর্জাগতিক পূর্বপুরুষ। কুকুর পিটার ভোরের আদর খাওয়ার লোভে তাঁর পায়ের কাছে গেলে তখন পণ্ডিতের খেয়াল হত যে ভোর হয়েছে। আম্বেদকর ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ, গোরুরগাড়ির অবিরাম ঠনঠন শব্দ, হাতুড়ি পেটানোর শব্দ এবং গাড়ির ঘর্ঘর আওয়াজ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। তাঁর মূলমন্ত্র (motto) ছিল ancora Imapro, অর্থাৎ তিনি তখনও শিক্ষালাভ করবেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল সাম্রাজ্যের পিপাসার মতো। তাঁর পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল নিবিড় অরণ্যে তৈরি কোনো গ্রন্থাগারে বসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও আইন প্রণেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত থাকা! এটা কি তাঁর পবিত্র আলোর সন্ধান, না মানুষের অন্তর, অহংকার, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বার্থপরতার গোপন রহস্যের পরীক্ষানিরীক্ষা?

জেফার্সন বলেছেন, সাহিত্যের অনুসরণই তাঁর প্রথম ভালবাসা। আধুনিক ভারতের প্রথম জননেতা তিলকও বলেছিলেন স্বাধীন ভারতে তিনি হবেন গণিতের আধ্যাপক। মহাপুরুষেরা মাঝে মাঝে তাঁদের ন্যায়পরায়ণতাবোধ ও স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসার জন্যই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়েন; এবং প্রথম সুযোগেই তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলে ফিরে যান ও জ্ঞানের মধ্যে আশ্রয় খোঁজেন। ভারতের স্বাধীনতার কারণই তিলককে রাজনীতিতে ঠেলে দিয়েছিল, আর অস্পৃশ্যদের কারণই আম্বেদকরকে তাড়িয়ে নিয়েছিল রাজনীতিতে। অন্যথায় আম্বেদকর বিধানসভার ভিতরটা দেখার আগ্রহও দেখাতেন না। তিনি হতেন একজন পণ্ডিতপ্রবর, ভবিষ্যদ্‌দর্শী, একজন ধ্যানেশ্বর। **ধন্যবাদ জানাই বরোদা রাজ্যের সেইসব আধিকারিক ও পিওনদের, যাঁরা তাঁকে অপমান করেছিলেন; তা না হলে ভারতের রাজনীতি ও বিশ্বের দাসত্ব সমস্যা একজন শক্তিমান ও বর্ণময় ব্যক্তিত্ব এবং একজন পরিত্রাতা থেকে বঞ্চিত থেকে যেত।**

গ্যেটে (Goethe) বলেছেন, আমরা যখন কম জানি তখন সঠিক জানি; বেশি জানলে আমাদের সন্দেহ বাড়ে। আম্বেদকরের জানাটা সঠিক হত যখন তিনি বেশি জানতেন। সাভারকর বা নেহরুর মতো হঠাৎ জ্বলে ওঠা দীপ্তি তাঁর ছিল না, তিনি যখন তাঁর প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রমাণ করতেন, তখন ওই বিষয়ের সমর্থনে একটার পর একটা মহান চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি দিতেন এবং তিনিই হতেন সর্বপ্রধান, অদম্য ও অপরাজেয়। জনসন কদাচিৎ কোনো বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন এবং তিনি বিশ্বাসও করতেন না যে, কেউ সে রকম করে। কিন্তু আম্বেদকর একবার যে বই পড়তেন, তা তিনি স্মরণ করতে পারতেন এবং সে বইয়ের রঙ ও তার যে কোনো অধ্যায়ও বর্ণনা করতে পারতেন। আম্বেদকরের বইয়ের পিপাসা ছিল

সততপ্রবাহিনী গঙ্গার মতো চিরবর্ধিষ্ণু ও বহমান। তিনি হাজার হাজার বই কিনেছিলেন ও কিছু দুর্লভ বইও সংগ্রহ করেছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁকে একবার তাঁর লাইব্রেরির জন্য দু'লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন। আম্বেদকর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে, যদি তিনি লাইব্রেরিই হারান, তাহলে তিনি তাঁর জীবনটাই হারাবেন। কথিত আছেÑ ডঃ জনসনের মতো ডঃ আম্বেদকরও বই ধার দেওয়ার মতো ভালোমানুষ ছিলেন না।

আম্বেদকরের লাইব্রেরিতে কারও কোনো বই স্পর্শ করার অনুমতি ছিল না। তিনি একবার বলেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত যদি কখনও কোনো নাজির (baillif) তাঁর লাইব্রেরির দখল নিতে আসে, প্রথম বই ছোঁয়ার আগেই সেই জায়গাতে তিনি তাঁকে হত্যা করবেন। বই ছিল তাঁর জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাসেরর মতো। সিসেরো বলেছেন, বইয়ের মধ্যে বাস করার জন্য তিনি সবকিছু ছাড়তেও প্রস্তুত। গিবন বলেছেন, ভারতের রত্নভাণ্ডারের বদলেও তিনি তাঁর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা ত্যাগ করবেন না। ম্যাকলে বলেছেন, যদি তাঁকে বই পড়তে দেওয়া না হয়, তাহলে তিনি রাজাও হতে চাননা। স্যার ওয়াল্টার স্কট যখন বুকসেল্ফে রাখা তাঁর সারাজীবনের বন্ধুদের দুঃখপূর্ণভাবে বিদায় দিয়েছিলেন, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবে এই চিন্তায় আম্বেদকর প্রচণ্ডভাবে কেঁদেছিলেন; কারণ, জীবন তাহলে অর্থহীন হয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন, যদি দৃষ্টিশক্তি হারান, তাহলে তিনি তাঁর জীবনটাই শেষ করে দেবেন।

তিনি যখন কোনো বই লিখতেন, তখন আনন্দে থাকতেন। যখন তাঁর চিন্তাভাবনা কোনো বইয়ে ছাপা হয়েছে দেখতেন, তখন তিনি স্বর্গীয় আনন্দ পেতেন। তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নতুন বই তাঁর চার সন্তানের জন্মের চাইতেও তাঁকে বেশি আনন্দ দিত। জেফার্সন ঋণশোধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে তাঁর লাইব্রেরি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। 'পিওপ্‌লস্ এডুকেশন সোসাইটি'-র একান্ত আবেদনে অমূল্য সংগ্রহের জন্য বিড়লার প্রস্তাবিত দামের প্রায় অর্ধেক দামে আম্বেদকর তাঁর অপূর্ব লাইব্রেরিটি সিদ্ধার্থ কলেজের ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেন। এরপরেও তাঁর বই কেনার কাজ যথারীতি চলতে থাকে এবং ২৬ আলিপুর রোড, দিল্লিতে আর একটি লাইব্রেরি গড়ে ওঠে।

মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, তা শ্রমের দ্বারাই আসে। একবার এক সাংবাদিককে আম্বেদকর বলেছিলেন, "আমি যে কত কষ্ট সহ্য করেছি ও শ্রম দিয়েছি, সে বিষয়ে আপনাদের কোনো ধারণা নেই, আপনারা হলে একদম মুছে যেতেন।" একটা আদর্শকে অনুসরণ করে চললে তা মানুষকে চালনাশক্তি ও এক চমৎকার নৈতিক

বিক্রম এনে দেয়। আম্বেদকর সারাজীবন তাঁর শক্তি বাড়ানোর জন্য শ্রম দিয়েছেন ও বন্দিদশা থেকে তাঁর লোকদের মুক্ত করতে একান্তভাবে তার প্রয়োগ করেছেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাস, তাঁর রক্তের আগুন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞান, শক্তি, সুখশান্তি ও প্রয়াসকে পরিচালিত করেছেন। আম্বেদকর ছিলেন এক অদ্ভুত মিশ্রণের চিন্তাবিদ, যিনি সংগ্রামকে ভালোবাসেন, আবার যিনি জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিত হয়েও একজন প্রকৃত কাজের মানুষ। জ্ঞান ছাড়া কর্ম নিরর্থক। কিন্তু আম্বেদকর ছিলেন একজন চিন্তাশীল ও কর্মোদ্যোগী মানুষ। তিনি পাণ্ডিত্য ও রাজনীতির জগতেও এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী, আর ছিল অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণক্ষমতার এক বিশাল ক্ষেত্র।

এই মহামানবের জীবন ও কর্মের উপরে তিন ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যেমন বাল্যকালে তিনি বিমোহিত হয়ে মনোযোগের সাথে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতেন, পাশাপশি বুদ্ধের জীবনী, কবিরের উপদেশ ও ফুলের সংগ্রামের অবদানও ছিল অসাধারণ। এইসব ব্যক্তিত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন আত্মিক শক্তি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা যুগিয়েছিল তাঁকে অস্ত্র।

আদর্শবাদ ও বাস্তব জীবনের সমন্বয়ের দিক থেকে এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে আম্বেদকর ছিলেন রানাডে, ভাণ্ডারকর, তিলক ও তেলাঙ-এর সমগোত্রীয়, যাঁরা শিক্ষা ও গবেষণার জগতে ভারতীয় পাণ্ডিত্যের পতাকা উন্মোচিত করেন। তাঁরা ছিলেন এমন নেতা যাঁদের জীবনের সাথে পাণ্ডিত্যের সুখকর মিলন ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, সি.ভি.রমনের Rays, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিজ্ঞান গবেষণা, জগদীশ বসুর উদ্ভিদ শারীরবৃত্ত (Plant Physiology) নিয়ে গবেষণা এবং রাধাকৃষ্ণনের দর্শন বিশ্বকে অলঙ্কৃত করেছে ও সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ওই ব্যাপারটা ভিন্ন রকমের। আম্বেদকর ছিলেন পণ্ডিত রাজনীতিকদের শেষ যোগসূত্র, যে ধারা ভারতে নষ্ট হতে চলেছে এবং রাজনীতিকে দুর্বল করে তুলছে। সপ্রু, জয়াকর এবং শাস্ত্রীর মতো আইনজ্ঞ রাজনীতিকরা কিছুদিন তাঁদের নিজস্ব ধারা বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু এখন জঙ্গি রাজনীতিকরা (action-politicians) ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের সাথে জোট করে এলাকা দখল করে নিচ্ছেন।

তিলক ছাড়া অন্য সব পণ্ডিত-রাজনীতিকদের চেয়ে আম্বেদকরের আরও একটি সুবিধা ছিল। আম্বেদকর ঝোড়ো রাজনৈতিক জীবন যাপন করতেন; রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আন্দোলন চালাতেন এবং প্রয়োজনবোধে ফায়ারিং লাইনেও চলে যেতেন। তিনি মনে করতেন বেপরোয়াভাবে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়। নিষ্ঠুর আক্রমণে তিনি রুখে দাঁড়াতেন ও প্রত্যাঘাত করতেন। কিন্তু কখন? যখন তিনি বাধ্য হতেন; যখন তিনি বুঝতেন তপশিলি জাতির প্রতি

কর্তব্যপালনে অবহেলা হচ্ছে এবং যখন তাঁকে বইপত্র থেকে আলাদা করার জন্য টোপ দেওয়া হত। কি প্রাচীন, কি আধুনিক Ñ বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের কারও সাথে তাঁর চিরন্তন কথাবার্তায় মগ্ন থাকা অবস্থা থেকে যখন তাঁকে জাগানো হত ও কিছু করতে বাধ্য করা হত, তিনি মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে যেতেন কীভাবে লড়াই শুরু করতে হবে এবং তিনি গর্জে উঠতেন ও অতিকায় ভীমের মতো তাঁর বিরোধী শিবিরের দিকে বজ্র নিক্ষেপ করতেন। এই কারণেই তাঁকে শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, বিবেচনা করা হয় বারোজন অত্যাশ্চর্য ব্যক্তির অন্যতম এবং ভারতমাতার সর্বাধিক সাহসী সন্তানদের একজন হিসাবে। কেউ কেউ তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মেধাবীদের একজন বলে গণ্য করেন। বস্তুত তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি Ñ যেন লিলিপুটদের মাঝে একজন গালিভার। আম্বেদকরের কথা চিন্তা করা মানেই এক মহান এবং জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডারের কথা চিন্তা করা! তিনি ছিলেন ভারতের এমন এক সন্তান যিনি বিদ্যায় ও রাজনৈতিক জ্ঞানে সেই যুগের যে কোনো শক্তিমান ব্যক্তির সমকক্ষ। যাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক জ্ঞান নিয়ে দম্ভোক্তি করতেন তাঁরা একবার "রাজগৃহ" পরিদর্শন করে চিরন্তন ধ্যানযজ্ঞের (Dnyana Yadnya) আলোয় তাঁদের জ্ঞানালোকের তুলনা করে বিনীতভাবে নতমস্তকে সেখান থেকে ফিরে আসতেন।

মঞ্চ এবং সংসদ Ñ উভয় ক্ষেত্রেই আম্বেদকর ছিলেন একজন বলিষ্ঠ বক্তা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল আকস্মিক এবং অস্বস্তিকর ভাবে নিষ্ঠুর। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম গুলিবর্ষণ করে যেতেন। বার্কের মতো তাঁর বাগ্মীতা ছিল না। তাঁর সরল, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ বক্তব্যের মধ্যে নিজস্ব একটা মনোহারিত্ব ছিল। বক্তব্যের নির্ভীকতা আরও তীক্ষ্ণ হত তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতায়, যা তিনি অর্জন করতেন অবিরাম অধ্যয়নের মাধ্যমে। তিনি বিশ্বাস করতেন, তিনি যা বলেন, তা-ই চরম সত্য। সেটা যাঁদের আঘাত করত তাঁরাই কেবল ওই বক্তব্যের উগ্রতা ও প্রচণ্ডতাকে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলে উচ্চৈস্বরে নিন্দা করতেন।

সমস্ত সচ্চরিত্র ও প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিদের মতো আম্বেদকরেরও অনেক অনুরাগী এবং নিন্দুক ছিল। তাঁর বিশাল ব্যক্তিগত চারিত্রিক শুদ্ধতা ও নির্ভীক বৌদ্ধিক সততার জন্য খ্যাতি ছিল। একথা সত্য যে, বিল মেটানোর সময় তিনি হুল ফোটাতে ছাড়তেন না। যখন কোনো পার্টি হিসাব মেটাবার জন্য তাঁর কাছে আসত, তিনি বলতেন টাকা তো দেওয়া ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। তিনি যা বলতেন কখনও তার মধ্যে কিছু সত্য থাকত, তবে প্রায়ই দেখা যেত দেওয়ার পদ্ধতিতে বা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ত্রুটি থাকত। যদিও তিনি নিষ্কলুষ সামাজিক জীবন কাটিয়েছেন, তবুও তাঁর নিন্দুক ছিল। প্রত্যেক অতিবিপ্লবীই (iconoclast) পূর্ববর্তী প্রজন্মের দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দেন

এবং নিজেই সেই মন্দিরে সমাসীন হন। বুদ্ধ ছিলেন একজন অতিবিপ্লবী এবং পরবর্তীকালে তিনি দেবমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং ঈশ্বররূপে পূজিত হয়েছেন। আম্বেদকরের লোকদের কাছে তাঁর কথাই ছিল আইন। তাঁর কথা তাঁদের কাছে চরম সত্য। তাঁরা তাঁকে দেবতার প্রতিমূর্তি মনে করতেন এবং প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনে তাঁর প্রতিকৃতি পালকিতে রেখে শোভাযাত্রা বের করতেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, তিলক, গান্ধি, সাভারকর ও নেহরুর জন্মবার্ষিকীর মতোই তাঁর জন্মদিনও ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে উদযাপিত হত।

তাঁর লোকদের উপর আম্বেদকরের প্রভাব ছিল অবিচল। একটি উদাহরণ এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। হিন্দু-দেবদেবীদের পুজো করতে তিনি যখন তাঁর লোকদের বারণ করেন, কিছুদিনের জন্য তাঁরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কিন্তু অভ্যাস ও ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায় ও সহজে তা সমূলে উৎপাটিত হয় না। অজ্ঞানতা মানুষের ভয়কে প্রকোপিত করে। তাই কিছুদিন পরে ঈশ্বরভীতি প্রাধান্য পায় এবং তাঁদের বেশির ভাগ আবার গোপনে পূজা করার পুরোনো প্রথায় ফিরে যান। এক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ তাঁর 'বাবাসাহেব'-এর কাছে যান এবং তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হিন্দুর দেবতা গণপতির মূর্তি পুজো করার অনুমতি দিতে, যাতে তিনি তাঁর মানত পূর্ণ করতে পারেন। ঈশ্বরের কাছে তিনি এই পুজোর মানত করেছিলেন। আম্বেদকর এই অকপট হৃদয় বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন এবং উচ্চকণ্ঠে তাঁকে বলেন, "কে আপনাকে বলেছে যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না? যান, আপনি যা পছন্দ করেন, তাই করুন।" তারপরেই বৃদ্ধ তাঁর মানত পূর্ণ করেন। আর একটি উদাহরণ Ñ এক কংগ্রেস-মন্ত্রী এক আম্বেদকর-অনুসারীকে ওয়াচম্যান-এর চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন। বাবাসাহেবের বিরোধীদের কাছে রুটি ও আশ্রয়ের জন্য গিয়েছেন বলে চাকরি-অন্বেষকের পুত্র তাঁর বাবাকে তিরস্কার করে। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তখন মন্ত্রীর কাছে যান এবং ওই চাকরি গ্রহণে তাঁর অক্ষমতার কথা বাধোবাধো গলায় তাঁকে জানান। তাঁর মতে ভিখারির মতো ওই চাকরি গ্রহণ করার মানে তাঁদের "রাজা" আম্বেদকরের প্রতি অবাধ্যতা করা।

আম্বেদকরের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর একগুঁয়েমি, পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা, যে গুণটি রাজনীতিতে সাফল্য এনে দেয় Ñ এই তিনটির এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ। যুক্তিযুক্ততা (Expediency) নয়, পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসাই (Resilience) তাঁকে তাঁর অবস্থান বা বিবেকবোধের সাথে আপস না করেই তাঁর একগুঁয়েমি দূর করে দেয়। একটি মানুষকে ঘুম থেকে জাগাতে প্রভাত যে দু'বার আসে না, সে কথা বুঝতে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সুস্থ বিচারবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন। বল বাউন্স করার সময়ই তাকে ক্যাচ করতে হয়।

তাঁর কুড়ি বছর বয়স পার হওয়ার পর প্রথম দিকে শেক্সপিয়ারের Ñ "মানুষের জীবনে একবার জোয়ার আসে, যা বন্যার আকার ধারণ করে এবং সফলতায় পৌঁছে দেয়" Ñ (There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood, leads on to success.) এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর পিতার বন্ধুর মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাইমন কমিশনের সাথে সহযোগিতার ফলে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল তারকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংবিধান রচনার ব্যাপারে গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন কাজ করেছিলেন তা-ই তাঁকে সংবিধান বিশেষজ্ঞরূপে তৈরি করে। Executive Councillorship তাঁকে শ্রমিক সমস্যার উন্নততর অবস্থা আনয়নে তাঁর চিরন্তন আগ্রহ দেখাবার সুযোগ দেয় এবং প্রশাসক হিসাবে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সবশেষে ভারতের সংবিধানের প্রধান রূপকার হিসাবে তিনি যে শ্রম দিয়েছেন ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা তাঁর কাজকে বিশ্বজোড়া সাংবিধানিক কর্তৃত্বে রাজসম্মান এনে দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে একজন অস্পৃশ্য হিন্দু কী করতে পারেন এবং কীভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধীশক্তিসম্পন্নদের সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম। স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বাবলম্বী আম্বেদকরের জীবনপ্রভাত ছিল ধূলিময়, দ্বিপ্রহর ছিল গৌরবোজ্জ্বল এবং তাঁর জীবনসন্ধ্যা ছিল অবশ্যই স্বর্ণোজ্জ্বল।

আম্বেদকর গীতাকে গ্রহণ করতে মোটেই রাজি হননি। তাঁর মতে নীতিশাস্ত্রের উপরে এটি একখানা দায়িত্বজ্ঞানহীন বই Ñ সকল ভুলের এক আপসমীমাংসা। তিনি ধর্মের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, খিদেয় কাতর কোনো গরিব মানুষ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে না, কারণ এই নয় যে, সে আইনি পরিণতিকে ভয় পায়, তার কারণ ধর্ম তার মনের উপরে গভীর চাপ সৃষ্টি করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, হৃদয়ের সাথে যেমন ধর্মের সরাসরি যোগ আছে, তেমনি আইনের সাথে যোগ আছে যুক্তির। জীবনে আবেগ একটি প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং মানুষ গঠনে ধর্মের গুরুত্ব আছে। তিনি প্রায়ই বলতেন, তাঁর মধ্যে যা ভাল কিছু আছে, তা সবই তাঁর ধর্মের ফল।

একজন নামজাদা নেতা হিসাবে আম্বেদকর প্রাদেশিকতা নিয়ে বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। কিন্তু বিষয়টি যখন আলোচনায় আসত, গর্বের সাথেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খোলাখুলি বলতেন, মারাঠিরা কখনও দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং লণ্ডনে দেশপ্রেমিক মারাঠি ছাত্রদের দৃষ্টান্তমূলক আচরণের উল্লেখ করতেন। ওই একই মেজাজে তিনি আরও বলতেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের হুমকিতে মারাঠিরা ভয় পান না, কারণ তাঁরা নিকট অতীতেই একবার যুদ্ধক্ষেত্রের পর যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক মুসলিম শক্তিকে পরাজিত করেছেন। বম্বেকে তার অবিচ্ছেদ্য

অংশ হিসাবে রেখে এক স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রশ্নে আম্বেদকরের মতো এতটা জোরালো প্রবক্তা আর কেউ ছিলেন না এবং এই অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরে না আসার জন্য তিনি মহারাষ্ট্রীয়দের বলতেন।

আম্বেদকর ছিলেন জনগণের নেতা। সংস্কারমুক্ত রাজনীতিবিদরা উপরতলার লোকদের প্রভাবিত করেছেন। তিলক ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রথম নেতা, যিনি মধ্যবিত্তদের প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাঁর সেই প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জনসাধারণের মধ্যে। গান্ধি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং আম্বেদকর উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সমাজের নিম্নতর শ্রেণির মানুষদের। আম্বেদকর অবিরাম দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তিলক, গান্ধি, নেহরু, সাভারকর ও সুভাষ বসুর মতো তিনিও জনতার সামনে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। যাঁরা একটি উদ্দশ্য পূরণের লক্ষ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, আম্বেদকর ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি একটি সংগঠনের চেয়েও একটি উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বেশি। তিনি বলেন, জনতার পাগলামিকে কোনো নেতার উৎসাহিত করা উচিত নয়। তিনি ছিলেন এমন একজন নেতা, যিনি সাহসিকতার সাথে মানুষকে সত্যিকার মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এই জাতীয় নেতৃত্ব মাধুর্য ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে; কিন্তু সংগঠনের চেয়েও তাঁর সম্পর্ক থাকে উদ্দেশ্যের সাথেই বেশি।

আম্বেদকর তাঁর রাজনৈতিক দলকে আধুনিক ধাঁচে সংগঠিত করার চেষ্টা করেননি। আলাদা রকমের সংগঠন করায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। যে সব সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন সেসব সংগঠনের নিয়মিত বার্ষিক আলোচনাসভা বসত না বা কোনো সাধারণসভা হত না। যখন যেখানে তিনি বসতেন, সেখানটাই হত আলোচনাসভার জায়গা ও তখনই হত তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। প্রেসিডেন্ট কিংবা সেক্রেটারি, বা ওয়ার্কিং কমিটিÑ সকলেই তাঁর ব্যবস্থাপনায় শামিল হতেন। তাঁর অনুগামীরা সকলেই তাঁর চারিত্রিক সরলতা ও সততা, সক্ষমতা, ত্যাগ ও পাণ্ডিত্যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কমিটি গঠন, সংবাদমাধ্যমের জন্য উচ্চপ্রশংসামূলক রচনা এবং এক নেতাকে অন্য নেতার বিরুদ্ধে লাগানোর খেলার শঠতার কোনো আবেদন তাঁর ছিল না। যখন তিনি চাইতেন তাঁর লোক তাঁর পতাকাতলে জড়ো হবে, তিনি সাধারণ এক উদাত্ত আহ্বান জানাতেন, আর তখনই বর্ষা ঋতুতে শস্য গজিয়ে ওঠার মতো গড়ে উঠত তাঁর সংগঠন। গ্রীষ্মকালে মাঠ থাকত শস্যহীন, পতাকা তখন তাঁর পাঠকক্ষের কোনো নিভৃত কোণে পড়ে থাকত, আর তাঁর লোকেরা থাকতেন তাঁদের ঘরে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ
বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন

জীবনের শেষ ভাগে ডঃ আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের পতাকা উত্তোলন করার এক মহান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বারো শো বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্বাসিত বুদ্ধকে পুনরায় তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পতাকা মেলে ধরেন এবং তাঁর লোকেরা এগিয়ে যান। এভাবেই শুরু হয় তাঁর সংগ্রামের শেষপর্ব।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আম্বেদকর তৃতীয় বৌদ্ধ বিশ্ব সম্মেলনে যোগ দিতে রেঙ্গুন যান। তাঁর স্ত্রী ও ব্যক্তিগত সেবক এস.ভি. সাভাডকর তাঁর সঙ্গী হন। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি না হলেও তিনি এই সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার কয়েক মিনিট আগে দৃশ্যতই তাঁকে অভিভূত দেখায়; তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল নেমে আসে। বৌদ্ধিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিকভাবে তিনি অভিভূত। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা এগোবার সাথে সাথে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে। তিনি বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য ও তার প্রচার বিষয়ে ভাবোদ্দীপক মতামতের দ্বারা সম্মেলনকে সম্মোহিত করেন। তিনি বলেন, সিংহল ও ব্রহ্মদেশই বৌদ্ধ দেশগুলির মধ্যে পুরোভাগে। তিনি মনে করেন, বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সময় সাজসজ্জায় প্রচুর অর্থ অপব্যয় করা হয়। বৌদ্ধধর্মে আড়ম্বরের কোনো স্থান নেই। ব্রহ্মদেশীয় ও সিংহলী বৌদ্ধদের উচিত অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ও তার প্রচারের জন্য ওই অর্থ খরচ করা। আম্বেদকর ছিলেন তর্কোদ্দীপক পাণ্ডিত্যের মানুষ, তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য বৌদ্ধধর্মবিরোধী পণ্ডিতদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানান এবং তিনি নিশ্চিত যে, সমস্ত পণ্ডিতদেরকে তিনি পরাজিত করবেন। তিনি বলেন, হিন্দুধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে এবং গোরক্ষণ বৌদ্ধনীতি 'অহিংসার'ই জয়।

আম্বেদকর ঘোষণা করেন, যখন কাজের উপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরি হবে তখন তিনি ভারতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার করবেন। সংবিধান প্রণেতা হিসাবে ইতিমধ্যেই তিনি ওই উদ্দেশ্যে কয়েক ধাপ এগিয়েও গেছেন। সংবিধানে পালিভাষা নিয়ে পড়াশোনার সংস্থান রাখা, নতুন দিল্লিতে জমকালো রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে বৌদ্ধ-প্রবচন খোদাই করা এবং ভারত কর্তৃক অশোকচক্রকে তার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করাকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হিসাবে বর্ণনা করেন। প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টাতেই ভারত সরকার বুদ্ধজয়ন্তীকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেছে। তিনি গর্ব করে বলেন, সংসদে তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এতটাই প্রাঞ্জল ও ফলপ্রসূ

হয়েছে যে, এই চমৎকার পরিবর্তন কোনো বিরোধিতা ছাড়াই তিনি কার্যকর করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন, রেঙ্গুন সম্মেলনে যে আঠেরোটি দেশ যোগদান করেছে, তাদের কেউ এসব বিষয়ে এতটা অগ্রগতি করতে পারেনি। অন্যদিকে তিনি দু'টো কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন Ñ একটা বম্বেতে এবং অন্যটি ঔরঙ্গাবাদে, যেখানে ৩,৪০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করায় তিনি উৎসাহিত করতে পারেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি থেকে অন্তর্হিত। যদি যথেষ্ট অর্থের সংস্থান হয়, তাহলে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটানো সম্ভব এবং তার পটভূমি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। অবশ্য সাহায্য পান আর না পান তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাবেনই।

এর কয়েকদিন পরেই আম্বেদকর পুনার কাছে ডেহু রোডে নবনির্মিত এক বুদ্ধবিহারে বুদ্ধমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি মূর্তিটি রেঙ্গুন থেকে এনেছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে, বৌদ্ধধর্মের পতনের বারোশো বছর পর ভগবান বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করার সম্মান তাঁর লোকদের প্রাপ্য। এটি একটি মহান ঘটনা এবং নিঃসন্দেহে ইতিহাসে তা লেখা থাকবে। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন। বিশ হাজার নরনারীর ওই সভায় তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় বৌদ্ধধর্মের নীতি-আদর্শ ব্যাখ্যা করে তিনি একখানি বই লিখছেন। বইখানি সম্পূর্ণ করতে বছরখানেক সময় লাগতে পারে; সম্পূর্ণ হলেই তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন।

আম্বেদকর শ্রোতাদের আরও বলেন, পান্ধারপুর মন্দিরের বিঠোবা দেবতার মূর্তি আসলে বুদ্ধমূর্তি। এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র লেখার ইচ্ছা তাঁর আছে এবং সেটা সম্পূর্ণ হলে পুনায় 'ভারতীয় ইতিহাস সংশোধন মণ্ডল'-এর সামনে তিনি পাঠ করতে চান। তিনি বলেছেন, 'পাণ্ডুরাং' দেবতার নাম 'পুণ্ডালিক' থেকে পাওয়া। 'পুণ্ডালিক' মানে পদ্ম এবং 'পদ্ম'কে পালিভাষায় বলা হয় পাণ্ডুরাং। সুতরাং 'পাণ্ডুরাং' বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ নন।

এই বক্তৃতায় আম্বেদকর লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশীর এক প্রবন্ধের উল্লেখ করেন যেখানে মন্তব্য করা হয়েছে আম্বেদকরের মিশন শেষ। যোশীর মতো একজন পণ্ডিত ব্যক্তির এহেন মনোভাব প্রকাশ করায় আম্বেদকর দুঃখিত হন এবং বলেন, তাঁর জীবনের মিশন সঠিক আন্তরিকতায় শীঘ্রই শুরু হবে।

আম্বেদকর ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে লোনাভ্লায় তাঁর গবেষণাপত্র রচনার কাজ শুরু করেন; কিন্তু মনে হয়, তিনি মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার মতো লিখে যেতে পেরেছেন।

নতুন বছর ১৯৫৫ সালের শুরু হলো 'আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে চলেছেন' এই সংবাদ নিয়ে। কলকাতার 'মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া'র সাধারণ সম্পাদক

ডি. ভ্যালিনসিন্‌হা ১৯৫৬ সালের মে মাসে আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি মন্তব্য করেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ উপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আম্বেদকরের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সবশেষে তিনি বলেন, যদি ভারতের ছ'কোটি মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তা এদেশে নতুন জীবন নিয়ে আসবে এবং সত্বর তার উন্নতি হবে।

এবার বৌদ্ধধর্মের একজন দুর্দান্ত সমর্থক হিসাবে আম্বেদকর বেরিয়ে আসেন এবং দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি, যাঁরা তাঁর এই সিদ্ধান্তের খবরে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন, সেসব জায়গায় ভাষণ দেবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ পেতে থাকেন। ইউরোপে একটি খ্রিস্টান মিশনারি আম্বেদকরের কাজ ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছিল এবং তাঁর "কংগ্রেস এবং গান্ধি অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছেন?" (What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables) নামক বইখানির আন্তরিকতা ও খোলাখুলি বক্তব্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল। খ্রিস্ট মতবাদের পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতার বিষয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখতে সংস্থাটি আম্বেদকরের কাছে আবেদন জানায়।

আম্বেদকর এরপর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অভিযানে নামেন। তিনি ডি. ভ্যালিনসিনহাকে লেখেন, 'ধম্ম দীক্ষা অনুষ্ঠান' (Dhamma Diksha Ceremony) নামে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি নির্দেশাবলি তিনি প্রস্তুত করেছেন; যাঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন তাঁদের প্রত্যেককেই এগুলি মেনে চলতে হবে; কারণ এটা ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাধারণ অজ্ঞ জনগণের ধর্মান্তর গ্রহণ কোনো ধর্মান্তরই নয়, ওটা একটা নামমাত্র বিষয়। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হবার কারণ, সাধারণ জনগণের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা, যার ফলে বুদ্ধের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট দেবদেবীদের পূজাও তাঁরা করছেন। সুতরাং ধম্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি অনুষ্ঠান থাকতে হবে।

মনে হয়, গবেষণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত কলেজগুলিতে grant-in-aid-এর নিয়মকানুন তিনি এ সময় ধৈর্যসহকারে সংগ্রহ করছিলেন। সব রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন এবং এ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তাদের অনুরোধ করেন। অধ্যবসায়ী প্রয়াস, অনুসন্ধিৎসা ও শক্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজেকে বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তায় উন্নীত করতে পারে না! আম্বেদকরের তা ছিল।

ভারতে এই ধর্মবিশ্বাসের প্রচারের জন্য ধর্মপ্রচারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোরে একটি বৌদ্ধধর্মের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করার বিষয়ে ওই বছরের গোড়ায় ডঃ আম্বেদকরের অন্য একটি ঘোষণা ছিল। যখন ডঃ আম্বেদকর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে

জুন মাসের প্রথমদিকে মহীশূরের মহারাজার সাথে দেখা করেন তখন মহারাজা পাঁচ একর জমির একটি প্লট দান করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর দু'বার ব্রহ্মদেশ পরিদর্শনের ফল। The World Buddhist Council এবং Buddha Sasana Council তাঁকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, শীঘ্রই তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে দানের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে বেরোবেন। বৌদ্ধ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে মন্দির ও শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা থাকবে এবং একটি সুসজ্জিত বড়ো লাইব্রেরি এবং ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক পণ্ডিতদের জন্য একটি ডরমিটরি থাকবে এবং বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বই লেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রখ্যাত পণ্ডিতদের লেখা বই ছাপানোর জন্য একটি প্রেসও থাকবে।

এই ঘোষণার আগেই আম্বেদকর টোকিওতে থাকা ডঃ ফেলিক্স ভ্যালির সাথে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখছিলেন। ডঃ ফেলিক্স ভ্যালি চাইছিলেন গোলটেবিল সম্মেলনে বিশেষ উল্লেখ সহকারে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মূল উৎপত্তি বিষয়ক ভারতীয় ভাবনার আলোচনায় আম্বেদকর অংশ নেবেন। এই সম্মেলনগুলি জাপান সরকারের খরচে Society for Inernational Cultural Relation (Kokusai Banka Shinkokie)-এর আনুকূল্যে টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ ফেলিক্স ভ্যালি লিখেছেন, "আমাদের গোলটেবিল সম্মেলনে আপনি অংশগ্রহণ করলে তা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ হবে। একজন ভারতীয় বৌদ্ধনেতা হিসাবে আপনার নাম জাপানে সুপরিচিত এবং আপনার বিশ্বখ্যাতি আমাদের কাজে বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব এনে দেবে।" ডঃ ফেলিক্স ভ্যালি আম্বেদকরকে চিঠি লিখে জানতে চান, আমেরিকার যে ভদ্রমহিলা ডঃ আম্বেদকরকে বৌদ্ধদের উন্নতিকল্পে যে অর্থ দিতে চেয়েছিলেন সেই ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্গালোরে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে একটি Institute of Comparative Studies গড়ার পরিকল্পনার কাজে ওই অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি দেবেন কিনা। মহীশূরের রাজার কাছ থেকে আম্বেদকর জমির প্লটটি পেয়েছেন কিনা, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে, তাও তিনি জানতে চান।

বম্বেতে জাপানের কনসাল জেনারেল জাপানের বিদেশ মন্ত্রালয়ের আগ্রহে আম্বেদকরকে চিঠি লিখে জাপান ও ভারতের মধ্যে পণ্ডিত বিনিময়ের সম্ভাবনার কথা জানতে চান; যাঁদের ব্যয়ভার জাপানের দিক থেকে বহন করবে জাপানের Inernational Cultural Institution এবং এদিক থেকে আম্বেদকরের সহযোগিতায় বহন করবে ব্যাঙ্গালোরের প্রস্তাবিত Indo-Japanese Cultural Institution। কনসাল জেনারেল তাঁর পরবর্তী চিঠিতে ডঃ আম্বেদকরকে ডঃ ফেলিক্স ভ্যালির হোটেলের বিল পরিশোধ করা ও ভারতে তাঁর ফিরে আসার ব্যাপারে সাহায্য করেন। আম্বেদকর উত্তরে জানান, ডঃ ফেলিক্স ভ্যালিকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় তিনি নেই, তিনি

এমন কাউকেও চেনেন না, যিনি তা করতে পারেন। কারণ এদেশে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই কম।

ডঃ আম্বেদকর ডঃ ফেলিক্সকে জানান, আমেরিকার ভদ্রমহিলাটি বৌদ্ধধর্মী নন, বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি আগ্রহান্বিতও নন। এরপর ডঃ ফেলিক্স পরামর্শ দেন, আম্বেদকরের উচিত রতনচাঁদ হিরাচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, যিনি বারবার ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থল হিসাবে পুনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ ফেলিক্সের ভয়, পুনা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণদের পীঠস্থান, তাই সে জায়গা অভীষ্ট লক্ষ্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। তিনি সংকল্প করেছিলেন ভারতে একটি Indo-Japanese Institute প্রতিষ্ঠা করা, যেমন তাঁরা টোকিওতে করেছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও ডঃ রাধাকৃষ্ণনের কাছেও লিখেছিলেন।

জাপান-ব্যাঙ্কের গভর্নর এবং টোকিওতে Indo-Japanese Association-এর প্রেসিডেন্ট হিসাতো ইচিনাড়া ডঃ ফেলিক্সের কাছে লিখে জানান যে, তাঁর অ্যাসোসিয়েশন আনন্দিত এই কথা জেনে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের বাজেয়াপ্ত করা জাপানি সম্পত্তি তাদের জাপানি মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবছেন এই শর্তে যে, ওইসব সম্পত্তির একটা অংশ ভারত ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হবে। ডঃ আম্বেদকর ডঃ ফেলিক্সের চিঠির উত্তরে বলেছিলেন, বুদ্ধের প্রতি ভারত আগের মতোই আতিথ্যবিমুখ।

দু'জন প্রখ্যাত জাপানি সাহিত্যিককে সাথে নিয়ে ডঃ ফেলিক্স ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে ভারতে আসেন এবং ডঃ আম্বেদকরের সাথে দেখা করেন। ডঃ ফেলিক্সের বম্বে-পরিদর্শনের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িয়ে আছে। সিদ্ধার্থ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বৌদ্ধধর্মের উপর বক্তব্য রাখার সময় ডঃ ফেলিক্সের কয়েকটি উক্তি সম্পর্কে ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ কেনি অতিথিদের ধন্যবাদ জানানোর সময় অসতর্কভাবে সমালোচনার দৃষ্টিতে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। কলেজটির পরিচালক People's Education Society-র চেয়ারম্যান ডঃ আম্বেদকর ডঃ কেনিকে বরখাস্ত করেন। অধ্যাপকটি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছেন, না বৌদ্ধধর্মের সমালোকদের প্রতি চেয়ারম্যানের চরম ঘৃণার জন্য উক্ত অধ্যাপককে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়, তা একটি বিতর্কিত বিষয়।

রাজ্যসভায় (Council of States) 'সংবিধান সংশোধনী বিল' (Constitution Amendment Bill) নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ও ডঃ আম্বেদকরের মধ্যে বাক-যুদ্ধ হয়, যার লক্ষ্য ছিল জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে পুলিশের ক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট জমি বা বাড়ির মালিকের (eminent domain) ক্ষমতার মধ্যে স্বতন্ত্রতা ফিরিয়ে আনা।

ডঃ আম্বেদকর বিলটিকে তুচ্ছ ও নিরর্থক বলে বর্ণনা করেন এবং প্রস্তাব দেন, মৌলিক অধিকারে এইভাবে হস্তক্ষেপ না করে সরকারের উচিত বর্তমান সংবিধির স্থলে একটি যথোপযুক্ত 'জমি অধিগ্রহণ আইন' (Land Acquisition Act) পাশ করে সংসদকে স্থায়ীভাবে সকলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার অধিকার দেওয়া। তিনি মন্তব্য করেন, ঘন ঘন সংবিধান পরিবর্তন করা খারাপ, কারণ তাতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করার প্রবণতা থাকে এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিঘ্ন ঘটায়। তিনি সভাকে বলেন, আর্টিকেল- ৩১ খসড়া কমিটির তৈরি নয়Ñ প্যাটেল, নেহরু ও পন্থÑ এই তিন প্রধান ব্যক্তিত্বের আপসমীমাংসার ফল। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সমর্থন করেছিলেন প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্যক্তি করেছিলেন তার বিরোধিতা, আর তৃতীয়জন অবলম্বন করেছিলেন মধ্যপন্থা।

পন্থ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিলের উপর আম্বেদকরের ভাষণের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্রূপ করে বলেন, তিনি বিরোধী বেঞ্চে বসা ডঃ আম্বেদকরের চেয়ে আইনমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকরের সাথে থেকেই ভুল করতে পছন্দ করেন। প্রস্তাবিত বিলের উপরে আম্বেদকর তাঁর ভাষণে যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন পন্থ তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে নিশ্চিত বোধ করেন এবং শ্লেষাত্মক মন্তব্য করে বলেন, "অন্যান্য ব্যাপারেও তিনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

১৯৫৫ সালের মে মাস থেকে আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের আবার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। চিকিৎকের পরামর্শে অনেক আগেই তাঁর দাঁত তোলা হয়েছিল। যখন ঘুম থেকে উঠতেন এবং ঘরের ভিতর চলাফেরা করতেন, তখন তাঁর সাহায্যের দরকার হত। তাঁর শ্বাসকষ্ট ছিল। একটি অক্সিজেন সিলিণ্ডার কেনা হয়েছিল এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হত। কিন্তু এসব গোপন রাখা হয়, কারণ, ডঃ আম্বেদকর নিজেই আশঙ্কা করতেন এসব জানলে তাঁর অনুগামীরা ভয় পেয়ে যাবেন। পরে তাঁকে সপ্তাহে দু'বার অক্সিজেন দেওয়া হত। শীতকালে গরম করার যন্ত্রে তাঁর শরীরে তাপ দেওয়া হত। কখনো-কখনো তাঁকে বৈদ্যুতিক স্নানও করানো হত। প্রথম দিকে তাঁর স্ত্রী ও ডঃ মলভ্যাঙ্কর ছাড়া আর কেউ জানতেন না যে, তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ও কয়েকজন ঘনিষ্ট অনুগামী তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আম্বেদকর বাধা দিলেও শীতের সময় অল্প পরিমাণ ব্র্যাণ্ডি এবং গরমের সময় সান্ধ্যকালীন খাবারের সাথে কিছু বিয়ার খাওয়ানো হত তাঁকে। এটা ডাক্তারি পরামর্শে তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য করা হত।

তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য পাশ্চাত্য ধরনের খাবারের চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর রুচি ছিল না এবং সে জাতীয় খাবার তৈরির ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর ওজন ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। তাঁর রাজকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চেহারা এখন শীর্ণ

দেখতে। ফলে তাঁর উলের পোশাক ও স্যুট পালটাতে হয়। তাঁর ঘনিষ্ট সহকর্মীরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল; কিন্তু তা অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যায়।

যখন আম্বেদকর এরূপ মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের শেষ স্তম্ভ, যিনি তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন, সেই কমলাকান্ত চিত্রেকে নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। উদ্দেশ্য ও নেতার প্রতি উৎসর্গীকৃত চিত্রে দিনরাত সকল পরিস্থিতিতে বিশ্বাসী ও অনুগত থেকে নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সেবা করেছেন। অনেক সহকর্মীর সাথে আম্বেদকরের আগেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, অন্যান্যরা নির্দয়ভাবে বিরোধী শিবিরে বিতাড়িত এবং তাঁর কর্মীপ্রধানের এই বিদায়ে আম্বেদকর তাঁর পুরোনো এবং একান্ত অনুগত সহযোগীদের সাথে তাঁর শেষ যোগসূত্রটিকেও ছিন্ন করে দিলেন। তাঁর অসুস্থতার মধ্যে শেষের দিনগুলিতে আম্বেদকর উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ফন্দিবাজ লোকদের প্রভাবে অবরুদ্ধ ছিলেন এবং চিত্রে তারই বলি হন। কোনো মহান নেতার স্ত্রী হওয়া যথেষ্ট এক অগ্নিপরীক্ষা, কোনো মহান নেতার সচিব হওয়া নিশ্চিতরূপে এক বিরাট পরীক্ষা। হয় তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করবেন অথবা ভুল বোঝা হবে; প্রায়ই দেখা যায় তিনি দু'টো শাস্তিই ভোগ করেছেন।

অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আম্বেদকর তাঁর সহকর্মীদের ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালু রাখার জন্য দরকারী অর্থের জন্য সব সময় চিন্তিত থাকতেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট, যখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য বম্বেতে আনা হয় তখন তাঁর সোসাইটির জন্য অর্থসংগ্রহের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে চিঠি লেখেন। নেহরু একটি বার্তা পাঠান; কিন্তু আম্বেদকর তাঁর প্রস্তাবমতো একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করে বার্তাটি পুনরায় লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। ওই একই চিঠিতে রাশিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে আসায় আম্বেদকর নেহরুকে অভিনন্দনও জানান। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আম্বেদকর তাঁর কলেজের এক প্রাক্তন অধ্যাপক ও বৌদ্ধধর্মে সুপণ্ডিত ডঃ বি.জি. গোখলে, যিনি তখন আমেরিকায় ছিলেন; সেখানে কিছু ট্রাস্টের সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে তাঁর কাছেও একটি চিঠি লেখেন। তিনি লেখেন, "আমি এটা দেখেছি, আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন আমেরিকান ট্রাস্টকে রাজি করানো ভীষণ কঠিন। সম্ভবত আপনার ব্যক্তিগত কথাবার্তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।" তিনি কিছুদিনের জন্য ঔরঙ্গাবাদে ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অসুস্থতার জন্যই তিনি তখন রাজ্যসভার (Council of States) অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালের ২৯ মার্চ থেকে নবম অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছুটি মঞ্জুর করা হয়।

'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালের ২৭ আগস্ট কেন্দ্রে ও রাজ্যে আইনসভা এবং দেশের সমস্ত জেলা লোকাল বোর্ডগুলিতে তপশিলি জাতির জন্য আসন সংরক্ষণ বিলোপ করার পক্ষে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেননা কমিটি বিশ্বাস করে যে, তা বিলোপ করার সময় এসে গেছে এবং এই সংস্থান রাখার আর কোনো দরকার নেই। নির্বাচনের সময় এর বিশৃঙ্খলতা 'তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-কে হতাশ করে। কংগ্রেসের মুষিকতুল্য হরিজন প্রার্থীরা তপশিলি জাতি ফেডারেশনের সিংহতুল্য প্রার্থীদেরকে তাঁদের নিজেদের ডেরাতেই বারবার হারিয়ে দেন।

'তপশিলি জাতি ফেডারেশন' গোয়াকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সমর্থন করে। একটি নতুন সংবিধানও সে গ্রহণ করে ও রাজাভাউ খোব্রাগাড়েকে তার সম্পাদক নিযুক্ত করে। দশ বছর ধরে নিজের মতো করে অক্লান্তভাবে কাজ করার পর হট্টগোলকারী রাজভোজ আম্বেদকরের একনায়কোচিত আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং অসাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা জবরদখল করার জন্য তাঁর সমালোচনা করে তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। রাজভোজ অভিযোগ করেন যে, ডঃ আম্বেদকর তাঁর বিয়ের পর থেকেই ফেডারেশনের নেতাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং এন. শিবরাজও অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ডঃ আম্বেদকরের প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও তিনিও পরিত্যক্ত হয়েছেন।

১৯৫৬ সালের প্রথম ভাগে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই লেখার কাজ প্রায় শেষ। আম্বেদকর বইখানি লিখতে শুরু করেন ১৯৫১ সালের নভেম্বরে। এ বইখনি লেখার সাথে সাথে তিনি তাঁর প্রধান কাজকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য 'ভারতের বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব' (Revolution and Counter Revolution in India) ও 'বুদ্ধ ও কার্ল মার্কস' (Buddha and Karl Marx) নামে আরও দু'খানি বই লিখতে শুরু করেছিলেন। ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত 'বুদ্ধ ও কার্ল মার্কস' লেখা অসম্পূর্ণ ছিল। এর মধ্যে আরও একটি অধ্যায়ের দরকার ছিল এবং অন্যখানিতে সম্পূর্ণ মানে ফুটিয়ে তুলতে দরকার ছিল আরও কয়েকটি অধ্যায়ের। কিন্তু এ বই দু'খানিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়; সম্পূর্ণ হয় শুধু বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের উপর লিখিত বইখানি। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি 'হিন্দুধর্মের হেঁয়ালি' (The Riddle of Hinduism) নামে আর একখানি বই লিখতে শুরু করেন, যার মধ্যে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কীভাবে পবিত্র গঙ্গার তীরে বসে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পা ধুয়ে দিয়েছেন, সে কথা বর্ণনা করেছেন।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের উপরে লেখা বইয়ের টাইপ করা পাণ্ডুলিপি কয়েকবার সংশোধন

করা হয়। প্যারাগ্রাফগুলি বারবার উলটাপালটা করে সাজানো হয়, কয়েকবার সংখ্যায়িত করা হয়; সেগুলি কেটে আঠা দিয়ে আবার সঠিক জায়গায় জুড়ে দেওয়া হয়। কখনো সম্পূর্ণ একটা অধ্যায়ই নতুন করে লেখা হয়। সেটা এক অসাধারণ কাজ, যা সম্পাদনা করতে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব নানক চাঁদ রত্তু ও তাঁর সহকর্মী প্রকাশ চাঁদের মাসের পর মাস লেগে যায়; রত্তু কখনও মাঝরাতের আগে খাবারই খেতে পারতেন না।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের উপরে লেখা বই 'বুদ্ধ ও তাঁর নীতিমালা' (The Buddha and His Gospel) নাম দিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রচারের জন্য ছাপা হয় এবং প্রায় ৫০ কপি ব্যক্তিগত মতামতের জন্য প্রচার করা হয়। ১৯৫৬-র ফেব্রুয়ারিতে বইখানিতে 'দেবতা বলে কিছু নেই' ও 'আত্মা বলে কিছু নেই' নামে দু'টো নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়।

অসুস্থতা সত্ত্বেও আম্বেদকর পরিস্থিতির সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন। টেবিলে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে যেতেন। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে এক শনিবার তিনি রত্তুকে পরদিন খুব ভোরে আসতে বলেন। মনে হয় ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি যে বইখানি লেখা সম্পূর্ণ করেছিলেন তার মুখবন্ধ ও ভূমিকা লিখছিলেন। রত্তু নির্দেশমতো তাঁর মনিবের বাসভবনে এসে হাজির হন। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে যান, যখন দেখেন বাবাসাহেব গতরাতে যে চেয়ারখানিতে বসেছিলেন, আজও সেই চেয়ারে বসে একমনে লিখে চলেছেন। প্রায় পাঁচ মিনিট তাঁর চেয়ারের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন; তখনও তাঁর মনিব তাঁর কাজে গভীরভাবে মগ্ন। রত্তু তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাঁর টেবিলের কয়েকখানা বই এদিকওদিক করেন। অমনি মাথা তোলেন আম্বেদকর এবং রত্তুকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি তখনও বাড়ি যাননি। রত্তু বলেন, শনিবারের রাত তিনি বাড়িতেই কাটিয়েছেন; এখন রবিবার সকাল, সুতরাং সকাল সকাল কাজ শুরু করবেন বলে তিনি এসেছেন। পণ্ডিত ঋষি বলেন, "আমি ভেবেছি তুমি এখনও এখানেই আছো, বাড়ি যাওনি। ভোর হয়েছে আমি বুঝতে পারিনি। আমি লিখেই যাচ্ছিলাম, একটু নড়িওনি"। তারপর তিনি ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে তাঁর সকালের প্রার্থনা করেন, আয়রণ বারে গিয়ে সামান্য ব্যায়াম করেন, চা খান এবং আবার তাঁর কাজ শুরু করেন।

১৯৫৬ সালের ১৫ মার্চ আম্বেদকর তাঁর বইয়ের মুখবন্ধ নিজের হাতে লেখেন এবং রত্তুকে তা ডিক্টেশন দেন।

একই সময় রাজ্যসভাতেও রাজনীতি নিয়ে জোর তর্কাতর্কি চলছিল। ১৯৫৬ সালের ১ মে আম্বেদকর ভাষা-সমস্যা নিয়ে জোরালো একটি বক্তৃতা দেন। তিনি সভায় বলেন, বিলের ব্যাপারে বম্বে বিতর্কের এক ঝোড়ো কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতের প্রধান নগরী যা এক সময় দেশের বাকি অংশকে রাজনীতি ও নাগরিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে, সেটা আন্দামানের পর্যায়ে নেমে গিয়েছে এবং একটি কেন্দ্র শাসতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বম্বে মহারাষ্ট্রের অঙ্গীভূত এবং এর মূল অধিবাসীরা হচ্ছেন কোলিরা। এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন মহিয়সী লক্ষ্মীবাঈ, যাঁর কাছ থেকে পর্তুগিজরা এটাকে ইজারা নেয় ও পরে দখল করে। তিনি বলেন, যে মহারাষ্ট্রীয়রা চান বম্বে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হোক, তিনি তাঁদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন; তিনি সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। বক্তৃতা শেষ করার পরে তিনি বলেন, এটা সকলকে খুশি করবে না। এক পক্ষকাল পরে তিনি শহ্যাদ্রিদের রেখা দ্বারা বিভক্ত দু'টো মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রস্তাব দিয়ে আর একটি পরিকল্পনা দিলেন। যাইহোক, তাঁর পরামর্শ ছিল পুনা বা নাগপুরের বদলে ঔরঙ্গাবাদই হওয়া উচিত সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের রাজধানী।

'আমি কেন বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি' (Why I like Buddhism and how it is useful to the World in its present Circumstances)-এ বিষয়ে আম্বেদকরের একটি আলোচনা ১৯৫৬ সালের মে মাসে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (B.B.C.), লণ্ডন থেকে প্রচারিত হয়। তিনি বলেন, "আমি বৌদ্ধধর্মকে শ্রেয় মনে করি, কারণ এই ধর্ম একসঙ্গে তিনটি নীতির কথা বলে, যা অন্য কোনো ধর্ম বলে না। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেয় প্রজ্ঞা (কুসংস্কার ও অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে সঠিক বোধ), করুণা (প্রেম) এবং সমতা (সাম্য)। ভালো ও সুখী জীবনের জন্য মানুষ যা চায় এ হচ্ছে তাই। দেবতা বা আত্মা Ñ কেউই সমাজকে রক্ষা করতে পারে না। মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ সকল দেশের ধর্মীয় রীতিনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে।" তিনি দাবি করেন, বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে মার্কস ও তাঁর সাম্যবাদের এক পরিপূর্ণ জবাব এবং মন্তব্য করেন, "যে সব বৌদ্ধদেশ কম্যুনিজম গ্রহণ করেছে, তারা জানে না কম্যুনিজম কী। রাশিয়ার ধরনের কম্যুনিজমের লক্ষ্য রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। বৌদ্ধ কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত করতে চায় রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে। রাশিয়ার জালে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাবধান হওয়া দরকার। তাদের যা অবশ্য কর্তব্য, তা হল বুদ্ধের শিক্ষাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া। দারিদ্র আছে এবং সব সময়ই থাকবে। এমনকি রাশিয়াতেও দারিদ্র আছে। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার জন্য দারিদ্র কোনো অজুহাত হতে পারে না। একবার যদি অনুভব করা যায় যে, বুদ্ধের মতাদর্শ হচ্ছে একটি সামাজিক নীতিমালা, তাহলে চিরস্থায়ীভাবে এর পুনরভ্যুদয় হবে।"

এই সময় 'ভয়েস অব আমেরিকা'-র জন্য দেওয়া বক্তৃতায় আম্বেদকর ভারতে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে প্রজাতন্ত্র বা

সংসদীয় সরকারের সাথে সমান বিবেচনা করা যায় না। গণতন্ত্রের শিকড় সংসদীয় বা অন্য কোনো রকম সরকারের মধ্যে বিস্তৃত নয়। আম্বেদকর মন্তব্য করেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে মিলেমিশে বসবাস করার একটি পদ্ধতি। গণতন্ত্রের শিকড় খুঁজতে হবে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, যারা সমাজ গঠন করে, সেই সাধারণ মানুষের সংযুক্ত জীবন যাপন প্রণালীর মধ্যে।" ভারতীয় সমাজের ভিত্তি হচ্ছে জাতপাত, যা তাদের জীবনে কেবল বর্জনই করায়। ভোট দেওয়া ও প্রার্থী ঠিক করাও হয় জাতের ভিত্তিতে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পদগুলি শিল্পপতিদের জাতের লোকেরাই দখল করে; বাণিজ্য ভবন তো একটি মাত্র জাতেরই শিবির; বদান্যতাও সাম্প্রদায়িক। জাত প্রথা ঘৃণার এক নিম্নমুখী সিঁড়ি। জাত ও শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছেÑ শ্রেণি ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা (isolation) নেই, কিন্তু জাতব্যবস্থার মধ্যে আছে।"

উপসংহারে আম্বেদকর বলেন, "ভারতীয় সমাজে নিম্নস্তরের যারা জাতব্যবস্থা দূর করতে আগ্রহী, তাদেরকে যদি তোমরা শিক্ষা দাও, তাহলেই জাতব্যবস্থা দূর হবে। এই মুহূর্তে ভারত সরকার ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার ব্যাপারে বাছবিচারহীনভাবে যে সাহায্য দিচ্ছে, তা জাতব্যবস্থাকেই শক্তিশালী করছে। যারা জাতব্যবস্থা দূর করতে চায়, তাদের শিক্ষাদান করলে ভারতে গণতন্ত্রের প্রত্যাশার উন্নতি হবে এবং গণতন্ত্রকে নিরাপদ ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করা হবে।"

আম্বেদকর শীঘ্রই 'রিপাব্লিকান পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, যখনই ভাল মনে হবে তখনই এ ব্যাপারে তিনি কাজ শুরু করবেন। ১৯৫৬ সালের ৫ মে বম্বের সিদ্ধার্থ কলেজের লাইব্রেরিয়ান এস.এস. রেগে-কে তিনি একখানি চিঠিতে লেখেন, "এটি একটি জরুরি বিষয়, আমি চাই আপনি বিষয়টিতে মনোযোগ দেবেন; সেটি হল আমার 'বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম' (The Buddha And His Dhamma) বইখানির প্রকাশনা।" তিনি বলেন, তিনি তাঁর এই বইখানি প্রকাশ করতে চান এবং বইখানির আদল ও তার সাইজ হবে Jeanyee Wong-এর Buddha His Life And Teaching-এর মতো। তিনি রেগেকে বইখানি Messrs. G. Claridge and Company-কে দেখাতে বলেন এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব নিতে বলেন। অসুস্থ মানুষটি মন্তব্য করেন, "আমি খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি এবং আমি চাই যত দেরিই হোক, সেপ্টেম্বরের মধ্যে বইখানি প্রকাশিত হোক। মুদ্রাকর যত তাড়াতাড়ি পারবেন, আমিও তত তাড়াতাড়ি বইখানি তাঁর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। তাঁদের আনুমানিক খরচ কতÑ আমাকে তারবার্তা করে জানান; আমি প্রায় ২০০০ কপি চাই।"

রেগের তত্ত্বাবধানে "বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম" (The Buddha And His Dhamma) ছাপা শুরু হয়। আম্বেদকর প্রুফ দেখার কাজে ব্যস্ত। সেগুলি সংশোধন করা হয় ও

কোনো সময় কিছু পংক্তি নতুন করে লেখা হয় এবং পুনরায় কম্পোজের জন্য পাঠানো হয়। একটি বিশাল কাজ রেগেকে সম্পাদন করতে হয়। বম্বের Sir Dorabji Tata Trust-এর ট্রাস্টিগণ এই বইখানি প্রকাশ করার জন্য ৩০০০ টাকার সাহায্য মঞ্জুর করে।

ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করতে ও তাঁর প্রস্তাবিত 'রিপাব্লিকান পার্টি'তে নতুন প্রজন্মকে শামিল করতে আম্বেদকর রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য একটি প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে এস.এস. রেগের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ও প্রস্তুতি নিতে তিনি তখন ব্যস্ত। আইনসভায় যোগদানের উচ্চাশা যাঁরা পোষণ করেন, এই স্কুলটি ছিল তাঁদের জন্য। এ জাতীয় স্কুল এদেশে এটাই প্রথম। এই স্কুলের অধ্যক্ষ পদের জন্য তিনি একজন উপযুক্ত লোক চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, অধ্যক্ষ হতে গেলে একজনকে অবশ্যই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে; শিক্ষক হতে গেলে তাঁর বিষয়টিতে অভিজ্ঞ হতে হবে, অবশ্যই চমৎকার বাচনভঙ্গি হবে এবং থাকবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেন, একটি স্কুলের সুখ্যাতি প্রধানত নির্ভর করে তার শিক্ষকদের বুদ্ধিমত্তা ও কথা বলার নৈপুণ্যের উপর। এস.এস. রেগে স্কুলটির রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন এবং পনেরোটি ছাত্র নিয়ে সেটি ১৯৫৬ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৫৭ সালের মার্চ পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ডঃ আম্বেদকর স্কুলটি পরিদর্শন করার কখনও সুযোগ পাননি। স্বভাবতই এক অনাথ শিশুর মতো স্কুলটির অপমৃত্যু হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথমদিকে আম্বেদকর বম্বে আসেন এবং ২৪ মে নারে পার্কে বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানের দিন ঘোষণা করেন যে, তিনি ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ করেন বীর সাভারকরকে, যিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচারিত অহিংসা নীতির উপর ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর উপর প্রচণ্ড ক্রোধে আম্বেদকর বলেন, তিনি সাভারকরকে জবাব দেবেন যদি যথার্থ জানতে পারেন সাভারকর কী বলতে চান। সাভারকারের প্রবন্ধগুলি তাঁর অন্যান্য লেখার মতোই ছিল যুক্তিযুক্ত, জোরালো ও ভাবোদ্দীপক এবং তাঁর মতামত ছিল একজন চিন্তাশীল নেতার মতামত। আম্বেদকরের সভায় রওনা হবার সময়, এমনকি তিনি যখন মঞ্চের উপরে তখনও একদল হীনমনা চাটুকার সাভারকরের লেখার জবাবে কিছু বলার জন্য তাঁকে উত্তেজিত করে তোলে। মনে হল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নেতাদের মধ্যে আবার একটা তীব্র বিতর্ক বেধে গেছে। আম্বেদকর গর্জন করে বলেন, একমাত্র যাঁরা তাঁদের উন্নতি সাধনের সংকল্প করবেন, তাঁরাই তাঁদের সমালোচনা করার অধিকারী। তিনি বলেন, তাঁর সমালোচকদের উচিত তাঁকে একা থাকতে দেওয়া; তাঁরা তাঁকে (আম্বেদকরকে) ও তাঁর লোকদেরকে

খানাডোবায় পড়ার স্বাধীনতা দিন। আম্বেদকর খোলাখুলি বলেন, তাঁর লোকেরা তাঁর মেষ, আর তিনি (আম্বেদকর) তাঁদের মেষপালক। আর কোনো ধর্মবিশেষজ্ঞ নেই, যিনি তাঁর মতো এতটা মহান। তাঁদের তাঁকেই অনুসরণ করা উচিত এবং তাতেই তাঁরা অচিরে জ্ঞানলাভ করবেন।

তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে ভিন্ন। তিনি আবারও মন্তব্য করেন, **"হিন্দুধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। বৌদ্ধধর্মে কোনো ঈশ্বর নেই। হিন্দুধর্ম আত্মায় বিশ্বাস করে। বৌদ্ধধর্মমতে আত্মা নেই। হিন্দুধর্ম চতুর্বর্ণ ও জাতব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। বৌদ্ধধর্মে জাতব্যবস্থা ও চতুর্বর্ণের কোনো স্থান নেই।"** তিনি তাঁর অনুগামীদের বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর বই শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বৌদ্ধধর্মের সংগঠনে যত রকম বিচ্যুতি ছিল তিনি তা সব দূর করেছেন। এখন তিনি তাঁকে একত্রীকরণ করবেন; সুতরাং ভারতে বৌদ্ধধর্মের জোয়ার আর কখনও অপসৃত হবে না। কম্যুনিস্টদের উচিত বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করা, যাতে তাঁরা জানতে পারবেন মানবজাতির দুর্ভাগ্য কীভাবে দূর করা যায়।

বক্তৃতায় আম্বেদকর নিজেকে মোজেসের সঙ্গে তুলনা করেন যিনি মিশর থেকে তাঁর লোকদের পরিচালিত করে স্বাধীনতার দেশ প্যালেস্টাইনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে, যে কোনো ধর্মেরই ক্রমশ দুর্বলতর হওয়ার কারণ তিনটি। স্থায়ী নীতির অভাব; বহুমুখী শক্তিমান সুবক্তার অভাব ও সহজবোধ্য আচরণনীতির অভাব। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, তিনি একটি অতি উৎকৃষ্ট বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করবেন। এভাবেই বম্বেতে তাঁর শেষ বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

আম্বেদকর, একজন বাইবেলে অনুরক্ত ছাত্র, তাঁর বাইবেল বিষয়ে সাহিত্যের প্রচুর সংগ্রহ ছিল। মোজেসের সঙ্গে তাই তিনি নিজের তুলনা করতেন। যথাযথই তাই। মোজেস চেয়েছিলেন, বাধ্যতামূলক শ্রম ও অন্তহীন দাসত্ব থেকে ইজরায়েলীদের মুক্ত করতে। মোজেস একজন রানির কাছে লালিতপালিত হন ও শিক্ষালাভ করেন। আম্বেদকর শিক্ষার সুযোগের সংস্থান পেয়েছেন একজন রাজার কাছ থেকেই। মোজেস তখনকার বিদ্যাশিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র University Temple of On থেকে শিক্ষা লাভ করেন। আম্বেদকর তাঁর জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধানী ও অর্জন করার মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মোজেসের মতো তিনিও ছিলেন শক্তিশালী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও উপাসনার কারণে মোজেস ছিলেন বিনয়ী। আম্বেদকর এই গুণটির শিক্ষা পেয়েছেন তাঁর মানুষরূপী দেবতা বুদ্ধের পদতলে বসে। উভয়েই তাঁদের লোকদেরকে বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করেছেন, তাঁদেরকে ধর্ম ও আইন দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন প্রতিশ্রুত দেশের দ্বারপ্রান্তে। মোজেস যখন তাঁর লোকদের মুক্ত করেন তখন তাঁর বয়স ছিল

আশি, এবং আম্বেদকরের বয়স তখন পঁয়ষট্টি। মোজেসের মতো আম্বেদকরও একটি জাতির সংবিধান রচনা করেন, বিশ্লেষণ করেন ও তার ব্যাখ্যা দেন।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আম্বেদকর দিল্লির ২৬ নং আলিপুর রোডে তাঁর বাসভবনে ছিলেন। জুন-জুলাই মাসে তিনি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, প্রায় হৃদয়বিদারক অবস্থা। তাঁর পা তাঁর শরীরের ভার বহন করতে পারছিল না। তাঁর দৃষ্টিশক্তি দ্রুত কমে আসছিল। বাড়িতে তিনি নিজে নিজে হাঁটাচলা করতে পারেন না। ওই অবস্থায় বাইরেও যেতে পারেন না। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না।ড্রাগ নেওয়া একটি ক্ষতিকর অভ্যাস, সেটাই তাঁকে হারিয়ে দেয়। তিনি সব সময় বন্ধুদের বা অন্য কারো কাছ থেকে ওষুধ খাওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠতেন। এসব ঔষধ বা লতাগুল্ম পাওয়া গেলেও তাঁর ডাক্তার স্ত্রী সম্ভবত সেগুলি তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত মনে করেননি। আম্বেদকর জীবনের সব আশাই হারিয়ে ফেলেন।

একজন ফরাসি মহিলা-ডাক্তার ‘কসমিক রেডিয়েশন’ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে তাঁর পা ও মেরুদণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে তাজা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আম্বেদকরের স্ত্রী একজন প্রসিদ্ধ চিৎিসক হওয়ায় সেই মহিলাটির ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করেন। কখনো-কখনো আম্বেদকর তাঁর স্ত্রীর উপর রেগে যেতেন, চিৎকার করে বলতেন, “আমার চিকিৎসা করতে অন্যদের তুমি বাধা দাও কেন, যখন তোমার ডাক্তারবাবুরা আট বছরেও আমার রোগ সারাতে পারলেন না?” তারপর তিনি তাঁর খাবার বা ওষুধও খেতেন না এবং মিষ্টি কথায় তাঁকে ভুলিয়ে খাবার ও ওষুধ খাওয়ানোর জন্য তাঁরই অবৈতনিক সচিবের বা তাঁর কোনো অনুরাগীর সাহায্য নিতে হত।

তিনি পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন ও বিমর্ষ-অন্তর এবং যখনই তিনি ভাবতেন তিনি আর তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবেন না, তখনই তিনি বিষণ্নভাবে ভীষণ কাঁদতেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর লোকদের শাসকশ্রেণিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতায় ধরাশায়ী। তিনি যা প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ করেছিলেন, তা দলিত শ্রেণির অল্পসংখ্যক শিক্ষিত মানুষ ভোগ করছেন; গ্রামের বিশাল অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে এখনও প্রায় আগের মতোই থেকে গেছেন। তিনি তাঁদের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর জীবন শেষ হয়ে আসছে, তিনি ভাবেন, অন্য কোনো দলিত শ্রেণির নেতা নেই যিনি উপযুক্ত সময় জেগে উঠবেন ও এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, তাঁর বেশিরভাগ সহকর্মীরা নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে চলেছেন।

তিনি যেসব বই লেখা সম্পূর্ণ করবেন বলে ভেবেছিলেন, সে ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত ভাবনা তাঁকে ভয়াবহ যন্ত্রণা দিত। The Buddha And Karl Marx, Revolution And Counter Revolution in India এবং The Riddle of Hiduism সম্পূর্ণ করতে হবে ও প্রকাশ করতে হবে। তাঁর মৃত্যুর পর অন্য কেউ ওই বইগুলি সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। তিনি তাঁর দেশের জন্য আরও কিছু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝলেন, সেই অবস্থায় এই কাজে আগ্রহ বজায় রাখাই কঠিন, যখন প্রধানমন্ত্রীর মতের সাথে মেলে না এমন কোনো মতকে দেশের লোক শুনতেও প্রস্তুত নন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেন, "যে দেশের লোক এত সংস্কারে আচ্ছন্ন, সে দেশে জন্ম নেওয়াও পাপ। সমস্ত দিক থেকে আমার প্রতি নানা অমর্যাদাকর শব্দ নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও যেভাবেই হোক, আমি দেশের জন্য যথেষ্ট করেছি। আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত তা করেও যাব।"একথা বলেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। একদিন তিনি তাঁর অবৈতনিক ব্যক্তিগত সচিব রত্তুকে বলেন, "**আমার লোকদের বলো Ñ আমি যা করেছি, তা করতে সমর্থ হয়েছি, দুঃখযন্ত্রণাকে ভেঙে গুড়িয়ে, জীবনে অন্তহীন কষ্ট স্বীকার করে এবং বিরোধীদের সাথে লড়াই করে আসার মধ্য দিয়ে। বিশাল কষ্টকর অবস্থা সহ্য করে এই ক্যারাভ্যানকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছি, যেখানে আজ দেখতে পাচ্ছ। অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ক্যারাভ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে সে তার পথে চলতে পারে। যদি আমার সহকর্মীরা ক্যারাভ্যানকে সামনে নিয়ে যেতে সমর্থ না হয়, তাহলে তাদের উচিত হবে সেখানেই রেখে দিতে, কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতে ক্যারাভ্যানকে পিছিয়ে দেওয়া চলবে না। এটাই আমার লোকদের কাছে আমার বার্তা।**" অসহ্য দুঃখ ও তীব্র মনঃকষ্ট নিংড়ানো তাঁর এই স্বগতোক্তি। খাবার ইচ্ছা তাঁর আর রইল না, চোখে জল নিয়ে তিনি বিছানায় শায়িত হলেন।

আম্বেদকর তখন এতটা ভেঙে পড়েছেন যে, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদরা যাঁরাই তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা বলেছেন, তাঁর মুখমণ্ডলে তখন মৃত্যু অপেক্ষমান। তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে তাঁরা অবাক হয়েছেন। বহুমূত্র রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত তাঁর শরীর সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেছে। সুইচ বন্ধ করে দেওয়ার পর বৈদ্যুতিক পাখা যেমন কিছু সময় চলতে থাকে, তেমনি তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আত্মশক্তি তাড়িত হচ্ছে ও চলছে।

আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের নির্দিষ্ট দিন ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর দ্রুত এগিয়ে আসছিল। তাঁর অনুরাগী সহকর্মীরা প্রায়ই তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে আলোচনা করতেন। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আম্বেদকর শংকরানন্দ শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাঁর বাবাসাহেবের প্রতি অসীম অনুরাগী সহকর্মী ছিলেন। বাবাসাহেব তাঁকে বলেন, তিনি তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের অনুষ্ঠানটি বম্বে, সারনাথ বা নাগপুরে করতে চান। তিনি নিজে নাগপুরকেই বেশি পছন্দ করেন; কারণ, সেটা

ঐতিহাসিক শহর, যেখানে বৌদ্ধধর্মী নাগারা প্রাচীনকালে সতেজে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর প্রভুর বার্তা পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে বুদ্ধের ধম্মচক্রকে সন্নিবেশ করে আবার গতিশীল করে তুলবেন। এক ভক্ত আম্বেদকরের কাছে তাঁর ভীতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, তাঁর অনুসারীরা যদি একযোগে সবাই তাঁকে অনুসরণ না করেন, তাহলে তা হবে এক প্রচণ্ড আঘাত, ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর। নেতা গম্ভীরভাবে উত্তর দেন যে, সমস্যাটি নিয়ে বেশ দীর্ঘকাল ধরেই তিনি ভেবেছেন এবং কোনো না কোনো ভাবে ধর্মান্তরগ্রহণের বিষয়টি বিলম্বিত করেছেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপ হচ্ছে এবং তিনি মনে করছেন, তাঁর শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং এবারে আর তিনি তাঁর ধর্মান্তরগ্রহণের দিন স্থগিত করবেন না। যাঁরা তাঁর সাথে যোগ দিতে চান, তাঁদের তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাগত জানান; যাঁরা ধর্মান্তর সমর্থন করেন না, তাঁরা যেখানে ইচ্ছা যাওয়ার জন্য স্বাধীন।

সুতরাং তিনি ডব্লিউ.এম. গডবোলেকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। গডবোলে ছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধ যান সমিতির সেক্রেটারি যেটি আম্বেদকর কিছুদিন আগে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাগপুরে যেসব আয়োজন করা হবে তাই নিয়ে আম্বেদকর গডবোলের সাথে আলোচনা করেন; তিনি চেয়েছিলেন অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীনভাবে সাফল্য লাভ করাতে। বি.বি.জে. সমিতির তরফ থেকে দলিত শ্রেণির মানুষদের কাছে একটি সাধারণ আবেদনে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, তাঁরা যেন সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিপুল সংখ্যায় দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসেন।

২৩ সেপ্টেম্বর আম্বেদকর এক সংবাদবিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রচার করেন যে, ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৬ দশহরার দিন নাগপুরে সকাল ৯ টা থেকে ১১ টার মধ্যে তাঁর বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

আম্বেদকর তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য গোরখপুর জেলার কুশিনারার রেভারেণ্ট ভিক্ষু চন্দ্রমণিকে ১৪ অক্টোবর নাগপুরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন। আপনি ভারতের বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু হওয়ায় এই অনুষ্ঠান আপনার দ্বারা সম্পন্ন হলে যথোচিত হবে বলে আমরা মনে করি।" তিনি পুরোহিতকে বিমান বা ট্রেনে যাতায়াতের ভাড়া দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন এবং বলেন, তিনি কুশিনারা থেকে নাগপুরে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য কাউকে পাঠাবেন।

তারপর আম্বেদকর তাঁর নিজের, স্ত্রীর ও রত্তুর জন্য ১১ অক্টোবরের প্লেনের টিকিট কাটেন। ডি. ভ্যালিসিনহাকে তিনি চিঠিতে লেখেন, তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে, মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করুক। তিনি তাঁকে জানান, প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নিয়ম-পদ্ধতি কী, সে সম্পর্কে

তাঁর ধারণা নেই। প্রথা অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও তিনি নিজে অনেকগুলি শপথের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি প্রস্তুত করেছেন, যা 'ধম্ম দীক্ষা অনুষ্ঠান'-এর সময় একজন ভিক্ষু বা কোনো সাধারণ বৌদ্ধ পাঠ করাবেন। তিনি তাঁকে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য জোর করেন এবং তাঁর বন্ধু ও উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কিছু দান পাওয়া যাবে কিনা তা তাঁর কাছে জানতে চান। তিনি ভ্যালিসিনহার কাছে আবার ৫ অক্টোবর এই বলে চিঠি লেখেন যে, ভ্যালিসিনহা ও তাঁর নিজের মধ্যে দীক্ষা-অনুষ্ঠান নিয়ে যদি কিছু মতপার্থক্য থাকে, তিনি কিছুটা আগে নাগপুরে এলে সেগুলি তিনি মিটিয়ে ফেলবেন।

আসন্ন ধর্মান্তরগ্রহণের বিবরণ দিয়ে ভারতের প্রখ্যাত বৌদ্ধ-পত্রিকা "মহাবোধি" আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে মন্তব্য করে, "সিংহহৃদয় নেতা ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ যখন আগামী বিজয়া দশমীর দিন সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তখন অবশ্যই বৌদ্ধ-জগতের প্রত্যেকটি জায়গা থেকে তিনবার 'সাধু' ধ্বনিত হবে। সে সাধুবাদ উচ্চারিত হবে দিব্যসুন্দর দেবতাদের মুখ থেকে এবং তা প্রতিধ্বনিত হবে স্বর্গলোক থেকে স্বর্গলোকে, শেষপর্যন্ত যতক্ষণ তা শিক্ষা-সংস্কৃতির (বুদ্ধের) সিংহাসনের পাদদেশে না পৌঁছায়। সেই ধ্বনি শুনে ভারতে বৌদ্ধধর্ম পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে দিনের তাপ সহ্য করে যাঁরা শ্রম দেন, তাঁরা ক্ষণকালের জন্য তাঁদের কাজ থামাবেন এবং তাঁদের অন্তরে আনন্দের সাথে জানবেন অবশেষে জোয়ার ফিরেছে (আবার বুঝি বৌদ্ধধর্মের স্রোতধারার মোড় ঘুরেছে)।" স্বর্গীয় আনন্দ প্রকাশের এ এক সম্পূর্ণ হিন্দুরীতি!

আম্বেদকর ১১ অক্টোবর সকালে তাঁর স্ত্রী ও রত্তুকে নিয়ে বিমানে দিল্লি ত্যাগ করে দুপুরে নাগপুরে এসে পৌঁছান। নাগপুরে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয় শ্যাম হোটেলে। সেখানে বিশাল জনতার ভিড় চাইছেন তাঁদের পরিত্রাতার চরণ স্পর্শ করতে, কিন্তু তাঁর পদচিহ্নের ধূলি ললাটে মেখেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নির্ধারিত দিনের আগে এক সপ্তাহ ধরে দলিত শ্রেণির হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা ও শিশু Ñ বিশেষ করে মাহারেরা সেণ্ট্রাল প্রভিন্সগুলির মারাঠি ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে এবং বেরার ও বম্বে থেকে, ট্রেনে করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্রোতের মতো নাগপুরে এসে পৌঁছান। গরিব লোকেরা গাড়িভাড়ার জন্য এবং তাঁদের নেতার নির্দেশিত পোশাক Ñ সাদা শাড়ি, সাদা জামা কেনার জন্য তাঁদের সামান্য যেসব অলংকার বা ছোট্ট মনোহারী দ্রব্যাদি ছিল, তা বিক্রি করেন। হাজার হাজার লোক যাঁরা সহজ যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারেননি, তাঁরা 'ভগবান বুদ্ধ কি জয়', 'বাবাসাহেব কি জয়' স্লোগান দিয়ে শত শত মাইল পথ যাত্রা করে আসেন। ঘরমুখো পর্যটকদের

মতো তাঁরা তখন আনন্দে উদ্বেলিত। স্কুলবাড়িগুলিতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়। এক বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাঁদেরকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রিত করে। কেউ কেউ হোটেলে খাবার খান, অন্য সবাই খোলা জায়গায় রান্না করেন। সমস্ত পরিবেশটাই তখন বৌদ্ধ ধার্মিকতায় পূর্ণ। প্রাচীন কালের বৌদ্ধধর্মের মহান পণ্ডিত নেতা নাগার্জুনের বাসস্থান বলে পবিত্র নাগপুর এখন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারায় এক মহান গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থানে রূপান্তরিত। দর্শকদের বিশাল ভিড় গন্তব্যের দিকে যাওয়ার পথে গগনভেদী স্লোগান দিতে থাকেনÑ"বাবাসাহেব দিচ্ছেন জাগার ডাক, সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করো", "আকাশ পাতাল অনেক ঘোরো, বৌদ্ধধর্মই গ্রহণ করো।"

শ্রদ্ধানন্দ পীঠে 'ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট'-এর কাছাকাছি ১৪ একরের সুবিস্তৃত খোলা ময়দান সুসজ্জিত ঘেরা স্থানে পরিবর্তিত হয়েছে। উত্তরপ্রান্তে শ্বেতবস্ত্রে সারিবদ্ধ এবং সাঁচিস্তূপের অবিকল অনুকরণে বেষ্টিত বিশাল বেদি। তার দু'দিকেই রয়েছে বিশেষভাবে তৈরি দু'টি প্যাণ্ডেলÑ একটি পুরুষদের অন্যটি মহিলাদের। নীল, লাল ও সবুজ রঙের ডোরাকাটা বৌদ্ধ পতাকা সর্বত্র পতপত করে উড়ছে। সেখানে যাওয়ার সব ক'টি প্রবেশদ্বার ও সড়ক রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো।

১৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় আম্বেদকর একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভগবান বুদ্ধ নিজে যে ধর্মবিশ্বাসের কথা প্রচার করে গেছেন, তাঁর বৌদ্ধধর্ম সেই মতবাদই কঠোরভাবে মেনে চলবে, হীনযান ও মহাযানের জন্য যেসব মতানৈক্যের উদ্ভব হয়েছে, সেগুলির মধ্যে তিনি তাঁর লোকদের কোনোভাবে জড়িত করবেন না।

তাঁর বৌদ্ধধর্ম হবে নব্য বৌদ্ধধর্ম বা নবযান। যখন জিজ্ঞেস করা হয় কেন তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছেন, তিনি রাগতভাবে বলেন, "আপনি নিজেকে ও আপনার পূর্বপুরুষদের কেন জিজ্ঞেস করতে পারছেন না, কেন আমি হিন্দুসমাজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছি?" তিনি সাংবাদিকদের কাছে প্রশ্ন করেন, তাঁরা কেন চান তাঁর লোকেরা শুধুমাত্র সংরক্ষণের মতো সুবিধা ভোগ করার জন্য হরিজন হয়ে থাকবে। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, এইসব বিশেষ অধিকার ভোগ করার জন্য ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্য হতে তৈরি আছেন কিনা। তিনি বলেন যে, মনুষ্যত্ব অর্জন করার জন্য তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি একবার মহাত্মা গান্ধিকে বলেছিলেন, যদিও অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে তিনি গান্ধির থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, তাহলেও সময় এলে "দেশের পক্ষে সবচেয়ে কম ক্ষতিকর পথই আমি বেছে নেব; এবং সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো উপকার, যা আমি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে দেশের জন্য করতে যাচ্ছি। কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতির এক

অপরিহার্য অঙ্গ। আমি সাবধানতা অবলম্বন করেছি যাতে আমার ধর্মান্তরগ্রহণ এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসের কোনো ক্ষতি না করে।"

তিনি আলোকোজ্জ্বল চোখে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, পরবর্তী দশ বা পনেরো বছরের মধ্যে গণধর্মান্তরের ঢেউ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভারত একটি বৌদ্ধদেশে পরিণত হবে। ব্রাহ্মণরা সকলের শেষে তা অনুসরণ করবে এবং সর্বশেষই হোক তারা! রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে নিম্নতম শ্রেণির মানুষদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা তিনি সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি স্বীকার করেন, তাঁর অনুগামীরা অজ্ঞ। তিনি তাঁর বইপুস্তক ও ধর্মোপদেশের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের নীতি-নৈতিকতা তাঁদের শিক্ষা দেবেন। তাঁরা রুটির চেয়ে সম্মানকে শ্রেয় মনে করেন; তথাপি তাঁরা তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করারও যথেষ্ট চেষ্টা করবেন।

আম্বেদকর আরও বলেন, পরবর্তী নির্বাচনের আগেই 'রিপাব্লিকান পার্টি' নামে তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে চান। যাঁরা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব Ñ এই তিনটি নির্দেশক নীতি স্বীকার করে নেবেন, তাঁদর সকলের জন্যই এর দরজা খোলা থাকবে। আম্বেদকর আরও বলেন, কোনো একটি উপযুক্ত কেন্দ্র থেকে তিনি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বম্বের নতুন দ্বি-ভাষাভাষী রাজ্য যা গুজরাট ও মহারাষ্ট্রকে যুক্ত করেছে, তিনি তার সমাপ্তি ঘটানোর জন্য লড়াই করবেন। ওই উদ্দেশ্যে তিনি সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন জানাবেন, যে সমিতি ঐক্যবদ্ধ মহারাষ্ট্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

সেই সন্ধ্যায় তিনি আরও একটি সাক্ষাৎকার দেন। আম্বেদকরের মতো কর্তৃত্বব্যঞ্জক চরিত্রের মানুষেরা সাংবাদিক সম্মেলনে কদাচিৎ সফলতা লাভ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং যুক্তি দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকরা তাঁর পিছনে লেগেই আছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে সমর্থ হননি।

১৩ অক্টোবর রাতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পর পর্যন্ত ধর্মান্তরগ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা যায় নাÑ এ বিষয় নিয়ে আম্বেদকর ও তাঁর কয়েকজন নির্বাচিত সহকর্মীর মধ্যে আলোচনা হয়। সেখানে মতভেদ হয় ও আম্বেদকর ভয়ঙ্করভাবে মেজাজ হারান। তিনি তাঁদের ভয় দেখিয়ে বলেন, তাঁরা যদি সত্যের অপলাপ করেন বা দ্বিধাগ্রস্তভাবে চলেন, তাহলে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তাঁরা মেষশাবকের মতো ক্ষীণস্বরে কিছু বলে হোটেল ছেড়ে যান।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর আম্বেদকর খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়েন। তিনি রত্তুকে গরমজলে স্নান করার ব্যবস্থা করতে বলেন; তারপর প্যাণ্ডেলে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে বলেন। রত্তু খোঁজখবর নেন এবং ফিরে আসেন।

ভোর থেকে দীক্ষাভূমির দিকে মানবসমুদ্রের ঢল আসতে থাকে। সকাল হতেই ঝাড়ুদারেরা রাস্তা ঝাঁট দেন; তাঁরা মনে করেন রাস্তা ঝাঁট দেওয়া তাঁদের পরম সৌভাগ্য, কারণ ঐ রাস্তা দিয়ে তাঁদের মুক্তিদাতা অতিক্রম করে যাবেন। বুদ্ধ ও বাবাসাহেবের 'জয়' ধ্বনিতে তখন আকাশ পরিপূর্ণ।

রেশমের মতো সাদা ধূতি ও সাদা কোট পরিহিত ডঃ আম্বেদকর সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে গাড়িতে করে রত্তু ও তাঁর স্ত্রী মিসেস সবিতা আম্বেদকরকে নিয়ে হোটেল ত্যাগ করেন। মিসেস আম্বেদকরও সাদা শাড়ি পরেছিলেন। যখন তিনি প্যাণ্ডেলে পৌঁছান এবং যখন তাঁকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেই বিশাল জনতা প্রবল উৎসাহে তাঁদের মুক্তিদাতার জয়ধ্বনি দেন। এক হাতে লাঠি, অন্য হাত রত্তুর কাঁধে রেখে তিনি মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে অভিনন্দনজ্ঞাপক তুমুল হর্ষধ্বনি। তখন সকাল ৯ টা বেজে ১৫ মিনিট। ফটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ক্যামেরাম্যানরা ব্যস্ত; সাংবাদিকরা রিপোর্ট লিখছেন। মঞ্চে টেবিলের উপর একটি ব্রোঞ্জের ছোট্ট বুদ্ধমূর্তি, তার দু'পাশে ঘিরে থাকা দু'টি ব্যাঘ্রমূর্তি, তার সামনে জ্বলছে সুগন্ধি ধূপ। মঞ্চের উপরে বসে ছিলেন ডি. ভ্যালিসিনহা, ভেন.এম. সংঘরত্ন থেরা, ভেন.এইচ. সদ্দা টিসসা থেরা ও ভেন.পান্নানন্দ থেরা।

একজন মহিলার মারাঠি ভাষায় পরিবেশন করা ডঃ আম্বেদকরের প্রশস্তিমূলক সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশাল জনসমাবেশ এক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে ডঃ আম্বেদকরের পিতার মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ করে নীরবতা পালন করে। তারপরেই মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফটোগ্রাফাররা হুমড়ি খেয়ে ছুটে যান মঞ্চের দিকে। রাজ্যের সমস্ত অংশ থেকে আসা তিন লক্ষেরও অধিক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলার বিশাল জনতা আগ্রহের সাথে এই অনুষ্ঠানটি লক্ষ করেন। কুশিনারার তিরাশি বছর বয়স্ক মহাস্থবির চন্দ্রমণি ও তাঁর চারজন গৈরিক বসন পরিহিত ভিক্ষুর পরিচালনায় বুদ্ধমূর্তির সামনে আনত মস্তক ডঃ আম্বেদকর ও তাঁর সহধর্মিনী পালিভাষায় Ñ বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘ এই ত্রিশরণ এবং হত্যা, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ, অসঙ্গত যৌনজীবন ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকার পাঁচটি অনুশাসনের পঞ্চশীল নীতি পাঠ করেন। আবার তাঁরা মারাঠি ভাষায় পালি মন্ত্রটি আবৃত্তি করেন। এরপর তাঁরা বুদ্ধমূর্তির সামনে তিনবার করজোড়ে মাথা নোয়ান ও শ্বেতপদ্মের অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এর সাথে সাথেই বৌদ্ধসমাজে আম্বেদকরের প্রবেশের কথা ঘোষণা করা হয় এবং বিশাল জনতা এক সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তোলেন, 'বাবাসাহেব আম্বেদকর কি জয়' ও 'ভগবান বুদ্ধ কি জয়।' সমস্ত অনুষ্ঠানটির চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়। তখন সকাল ১০ টা বাজতে ১৫ মিনিট বাকি।

ধর্মান্তর গ্রহণে তাঁর ঘনিষ্ঠতম অনুরাগীবৃন্দের দ্বারা আম্বেদকর বিপুলভাবে

পুষ্পমালায় ভূষিত হন। ডি.ভ্যালিসিনহা ডঃ আম্বেদকর ও মিসেস সবিতা আম্বেদকরকে ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি উপহার দেন। ডঃ আম্বেদকর তখন ঘোষণা করেন, "আমার পুরোনো ধর্ম যা অসাম্য ও নিপীড়নের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে পরিত্যাগ করে আমি আজ পুনর্জন্ম লাভ করেছি। অবতারবাদের দর্শনে আমার বিশ্বাস নেই; একথা বলা অন্যায় ও ক্ষতিকর যে, বুদ্ধ বিষ্ণুর এক অবতার। আমি আর কোনো হিন্দুর দেবতা বা দেবীর ভক্ত নই। আমি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করব না। আমি বুদ্ধের অষ্টমার্গ কঠোরভাবে অনুসরণ করব। বৌদ্ধধর্ম একটি সত্যধর্ম এবং জ্ঞান, সঠিক পন্থা ও করুণা Ñ এই ত্রিশরণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমি জীবনধারণ করব।"

একবার কি দু'বার তিনি যখন হিন্দু-দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করেন এবং যখন ঘোষণা করেন, "আমি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করছি" তখন মনে হচ্ছিল এই মহান নেতা যেন গভীরভাবে বিচলিত; কথা বলার সময় দৃশ্যত তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শ্বাসরুদ্ধ। এই প্রতিজ্ঞাগুলি সংখ্যায় ছিল বাইশটি, যা তাঁর নিজেরই তৈরি করা। তিনি হিন্দুধর্ম, তার রীতিনীতি ও ঐতিহ্য পরিত্যাগ করলেন এবং ঘোষণা করলেন সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি মানুষের মধ্যে সাম্য বিস্তারের প্রচেষ্টা প্রাণপণে চালিয়ে যাবেন।

এখন একজন বৌদ্ধ ডঃ আম্বেদকর, অন্য যাঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। সমবেত জনতার সকলেই উঠে দাঁড়ান এবং সেই বিশাল জনতাকে তিনি ত্রিশরণ মন্ত্র, পঞ্চশীল নীতি ও নানাবিধ প্রতিজ্ঞা পাঠ করা পরিচালনা করেন। উচ্চস্বরে এবং সানন্দস্বরে সেই নীতি ও শপথবাণী তাঁরা পুনরায় উচ্চারণ করেন। তাঁর প্রায় তিনলক্ষ অনুগামী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর মেষপালকের সাদৃশ্যটি ব্যবহার করে বলতে হয় Ñ বৌদ্ধধর্মে তাঁদেরকে দলবদ্ধ করলেন। সব সময়ই তিনি খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টানদের এই বলে বিদ্রূপ করতেন যে, তাঁদের কাছে ধর্ম একটি উত্তরাধিকারের ব্যাপার। তাঁরা পৈতৃক সম্পত্তির সাথে ধর্মকেও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক লোকদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক তুলনামূলক ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন এবং বলতে গেলে প্রায় কেউই এভাবে পড়াশোনা করে তাঁর ধর্মবিশ্বাস লাভ করতে পারেননি। ডঃ আম্বেদকরের সাথে যাঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নাগপুর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডঃ এম.বি. নিয়োগী ও ডঃ আম্বেদকরের মহারাষ্ট্রীয় প্রধান সহযোদ্ধাগণ। ডঃ নিয়োগী অবশ্য বলেন, ডঃ আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সময় যেভাবে হিন্দুধর্মকে অভিযুক্ত করেন, বৌদ্ধদের মূল ধর্মাচারণে তার কোনো স্থান নেই। অনুষ্ঠানটি সকাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে শেষ হয়।

মহান নেতা ও তাঁর অনুগামীদেরকে বৌদ্ধধর্মে স্বাগত জানিয়ে বার্তা পাঠালেন

ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ইউ বা সোয়ে, ব্রহ্মদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউনু, কলকাতার ডঃ অরবিন্দ বরুয়া এবং কলম্বোর এইচ.ডব্লিউ. অমরসূর্য। এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে, বীর সাভারকরের কথা না বললেও নেহরু, ডঃ রাধাকৃষ্ণন, সি. রাজাগোপালাচারী বা ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো ভারতীয় কোনো বড়ো মাপের নেতার কাছ থেকে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো বার্তা আসেনি। নেহরু বিশ্বাস করতেন ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও গণতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন কিছু নেই। তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দুধর্মের মধ্যেই হৃদয়গ্রাহী বিশ্বজনীনতা রয়েছে। পরিবর্তনের সাথে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। বিভিন্ন রকম এমনকি বিরুদ্ধ মতকেও গ্রহণ করে নেওয়ার মতো সে বিশাল। নেহরুর মতে Ñ হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, কিন্তু যে কোনো পুনর্নবীকরণের মধ্য দিয়েই যেতে হোক না কেন, ভারতে ধর্মের ভিতরে সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রতিফলন থাকবেই। ইতিপূর্বে হিন্দুধর্ম বহুবার বড়ো বড়ো পরিবর্তনকে আত্মস্থ করেছে। ভারতে বৌদ্ধধর্ম আসার পর হিন্দুধর্ম কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সাথে প্রতিযোগিতায় নামেনি; সে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। রাধাকৃষ্ণন বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধ এক পবিত্রতর হিন্দুধর্ম অর্জন করারই চেষ্টা করেছিলেন।

পরদিন ওই জায়গায়তেই অন্য আর এক বিশাল অনুগামী জনতাকে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন ও বলেন, তপশিলি জাতি তাঁদের ধর্ম পরিবর্তন করলেও তাঁদের অধিকার হারাবেন না। তিনি মন্তব্য করেন, তপশিলি জাতি সংবিধানের বলে যেসব বিশেষাধিকার ভোগ করছেন, সেগুলি তাঁরই শ্রমের ফসল এবং সেগুলি তাঁর লোকদের জন্য বজায় রাখতেও তিনি সক্ষম। তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা, "যদিও জন্মগতভাবে আমি একজন হিন্দু, তাহলেও আমি হিন্দু হিসাবে মরব না।" তিনি তাঁর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন এবং এক স্বর্গীয় পরিতৃপ্তি পেয়েছেন এই ভেবে যে, অবশেষে তিনি হিন্দুধর্মের নরকযন্ত্রণা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করায় তিনি বিশ্বাসী নন; তাই তিনি চিন্তাভাবনা করার জন্য কুড়ি বছরেরও বেশি সময় নিয়ে একটি পাকাপাকি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

মার্ক্স-দর্শনের উল্লেখ করে ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করেন, "মানুষ শুধু রুটির উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে পারে না। তার একটা মন আছে, তার চিন্তার খোরাকের দরকার। ধর্ম মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে আশা প্রবেশ করায় এবং তাকে কাজ করতে পরিচালনা করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম নিপীড়িতদের প্রবল উৎসাহে একদম জল ঢেলে দিয়েছে। তাই আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন অপরিহার্য বলে মনে করি ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করি।" বৌদ্ধধর্ম স্থান ও কালের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং যে কোনো দেশে সে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। যে দেশের মানুষ মনের সংস্কৃতির চেয়ে রুটিকে শ্রেয়

মনে করে, তিনি সে দেশের সাথে কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনও রাখতে চান না। তিনি বলেন, "হিন্দুধর্ম যদি তপশিলি জাতিকে অস্ত্রধারণ করার স্বাধীনতা দিত, তাহলে এদেশ কোনোকালেই পরাধীন হত না।"

তারপর তিনি ঐকান্তিকভাবে তাঁর লোকদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, বৌদ্ধধর্মকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব তাঁদেরই কাঁধে এসে পড়েছে; যদি তাঁরা বৌদ্ধধর্মের নিয়মনীতি কঠোরভাবে এবং অত্যুজ্জ্বলরূপে অনুসরণ না করেন, তাহলে তার অর্থ হবে, মাহাররাই তাকে (ধর্মকে) শোচনীয় অবস্থায় নামিয়ে এনেছেন। পৃথিবীতে আর কোনো ব্যক্তির উপর এমন অদ্বিতীয় গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়নি যেমন তাঁর উপর হয়েছেÑ এই বলে তিনি তাঁর কথা শেষ করেন।

নাগপুরে থাকার সময়ে আম্বেদকর শ্যাম হোটেলে তাঁর দলের লোকদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, তাঁর দলের লোকেরা ধর্মের চেয়ে রাজনীতিতেই বেশি আগ্রহী; কিন্তু তিনি রাজনীতির চেয়েও ধর্মের প্রতি বেশি আগ্রহী। তপশিলি জাতি ফেডারেশন দলিত শ্রেণির মধ্যে আত্মমর্যাদার সৃষ্টি করেছে; কিন্তু তা তাঁদের এবং অন্যান্য শ্রেণিগুলির মধ্যে একটি অবরোধেরও সৃষ্টি করেছে। ব্যাপারটা এমনই এক অদ্ভুত অবস্থায় এসে গেছে যে, অন্যান্য লোকেরা তপশিলি শ্রেণির প্রার্থীদের ভোট দিচ্ছেন না; তাঁরা নিজেরাও অন্যান্য দলের প্রার্থীদের ভোট দিচ্ছেন না। সুতরাং তাঁদের দুঃখদুর্দশার প্রতি যাঁদের সহানুভূতি আছে, তাঁদেরকে নিয়ে একটি দল গঠন করতে হবে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে তাঁদের কাজ করার চেষ্টা করতে হবে।

তিনি বলেন, সমস্ত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। এটাই ছিল তাঁর শেষ রাজনৈতিক বক্তৃতা। ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি ভেঙে যাওয়ার চৌদ্দ বছর পরে তাঁর এই উপলব্ধি। তাঁর দলীয় লোকদের বা অনুগামীদের তিনি কদাচিৎ অন্য সম্প্রদায়ের সাথে মেলামেশা করতে উৎসাহিত করেছেন। একবারই ব্যতিক্রম ছিল যখন তিনি তাঁদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে বলেছিলেন ও সামগ্রিকভাবে সমস্ত জাতির কল্যাণ ও উন্নতিসাধনের কথা ভাবতে বলেছিলেন। সংবিধানের প্রধান স্থপতি হিসাবে তাঁর বিজয়গৌরব ও জয়মাল্য যখন সম্পূর্ণ তরতাজা ছিল তখনই এটা সংঘটিত হয়।

যদিও দেশের বড়ো বড়ো নেতারা ডঃ আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে নিঃস্পৃহ ছিলেন, তবুও দেশের বড়ো বড়ো সংবাদপত্রগুলি ঐকান্তিকতা ও উদ্বেগের সাথে এ ঘটনার পর্যালোচনা করে। ধর্মীয় পুনর্জন্মের মাধ্যমে একজন সৎ 'দ্বিজ' (ব্রাহ্মণ) হয়ে ওঠার জন্য ডঃ আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানিয়ে বম্বের 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' মন্তব্য করে, "যাইহোক, লোকে সন্তুষ্ট হবে যে, যখন ঐতিহ্যবাহী

হিন্দু-সমাজব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে এসেও তিনি অপরিহার্যভাবে অন্য আর একটি ভারতীয় ধর্মপথকেই বেছে নিয়েছেন, যা শিখধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও আর্যসমাজের মতো হিন্দুধর্মেরই একটি ভিন্নরূপ মাত্র।'' ধর্মান্তরগ্রহণকে বর্তমান শতাব্দীর একটি বৃহত্তম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করে নাগপুরের হিতবাদ (Hitawad) পত্রিকা বলে, "যথেষ্ট আপাতবিরোধী, ডঃ আম্বেদকর একজন অত্যন্ত যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাবিদ, বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী উচ্চ প্রবক্তারূপে সম্রাট অশোক ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মৃতির পর্যায়ে উন্নীত।'' এটি আরও বলে যে, নাগপুরে হরিজনদের ধর্মান্তরগ্রহণ হিন্দু সংস্কারকদের প্রতি এক সতর্কসঙ্কেত।

বীর সাভারকর হিন্দুর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, হিন্দু হচ্ছেন এমন একজন যার পিতৃভূমি এবং পবিত্র ভূমি হচ্ছে ভারত। ডঃ আম্বেদকরের ধর্মান্তরণকে তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যেই নিশ্চিত ঝাঁপ দেওয়া বলে বর্ণনা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বৌদ্ধ-আম্বেদকরই হিন্দু-আম্বেদকর। তিনি হিন্দুত্বের পরিমণ্ডলে অবৈদিক কিন্তু ভারতীয় একটি ধর্মব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেছেন; তাঁর মতে এটা ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন নয়। সাভারকর বলেন, ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁদের সমস্যার সমাধান করবে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই উপলক্ষ্যে মহাস্থবির চন্দ্রমণি ও অন্যান্য ভিক্ষুরা যে প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিলেন, তাতেও বলা হয়েছিল যে, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একই বৃক্ষের দু'টি শাখা।

বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এই মহান ধর্মপরিবর্তন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় স্থাপন করেছে। একজন বৌদ্ধ লেখক মন্তব্য করেন, "পরিবর্তন বোঝাতে Conversion সঠিক পরিভাষা নয়, কারণ, Conversion-এর সাথে বলপ্রয়োগ ও প্রলোভিত করার বিষয়টি জড়িত থাকে।'' তিনি বলেন, এটা হচ্ছে স্বেচ্ছা-ধর্মান্তরণ Ñ যার অর্থ, নিজের ধর্মবিশ্বাসকে ছেড়ে স্বেচ্ছায় বাইরের আর একটি ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করা। অন্য বৌদ্ধরা বলেন, অসমসাহসিক নেতার দ্বারা ধম্মচক্র আবার ঘুর্ণায়মান হয়েছে, এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিপ্লব, আধুনিক যুগে ভারতই যার সাক্ষী থাকল।

পরদিন ১৫ অক্টোবর নাগপুর মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন কর্তৃক ডঃ আম্বেদকরকে টাউন হলে স্বাগত জানানো হলে সেখানে তিনি বলেন, কংগ্রেস রাজনীতি নিয়ে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই শাসকদল যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকে, তাহলে দেশে আগুন জ্বলবে। তিনি বলেন, সংবিধান রচয়িতা হিসাবে তিনি সব সময়ই ভাবছেন, সংবিধান কীভাবে কাজ করছে ও তা দেশের মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা। তিনি নিজেকে সংবিধান রচয়িতা বলছেন কোনো

অহংকারবোধে নয়, কারণ, দেশে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা সংবিধান রচনা করতে পারতেন। তিনি প্রবলভাবে নেহরুর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাঁকে তিনি খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন, শিক্ষিত মহিলারা বিপথে যাচ্ছেন এবং নির্বাচনে লড়ার জন্য তাঁরা টিকেট পেতে নৈতিকতা বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। "বাবাসাহেবের মতো বৈশিষ্টমণ্ডিত সমাজসংস্কারক, দার্শনিক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাংবিধানিককে" পেয়ে করপোরেশন আনন্দিত হয়। ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর চান্দা-তে এক ধর্মান্তরগ্রহণ অনুষ্ঠানে আম্বেদকর যোগ দেন; যেসব শপথবাক্য তিনি তৈরি করেছিলেন, সেগুলি সেখানেও দলিত শ্রেণির বিশাল সমাবেশে পুনরাবৃত্তি করা হয়।

এরপর ডঃ আম্বেদকর চান্দা থেকে রত্তুর পাঠ করা বিভিন্ন সংবাদপত্রে গণধর্মান্তর সম্পর্কে প্রকাশিত রিপোর্ট শুনতে শুনতে দিল্লির উদ্দেশে ট্রেনে যাত্রা করেন। তবে নাগপুর পৌঁছে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা বিমানযোগে দিল্লিতে ফেরেন। যদিও তাঁকে ক্লান্ত ও নিঃশেষিত মনে হচ্ছিল, তবুও তিনি ছিলেন উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন। তিনদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর তিনি আবার ঝরঝরে ও সতেজতা অনুভব করেন এবং খুব উচ্চস্বরে গানও গেয়ে ওঠেন। তার মধ্যে একখানি ছিল কবীরের। তাঁর ঘরে রেডিওতে His Master-এর গানও শোনা গেছে। যদিও তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ, তবু তাঁর মুখ গর্ব ও আনন্দে উজ্জ্বল। বস্তুত তিনি নবযুগ সৃষ্টিকারী এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জনক। তিনি একটি মহান কাজ সুসম্পন্ন করার পবিত্র পরিতৃপ্তি পেয়েছেন এবং এইভাবে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণকে প্রতিষ্ঠিত করে ধম্মচক্রকে আবার গতিশীল করেছেন। স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের ভবিষ্যদ্‌বাণী তিনি পূর্ণ করেছেন, যিনি ১৮৮১ সালে বলেছিলেন, "বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ, আমি আবার বলছি ভারতে সম্ভাবনাময় বিষয়গুলির মধ্যে একটি।" গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি গানে আহ্বান জানিয়ে বুদ্ধের আগমনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তিমযাত্রা

ধর্মান্তরগ্রহণ অনুষ্ঠানের যেসব ছবি তোলা হয়েছিল, উৎফুল্ল মনে আম্বেদকর সেগুলি তাঁর নিকটজনদের দেখান। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বম্বেতেও ধর্মান্তরগ্রহণের কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। তিনি তাঁর গুণমুগ্ধদের কাছে এই ধর্মান্তরগ্রহণ অনুষ্ঠানের কাহিনি গভীর ও বর্ণময় আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করতেন।

এই সময় বম্বের এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলেজের পক্ষ থেকে যে রচনা সংকলন বের করা হবে তাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডঃ আম্বেদকরকে তাঁর ইচ্ছামতো যে কোনো বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। ডঃ আম্বেদকর এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে জানান যে, তিনি "গণতন্ত্র কী ও ভারতে এর সম্ভাবনাই বা কী" (What is Democracy and what are its prospects in India?)-এর উপরে লিখতে চান। তিনি জানান, তিনি নিশ্চিত নন যে সমাবেশে তিনি ভাষণ দিতে পারবেন, কারণ তাঁর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও তিনি অসুস্থ। কলেজটির জন্য একটি অর্থ তহবিলের আবেদনপত্রে তিনি সইও করেন। তবে তাঁর সই কার্যকর হবে ভেবে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি জোরাজুরি করেন যে, তাঁকে উপস্থিত থাকতেই হবে, তবে দিল্লি থেকে তাঁকে একটি বিশেষ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি ১৯৫৬ সালের ৩০ অক্টোবর ডি.ভ্যালিসিনহার ১৯৫৬ সালের ২৫ অক্টোবরে লেখা চিঠির উত্তরে তাঁর কাছে লেখেন, "এটি একটি মহৎ ঘটনা এবং ধর্মান্তরগ্রহণের জন্য সেখানে জনতার যে ভিড় এগিয়ে এসেছিল, তা ছিল আমার প্রত্যাশার বাইরে। ধন্যবাদ বুদ্ধকে Ñ সবটাই ভালোভাবে শেষ হয়েছে।" তিনি বলেন, "যাঁরা তাঁর ধম্ম গ্রহণ করেছেন, এবং আমার কথায় আরও করবেন, সেইসব মানুষদেরকে বুদ্ধ-মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করানোর পন্থা ও উপায়ের কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমি শঙ্কিত সংঘকে তার দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হবে এবং সন্ন্যাসী হওয়ার বদলে ভিক্ষুদের এখন খ্রিস্টীয় মিশনারিদের মতো সমাজসেবক ও সমাজপ্রচারক হতে হবে।"

যদিও তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ, তবুও তাঁকে নেপালের কাঠমণ্ডুতে বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে হবে বলে আম্বেদকর-ঘনিষ্টদের তরফ থেকে এই সময় প্রবল উৎসাহে একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কলকাতার এম. জ্যোতির মাধ্যমে নেপালে তাঁর থাকার

ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর সঙ্গে কাঠমণ্ডুতে যাওয়ার জন্য তাঁর স্বাস্থ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডঃ মলভ্যাঙ্করকে বম্বে থেকে দিল্লিতে ডেকে আনা হয়। ভ্রমণের সময় কাজ করবেন বলে আম্বেদকর তাঁর অসম্পূর্ণ বইয়ের পাণ্ডুলিপির কয়েকখানি সঙ্গে নেন। কিন্তু পাটনায় রওনা হওয়ার আগেই, যেখান থেকে তাঁর বিমানযোগে কাঠমাণ্ডু যাবার কথা, তাঁকে কিছুটা আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয়। বম্বেতে তাঁর আগের বাসস্থান 'রাজগৃহ'-কে বর্ধিত করার কাজে ঠিকাদারদের দাবি করা অনেক টাকা না মেটানোর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তিনি দিল্লিতে এক বন্ধুর কাছে যান এবং কিছু টাকা পান এবং বাকি টাকার ব্যবস্থা হয় বম্বেতে; মোট ৪০,০০০ টাকা তাঁকে জমা দিতে হয় বম্বে হাইকোর্টে। মিসেস আম্বেদকর বম্বে আসেন, প্রয়োজনীয় টাকা জমা দেন ও দিল্লি ফিরে যান। তারপর আম্বেদকর ও তাঁর সঙ্গীরা ১৯৫৬ সালের ১৪ নভেম্বর পাটনা থেকে বিমানযোগে কাঠমণ্ডু রওনা হন। ঔরঙ্গাবাদের মিলিন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এম.বি. চিটনিস ও বি.এইচ. ভ্যারেলও তাঁর সঙ্গী হন।

World Fellowship of Buddhists-এর চতুর্থ সম্মেলন কাঠমণ্ডুতে বসে। নেপালের রাজা মহেন্দ্র ১৯৫৬ সালের ১৫ নভেম্বর বিকেলে 'সিংহ-দরবার-গ্যালারি হলে' ওই সম্মেলনের সূচনা করেন। হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল সরকার ১৯৫৬ সালের ১৫ নভেম্বরকে ছুটির দিন ঘোষণা করে এবং শক্তিমান হিন্দু নেতা, যিনি ভারতে বুদ্ধ-মতবাদকে ধ্বংস করেন, সেই শংকরাচার্যের জীবনালেখ্যর উপরে নির্মিত একটি ভারতীয় ছায়াছবির প্রদর্শনীও নিষিদ্ধ করে। অভিযোগ এর মধ্যে কয়েকটি বৌদ্ধবিরোধী দৃশ্য রয়েছে। দেখা যায় নেপালের হিন্দু রাজা বৌদ্ধদের প্রতি ঐতিহ্যগত সহিষ্ণু মতাদর্শ গ্রহণ করলেও, তাঁর এই সহিষ্ণু মতাদর্শের পালটা ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঠমণ্ডুর ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সাম্প্রতিক কালে দেওয়া পশুপতিনাথ মন্দিরে বৌদ্ধদের প্রবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে নেয়। খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, অধিকার ফিরিয়ে নেওয়ার এই ঘোষণা হয় বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের মধ্যে আম্বেদকরের উপস্থিতির সময়ই।

এই সময় বক্তৃতা করতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেন, এই সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে এসেছেন বিশ্বের কাছে ঘোষণা করতে যে, তিনি দেখেছেন বৌদ্ধধর্মই সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্বোত্তম, কারণ এ ধর্ম স্রেফ একটি ধর্ম নয়, একটি সামাজিক মতবাদও। যখন তিনি উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিতে ওঠেন তখন সম্পূর্ণ সভা বিপুলভাবে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জানায়।

সম্মেলনের সভাপতি ডঃ মালালাসেকর পাঁচ লক্ষ অনুগামীসহ ডঃ আম্বেদকরের একমাস আগের ধর্মান্তরগ্রহণকে পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মান্তরগ্রহণ বলে বর্ণনা করেন। ২০ নভেম্বর ডঃ আম্বেদকরকে "বৌদ্ধধর্মে অহিংসা" বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য

অনুরোধ করা হয়, কিন্তু বেশির ভাগ প্রতিনিধি তাঁকে "বুদ্ধ ও কার্লমার্কসের" উপর বলার জন্য চাপ দেন। বিষয়টি গ্রহণ করে আম্বেদকর বৌদ্ধ দেশগুলিতে যেসব বৌদ্ধ কিশোর-কিশোরী কার্লমার্কসকে তাদের একমাত্র উপাস্য পয়গম্বর ভেবে তাকিয়ে আছে, তাদের ভাগ্যের কথা ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বুদ্ধ ও কার্লমার্কসের লক্ষ্য একই। মার্কস বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই দুঃখের মূল কারণ। এরই ফল হচ্ছে শোষণ, দুঃখবেদনা ও দাসত্ব। বুদ্ধও চেয়েছিলেন দুঃখ দূর করতে এবং বৌদ্ধসাহিত্যে দুঃখ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সম্পত্তি অর্থেই। বুদ্ধের মতে সব কিছুই অনিত্য; সুতরাং সম্পত্তির জন্য লড়াই নয়। ভিক্ষুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার অনুমতি নেই। বুদ্ধ তাঁর ধর্মের ভিত ঈশ্বর বা আত্মার উপর স্থাপন করেননি। সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করার পথে বুদ্ধ বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না, যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি অস্বীকার করার নীতি সমাজে প্রয়োগ করা হয়।

তিনি বলে যান, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ও কম্যুনিজমের মধ্যে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর অর্থগত দিক থেকে প্রচণ্ড রকমের পার্থক্য রয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্তিকরণে কম্যুনিজম চরমপন্থা গ্রহণ করেছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পন্থা হিসাবে বুদ্ধের নীতি গ্রহণ করেছে অহিংসার পথ। মার্কসের পদ্ধতি দ্রুত ফলদায়ক। বুদ্ধের পদ্ধতি যদিও ক্লান্তিকর, তথাপি তা অহিংসার এবং সবচেয়ে সুনিশ্চিত পথ। মানুষের মনের এবং বিশ্বমনের সংস্কারসাধন না করে জগতের সংস্কারসাধন করা সম্ভব নয়। একবার যদি মনের পরিবর্তন ঘটে, তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না; অর্জন চিরস্থায়ী হয়। মার্কসবাদের পথ বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে। আম্বেদকর ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, যদি রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্র ব্যর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্রের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য রুশ জনসাধারণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হবে। তদুপরি বৌদ্ধ-ব্যবস্থা হচ্ছে এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পক্ষান্তরে কম্যুনিস্ট-ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে একনায়কতন্ত্র। অতএব, বৌদ্ধপদ্ধতিই সব চেয়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য। বৌদ্ধভিক্ষুদের উচিত বুদ্ধ-অনুসারী জনগণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য খ্রিস্টানদের কিছু পদ্ধতি অনুকরণ করা।

জর্জ ওয়াশিংটন মন্তব্য করেছিলেন, ঈশ্বর ও বাইবেল ছাড়া পৃথিবীকে সঠিকভাবে শাসন করা অসম্ভব। **ডঃ আম্বেদকরের মতে, বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে ও ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।**

আম্বেদকরের বিরুদ্ধে কন্ট্রাক্টরদের করা বম্বে হাইকোর্টের মামলায় তাঁর পক্ষে ওকালতি করেছিলেন তাঁর আইনজীবী কে.জে. কলে এবং রত্তু এই আইনজীবীর কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়ে তা কাঠমণ্ডুতে তাঁর মনিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। ফিরে আসার পথে আম্বেদকর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী বিদ্যাপীঠে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'চ্যালেঞ্জিং' মেজাজে বক্তৃতা করেন। বুদ্ধিবৃত্তিক জয়লাভে তিনি প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস

করতেন এবং তিনি মনে করতেন শংকরাচার্য হিন্দুধর্মের জন্য যা করেছিলেন, তিনি এখন বুদ্ধ-মতবাদের জন্য তাই করবেন। "ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্‌মিথ্যা" এই জ্ঞানগর্ভ বাণীর মধ্যে শংকরাচার্যের দর্শন যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাঁর বক্তব্য রাখেন। আম্বেদকর বলেন, ব্রহ্ম যদি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত, তাহলে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন অস্পৃশ্যও সমান। কিন্তু শংকর এই মতবাদ সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেননি এবং এ আলোচনাকে রেখে দিয়েছেন একটি বেদান্তিক স্তরে। তিনি যদি সামাজিক স্তরে এর প্রয়োগ করতেন এবং সামাজিক সাম্যের কথা প্রচার করতেন, তাহলে জগৎ মিথ্যা Ñ এমন একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বদলে তাঁর এ প্রস্তাব সুগভীর ও মূল্যবান বিবেচনীয় হতে পারত।

সুতরাং, আম্বেদকর ছাত্রছাত্রীদের কাছে জানতে চান, যেসব হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ বেদের পুরুষ সূক্ত দ্বারা প্রস্থাপিত অসাম্যের শ্রেণিবিন্যাসকে সমর্থন করে এবং সামাজিক অসাম্যকে ধর্মীয় অনুমোদন দেয়, তাঁরা সেই ধর্মগ্রন্থগুলিকে অনুসরণ করবেন, না ভারতীয় সংবিধানে প্রস্থাপিত স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব Ñ এই নীতিগুলিকে সমর্থন করবেন এবং হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ যে শ্রেণিবিভাগজনিত অসাম্যকে প্রচার করে, তা খণ্ডন করবেন। আম্বেদকর এরপরে পবিত্র বৌদ্ধ-স্থানগুলি দ্বিতীয়বার পরিদর্শন শেষ করেন। তিনি কুশিনগর থেকে ফিরে এসে ১৯৫৬ সালের ৩০ নভেম্বর বিমানযোগে দিল্লি পৌঁছান। বিমানবন্দর থেকে বাসভবনে যাওয়ার পথে আম্বেদকর রত্তুকে প্রথম তাঁর (আম্বেদকরের) কুকুরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কুকুরটি ক'দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এবং পরে তিনি তাঁর মামলার ব্যাপারে খোঁজ নেন।

ফিরে আসার পরই তাঁকে বিমর্ষ, উদ্বিগ্ন ও বিষাদগ্রস্ত দেখা যায়। মিসেস আম্বেদকরের বাবা, ভাই ও ডঃ মলভ্যাঙ্কর তখন আম্বেদকর পরিবারের সাথে ছিলেন। তিনি ভীষণভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন বলে রত্তুকে রাতের জন্য তাঁর বাড়িতে থাকতে বলেন এবং রত্তু থেকেও যান। ১ ডিসেম্বর সকালে আম্বেদকর ৭ টা ১৫ মিনিটে ঘুম থেকে ওঠেন, চা খান এবং চনমনে হয়ে ওঠেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি মথুরা রোডে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনী দেখতে যান, খুব আগ্রহ সহকারে তিনি 'বুদ্ধিস্ট আর্ট গ্যালারি' দেখেন, তারপর প্রদর্শনীর বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ গুণমুগ্ধ এক ব্যক্তির, বিভিন্ন দেশের বুদ্ধমূর্তিগুলি আকৃতিতে এত আলাদা আলাদা কেন Ñ এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, **বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৬০০ বছর পর পর্যন্ত বুদ্ধের কোনো প্রতিকৃতি বা মূর্তি ছিল না। এরপর কেউ একজন তাঁর নিজের কল্পনায় বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেন এবং তারপর সমস্ত বৌদ্ধ দেশে তাদের সৌন্দর্যের আদর্শ অনুযায়ী বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়ে বহুল প্রচারিত হয়।**

বাড়িতে যাওয়ার পথে আম্বেদকর নতুন প্রকাশিত বই দেখার জন্য কনৌট প্লেসে একটি বইয়ের দোকানেও যান এবং বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য কতগুলি বইয়ের অর্ডারও দেন।

২ ডিসেম্বর আম্বেদকর অশোক বিহারে দালাইলামার সম্মানে অয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দালাইলামা বুদ্ধগয়ায় হতে যাওয়া বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০তম শীতকালীন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির লনে একখানি চেয়ারে বসে আম্বেদকর তাঁর কয়েকজন একান্ত অনুরাগীর সাথে খোশগল্প করেন এবং সেই লনে বসেই নৈশভোজন সারেন। রাত ১০টা ৩০ মিনিটের পরে তিনি শুতে যান এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি ক্লান্তি বোধ করেন এবং পরিচারকদের লনের উপরে চেয়ার পেতে দিতে বলেন। তখন মিসেস আম্বেদকরের ভাই বালু কবির তাঁদের একটি গ্রুপফটো তোলেন। এই গ্রুপের মধ্যে ছিলেন মিসেস আম্বেদকর, ডঃ আম্বেদকর, মিসেস আম্বেদকরের বাবা কে.ভি. কবির ও ডঃ মলভ্যাঙ্কার।

রাত নেমে এলে তিনি একহাতে লাঠি ও অন্য হাত রত্তুর কাঁধে ভর দিয়ে তাঁর মালি যে তিনদিনের বেশি জ্বরে ভুগছিলেন তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিতে যান। বৃদ্ধ মানুষটির জ্বর ও কাশি হয়েছে; তাঁর হতভাগিনী স্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। মালির ভয় হচ্ছিল তাঁর চাকরিই হয়তো চলে যাবে; আর যদি একেবারে এই বুড়ো বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর বউকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মালি উপরের দিকে মুখ করে বিছানায় শুয়ে সামান্য হেসে হাতজোড় করে মনিবকে সম্ভাষণ জানান; তাঁর চোখ তখন জলে ভরা। তিনি তাঁর মনিবের দয়ায় অভিভূত। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেন, "ভগবান দেখতে এসে নিজেই দয়া করেছেন আমাকে। কিন্তু স্যার, আমার জীবনের আর কোনো আশা নেই। আমার স্ত্রীর তো ..." আবার তিনি সকরুণভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। তাঁকে শান্ত করে তাঁর মনিব বলেন, "কান্না থামাও। আজ বা কাল সবাইকেই তো মরতে হবে। আমিও তো একদিন মারা যাব। সাহস রাখ। ওষুধ খাও, আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং তুমি ভালো হয়ে যাবে..." তিনি রত্তুকে বলেন, "দেখ, এই বেচারা মানুষটি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে .. কিন্তু আমি পাচ্ছি না।.. সে যে কোনো মুহূর্তে আসুক!" যে মৃত্যু গত দু'বছর তাঁর উপর ছায়া ফেলে চলেছে, এই আকস্মিক কথাগুলি কি সে শুনছিল?

আম্বেদকর ১৪ ডিসেম্বরের জন্য কয়েকখানি টিকেট রিজার্ভ করার ব্যাপারে রত্তুকে রেলওয়ে বুকিং অফিসে খোঁজ নিতে বলেন। কারণ, ১৯৫৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর বম্বেতে তাঁর অনুগামীদের ধর্মান্তরগ্রহণের একটি অনুষ্ঠান তাঁকে সম্পন্ন করতে হবে। তিনি তাঁর লাইব্রেরি থেকে মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' বইখানি বের

করলেন, তাঁর "দি বুদ্ধ অ্যাণ্ড কার্ল মার্কস" বইয়ের শেষ অধ্যায়টি লেখা শেষ করে তা টাইপ করতে দেন। মঙ্গলবার, ৪ ডিসেম্বর কিছু সময়ের জন্য আম্বেদকর রাজ্যসভায় উপস্থিত হন এবং লবিতে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেও দেখা যায়। কেউ ভাবেননি এটাই হবে তাঁর শেষ দেখা। সন্ধ্যায় তিনি দু'টো গুরুত্বপূর্ণ চিঠির ডিকটেশন দেন, একটি আচার্য পি.কে. আত্রেকে ও অন্যটি এস.এম. যোশীকে; এঁরা উভয়ই ছিলেন মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস দলের বিরোধী পক্ষের উচ্চ পর্যায়ের নেতা এবং সংযুক্ত মহারাষ্ট্র বিক্ষোভ আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা। তাঁর এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ছিল ওই দুই নেতাকে বুঝিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত 'রিপাব্লিকান পার্টি'-তে যোগ দেওয়ানো। তিনি এম.বি. সামর্থ, বার-অ্যাট-ল-কে বম্বেতে তাঁর থাকার জন্য তাঁর ভাইয়ের বাংলোখানি পাওয়া যাবে কিনা জানতে চেয়ে লেখা একখানি চিঠিরও ডিক্টেশন দেন।

যদিও আম্বেদকর ও তাঁর সঙ্গীদের বম্বে রওনা হওয়ার কথা ছিল ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৬; কিন্তু সে ব্যবস্থার বদল করা হয় এবং মিসেস আম্বেদকরের বাবা, তাঁর ভাই ও একজন যাদব ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ট্রেনে করে বম্বের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। আম্বেদকর ১৪ ডিসেম্বর বিমানযোগে বম্বে যাবার সিদ্ধান্ত নেন কারণ, ট্রেনে যাবার ধকল তিনি সহ্য করতে পারবেন না। রত্তু রাত দেড়টা পর্যন্ত টাইপিং-এর কাজ করে মনিবের বাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েন। ৫ ডিসেম্বর সকালে রত্তু আগে আগেই উঠে পড়েন এবং তাঁর মনিবকে ঘুমন্ত দেখেন। সকাল পৌনে ন'টায় মনিব ঘুম থেকে ওঠেন। রত্তু তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে পথে একটি হোটেলে খাবার খেয়ে সাইকেল করে অফিসে রওনা হয়ে যান।

দুপুর দেড়টায় মিসেস আম্বেদকর কিছু কেনাকাটা করার উদ্দেশ্যে তাঁর অতিথি ডঃ মলভ্যাঙ্কারের সাথে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। অনেকক্ষণ পরে আম্বেদকর দু-তিনবার বেল বাজিয়ে তাঁর স্ত্রীর খোঁজ নেন; কিন্তু তিনি তখনও ফেরেননি। পাচক আলো জ্বালে ও তাঁকে বাথরুমে নিয়ে যায়। এরপর আম্বেদকর চা খান। আবার তিনি বেল বাজান ও তাঁর মুখ হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে। রত্তু সন্ধ্যা ৫টা ৩০মিনিটে আসেন এবং দেখেন তাঁর মনিব মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত। তিনি রত্তুকে কিছু টাইপিং-এর কাজ দিলেন। ঠিক সেই সময় মিসেস আম্বেদকর ডঃ মলভ্যাঙ্করকে নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি ভিতরে উঁকি মেরে দেখলেন, এবং আম্বেদকরও তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধের আগুন ছুঁড়ে মারলেন। মিসেস আম্বেদকর রত্তুকে তাঁর মনিবকে শান্ত করতে বলেন।

রাত ৮টা নাগাদ তাঁর রাগ প্রশমিত হয়। আগেকার সাক্ষাৎ-সূচি অনুযায়ী জৈন-নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। আম্বেদকর

তাঁদেরকে পরের দিন ডাকার কথা ভেবেছিলেন; কিন্তু, তিনি বলেন, যেহেতু তাঁরা এসে গেছেন, সেহেতু তাঁদের সঙ্গে কথা বলাই উচিত। প্রায় ২০ মিনিট পর তিনি বাথরুমে যান। তিনি এক হাত রত্তুর কাঁধের উপর রেখে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসেন; তিনি সজোরে সোফার উপরে বসে পড়েন এবং চোখ বুজে থাকেন।

শ্রদ্ধা জানাতে জৈন নেতারা উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়েন। কয়েক মিনিটের জন্য সম্পূর্ণ নীরবতা থাকে সেখানে; জৈন-নেতারা একাগ্রচিত্তে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। সামান্য মাথা তুলে তিনি তাঁদের আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তাঁরাও সাধারণভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের খবর জানতে চাইলে তিনি বলেন, "চলে যাচ্ছে।" এরপর তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। মনে হল, তাঁরা বেশ প্রভাবিত এবং ডঃ আম্বেদকরকে "Jain aur Buddha" বইখানির একটি কপি উপহার দেন। পরদিন সকালে তাঁদের একটি অনুষ্ঠানে আম্বেদকরকে যোগ দিতে ও সেখানে তাঁদের মুনির সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। তিনি যোগ দিতে রাজি হন, অবশ্য যদি তাঁর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। সর্বশেষ দর্শনার্থীরা তাঁর বাড়ি থেকে বিদায় নিলেন। তিনি যখন জৈন-দর্শনার্থীদের সাথে কথা বলছিলেন সেই সময় তাঁর শেষ অতিথি ডঃ মলভ্যাঙ্কারও তাঁর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে রাতের বিমানে বম্বে চলে যান।

রত্তু তাঁর মনিবের পা টিপে দিচ্ছিলেন। আম্বেদকর তাঁকে তাঁর মাথায় তেল মেখে দিতে বলেন। রত্তু তাই করেন। মনিব কিছুটা আরাম বোধ করেন। হঠাৎ একটি শান্ত, আনন্দদায়ক সঙ্গীতের সুর শোনা যায়; রত্তুর বুঝতে একটু সময় লাগে যে তাঁর মনিব চোখ বুজে গান গাইছেন, তাঁর ডান হাত দিয়ে সোফার হাতল বাজাচ্ছেন। ধীরে ধীরে গান বোঝা যায় ও জোর হতে থাকে। গানের ছত্রগুলি স্পষ্ট হয় ও "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" আরও পরিষ্কার হয়। আম্বেদকর রত্তুকে রেডিওগ্রামে তাঁর প্রিয় গান বাজাতে বলেন এবং মনিব ভক্তিভরে রেকর্ড করা সঙ্গীতের সুরে নিজের সুর মেলান।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাচক সুদামা বেরিয়ে এসে বলে, রাতের খাবার তৈরি। মনিব বলেন, তিনি সামান্য ভাত ছাড়া আর কিছু খাবেন না। তিনি তখনও সেই গানের মধ্যেই সম্মোহিত হয়ে আছেন। ভৃত্যটি দ্বিতীয়বার আসে এবং আম্বেদকর খাবার ঘরে যাওয়ার জন্য ওঠেন। রত্তুর কাঁধে হাত রেখে হাঁটবার সময় তিনি বিভিন্ন আলমারি থেকে কয়েকখানি বই বের করেন। সেখানকার অন্যান্য বইগুলির দিকেও তিনি একবার তাকিয়ে দেখেন এবং সেগুলি রত্তুকে তাঁর বিছানার কাছে টেবিলের উপর রেখে দিতে বলেন। তিনি তাঁর জীবনের মহৎ ও প্রকৃত বন্ধু বইগুলির দিকে

আর একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকান, তারপর ভিতরে প্রবেশ করেন। রত্তুর সাহায্যে তিনি রান্নাঘরের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসেন। তিনি সামান্য খাবার খান এবং রত্তুকে তাঁর মাথা ম্যাসেজ করে দিতে বলেন। তারপর কবিরের একটি গান "চল কবির তেরা ভব সাগর ডেরা" গাইতে গাইতে তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে তিনি উঠে দাঁড়ান। এইভাবে তিনি রান্নাঘরের পাশেই শোবার ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে বসার পরেই মিনিট কুড়ি আগে লাইব্রেরি থেকে যে বইগুলি নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলি তিনি একের পর এক দেখে টেবিলের উপরে রেখে দেন।

এরপর তিনি তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং রত্তুকে আস্তে আস্তে তাঁর পা টিপে দিতে বলেন। রাত তখন ১১টা ১৫ মিনিট। আগের রাতে রত্তু বাড়ি যাননি। মনিবের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসছে দেখে তিনি বাড়ি যাবার কথা ভাবলেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি টেবিলের বইগুলিকে সামান্য এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করলে আম্বেদকর চোখ মেলে তাকান। রত্তু মনিবের অনুমতি নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য সাইকেল বের করলেন। কারণ রত্তু তখন ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত; এবং তিনি জানতেন, তাঁর স্ত্রী হয়তো তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন। চলে যাওয়ার জন্য তিনি গেট পর্যন্ত পৌঁছাতেই সুদামা দৌড়ে এসে বলল, বাবাসাহেব তাঁকে ডাকছেন। বাবাসাহেব রত্তুকে "বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম" (The Buddha And His Dhamma) বইখানির মুখবন্ধ ও ভূমিকার টাইপস্ক্রিপ্ট এবং আচার্য আত্রে ও এস.এ. যোশীকে লেখা তাঁর টাইপ করা চিঠি এবং বার্মা সরকারকে লেখা চিঠিখানিও আলমারি থেকে নিয়ে তাঁর টেবিলের উপর রেখে দিতে বলেন। রত্তু তাঁর মনিবের বিছানার কাছে টেবিলের উপর চিঠিগুলি, ভূমিকা ও মুখবন্ধ সব রেখে বাড়ি চলে যান। আম্বেদকর বলেন, তিনি রাতে মুখবন্ধ ও ভূমিকা পড়ে দেখবেন এবং আত্রে, যোশী ও বার্মা সরকারকে লেখা চিঠিগুলিও পড়বেন; কারণ পরদিন সেগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে। একটি ফ্লাস্কে কফিভর্তি করে ও একটি মিষ্টির থালা যথারীতি সুদামা তাঁর বিছানার কাছে রেখে দেয়। তাঁর ডাক্তার স্ত্রী, যিনি গত আট বছর ধরে তাঁর জীবন রক্ষার জন্য কঠিন লড়াই করেছেন, কিংবা তাঁর পরিচারকগণ, কারোরই সামান্যতম ধারণা ছিল না যে, মৃত্যু তাঁর শয্যার আড়ালেই লুকিয়ে ছিল।

১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর, সকালে মিসেস সবিতা আম্বেদকর স্বাভাবিক নিয়মেই ঘুম থেকে ওঠেন। ৬ টা ৩০ মিনিট নাগাদ তিনি স্বামীর বিছানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন তাঁর একটি পা বালিশের উপরে রাখা। বাগান থেকে যথারীতি একবার ঘুরে এসে তিনি রোজকার মতো তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতে যান। তিনি তাঁকে জাগাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারেন তাঁর স্বামী আর ইহজগতে নেই, তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। তিনি গাড়ি পাঠালে রত্তু আসেন। রত্তু আসতেই

মিসেস আম্বেদকর সোফার উপরে ভেঙে পড়েন এবং চিৎকার করে কেঁদে ওঠে বলেন, বাবাসাহেব এ জগত ছেড়ে চলে গেছেন। রত্তু ভাবতেই পারছিলেন না, কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলেন, "সে কী! বাবাসাহেব আর এ জগতে নেই!" রত্তু সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ম্যাসেজ করে, হাত-পা ওঠা-নামা করে, diaphragm (মধ্যচ্ছদ)-কে উপরের দিকে চাপ দিয়ে এবং তাঁর মুখে চামচে করে ব্র্যাণ্ডি তুলে দিয়ে মরদেহের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে সচল করে তোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর শ্বাসযন্ত্রকে আর সক্রিয় করতে পারলেন না। ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আম্বেদকর diabetic neurosis-এ প্রচণ্ডভাবে ভুগছিলেন। গত দু'বছরে তাঁর হৃৎযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নিরাময় হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মিসেস আম্বেদকর স্বামীর শোকে উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠেন। রত্তু তাঁর মনিবের মৃতদেহের উপর পড়ে ভীষণভাবে কেঁদে কেঁদে বলেন, "ও! বাবাসাহেব, আমি এসেছি, আমায় কাজ দিন।" তখন চমনলাল শাহ্ নামে একব্যক্তি আম্বেদকরের বাড়িতে ছিলেন। যৌগিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে তাঁর অনুশীলনের সূত্রে আম্বেদকরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এর অনেক আগে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আম্বেদকর বলেছিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস, দলিত শ্রেণির উন্নয়নের জন্য তাঁর যতদিন প্রয়োজন, তাঁর জীবন ততদিনই দীর্ঘায়িত হবে। এই বিশ্বাস তাঁর হতাশা ও স্বাস্থ্যের নানাবিধ গোলযোগের মধ্যেও তাঁকে এতদিন টেনে নিয়ে এসেছে। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, বেশি নয়, তাঁর কাজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ঈশ্বর যেন ততটুকুই আয়ু দেবার আশীর্বাদ তাঁকে করেন। হতে পারে, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন একজন মহৎব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ হলেই মারা যান। চার বছর আগে তিনি তাঁর প্রধান সহযোদ্ধা ভৌরাও গাইকোয়াড়কে লিখেছিলেন, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না; সুতরাং সেই ঘটনার জন্য ভৌরাও গাইকোয়াড় যেন তাঁর মনকে তৈরি রাখেন।

এরপর রত্তু বাবাসাহেবের ঘনিষ্ঠ মহলে এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী মহলে এই মর্মান্তিক সংবাদ পৌঁছে দেন। দাবানলের মতো এ খবর সমস্ত দিল্লিতে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর গুণমুগ্ধ, সহযোগী ও ভক্তবৃন্দÑ সমস্ত মানুষেরা ২৬ নং আলিপুর রোডে ছুটে আসেন এবং এই মহান ব্যক্তিকে শেষবারের মতো এক নজর দেখবেন বলে শীঘ্রই তাঁর বাসভবনের বাইরে জমে ওঠে অসংখ্য শোকসন্তপ্ত মানুষের ভীড়। সিদ্ধার্থ কলেজের মাধ্যমে নেতার বম্বেবাসী সঙ্গীসাথিদেরকে খবর জানানো হয় এবং তাঁদেরকে এও জানানো হয় যে, রাত্রেই তাঁর মরদেহ বিমানযোগে বম্বেতে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু, যিনি বিদেশিদের কাছে আম্বেদকরকে তাঁর মন্ত্রীসভার রত্ন বলে পরিচয় করিয়ে দিতে গর্ববোধ করতেন এবং লবিতে অথবা কোনো অনুষ্ঠানে দেখা হলে খুব আন্তরিকতার সাথে বাবাসাহেবের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতেন, তিনিই আজ আম্বেদকরের বাসভবনে ছুটে এসেছেন এবং সহানুভূতিশীল ও উদ্বিগ্নতার সাথে মিসেস আম্বেদকরের খবর নেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে তাঁর অনুগামীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থপনা সম্পর্কেও তিনি খোঁজখবর নেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থ, যোগাযোগমন্ত্রী জগজীবন রাম ও রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাসভবনে আসেন। সমস্ত পরিস্থিতি জানানোর পর জগজীবন রাম মরদেহ বম্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করেন।

ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষ এসে ভীড় করে আলিপুর রোডে এবং আশপাশের সর্বত্র যাতায়াত ব্যবস্থা রুদ্ধ হয়ে যায়। ট্রাকের ভিতর একটি মঞ্চের উপরে মৃতদেহ তোলা হয় এবং "বাবাসাহেব অমর রহে" ধ্বনি সহযোগে দিল্লিতে শব-শোভাযাত্রা বের হয়; রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে সারিবদ্ধ হয়ে পথ চলতে শুরু করেন। বিমান বন্দরে পৌঁছাতে শোভাযাত্রার পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। রাত ৯ টার সময় নেহরু স্পেশাল ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে একটি ফুলের মালা পাঠান। লোকসভা ও রাজ্যসভার সেক্রেটারিরা মহান সাংসদকে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। বিভিন্ন সংসদসদস্য, প্রখ্যাত আইনজীবীগণ ও বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ এই মহান পণ্ডিত-রাজনীতিজ্ঞকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ৯টা ৩০মিনিটে বিমান ছাড়ে। শংকরানন্দ শাস্ত্রী, ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যায়ন, মিসেস আম্বেদকর, রত্তু, সুদামা, শংকরলাল শাস্ত্রী এবং অন্যান্য আরও অনেকে মৃতদেহের সাথে যান।

ভোর ৩ টায় সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে হাজার হাজার মানুষ বিমান থেকে মরদেহ নামিয়ে আনেন; মধ্যরাতের পরে নীরব শোভাযাত্রা সহকারে শব নিয়ে যাওয়া হয় বম্বের দাদার এলাকার আম্বেদকরের পুরোনো বাসভবন 'রাজগৃহে'। লাখ লাখ মানুষ জড়ো হয়েছেন তাঁদের মুক্তিদাতাকে শেষদেখা দেখার জন্য এবং দশ ঘণ্টারও বেশি সময় সারিবদ্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতাগণ মহান নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজগৃহে যান। সমস্ত বম্বে গভীর শোকে ছেয়ে যায়। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ সকালে বম্বের কারখানা, ডক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও টেক্সটাইল মিলÑ সব বন্ধ থাকে। বম্বে মিউনিসিপ্যাল কনসারভ্যান্সির কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেন। সমস্ত স্কুল, কলেজ ও সিনেমা হল বন্ধ থাকে। মহারাষ্ট্রের শোলাপুর ও নাগপুরের মতো বিভিন্ন শহরে স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ পালিত হয় এবং শোকমিছিল বের হয়। আমেদাবাদের টেক্সটাইল মিলগুলিও সব বন্ধ থাকে। শোকাহত হয়ে অনেকে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং প্রায় জনা

কুড়ির মতো অচৈতন্য হয়ে যান।

দুপুরবেলা অন্ত্যেষ্টি শোভাযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। ফুল ও ফুলের মালায় ভর্তি ট্রাকের উপরে মরদেহ রাখা। মরদেহের মাথার কাছে রয়েছে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি। মৃতদেহের চারপাশে প্রজ্বলিত মোমবাতি, এবং চারকোণে জ্বলছে সুগন্ধি ধূপ। বেলা দেড়টায় শম্বুকগতিতে শবযাত্রা ভিনসেন্ট রোড ধরে, সেদিন থেকে যার নাম রাখা হয় ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর রোড, পয়ইবাব্‌ড়ি, এলফিনস্টোন ব্রিজ, সায়নি রোড এবং গোখেল রোড হয়ে দাদার হিন্দু শব-চুল্লির দিকে রওনা হয়। উত্তর বম্বেতে যাতায়াত ব্যবস্থা পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। সমস্ত যাত্রাপথে সারিবদ্ধ লোকের ঠাসা ভীড়; এমনকি মহান মানুষটিকে শেষবারের মতো দেখতে লোকে গাছের মাথায় চড়েও বসেছেন। আশপাশের জেলাগুলি থেকে আসা শ'য়ে শ'য়ে লোক দু'মাইল দীর্ঘ শবযাত্রায় যোগ দেন। শবযাত্রার গাড়ি যখন রাস্তা অতিক্রম করে, তখন লোকেরা অজস্র ফুল আর ফুলের মালা শবদেহের উপর বর্ষণ করতে থাকেন। অবিরত ফুলের রাশি সরিয়ে নিতে হচ্ছিল, যাতে লোকেরা প্রয়াত নেতাকে দর্শন করতে পারেন। রাজ্যের মন্ত্রী ও কংগ্রেস দলের নেতারা শবযাত্রা চলার সময় পথে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বম্বের স্মরণকালের মধ্যে বৃহত্তম অন্ত্যেষ্টিযাত্রা চারঘণ্টা পর তার গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছায়। দাদার হিন্দু-শ্মশানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শত শত পুলিশ নিয়োগ করা হয়। উচ্চপদস্থ পুলিশকর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে পুলিশি ব্যবস্থার তদারকি করেন। পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ বৌদ্ধ-পুরোহিতদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই শেষকৃত্যানুষ্ঠানের সাক্ষী থাকেন। এক লাখেরও বেশি মানুষ তাঁদের প্রয়াত নেতার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে ওই শ্মশানভূমিতেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিটে যখন তাঁর পুত্র যশোবন্তরাও চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন, জনতা তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে। নগরপুলিশ "লাস্ট পোস্ট" (বিউগলে বিদায়ের সুর) বাজিয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, যে শ্রদ্ধা বম্বে শহরে সেই প্রথম একজন বেসরকারি ব্যক্তির উদ্দেশে জানানো হয়।

ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যায়ন চিতার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, ডঃ আম্বেদকর ছিলেন একজন মহান নেতা; তিনি দেশের সেবা করেছেন এবং তিনি নির্বাণ লাভ করলেন। মালয় ও সিংহল থেকে আসা ভিক্ষুগণ প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আচার্য পি.কে. আত্রে ওই সময় বলতে গিয়ে সমুদ্রে জোয়ার আসার শব্দের মতো কণ্ঠস্বরে বলেন, ডঃ আম্বেদকর দলিত শ্রেণির মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অনেক সংগ্রাম করেছেন। আত্রের বজ্রকণ্ঠ-বক্তৃতায় পাঁচলক্ষ মানুষ চোখের জলে ভিজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে আন্দোলিত হয়ে ওঠেন।

আত্রে বলেন, আম্বেদকর অবিচার, নিপীড়ন ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন; তিনি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, তিনি তা সংস্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন।

বম্বে বিধানসভার স্পিকার এস.এল. সিলাম, বম্বে সরকারের চিপ সেক্রেটারি, মিসেস সবিতা আম্বেদকর, মুকুন্দরাও আম্বেদকর, রাও বাহাদুর বোলে, আম্বেদকরের সহযোদ্ধা বি.এস. গাইকোয়াড়, আর.ডি. ভাণ্ডারে, বি.সি. কাম্বলে, পি.টি. বোরেল এবং আম্বেদকরের সহকর্মী আচার্য এম.ভি. দণ্ডে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। এটি একটি যুগপৎ সংঘটন যে, আম্বেদকরের পার্থিব শরীর বিলীন হয়ে যাওয়ার দিন ১৯৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বরেই সাঁচিতে ২৫০০ তম বুদ্ধজয়ন্তীর ৮ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানও শেষ হয়।

আম্বেদকরের মৃত্যুতে জাতি শোকসন্তপ্ত। সব দলই বলে যে, তাঁর মৃত্যুতে ভারতের মহত্তম সন্তানদের একজন চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যু রাজনীতির জগৎ থেকে এমন এক ব্যক্তিকে অপসারিত করে, যিনি তিরিশ বছরেরও বেশি সময় জাতীয় জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিভিন্ন অপরিহার্য ও দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বের গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক চিন্তনরীতি তার শ্রেষ্ঠ বিজয়ীকে হারায়। সংবিধান রচনা ও হিন্দু-আইনের ব্যাপারে জাতির প্রতি আম্বেদকরের মহান সেবার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় বলেন, ডঃ আম্বেদকর হিন্দুসমাজের দমনপীড়নমূলক বিষয়গুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক প্রতীক হিসাবে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর এই নিপীড়নকারী বিষয়গুলির ব্যাপারে প্রবল বিরোধিতা মানুষের মনকে জাগ্রত করে রেখেছিল। যদিও তিনি অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন, তবুও সরকারি কর্মকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত গঠনমূলক ও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। যার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই বিদ্রোহ করা উচিত, সেইসব বিষয়ের বিরুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন। নেহরু ডঃ আম্বেদকরকে বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করতেন, তিনি সারাদিনের জন্য লোকসভা মুলতবি রাখার অনুরোধ করেন।

বীর সাভারকর বলেন, আম্বেদকরের মৃত্যুর ফলে ভারত একজন প্রকৃত মহামানবকে হারালো। বম্বের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি কয়াজি বলেন, ডঃ আম্বেদকর উদ্দেশ্য পূরণের জীবনযাপন করেছেন এবং নিপীড়িতদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যকে তিনি তাঁর জীবনে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন ও সেই উদ্দেশ্য তিনি শেষ পর্যন্ত পালন করে গিয়েছেন। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, আম্বেদকর আমাদের সংবিধানের স্থপতি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর দায়িত্ব পালন, বিশেষভাবে দলিত শ্রেণির উন্নয়নে তাঁর সেবামূলক কাজের পরিমাপ করা যায় না।

সি. রাজা গোপালাচারি বলেন, তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করাই ছিল আম্বেদকরের ক্রোধের শেষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যা তাঁর এই ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে দুর্ভাগ্যবশত বৌদ্ধধর্মের করুণা ও সততার মতবাদ গ্রহণ করার চেয়ে হিন্দুধর্মের বিরোধিতাই ছিল বেশি। তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ অকপট, তীক্ষ্ণ আইনজ্ঞের জ্ঞানসম্পন্ন, গর্বিত ও অনমনীয় অন্তকরণবিশিষ্ট, বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সঠিক নৈতিকতায় তাঁর কাছে গেলে সম্পূর্ণ বন্ধুভাবাপন্ন একজন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, এমন একজন ব্যক্তি জীবনের যথোপযুক্ত কাজের পরে শান্তিলাভ করেছেন।

সংবাদপত্র দুনিয়া তাঁকে দলিত শ্রেণির এক সাহসী, পরাক্রমশালী ও অক্লান্ত বীর যোদ্ধা হিসাবে বর্ণনা করে। সবাই স্বীকার করে তিনি ভারতের একজন মহান সন্তান, একজন বড়ো পণ্ডিত, একজন বিশ্ববিখ্যাত আইনবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সংসদীয় ধারা ও কার্যক্রমে একজন পারদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু বেশিরভাগই বলে যে, আম্বেদকর ছিলেন উগ্র, 'রণংদেহি' ও বিসদৃশ চরিত্রের মানুষ এবং ভারত অস্পৃশ্যতার লজ্জা দূর করার উদ্দেশ্যে সামাজিক ও আইনগত দিক থেকে যে বিরাট অগ্রগতি করে চলেছে তা তিনি উপেক্ষা করেছেন। 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া' বলে, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ, প্রতিভাশালী ও নানাবিধ বিষয়ে আগ্রহী ও কুশলী ব্যক্তি, যিনি ভিন্ন পরিবেশে তাঁর দেশ ও সমাজকে আরও অনেক বেশি সেবা দিয়ে যেতে পারতেন। আম্বালার 'ট্রিবিউন' পত্রিকা সাবধান করে দিয়ে বলে যে, আম্বেদকরের অপূর্ণ কর্মসূচি যাঁরা গ্রহণ করবেন, তাঁরা যদি একাকী লড়াই করতে যান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই হতাশাগ্রস্ত ও নিঃশেষিত হবেন। 'হিন্দুস্তান টাইমস' মন্তব্য করে, "যা থাকবে তা হল দেশের জন্য তাঁর মহান সেবামূলক কাজের স্মৃতি এবং সমকালীন ব্যক্তিদের মনে তাঁর সক্রিয় ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের ছাপ।" 'দি ফ্রি প্রেস জার্নাল' বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদ্রোহ করা ব্যক্তি হিসাবে দেশ তাঁকে দীর্ঘকাল মনে রাখবে।

তাঁর জীবনের অগ্রগতিকে বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সংগ্রাম হিসাবে বর্ণনা করে কলকাতার 'স্টেটসম্যান' মন্তব্য করে যে, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং আইন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শ্রম ও রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতা যদি আরও অনুকূল পরিবেশ পেত, তবে বিদ্যার জগতে তা তাঁকে এর থেকেও অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক অবদান রাখায় সক্ষম করে তুলত। ডঃ আম্বেদকরের বিস্ময়কর জীবনধারা সম্পর্কে উচ্চপ্রশংসা সহ অন্যায়-অবিচার ও মানবাধিকার অস্বীকারের ভিত্তিতে গড়া পুরোনো সমাজবিন্যাসকে ধ্বংস করতে যুদ্ধংদেহী শক্তিতে দক্ষ পুরুষরূপে বর্ণনা করে 'দি অমৃত বাজার পত্রিকা' মন্তব্য করে যে, তাঁর হঠাৎ মৃত্যু দেশবাসীকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁর মহান গুণাবলি ও মহান দেশপ্রেমের কথা, যা তাঁকে

উপমহাদেশের এক গুণসম্পন্ন সন্তানে পরিণত করেছে।

'দি নিউইয়র্ক টাইমস' বলে যে, আম্বেদকর সমগ্র পৃথিবীতে প্রধানত অস্পৃশ্যদের বিজয়ী বীরযোদ্ধা হিসাবেই পরিচিত ও সম্মানিত। "যে বিষয়টি সম্ভবত তেমন সুপরিচিত নয়, তা হল Ñ ভারতের আইন সংক্রান্ত নির্মাণে তিনি এক সুগভীর ছাপ রেখে গেছেন।" লণ্ডনের 'দি টাইমস' বলে যে, তাঁর প্রভাব ব্রিটিশ শাসনের শেষের বছরগুলিতে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক (socio-political) বিবর্তনের যে কোনো ইতিহাসে দীপ্যমান হয়ে থাকবে।

তারপর বার্মার প্রধানমন্ত্রী ইউ. নু. শেষ শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, এটা তর্কাতীত যে, আম্বেদকর ছিলেন প্রথিতযশা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যাঁরা মহান দেশ ভারতের ইতিহাসে এমন একটি সময়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, যখন জাতির জীবন ও সামাজিক পরিকাঠামোতে পরিবর্তনের গতিধারা এবং পরিস্থিতি একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ছাপ রাখে। বার্মার প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, যাঁরা দেশের সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার কাজে সাহায্য করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। সেই প্রক্রিয়ায় শত শত হাজার, এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষ এক উন্নততর ও অধিকতর সুখী জীবনের দিকে তাকাতে সক্ষম হয়েছেন।

আম্বেদকরের প্রয়াণের পরে এগারোতম দিনে দিল্লিতে তাঁর অনুগামীরা ভারত সরকারের কাছে আম্বেদকরের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়ে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়ে এক বিশাল সভা করেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থ ও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে একটি ডেপুটেশন দিয়ে বিষয়টিকে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য তাঁদের অনুরোধ করা হয়। তাঁর ছেলেও দিল্লিতে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সুতরাং সরকার আম্বেদকরের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য আদেশ দেয় এবং ১৯৫৭ সালের ২৬ নভেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে পন্থ লোকসভায় জানান, দিল্লির 'ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ'-এর তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রয়াত ডঃ আম্বেদকর স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিশ্ব জানে না, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ডঃ আম্বেদকর "বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম" (The Buddha And His Dhamma) বই-এ তাঁর মুখবন্ধে কৃতজ্ঞতার সাথে একটি ঋণের কথা স্বীকার করেছেন, "পাঁচ বছরের মধ্যে আমার স্বাস্থ্যের অনেকবার উন্নতি-অবনতি হয়েছে। একটা সময় আমার অবস্থা এতটাই সংকটজনক হয়েছিল যে, ডাক্তাররা আমাকে নির্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখা বলতেন। এই নির্বানোন্মুখ শিখাটির সফল পুনরুদ্দীপণের কাজ হয় আমার স্ত্রী ও চিকিৎসক ডঃ মলভ্যাঙ্করের ডাক্তারি দক্ষতার ফলে, যাঁরা আমার দেখাশোনা করতেন। তাঁদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। একমাত্র

তাঁরাই কাজটি সম্পূর্ণ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন।" এই মুখবন্ধটি Ñ বিশেষ করে এই অংশটি, কেন শেষ পর্যন্ত বই-এ প্রকাশিত হয়নি, তা এক রহস্যময় ব্যাপার।

আম্বেদকর কাঠমণ্ডুতে তাঁর 'বুদ্ধ ও কার্লমার্কস'-এর উপরে বক্তৃতায় বলেছিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে সম্পত্তিকে দুঃখ বলা হয়। তিনি সব সময় বলতেন, তিলকের ভাগ্যের মতো তিনি ভুগবেন না, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারীরা কখনও আদালতে যাবেন না। তবে তাঁর সে আশা ভুল প্রমাণিত হয়। তাঁর ছেলে ও স্ত্রী সম্পত্তিতে তাঁদের নিজ নিজ অংশের দাবি নিয়ে আদালতে গিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে আদালতেই তাঁর স্ত্রী ও ছেলের মধ্যে একটা আপসমীমাংসা হয়।

আম্বেদকরের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কয়েকটি লক্ষ করার মতো ঘটনা ঘটে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী যশবন্তরাও চ্যবন, যাঁর সুবিবেচনা ও সুষম নীতির জন্য সুখ্যাতি রয়েছে, তিনি জনগণের আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্বেদকরের জন্মদিনকে একটি সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও বাবাসাহেবের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার জন্য সরকার বৌদ্ধ-সংগঠনগুলিকে নাগপুরের কাছে যেখানে ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর ঐতিহাসিক দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল সেখানে এগারো একর জমি দান করে এবং যে দাদার হিন্দু-শ্মশানে নির্যাতিত মানুষের মুক্তিদাতাকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানেও বম্বে সরকার ছোটো আর একখণ্ড জমি দান করে। বম্বের পুরোনো সেক্রেটারিয়েটের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাবাসাহেবের একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হয় এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বম্বের দাদার চৌপাটিতে চৈত্যভূমির উপর নির্মাণ করা হয় এক বিশাল স্তূপ (প্যাগোডা)।

ডঃ আম্বেদকরের নির্দেশ অনুসারে 'রিপাব্লিকান পার্টি' গঠিত হয়; কিন্তু এটা তপশিলি জাতি ফেডারেশনের রিপাব্লিকান পার্টিতে পরিবর্তন হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠিত হওয়ার পর দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ সহযোগিতা করে লাল পার্টির কর্তৃত্বে প্রভাবিত সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতিকে ও অন্যটি সহযোগিতা করে প্রজা সোসালিস্ট পার্টিকে, যার সঙ্গে ডঃ আম্বেদকর নিজেই সহযোগিতা করতেন। নাম করার মতো কোনো বড়ো নেতা রিপাব্লিকান পার্টিতে যোগ দেননি। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে দলের নামেরই শুধু পরিবর্তন হয়েছে, আর বেশি কিছু নয়।

আম্বেদকরের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ বই "বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম" (The Buddha And His Dhamma) তাঁর মরণোত্তরকালে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আম্বেদকর যে ব্যাখ্যা রেখেছেন বা বৌদ্ধধর্ম বলতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, এই বই সেই ব্যাখ্যাই প্রদান করে। বইখানি কিছুটা বিষয়ীকেন্দ্রিক, দ্ব্যর্থহীন এবং একটি চমৎকার আদর্শ। এর ভাষা ওজস্বী। এ বই এক অত্যদ্ভুত যুক্তিযুক্ত বিতর্কে ঝকমকে

ধারাবিবরণী। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বই-এ তার লেখকের ব্যক্তিত্ব সব সময়ই প্রতিফলিত হয়। The Buddha And His Dhamma আসলে আম্বেদকরের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধের দর্শনের এক একীভবন; ঠিক যেমন 'গীতা রহস্য' তিলক ও গীতার একীভবন।

যাইহোক, ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধপত্রিকা 'মহাবোধি' তার মত প্রকাশ করে বলে যে, The Buddha And His Dhamma একখানি বিপজ্জনক বই; আম্বেদকরের কর্মতত্ত্ব ও অহিংসা তত্ত্বের ভাষ্য এবং বুদ্ধের মতবাদ যে শুধুমাত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থাÑ তাঁর এই মতবাদ বুদ্ধ-মতবাদের সঠিক স্পষ্টীকরণ নয়, বুদ্ধ-মতবাদের এক নতুন রূপ। সমালোচক মন্তব্য করেন, প্রকৃতপক্ষে নব-বৌদ্ধরা যে ঘৃণা ও আগ্রাসীতা লালন করেন এবং প্রদর্শনও করেন, সম্পূর্ণ বইখানি তাই ব্যাখ্যা করে। সমালোচক আরও বলেন, "আম্বেদকরের বুদ্ধ-মতবাদ ঘৃণার উপরে প্রতিষ্ঠিত, আর বুদ্ধ-মতবাদ করুণার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমরা আম্বেদকরের বই থেকে যা গ্রহণ করব, তা বুদ্ধের বাণী কিনা, মনে হয় সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়াই বেশি জরুরি।"

এই সমালোচক যুক্তি দেখান যে, বইখানির নাম The Buddha And His Dhamma থেকে বদল করে নাম রাখা উচিত "আম্বেদকর ও তাঁর ধম্ম" (Amdedkar And His Dhamma)। কারণ, আম্বেদকর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যেই অধম্মকে ধম্ম বলে প্রচার করেছেন।

রেঙ্গুনের The Light of the Dhamma-তে মন্তব্য করা হয়, যদিও এ বইখানি একজন মহান ব্যক্তির রচনা, তবুও দুর্ভাগ্যক্রমে এবং খুবই দুর্ভাগ্যক্রমে এটি কোনো উঁচুদরের বই নয়, যা বহুমুখী শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও লেখক লেখার পক্ষে উপযুক্ত নন। সমালোচক দেখান যে, মহান ডক্টর আদি গ্রন্থগুলিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন; যখনই তিনি দেখেছেন বুদ্ধ-মতবাদের ধারণা তাঁর নিজের কাছে বিড়ম্বনাকর, তখনই তিনি সেগুলিকে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের দ্বারা পরবর্তীকালের সংযোজন বলে নিন্দা করেছেন। তা সত্ত্বেও লেখক একজন মহান এবং সৎব্যক্তি; দুঃখজনক হচ্ছে যে, এখানি উঁচুদরের বই বা ভালো বই কোনোটাই হয়নি।

সমালোচকরা যা-ই বলুন, ভারতে আম্বেদকরের বুদ্ধ-মতবাদ ব্রাহ্ম সমাজ, সত্যশোধক সমাজ, আর্য সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের মতো একটি সংস্কার-মঞ্চ হিসাবে থেকে যাবে। জেন বুদ্ধ-মতবাদ আছে। ব্রহ্মদেশের স্বদেশি 'নাত' উপাসনা করার বুদ্ধ-মতবাদ আছে। মহাযান বুদ্ধ-মতবাদ ও হীনযান বুদ্ধ-মতবাদও আছে। আম্বেদকর প্রতিবাদী হিন্দুধর্ম চেয়েছিলেন। আপনারা তাঁর বুদ্ধ-মতবাদকে আম্বেদকরীয় অথবা Buddhist New Testament বলতে পারেন, যা অভূতপূর্বভাবে স্বদেশি ধাচে

নব-বুদ্ধ-মতবাদ রূপে আবির্ভূত হবে, যা বুদ্ধের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ভারতীয় মনের সুতোয় বোনা ধর্মীয় আচার সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যকে। হিন্দু-মতবাদ ও বুদ্ধ-মতবাদ একই বৃক্ষের শাখা; ঠিক যেমন ক্যাথলিক চার্চ ও প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ একই খ্রিস্টানধর্মের শাখা। সুতরাং ভারতে যাঁরা বুদ্ধের উপাসনা করেন, তাঁরা ভাল করবেন ডঃ রিস ডেভিডসের কথা স্মরণ করে, যিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, গৌতম জন্মেছিলেন ও লালিতপালিত হয়েছিলেন একজন হিন্দু হিসাবে এবং তিনি জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন একজন হিন্দু হিসাবেই। তাঁর শিক্ষা ছিল সুদূরপ্রসারী ও মৌলিক এবং প্রকৃতই সে যুগের ধর্ম-বিনাশক, তবুও তা ছিল আদ্যোপান্ত ভারতীয়...। তিনি ছিলেন হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, বিজ্ঞতম ও উৎকৃষ্টতম।"

'ভারত' নামটির মধ্যে আম্বেদকর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনোহারিত্ব ও চুম্বকত্ব দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাপ্তাহিকীর একটির নাম রেখেছিলেন "বহিষ্কৃত ভারত"। তাঁর ছাপাখানার নাম ছিল "ভারত ভূষণ প্রিন্টিং প্রেস"। তাঁর মন্দির-প্রবেশের লড়াই ও হিন্দু-আইন সংকলন করার সংগ্রাম তাঁর অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের কথাই জোরালোভাবে প্রকাশ করে। আপনি লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের ধর্মান্তর গ্রহণকে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু যদি ধর্মান্তর গ্রহণকে একটি বিদেশি ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করা বুঝায় তাহলে আম্বেদকরের ধর্মান্তর গ্রহণকে নয়। আম্বেদকর গোলটেবিল বৈঠকে জোরের সঙ্গে বলেছিলেন দলিত শ্রেণির মানুষকে প্রতিবাদী হিন্দু বা ভিন্নমতাবলম্বী হিন্দু বলে অভিহিত করতে হবে। কারও তাঁর সেই স্মরণযোগ্য কথা ভুলে গেলে চলবে না যা ছিল তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি Ñ "আমার মন যদি ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় অধিকার করত, তাহলে আমি পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এদেশে বিপর্যয় বয়ে আনতাম।"।

হিন্দু সংস্কৃতিতে বাস করতে তাঁর ভয় ও অনিশ্চয়তাবোধ, তাঁর এমন ধর্মগ্রহণের অঙ্গীকার করা, যে ধর্ম দলিত শ্রেণিকে বিরাষ্ট্রীয় করবে না কিংবা এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যেরও কোনো ক্ষতি করবে না Ñ এ সমস্তই প্রমাণ করে, এ দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর ধর্মের কিছু করার আছে। তাঁর ধর্ম ও রাজনীতি হাতধরাধরি করে চলেছে। এই কারণেই তাঁর বৌদ্ধ-সমালোচকরা বলেন যে, আম্বেদকরের প্রচারিত ধম্ম বুদ্ধ-মতবাদ নয়, আম্বেদকর-মতবাদ। সঠিকভাবেই তাই। তাঁর ধম্ম প্রয়োজন হলে হত্যা করার আবশ্যকতাই প্রচার করবে এবং ভারতের প্রতি তাঁর বার্তা হচ্ছে Ñ শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ভারতীয়দের দৃঢ়সংকল্প নিতে হবে।

সুতরাং ডঃ আম্বেদকরের জীবনকাহিনি হচ্ছে মানবিক অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে

এক বিজয়ী বীরের সংগ্রামকাহিনি। সারাদেশ জুড়ে শোকসভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটা মানুষের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি ছিলেন মানুষের মর্যাদা আদায়ের এক মহান যোদ্ধা ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তিদাতা। এদেশে তো নয়ই, সম্ভবত অন্য কোনো দেশেও তাঁর মতো সাড়া জাগানো, বৈচিত্রময়, রোমাঞ্চকর ও আশ্চর্যজনক কর্মধারার সমকক্ষ কেউ হতে পারেননি। গোবরের স্তূপে জন্মানো, অস্পৃশ্য হিসাবে জীবন শুরু করা, ছেলেবেলায় কুষ্ঠরোগীর মতো আচরণ পাওয়া এবং যৌবনে নিঃস্ব ও সমাজপরিত্যক্ত হওয়া, যা পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় চুলকাটা সেলুন, ছাত্রাবাস, গোরুর গাড়ি ও অফিস থেকে বহিষ্কৃত হওয়া Ñ এ সমস্তই তাঁর জীবনে এক প্রচণ্ড আঘাতের অভিজ্ঞতা। টিফিন বয়ে নেওয়া বালক হিসাবে কাজ করা, বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে উচ্চতম ডিগ্রি অর্জনের জন্য পেটে ক্ষুধা নিয়েও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া, পড়াশোনার জন্য একান্তভাবে নিয়োজিত থেকে সময় ব্যয় করা, কোনো পারিবারিক সৌভাগ্যের বলে কিংবা রাজনৈতিক আনুকূল্য লাভ ছাড়াই Ñ কখনো শল্যবিদের ক্ষুদ্র ছুরি নিয়ে, কখনো গদার মতো হাতিয়ার নিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে লড়াই করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং ভয়ানক বিপদ ও কঠিন রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখোমুখী হওয়াই যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ, বীরত্বব্যঞ্জক এবং আকর্ষণীয়।

একইসঙ্গে কোনো দলীয় প্রচার বা দলীয় সংগঠন ছাড়া নাম, যশ ও জাতীয় স্তরে বিশিষ্টতা অর্জন করা, একটি দেশের জনাধিকার, অর্থনীতি ও সংবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোতে থেকে কাজ করা, একটি সরকারের‘নির্বাহী কর্মকর্তা পরিদ’-এ (Executive Council) শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী (Labour Member) হওয়া, একটি স্বাধীন দেশের প্রথম আইনমন্ত্রী হওয়া, যে জাতি তাঁকে তাঁর বাল্যকালে পদদলিত করেছে, সেই জাতির সংবিধানের প্রধান স্থপতি হওয়া এবং যে নিগৃহীত মানুষেরা অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক, পরাধীনতার শিকল ও দাসত্ব মাথায় নিয়ে যুগ যুগ ধরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছেন, তাঁদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করা Ñ এ সমস্তই মানবজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত এক নজিরবিহীন সাফল্য। সুতরাং এক অস্পৃশ্য হিন্দুর এই সন্তান এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসে একজন শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, লেখক, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, নেতা, সংগ্রামী, ন্যায় বিচারক, আইনপ্রণেতা, সমতা সাধক ও একজন মুক্তিদাতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আম্বেদকর সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন। তিনি অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাজনীতির উপরে বই লিখেছেন। তিনি ছাত্রাবাস ও পাঠাগার পরিচালনা করেছেন। তিনি একটি আইন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি শত শত রাজনৈতিক ও সামাজিক

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। জনগণের নেতা হিসাবে তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন এবং (একাধিক) কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি কূটনীতিজ্ঞের প্রাজ্ঞতা, নেতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য, বীরোচিত সাহসিকতা, আত্মোৎসর্গীর সহিষ্ণুতা ও পণ্ডিতোচিত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি উচ্চ সরকারি অফিসকে তাঁর জ্ঞান, গণতান্ত্রিক মানসিকতা ও মানবিক মর্যাদার প্রতি তাঁর ভালবাসা দিয়ে সমৃদ্ধ করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এইটুকু জীবনকালের মধ্যে একজন অস্পৃশ্য সন্তানের এত বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী হওয়া, এত সম্মান, এত পাণ্ডিত্য অর্জন করা আধুনিক জগতে এক অতুলনীয় কৃতিত্ব।

মহামানবেরা রাজপ্রাসাদ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, আবার পর্ণকুটির থেকেও আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন মুচি, দর্জি, কশাই, রাজমিস্ত্রি ও কামারের ঘর থেকে। কিন্তু ধুলোর ভিতর থেকে আবির্ভূত হওয়ার এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা ছিল আম্বেদকরের। তিনি এমন এক পরিবারে এসেছিলেন, যাঁদের শত শত পূর্বপুরুষ এদেশের কুকুরেরও অধম বলে বিবেচিত হয়েছেন, যাঁদের স্পর্শ দূষণীয় বলে গণ্য করা হয়েছে এবং যাঁদের ছায়াকেও অপবিত্র করা হয়েছে।

সুতরাং আম্বেদকরের নাম ভারতের ইতিহাসের সাথে অবিনশ্বর হয়ে যুক্ত থাকবে। তাঁর অধিকাংশ ভাবাদর্শ সংবিধানে একীভূত হয়ে আছে। তিনি মনুর তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং উচ্চ আসন থেকে তাকে নামিয়ে দিয়েছেন। এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসে এটা একটা তুলনাহীন জয়লাভ। এইভাবে আম্বেদকর এমন অনেক কিছু পেয়েছেন যা তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অর্জনেরও অনেক ঊর্ধ্বে এবং স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তিনি আমাদের যুগের প্রথম সারির খ্যাতিসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে অন্যতম। যাঁরা নিপীড়িত ও শোষিতের পরিত্রাতা, তিনি তাঁদেরই একজন। তিনি ছ'কোটি মানুষের ভাগ্য গড়ে মহাকালের বুকে দাগ রেখে গেছেন। তিনি এদেশের ভবিষ্যতের বুকে ও মানবমুক্তির ইতিহাসে তাঁর নাম লিখে রেখে গেছেন।

আম্বেদকরের সংগ্রামী জীবন প্রমাণ করে যে, ভারতে নিগৃহীত জাতিগুলির মধ্যে উঠে দাঁড়াবার শক্তির বীজ নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাঁদের শৌর্যবীর্য ও উৎকর্ষতার অব্যাহত অস্তিত্বের এটা একটা নির্ভেজাল প্রমাণ। তাঁর জীবন নিপীড়িত মানুষদের কাছে একটি উদাহরণ ও একটি অনুপ্রেরণা, যা শ্রেণিগত বাধা, জাতিগত বাধা, বিশেষ অধিকারে বাধা, ধনসম্পদের বাধা কোনো ব্যক্তিকে– যে ধৈর্য সহকারে শ্রম, জ্বলন্ত আন্তরিকতা, চূড়ান্ত সাহস ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলায় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে থাকে তার পূর্ণতা অর্জন ও উন্নতি লাভকে নিবারণ করতে পারে না। যাঁরা মনে করতেন ব্যক্তিগত উচ্চ মর্যাদা ও সফলতা লাভ করা একমাত্র

গুটিকয়েক সুবিধাভোগী মানুষের একচেটিয়া অধিকার, তিনি তাঁদের সে ঔদ্ধত্য ঝড়ের মতো তছনছ করে দিয়েছেন। আমরা আম্বেদকরের মতো কাউকে দেখতে পাবো না। এমার্সন মন্তব্য করেছেন, একজন মহামানব জন্মগ্রহণ করা মাত্রই প্রকৃতি তাঁর ছাঁচটিকে ভেঙে ফেলে।

"ন্যক্কারজনক ক্রীতদাসত্ব ও অমানুষিক অন্যায়-অবিচার সহ্য করে যে শ্রেণি যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করছে, যাঁদের মধ্যে আমি জন্মেছি, সেইসব যদি আমি দূর করতে না পারি, তাহলে একটি বুলেটের আঘাতে আমি আমার জীবন সাঙ্গ করে দেব।" এটাই ছিল আম্বেদকরের নেওয়া মহান প্রতিজ্ঞা। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে বিলোপ করা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে, স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁর এবং তাঁর উচ্চাভিলাষও সম্পূর্ণ হয়েছে। দাসত্বের অবসান হয়েছে। তিনি যা বলেছিলেন, তিনি তা করেছেন।

ভারতভূষণ আম্বেদকরের অনন্য জীবন তাঁর ভক্তদের কাছে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভের এক নতুন উৎসে পরিণত হয়েছে। এই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এক নতুন দেবতা। মন্দিরময় ভারতে এই দেবতার মন্দিরে যে প্রদীপ জ্বলতে থাকবে, তাতে এদেশের সমস্ত দিক এবং বিশ্বের সমস্ত কোণ আলোকিত হয়ে উঠবে। বাস্তবিকই সেখানে গড়ে উঠেছে জ্ঞানচর্চার এক নতুন পীঠস্থান, এক নতুন কাব্যের প্রেরণা, এক নতুন তীর্থক্ষেত্র এবং সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য রচনার এক নতুন সুযোগ।

বাবাসাহেবের বাণী

১। আমি চাই সেই স্বাধীন ভারত, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের থাকবে সমান অধিকার, যেখানে সামাজিক নিপীড়ন থাকবে না, অস্পৃশ্যতা যেখানে পাপ বলে বিবেচিত হবে এবং জন্মগত কারণে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে না।

২। গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দর্শন নয়, গণতন্ত্র হল একটি সমাজদর্শনÑ যাতে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং যাতে প্রতিটি মানুষের সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ স্বীকৃত।

৩। গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসনব্যবস্থা এবং পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই জনসাধারণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

৪। গণতন্ত্র মূলত একটি সামাজিক পরিকাঠামো। এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে দুটো বিষয় থাকবে। প্রথমটি হল একটি মানসিক ধারণা, এই ধারণাটি হল প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাম্যের ধারণা। আর দ্বিতীয়টি হল কঠোর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত সামাজিক সংগঠন।

৫। রিপাব্লিক বা সংসদীয় সরকারের সঙ্গে গণতন্ত্রকে এক তুলাদণ্ডে মাপা যায় না। গণতন্ত্রের শিকড় সংসদীয় বা অন্য কোনো রকম সরকারের মধ্যে অন্তরিত নয়। গণতন্ত্র হল, একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার একটি রীতি। গণতন্ত্রের শিকড় খুঁজতে হবে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, যাদের নিয়ে সমাজ গঠিত হয়, সেই সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মিলিত জীবনযাত্রার শর্তাবলির ভিতরে।

৬। অধিকার ভিক্ষা করে বা অধিকার হরণকারীর বিবেকের কাছে আবেদন করে পাবে না। নিজেদের চেষ্টায় ও শক্তিতে দুর্দম লড়াইয়ের মাধ্যমে ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতেহবে। ভীরু ছাগকেই বলি দেওয়া হয়, সিংহকে নয়।

৭। মন্দিরে পূজা করে আমরা সুখী হবÑ এটা আমাদের কাছে বড়ো কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে অস্পৃশ্যদের প্রবেশে মন্দির অপবিত্র হয় না; দেবতার পবিত্রতাও নষ্ট হয় না। সেইজন্য আমরা আলাদা মন্দির গড়তে উৎসাহী নই। অন্য হিন্দুদের সঙ্গে একস্থানে পূজা করতে আগ্রহী।

৮। হিন্দু-দেবতার পূজা করার অধিকার সব হিন্দুদেরই থাকা উচিত। দক্ষিণ

আফ্রিকায় ভারতীয়দের শ্বেতজাতির সঙ্গে গাড়িতে এক কামরায় চড়তে না দেওয়ার নীতিকে হিন্দুরা গভীরভাবে নিন্দা করছেন। তাহলে স্বজাতীয় কোনো হিন্দুকেও তাঁদের মন্দিরে ঢুকতে না দেওয়া তাঁদের শোভা পায় না।

৯। আইন অনুযায়ী অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া যায় না। হিন্দুমন্দির সকল হিন্দুর, তাদের স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য যাই ভাবা হোক না কেন।

১০। হিন্দুসমাজের বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা শুধু অস্পৃশ্যদেরই সর্বনাশ করেনি, হিন্দুজাতির ও সারা দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। দলিত শ্রেণি যদি আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা পান, তাঁরা শুধু নিজেদের উন্নতি করবেন না, তাঁদের পরিশ্রম, বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে সারা দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়াবেন। সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের জন্য দলিত শ্রেণির যে লড়াইÑ মানুষ হিসাবে সবাই সমান অধিকার শুধুমাত্র তাঁদের মঙ্গলের জন্য নয়, সারা ভারতের মঙ্গলের জন্য এবং হিন্দুত্বকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন।

১১। তথাকথিত অস্পৃশ্য নিচু জাতির ছেলেমেয়েরা সুযোগ পেলে শুধু ভারতের উঁচু জাতির সমকক্ষ হতে পারে তাই নয়, তারা জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সমান বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

১২। হিন্দুদের বুঝতে হবে যে, সনাতন বা চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। পরিবর্তনশীলতাই সবকিছুর ধর্ম এবং জগৎ, জীবন ও সমাজÑ সবই পরিবর্তিত হচ্ছে। যুক্তি দিয়ে বিচার করে দরকার মতো পরিবর্তনকে গ্রহণ করতেহবে।

১৩। মহাত্মারা অমর নন। জগতে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা বাণী ছড়িয়েছেন, শিষ্যদের নিয়ে রাস্তায় ধুলোর ঝড় তুলেছেন, কিন্তু দলিত শ্রেণিকে উপরে তোলেননি। দলিত শ্রেণি অনেক চেষ্টায় মানুষের মতো বাঁচার, সমাজে উপরে ওঠার একটু সুযোগ পেয়েছেন। কারও জীবনের জন্য তাঁরা এই সুযোগ ছাড়তে রাজি নন। (পুনাচুক্তির আগে গান্ধির অনশন প্রসঙ্গে)

১৪। যদি কোনো লোক মুখে হরিনাম কীর্তন করে বগলে শাণিত ছুরি লুকিয়ে রেখে মহাত্মা বলে পরিগণিত হতে পারেন, তাহলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে নিশ্চয়ই একজন মহাত্মা বলে স্বীকার করতে হবে।

১৫। মন্দির-প্রবেশ, তীর্থদর্শন, উপবাস, ব্রতপালন করে কোনো কাজ হবে না। বাপ-ঠাকুর্দারা শত শত বছর ধরে ভগবানের সেবা করেছেন, পূজা দিয়েছেন। তাতে জীবনে সুখ, সুবিধা, শান্তি একটুও বাড়েনি। অন্যের দয়ার দানে পূতিগন্ধময় বস্তিতে কোনোভাবে তোমাদের জীবন কাটে। তোমরা রাস্তার কুকুর-বিড়ালের মতো অনাহারে, অর্ধাহারে মরো। ধর্মীয় পূজা, উপবাস, কষ্টস্বীকার তোমাদের কষ্ট লাঘব করেনি।

১৬। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই শোষণের মূল উৎস। এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা বর্ণশ্রেষ্ঠই নয়, এর দ্বারা তাঁরা অতি সহজ উপায়ে সম্মানজনক ও আরামদায়ক জীবিকা বেছে নিয়েছেন।

১৭। ব্রাহ্মণরা দেবদেবীর স্রষ্টা; দেবদেবীর মূর্তিকে সাক্ষীগোপাল হিসাবে দাঁড় করিয়ে কৌশলে চলছে ব্রাহ্মণ শ্রেণির অবাধ লুণ্ঠন।

১৮। যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ, দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি হল ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণযন্ত্র। মন্দির ও তীর্থস্থান হল শোষণের কারখানা। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা হিন্দুসমাজের রক্তচোষা বাঁদুড়।

১৯। ব্রাহ্মণদের হাত থেকে ভারতের সাংস্কৃতিক জগৎকে মুক্ত করতে না পারলে এদেশে যুক্তিবাদী মননশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে না।

২০। ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের অত্যাচারের ফলে সমাজের নিচুতলার মানুষ দলে দলে ইসলাম, খ্রিস্টান ও শিখধর্ম গ্রহণ করেছেন। ভারত ভাগ ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারেরই প্রতিক্রিয়া।

২১। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভারতের আদিবাসীদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতারণা করেছেন এবং তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করেছেন। আদিবাসীরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বনেজঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

২২। আজ প্রয়োজন সমস্ত নিপীড়িত ও বঞ্চিত শ্রেণির মানুষদের একত্রিত হয়ে ভারতের মাটি থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল উৎপাটন করে ফেলা। অন্যথায় তাঁরা মানুষের অধিকার নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না।

২৩। রাজনৈতিক ক্ষমতা হল 'মহাচাবি', যার দ্বারা আমরা সকল প্রকার অধিকারের দ্বার মুক্ত করতে পারি।

২৪। ক্ষমতার মন্দির দখল কর, সবকিছু তোমার করায়ত্ত হবে, চাইবার আগে সব সুযোগসুবিধা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।

২৫। আমি অস্পৃশ্য, শূদ্র, আদিবাসী, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের মধ্য থেকে অসংখ্য বুদ্ধিদীপ্ত নেতা চাই। কোনোপ্রকার তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট না করে আমাদের সমস্ত শক্তি বঞ্চিত সমাজের ন্যায্য অধিকার লাভের সংগ্রামে নিয়োগ করতে হবে।

২৬। গলায় পৈতা ঝুলিয়ে যাঁরা মুখে সাম্যের বাণী উচ্চারণ করেন, তাঁরা শঠ ও প্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁদের সঙ্গে কোনো আপস নয়; সংগ্রামই আমাদের শোষণমুক্তির একমাত্র পথ।